

সাহিত্যপাঠ

(গদ্য ও কবিতা)

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত।

সাহিত্যপাঠ

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি

লেখক ও সংকলক

অধ্যাপক ড. ভীমদেব চৌধুরী

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক

অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মালান

অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম

ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান

প্রীতিশকুমার সরকার

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংক্রান্ত

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৯

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০২০

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৩

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মূল্য : ১৫৯.০০ (একশত উনষাট টাকা) মাত্র

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিত্তি দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে একাদশ-স্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনক্ষল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতিচেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাহ্নত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনক্ষ জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষয করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে একাদশ-স্বাদশ শ্রেণির প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উচ্চ পাঠ্যপুস্তক প্রশংসনে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের সূজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে সূজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে অধিকাংশ বিষয়ের মূল্যায়নকে সূজনশীল করা হয়েছে।

একাদশ-স্বাদশ ও আলিম শ্রেণির বাংলা সাহিত্যগঠ শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ট্রাই আউট এর মাধ্যমে সারাদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে কিছু গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পরিবর্তন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে একদিকে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাক্রম সম্পর্কে অবগত হয় এবং অন্যদিকে এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এছাড়া এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতিচেতনা, নারী-পুরুষের সমর্যাদাবোধ, আত্মত্ববোধ, বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাকার বিষয়েও পাঠ্যপুস্তকটি প্রশংসনে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। সুস্থ চিকিৎসার চর্চা ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলাও এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রশংসনে বিপুল কর্মসূজের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলক্রটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ছফ্টিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বাসানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বাসানয়াতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, নয়না প্রযোগ প্রয়োজন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মনন, মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র : গদ্য

| পাঠ সংখ্যা | শিরোনাম | লেখক | পৃষ্ঠা নম্বর |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| ১ | আত্মরিত | ঈশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৱ | ১ |
| ২ | মহ্যা | বিজ কানাই | ৯ |
| ৩ | বাঙালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন | বকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় | ১৫ |
| ৪ | কারবালা-প্রান্তর | মীর মশাররফ হোসেন | ১৯ |
| ৫ | অপরিচিতা | রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ | ২৬ |
| ৬ | বৰ্ষা | প্ৰমথ চৌধুৱী | ৪০ |
| ৭ | বিলাসী | শৱৎচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় | ৪৪ |
| ৮ | গৃহ | রোকেয়া সাখাৱ্যাত হোসেন | ৫৮ |
| ৯ | শিক্ষাচিন্তা | কাজী আবদুল ওদুদ | ৬৫ |
| ১০ | আহ্বান | বিভূতিভূষণ বন্দেয়োপাধ্যায় | ৭০ |
| ১১ | আমাৰ পথ | কাজী নজীৱল ইসলাম | ৭৬ |
| ১২ | তাজমহল | বনফুল | ৮০ |
| ১৩ | ভুলেৱ মূল্য | কাজী মোতাহার হোসেন | ৮৪ |
| ১৪ | জীবন ও বৃক্ষ | মোতাহেৱ হোসেন চৌধুৱী | ৮৮ |
| ১৫ | মানব-কল্যাণ | আবুল ফজল | ৯২ |
| ১৬ | গন্তব্য কাবুল | সৈয়দ মুজতবা আলী | ৯৬ |
| ১৭ | মাসি-পিসি | মানিক বন্দেয়োপাধ্যায় | ১০৬ |
| ১৮ | সৌদামিনী মালো | শওকত ওসমান | ১১৪ |
| ১৯ | কলিমান্দি দফাদাৰ | আবু জাফৱ শামসুদ্দিন | ১২৪ |
| ২০ | বায়ানৰ দিনগুলো | শেখ মুজিবুৱ রহমান | ১৩২ |
| ২১ | চেতনাৰ অ্যালবাম | আবদুল হক | ১৪০ |
| ২২ | একটি তুলসী গাছেৱ কাহিনি | সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ | ১৪৮ |
| ২৩ | মানুষ | মুনীৱ চৌধুৱী | ১৫২ |
| ২৪ | মৌসুম | শামসুদ্দীন আবুল কালাম | ১৬০ |
| ২৫ | গহন কোন বনেৱ ধাৰে | বিজেন শৰ্মা | ১৬৮ |
| ২৬ | কপিলদাস মুৰুৱ শেষ কাজ | শওকত আলী | ১৭৬ |
| ২৭ | জাদুঘৰে কেন যাৰ | অনিসুজ্জামান | ১৮৬ |
| ২৮ | রেইনকোট | আখতাৰজ্জামান ইলিয়াস | ১৯৪ |
| ২৯ | মহাজাগতিক কিউটেটৱ | মুহম্মদ জাফৱ ইকবাল | ২০৪ |
| ৩০ | নেকলেস | গী দ্য মোপাস়া | ২১০ |

সুচিপত্র : কবিতা

| পাঠ সংখ্যা | শিরোনাম | কবি | পৃষ্ঠা নম্বর |
|------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| ১ | ফুল্লরার বারোমাস্যা | মুকুন্দরাম চক্রবর্তী | ২২১ |
| ২ | খাতু-বর্ণন | আলাউদ্দিন | ২২৬ |
| ৩ | অদেশ | সৈক্ষেরচন্দ্ৰ গুপ্ত | ২৩০ |
| ৪ | বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ | মাইকেল মধুসূদন দত্ত | ২৩৩ |
| ৫ | মানব-বন্দনা | অক্ষয়কুমার বড়াল | ২৪০ |
| ৬ | সুখ | কায়কোবাদ | ২৪৮ |
| ৭ | সোনার তরী | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২৫২ |
| ৮ | ঐকতান | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২৫৭ |
| ৯ | নবান্ন | যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | ২৬২ |
| ১০ | বিদ্রোহী | কাজী নজরুল ইসলাম | ২৬৬ |
| ১১ | সাম্যবাদী | কাজী নজরুল ইসলাম | ২৭২ |
| ১২ | প্রতিদান | জসীমউদ্দীন | ২৭৬ |
| ১৩ | সুচেতনা | জীবনানন্দ দাশ | ২৭৯ |
| ১৪ | তাহারেই পড়ে মনে | সুফিয়া কামাল | ২৮৩ |
| ১৫ | সেই অস্ত্র | আহসান হাবীব | ২৮৮ |
| ১৬ | পদ্মা | ফরুরুখ আহমদ | ২৯২ |
| ১৭ | ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ | শামসুর রাহমান | ২৯৫ |
| ১৮ | আঠারো বছর বয়স | সুকান্ত ভট্টাচার্য | ২৯৯ |
| ১৯ | আলো ঢাই | সিকাল্দার আবু জাফর | ৩০৩ |
| ২০ | আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম | শাহ আবদুল করিম | ৩০৭ |
| ২১ | আমি কিংবদন্তির কথা বলছি | আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ | ৩১০ |
| ২২ | তোমার আপন পতাকা | হাসান হাফিজুর রহমান | ৩১৬ |
| ২৩ | হাড় | আলাউদ্দিন আল আজাদ | ৩২২ |
| ২৪ | নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় | সৈয়দ শামসুল হক | ৩২৬ |
| ২৫ | ছবি | আবু হেলা মোস্তফা কামাল | ৩৩০ |
| ২৬ | ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার | মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান | ৩৩৪ |
| ২৭ | প্রত্যাবর্তনের লজ্জা | আল মাহমুদ | ৩৩৯ |
| ২৮ | মানুষ সকল সত্য | দিলওয়ার | ৩৪৩ |
| ২৯ | ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায় | শহীদ কাদরী | ৩৪৭ |
| ৩০ | শান্তির গান | মহাদেব সাহা | ৩৫১ |

ଗଦ୍ୟ

আত্মচরিত

ইশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৱ

লেখক-পরিচিতি

ইশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৱ ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টেম্বৰ পঠিমবঙ্গের মেদিনীপুৱ জেলাৰ বীৱিসিংহ গ্রামে জন্মাইহণ কৱেন। তাৰ পিতাৰ নাম ঠাকুৱদাস বন্দোপাধ্যায় ও মাতাৰ নাম ডগবতী দেৱী। তাৰ বৎস পদবি বন্দোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগৱ তাৰ উপাধি। ইশ্বরচন্দ্ৰ নিজ গ্রামে পাঠশালাৰ পাঠ শেষে আট বছৰ বয়সে পিতাৰ সঙ্গে কলকাতায় আসেন। সেখানে শিবচৰণ মল্লিকেৰ বাড়িৰ পাঠশালায় এক বছৰ অধ্যয়ন সম্পন্ন কৱে তিনি ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে সংকৃত কলেজে ভৰ্তি হন। এ কলেজে নিৰবচিন্ন বাবোৰ বছৰ অধ্যয়ন কৱে তিনি ব্যাকৰণ, কাৰ্য, অলংকাৰ, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্ৰে পাণ্ডিত্য অৰ্জন কৱেন। সকল পৰীক্ষায় কৃতিত্বেৰ সাথে উন্নীৰ্ণ হয়ে লাভ কৱেন ‘বিদ্যাসাগৱ’ উপাধি। তিনি ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভিতাগে হেড পাণ্ডিত হিসেবে যোগদান কৱেন। পৱে তিনি সংকৃত কলেজেৰ অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। পৱে সৱকাৰ কৰ্তৃক বিশেষ বিদ্যালয় পৱিদৰ্শক নিযুক্ত হলে তাৰই তত্ত্বাবধানে কৃড়িটি মডেল কুল ও পঁয়াজিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নিজ অৰ্থ ব্যয়ে মেট্ৰোপলিটন কলেজ (অধুনা বিদ্যাসাগৱ কলেজ) স্থাপন তাৰ অনন্য কীৰ্তি।

ইশ্বরচন্দ্ৰই প্ৰথম গদ্যে যতিচৰেহেৰ যথামুখ ব্যবহাৰ কৱে বাংলা গদ্যে শৃংখলা আনয়ন কৱেন। তাৰকে বলা হয় বাংলা গদ্যেৰ প্ৰথম শিল্পী। শিক্ষকতা ছাড়াও সমাজ সংকৃত ও মূল্যচিন্তার প্ৰচার ও প্ৰসাৱে তাৰ অবদান তুলনাৰহিত। সমাজে বিধবাবিবাহ ও নাৱীশিক্ষার প্ৰচলনে এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহেৰ মতো সামাজিক অভিশাপ দূৰীকৱণে তাৰ অবদান চিৰস্মৰণীয়। পাঠ্যবই রচনায়ও তিনি অসামান্য মনীষাৰ পৱিচয় দিয়েছেন। তাৰ প্ৰথম গ্ৰন্থ ‘বেতাল পঞ্জবিংশতি’। এছাড়া ‘সংকৃত ব্যাকৰণেৰ উপক্ৰমণিকা’, ‘বৰ্ণ পৱিচয় (১ম ও ২য় ভাগ)’, ‘শকুন্তলা’, ‘সীতাৰ বনবাস’, ‘আখ্যানমঞ্জৰী’, ‘ভাস্তিবিলাস’ তাৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ।

ইশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৱ ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দেৰ ২৯ শে জুলাই কলকাতায় মৃত্যুবৰণ কৱেন।

বীৱিসিংহ গ্রামে আমাৰ জন্ম হয়। আমি জনক জননীৰ প্ৰথম সন্তান। বীৱিসিংহেৰ আধ ক্ৰোশ অন্তৱে, কোমৱগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে; ঐ গ্রামে, মঙ্গলবাৱে ও শনিবাৱে, মধ্যাহ্নসময়ে হাট বসিয়া থাকে। আমাৰ জন্মসময়ে পিতৃদেৱ বাটীতে ছিলেন না; কোমৱগঞ্জে হাট কৱিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেৱ তাঁহাকে আমাৰ জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, তাঁহাৰ সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, “একটি এঁড়ে বাছুৱ হইয়াছে।” এই সময়ে, আমাদেৱ বাটীতে, একটি গাই গভীণী ছিল; তাহাৰও আজ কাল, প্ৰসব হইবাৰ সম্ভাৱনা। এজন্য, পিতামহদেৱেৰ কথা শুনিয়া, পিতৃদেৱ মনে কৱিলেন, গাইটি প্ৰসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেৱ, এঁড়ে বাছুৱ দেখিবাৰ জন্য, গোয়ালেৰ দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেৱ হাস্যমুখে বলিলেন, “ও দিকে নয়, এ দিকে এস; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুৱ দেখাইয়া দিতেছি।” এই বলিয়া, সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুৱ দেখাইয়া দিলেন।

এই অকিঞ্চিতকৰ কথাৰ উল্লেখেৰ তাৎপৰ্য এই যে, আমি বাল্যকালে, যথে যথে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্ৰহাৰ ও তিৰকাৰ দ্বাৱা, পিতৃদেৱ আমাৰ অবাধ্যতা দূৱ কৱিতে পাৱিলেন না। ঐ সময়ে, তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদেৱ নিকট, পিতামহদেৱেৰ পূৰ্বোক্ত পৱিহাসবাক্যেৰ উল্লেখ কৱিয়া, বলিলেন, “ইনি সেই এঁড়ে বাছুৱ; বাৰা পৱিহাস কৱিয়াছিলেন, বটে; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ খবি ছিলেন; তাঁহাৰ পৱিহাসবাক্যও বিফল হইবাৰ নহে; বাৰাজি আমাৰ, অন্মে, এঁড়ে গৱ অপেক্ষাৰ একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।”...



পিতৃদেব ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম যখন ১৪/১৫ বৎসর, তখন তিনি মাত্তদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাস, প্রথমত বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু, যে উদ্দেশে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহা সম্পূর্ণ হয় না।...

যাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীত্র উপার্জনক্ষম হন, সেৱনপ পড়াশুনা করাই কর্তব্য।

এই সময়ে, মোটামুটি ইংরেজি জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম হইত। এজন্য, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইংরেজি পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিঙ্ক ছিৰ হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইংরেজি পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পঞ্চিতে ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরূপায় দীন বালকের তথ্য অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না।

যাহা হউক, একই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, ঠাকুরদাসের, নির্বিষ্ণু, দুই বেলা আহার ও ইংরেজি পড়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে, তদীয় আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ ধৰ্ব হইয়া গেল; সুতরাং, তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের, অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল।...

এক দিন, মধ্যাহ্নসময়ে, ক্ষুধায় অস্তির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহিগত হইলেন, এবং অন্যমনক্ষ হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিষ্ঠায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সমুখে উপস্থিত ও দণ্ডয়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্ক বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়িক বেচিতেছেন।...

ঠাকুরদাস, ভৃঞ্চির উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদার ও সন্নেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাক্ষণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন; ঠাকুরদাস, যেৱে বাঘ হইয়া, মুড়কিশুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ জ্বীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি এখন পর্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন সেই জ্বীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সতৰ দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার একুশ ঘটিবেক, এখনে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদ্বারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানন্দ প্রজ্বলিত হইয়াছিল, জ্বীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জনিয়াছিল।

কিছু দিন পরে, ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম পাইয়া, তাঁহার আর আহুদের সীমা রহিল না। পূর্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্রেশ সহ্য করিয়াও বেতনের দুইটি টাকা, যথানিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন।

দুই-তিন বৎসর পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাইভাগীশুলির, অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে, কষ্ট দূর হইল।



এই সময়ে, ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ-চক্রিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোঢাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাণীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত, তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতীদেবীর গর্তে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

আমার যখন জন্মেদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, মাতৃলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে, পাঁচ-ছয় মাস বাস করিতেন। কিন্তু একদিনের জন্মেও, স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের জন্ম হইত না। বস্তুত, ভাগিনীয়ী ও ভাগিনীয়ীর পুত্রকন্যাদের উপর এরূপ স্নেহপ্রদর্শন অনুষ্ঠচর ও অক্ষতপূর্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনীয়ীর মৃত্যু হইলে, তদীয় একবর্ষীয় দ্বিতীয় সন্তান, বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত, আদ্যন্ত অবিচলিতস্থে, প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাঁহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্ৰমী এবং শিক্ষাদানবিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইহার পাঠশালার ছাত্রেরা, অন্ন সময়ে উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত, এজন্য, ইনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।...

পাঠশালায় এক বৎসর শিক্ষার পর আমি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব, প্রথমত এরূপ আশা ছিল না। কিছু দিনের পর, প্রাণনাশের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল; একবারে বিজ্ঞুর হইলাম না। অধিক দিন জ্বরতোগ করিতে করিতে, পুরীহার সঞ্চার হইল। জ্বর ও পুরীহা উভয় সমবেত হওয়াতে শীত্র আরোগ্যলাভের সন্ভাবনা রহিল না। ছয় মাস অতীত হইয়া গেল; কিন্তু, রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

জননীদেবীর জ্যেষ্ঠ মাতৃল, রাধামোহন বিদ্যাভূষণ আমার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া বীরসিংহে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয় শক্তি হইয়া আমাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। মাতৃলের সন্নিকটে কোটরীনামে যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজ্ঞাতীয় উত্তম চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল। তিনি মাস চিকিৎসার পর, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম। এই সময়ে, আমার উপর, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের স্নেহ ও যত্নের পরাকার্ষা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে বীরসিংহে প্রতিপ্রেরিত হইলাম এবং পুনরায় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, আট বৎসর বয়স পর্যন্ত তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি শুরুমহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলাম। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, পাঠশালার সকল ছাত্র অপেক্ষা, আমার উপর তাঁহার অধিকতর স্নেহ ছিল। আমি তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিভাব।...

পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিয়ান্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনও প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, সীয় অঙ্গীয়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অঙ্গীয়ের অনুবর্তন, তদীয় স্বত্ব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার-প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভালো। তিনি নিতান্ত নিষ্পত্তি ছিলেন, এজন্য, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে, কম্বিল কালোও আবশ্যক হয় নাই।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় আমায়িক ও নিরহস্কার ছিলেন। কি ছেট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাহাদিগকে কপটবাটী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রংষ বা অসম্ভষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অধ্যবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অথবা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাহাদিগকে আচরণে ভদ্র তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান, ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হল্তে না করিয়া তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যুষে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণাশ অবধারিত ছিল। এজন্য, অনেকে সমবেত না হইয়া, ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায় সকল সময়ে ঐ সকল স্থল দিয়া একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই-চারি বার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপ আক্ষেলসেলামি পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। যন্ত্রের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্মকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

পিতামহদেবের দেহাত্যয়ের পর পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা হইয় করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। ... বড়বাজারনিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময়ে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্বে সিংহ মহাশয়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদুর্লভ সিংহ সংসারের কর্তা। এই সময়ে জগদুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যোত্তা ভগিনী, তাহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাহার এক পুত্র, এইমাত্র তাহার পরিবার। জগদুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্যাশসেসভাষণ করিতেন; সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদা মহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগকে, বড় দিদি ও ছেট দিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া পরের বাটীতে আছি বলিয়া, এক দিনের জন্যেও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি, কম্পিন কালেও বিস্ম্য হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্ৰ ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেৱেপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্ৰের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমার ও গোপালে রাইমণির অণুযাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, আমায়িকতা, সম্বিচেচনা প্রভৃতি সদ্গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রাখিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উপাসিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বৈধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি



স্বীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহার তুল্য কৃতম্ভ পামর ভূমগ্নে নাই। আমি পিতামহীদেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমত কিছু দিন, তাহার জন্য, যার পর নাই, উৎকর্ষিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে, তাহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহ ও যত্নে আমার সেই বিষম উৎকর্ষা ও উৎকর্ট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে, পিতৃদেব, মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাঁকোনিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারের চকে মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছিল। ঐ দোকানে সোহা ও পিতলের সানাবিধ বিলাতি জিনিস বিক্রি হইত। যে সকল খরিদ্দার ধারে জিনিস কিনিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। প্রতিদিন, প্রাতে এক প্রহরের সময় কর্মস্থানে যাইতেন; রাত্রি এক প্রহরের সময় বাসায় আসিতেন। এ অবস্থায় অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লিখামের অষ্টমবর্ষীয় বালকের পক্ষে, কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারিত না।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যতদ্র শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিক্ষাবিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। সেই সময়ে, প্রসঙ্গে, পিতৃদেব মাইলস্টোনের উপাখ্যান বলিলেন। সে উপাখ্যান এই—

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া, বাটশাবাটা শিলের মতো একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পৌতা দেখিতে পাইলাম। কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পৌতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইলস্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইলস্টোন কী, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইংরেজি কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; স্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পৌতা আছে; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদাই করা রহিয়াছে। এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল অর্ধেৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় ‘একের পিঠে নয় উনিশ’ ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অক্ষের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এটি ইংরেজির এক আর এইটি ইংরেজির নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সত্তর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইলস্টোন যেখানে পৌতা আছে, আমরা সে দিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর দরকার নাই; এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই আমি ইংরেজির অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইলস্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটিতে দশম মাইলস্টোন দেখিয়া পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা, আমার ইংরেজি অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনিটি মাইলস্টোন ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপে



বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অক্ষগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিয়ম, কৌশল করিয়া তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইলস্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর, পঞ্চম মাইলস্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন মাইলস্টোন, বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইলস্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি হয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহুদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কাণীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি আমার চিবুকে ধরিয়া ‘বেস বাবা বেস’ এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্বাদ করিলেন এবং পিতৃদেবকে সম্মোধিয়া বলিলেন, দাদা মহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক। যাহা হউক, আমার এই পরীক্ষা করিয়া, তাঁহারা সকলে যেমন আহুদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহুদ দেখিয়া, আমিও তদনুরূপ আহুদিত হইয়াছিলাম।

মাইল স্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া, পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আজীয়েরা একবাক্য হইয়া, ‘তবে ইহাকে রীতিমত ইংরেজি পড়ান উচিত’ এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে সিঙ্কেশ্বরীতলার ঠিক পূর্বদিকে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উহাতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে; ঐ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও; যদি ভালো শিখিতে পারে বিনা বেতনে হিন্দু কালেজে পড়িতে পাইবেক; হিন্দু কালেজে পড়িলে ইংরেজির চূড়ান্ত হইবেক। আর যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইংরেজি জানিলে, হাতের লেখা ভালো হইলে ও যেমন তেমন জ্যামিতি বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম করিতে পারিবেক।

আমরা পুরুষানুরূপে সংস্কৃতব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্যবশত ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত অতিশয় ক্ষেত্র জন্মিয়াছিল। তিনি সিঙ্কান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুর্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এজন্য পূর্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, উপার্জনক্ষম হইয়া, আমার দুর্ঘ যুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুর্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষেত্র দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি আমার ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আক্ষরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেক পীড়াগীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

মাতৃদেবীর মাতুল রাখামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক; আর যদি চাকরি করা অভিধেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে; সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া, যাহারা ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত। চতুর্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণ রূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।

[সংক্ষিপ্ত পাঠ]



শর্দার্থ ও টীকা

| | |
|--------------|--|
| ক্রোশ | - দূরত্ব পরিমাপের একক। দুই মাইলের চেয়ে কিছু বেশি। |
| নিরাকৃত | - নিরাকরণ। দূরীকরণ। |
| বিজ্ঞর | - স্ফুরমুক্ত। |
| অতিসার | - উদরাময়। পেটের পীড়াবিশেষ। |
| অনুবর্তন | - অনুসরণ। অনুগমন। |
| কপটবাচী | - কপট বা যিথ্যা কথা বলে যে। |
| আক্ষেলসেলামি | - মূর্খতার জন্য প্রাপ্ত শাস্তি। |
| দেহাত্যয় | - দেহত্যাগ। মৃত্যু। |
| সৌম্যমূর্তি | - প্রসন্ন বা প্রশান্ত মূর্তি। |
| কৃতমূল | - উপকারীর অপকার করে যে। |
| পামর | - পাপিষ্ঠ। নরাধম। |
| সমভিব্যাহারী | - একত্রে অবস্থানকারী। সঙ্গী। |
| হৌস | - সওদাগরি দণ্ডের বা অফিস। |

পাঠ-পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক বৰ্ণনাধৰ্মী অসমাপ্ত রচনার নাম ‘আত্মচরিত’; সংকলিত অংশে তাঁর শৈশব জীবনের কথা বিখ্যুত হয়েছে। এ রচনায় ঈশ্বরচন্দ্ৰ তাঁর পিতা, পিতামহ ও জননীর কথা বর্ণনা করেছেন। বিষয় অনুসারে গদ্দেয়ে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে তাঁর সহজাত শক্তিমন্ত্র প্রকাশ ঘটেছে বৰ্তমান রচনায়। কৌতুকবোধ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা এবং পাঠকের বোধগম্য করার অভিপ্রায়ে যথৰ্থ বিৱামিতহ ব্যবহার বৰ্তমান রচনার বিশিষ্ট প্রোত্ত্ব। ঈশ্বরচন্দ্ৰ শৈশবকালে ছিলেন ডানপিটে। পাঁচ বছৰ বয়সে গ্রামের পাঠশালায় তাঁকে ভৱিত কৰা হয় এবং আট বছৰ বয়স পৰ্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করেন। তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের মৃত্যুর পর, পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় অর্ধেপার্জনের নিমিত্তে কলকাতায় পাঢ়ি জয়ান, তখন বালক ঈশ্বরচন্দ্ৰও পিতার হাত ধৰে শহরে আসেন। কলকাতায় যাবার প্রাক্কালে, রাস্তার পাশে ‘বাটনাবাটো শিলের মতো’ প্রস্তর বা মাইলস্টেইন দেখে বালক ঈশ্বরচন্দ্ৰ খুবই কৌতুহলী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর পিতৃদেবের সহায়তায় পাথৰের গায়ে খোদিত ইংরেজি অঙ্কগুলো অতি দ্রুত শিখে নেন। বালকের অভাবিত মেধাশক্তিৰ পৱিচয় পেয়ে তাঁর পিতা ও অন্য সহগামীবৃন্দ বিশ্ময়ভিত্তি হন; তখন কেউ কেউ ঠাকুরদাসকে পৰামৰ্শ দেন, ঈশ্বরচন্দ্ৰকে যেন ইংরেজি স্কুলে ভৱিত কৰা হয়, কাৰণ ইংরেজি ভাষা ভালো জানা থাকলে ‘সাহেবদিগেৰ হৌসে ও সাহেবদেৱ বড় বড় দোকানে’ কাজ পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু ঠাকুরদাস এসব পৰামৰ্শ কানে নেননি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “আত্মচরিত” রচনাটিতে কে স্পষ্টবাদী?

ক. কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

খ. রাধামোহন বিদ্যাভূষণ

গ. রামজয় তর্কভূষণ

ঘ. ভাগবতচরণ সিংহ

২. কোন শুণের কারণে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে উপযুক্ত শিক্ষক বলা যায়?

ক. আঘাতের জন্য

খ. সদিচ্ছার জন্য

গ. যত্নশীলতার জন্য

ঘ. প্রশিক্ষণের জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

মেঘনা গ্রামের অপু কাজের সন্ধানে ঢাকায় এসে বৎশালের সাইকেল ব্যবসায়ী কাদের সাহেবের কাছে আশ্রয় নিলেন। গ্রামের ক্ষুলটি তেমন ভালো নয় বলে তিনি পুত্র উপলকে মালিকের বাসায় এনে রাখেন। মালিকের বোন রূমা অপত্য মেঝে দিয়ে উপলকে দেখাশুনা করতে লাগলেন। উপল একাকিন্ত ও গ্রামের স্মৃতি ভূলে সেখানে দিনাতিপাত করতে লাগল। এই সান্নিধ্যের কারণে উপল নারীর প্রতি আরও শুদ্ধাশীল হয়ে ওঠে।

৩. উদ্দীপকের রূমা “আত্মচরিত” রচনার কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনায়?

ক. গৃহিণীর

খ. জ্যেষ্ঠ ভগিনীর

গ. কনিষ্ঠা ভগিনীর

ঘ. পিতামহীদেবীর

৪. উক্ত চরিত্রটির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে—

i. জননীর প্রের

খ. জ্যেষ্ঠ ভগিনীর

ii. দায়িত্ব বোধ

ঘ. পিতামহীদেবীর

iii. মমত্ব

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

বাকাল গ্রামের মন্দিরের পুরোহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ তার পুত্র দিনেশকে টোল অর্থাৎ সংস্কৃত পাঠশালায় পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্রামবাসী তাকে বোঝালেন, এ শিক্ষা শেষে সব ধরনের চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করলে শিক্ষার দিগন্ত ও জ্ঞানার্জনের পথ বিস্তৃত হয় এবং চাকরির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত দিনেশকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করলেন।

ক. বড় বাজারের চকে মল্লিক মহাশয়ের কিসের দোকান ছিল?

খ. ঈশ্বরচন্দ্রকে কেন ইংরেজি পড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর।

গ. ‘দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার সাদৃশ্য আছে।’— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “দিনেশ ও ঈশ্বরচন্দ্র একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন”—‘আত্মচরিত’ অবলম্বনে মূল্যায়ন কর।



মহয়া দিজ কানাই

লেখক-পরিচিতি

মধ্যযুগের কবি দিজ কানাই পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের অধিবাসী। দল গঠন করে তিনি তৎকালীন লোকনাট্যরীতিতে নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। দিজ কানাই এক অসর্বো তরঙ্গীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে গভীর দৃষ্ট ভোগ করেন বলে শোনা যায়। দীনেশচন্দ্র সেনের অনুমান অনুযায়ী, তিনি সতেরো শতকের কবি। তাঁর সম্পর্কে যে প্রবাদ প্রচলিত তাতে জানা যায়, তিনি বর্ণবিভক্ত সমাজে উচ্চবর্ণ তথা ব্রাহ্মণশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেও নিম্নবর্ণ অর্ধাংশু শুদ্ধশ্রেণির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ‘মহয়া’ পালা রচনায় তাঁর যে উদারনৈতিক দ্রষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে তার মূলে তাঁর ব্যক্তি জীবনের সংক্ষারমুক্ত মানবিক বোধ সক্রিয় বলে ধারণা করা হয়।

গারো পাহাড় পেরিয়ে হিমানী পর্বত ছাড়িয়ে ‘সপ্ত সমুদ্র’ পারে বাঘ-ভালুকের বসতি রয়েছে এমন নির্জন বনে বাস করে ডাকাত সর্দার হুমরা বাইদ্যা। তাঁর ছোট ভাই মাইনুকা। এই বেদের দল ভ্রমণ করতে করতে এল ধনু নদীর পারে কাঞ্চনপুর গ্রামে। সেখানে এক বৃক্ষ ব্রাহ্মণের—

হয় মাসের শিশুকল্যা পরমা সুন্দরী।
রাত্রি নিশিকালে হুমরা তারে করল চুরি ॥
এক দুই তিল করি শুল বছর যায় ।
খেলা কছুরত তারে যতনে শিখায় ॥
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা ।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কল্যা ঝুলে কাঞ্চন সোনা ॥
হাটিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল ।
মুখেতে ফুটা উঠে কনক চাম্পার ফুল ॥
আগল ডাগল আখিরে আস্মানের তারা ।
তিলেক মাত্র দেখলে কইন্যা না যায় পাঞ্চরা ॥

মুনির মন টলে যাওয়ার মতো সুন্দরী হয়ে ওঠে সে। নাম তাঁর মহয়া সুন্দরী। অনেক দিন পরের কথা। বেদের দল উপস্থিত হলো বামনকান্দা গ্রামে। তাদের সঙ্গে রয়েছে খেলা দেখানোর নানা উপকরণ—

তোতা লইল ময়না লইল আরও লইল টিয়া ।
সোনামুখী দইয়ল লইল পিঞ্জিরায় ভরিয়া ॥
ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর ।
সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চঙ্গালের হাড় ॥
শিকারি কুকুর লইল শিয়াল হেজা ধরে ।
মনের সুখেতে চলে বৈদেশ নগরে ॥

এই গ্রামে বাস করে নদ্যার চাঁদ-পূর্ণিমার চাঁদের মতো তার রূপ। মায়ের অনুমতি নিয়ে সে ‘বাইর বাড়ি’র মহলে বাইদ্যার খেলার আয়োজন করে। বেদে কল্যার ঝুপের কথা আগেই শুনেছিল নদ্যার চাঁদ-স্বচক্ষে তা দেখে এবং খেলা কসরতে মুঝ হয়ে মহয়াকে সে হাজার টাকার শালসহ নানা বৃক্ষিস প্রদান করে। তাদের উলুয়াকান্দায় বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য জমি প্রদান করে।



বেদের দলের দিন কাটছিল সুখেই। পরম্পরের প্রতি মুঢ় নদ্যার চাঁদ ও মহঘার এক সঙ্গ্যবেলা জলের ঘাটে দেখা হয় এবং ব্যাকুল হৃদয়ের কথা জানাজানি হয়।

‘জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
 কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ’॥
 ‘শুন শুন ভিনদেশি কুমার বলি তোমার ঠাই।
 কাইল বা কি কইছলা কথা আমার মনে নাই।
 তুমি ত ভিনদেশি পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
 তোমার সঙে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি’॥
 ‘কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা।
 এই দেশে আসিবার আগে পূর্বে ছিলি কোথা’॥
 ‘নাহি আমার মাতাপিতা গর্ত সুন্দর ভাই।
 সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই’॥

দিন যায়। দিবস রঞ্জনী আনন্দনা মহঘার মনের খবর জানতে পারে পালক্ষসই— পরামর্শ দেয় ভুলে যাবার। মহঘা বলে :

চন্দ্রসূর্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি।
 নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী॥
 বাইদ্যার সঙে আমি যে সই যথায় তথায় যাই।
 আমার মন বানধ্যা রাখে এমন স্থান আর নাই॥
 বন্ধুরে লইয়া আমি অইবাম দেশান্তরি।
 বিশ ধাইয়া ঘরবায কিমা গলায় দিয়াম দড়ি॥

এদিকে চিরকেলে ভ্রমণ-পিয়াসী বেদের দলের এই গৃহী জীবন বাইদ্যা সর্দার হৃমরার ভালো লাগে না। মাইনকার সাথে সে ভিনদেশে চলে যাওয়ার পরামর্শ করে। সময় থেমে থাকে না। ফাণুম যায় যায়। নির্যুম নদের চাঁদ মধ্যরাতে বাঁশি তুলে নেয় হাতে। সে বাঁশির আহ্বানে ছুটে আসে প্রাণপ্রতিমা মহঘা। মহঘা জানায়—

শুন শুন নদ্যার ঠাকুর বলি যে তোমারে।
 এই না গেরাম ছাড়া যাইবাম আজি নিশাকালে॥
 তোমার সঙে আমার সঙ্গেরে বন্ধু এইনা শেষ দেখা।
 কেমন কর্যা ধোকবাম আমি হইয়া অদেখা॥
 আর না শুনবাম রে বন্ধু তোমার শুণের বাঁশি।
 আর না জাগিয়া বন্ধু পুরাইবাম নিশি॥
 মনে যদি লয়রে বন্ধু রাখ্যে আমার কথা।
 দেখা করতে যাইও বন্ধু খাওরে আমার মাথা॥
 যাইবার কালে একটি কথা বল্যা যাই তোমারে।
 উভর দেশে যাইও তুমি কয়েক দিন পরে॥

সেইদিনই অঙ্গকার রাতে বেদের দল উভর দেশে পালিয়ে যায়— সকাল বেলা এলাকার সবাই দেখে বাড়িগৰ সবই আছে কিন্তু বেদের দল নেই। খবর পৌছে যায় নদের চাঁদের কাছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সে পাগল হয়ে ওঠে মহঘার সঙ্গানে। গভীর বেদনা সন্ত্রেণ একদিন সুমঙ্গ মায়ের পায়ে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে নদের চাঁদ। ঘূরতে থাকে মাসের পর মাস যে পথে গেছে বেদের দল। সবাইকে জিজ্ঞাসা করে তার মহঘাকে দেখেছে কি-না।



এদিকে পুত্রের অদর্শনে কাঁদতে মা প্রায় অঙ্গ হয়ে গেল ।

অঞ্চলায়ণ মাসের অল্প শীতে কংসাই নদীর পাড়ে নদের টাঁদ মহয়াকে পেল । আহার নিদ্রাহীন মহয়া তখন পাগলপ্রায় । সংসারে ঘন নেই, শরীরের দিকে তাকানো যায় না । সেই মহয়া নদের টাঁদের আগমনে—

আজি কেনে অকস্মাতে হইল এমন ধারা ।

হয় মাইস্যা মরা যেন উঠ্যা হইল ধারা ॥

দেল ভরিয়া কল্যা করিল রঞ্জন ।

জাতি দিয়া নদীয়ার ঠাকুর করিল ভোঞ্জন ॥

হমরা বাইদ্যাও নতুন অতিথিকে তার দলে বরণ করে নিল— কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ভিন্ন । গভীর রাতে বিষমাখানো ছুরি মহয়ার হাতে দিয়ে বলল—

‘আমার মাথা খাওরে কল্যা আমার মাথা খাও

দুষ্মনে মারিয়া ছুরি সাওরে ভাসাও ।’

মহয়ার সমন্ত পৃথিবী অঙ্ককার হয়ে আসে । স্বুমন্ত প্রিয়তমের কাছে এসে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে নিজ বুকে ছুরি বসাতে চায় । এমন সময় জেগে উঠে নদের টাঁদ । সকল ঘটনা শুনে বলে—

‘তোমার লাগিয়া কল্যা ফিরি দেশ বিদেশে ।

তোমারে ছাড়িয়া কল্যা আর না যাইবাম দেশে ॥

কী কইবাম বাপ মায়ে কেমনে যাইবাম ঘরে ।

জাতি নাশ করলাম কল্যা তোমারে পাইবার তরে ॥

তোমায় যদি না পাই কল্যা আর না যাইবাম বাড়ি ।

এই হাতে মার লো কল্যা আমার গলায় ছুরি’॥

‘পইড়া থাকুক বাপ মাও পইড়া থাকুক ঘর ।

তোমারে লইয়া বদ্ধ যাইবাম দেশান্তর ॥

দুই আঁধি যে দিগে যায় যাইবাম সেইখানে ।

আমার সঙ্গে চল বদ্ধ যাইবাম গহিন বনে’॥

চন্দ্ৰ সূর্য সাক্ষী রেখে, বাপের বাড়ির তাজি ঘোড়ায় চড়ে অজ্ঞানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে দুজন । পথে পাৰ্বত্য খৱস্ত্রাতা নদী । তাজি ঘোড়া বিদায় দিয়ে দুজন তখন পারাপারের চিঞ্চল অস্ত্রি । এমন সময় ভিনদেশি এক সাধুৰ নৌকা পেয়ে তারা তাতে উঠে পড়ে । মহয়ার রূপ-যৌবনে মুক্ষ সাধু কৌশলে নদের টাঁদকে ‘উজান পাকে’ ফেলে দেয় । মহয়াকে পাওয়ার ইচ্ছায় তাকে সে রানি করে রাখার প্রতিশ্রুতি দেয় । নানা প্রতিশ্রুতিৰ পৰ—

এতেক শুনিয়া মহয়া কী কাম করিল ।

সাধুৰ লাগিয়া কল্যা পান বানাইল ॥

পাহাড়িয়া তক্ষকেৰ বিষ শিরে বাঙ্কা ছিল ।

চূন-খয়েৱেৰ কল্যা বিষ মিশাইল ॥

হাসিয়া খেলিয়া কল্যা সাধুৱে পান দিল মুখে ।

রসের নাগাইৱা পান খায় সুখে ॥

‘কী পান দিছলো কল্যা শুণেৰ অন্ত নাই ।

বাছতে শুইয়া তোমার আমি সুখে নিদ্রা যাই’॥

‘পান খাইয়া মাঝিমাল্লা বিষে পৱে ঢলি ।

নৌকার উপৱে কল্যা হাসে খলখলি’॥

অচেতন্য সাধুসহ মৌকা ডুবিয়ে দিয়ে নদীপারের বনে প্রিয়কে ঝঁজতে থাকে মহয়া। এক ভাঙা মন্দিরে মুমুর্খ নদের চাঁদকে ঝুঁজে পায় সে। এখানেও এক বৃক্ষ জটাধারী সন্ন্যাসীর কবলে পড়ে মহয়া। সন্ন্যাসীর হাত থেকে বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত এক রাত্রে অসুস্থ নদ্যার চাঁদকে কাঁধে নিয়ে বন ত্যাগ করে। অন্য বনে দিনে দিলে সুস্থ হয়ে ওঠে নদের চাঁদ। সুখেই কাটে সময় এই বনদম্পত্তির। কিন্তু একদিন হঠাতে বংশী ধৰনি শুনে চমকে ওঠে মহয়া— চোখ থেকে গড়ায় পানি। নদের চাঁদ ভাবে— তার প্রাণপ্রতিমা হঠাতে এমন বিরস-বদন ও চক্ষু কেন? হুমরা বাইদ্যা ছোটকালে তাকে চুরি করে এনেছে, এটুকুর বাইরে তার জন্মপরিচয় আজও যে শোনা হলো না। মহয়া জানায়— কালকে যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে সেকথা বলবে। বলতে বলতেই ঢলে পড়ে সে। নদের চাঁদ ভাবে মহয়াকে হয়ত সাপে কেটেছে। সেমতেই সে পরিচর্যা করতে চায়। তখন—

কান্দিয়া মহয়া কর, এই শেষ দিন।

সাপে নাহি খাইছে মোরে গেছে সুখের দিন॥

দূর বনে বাজল বাঁশি শুন্যাছ যে কানে।

আসিছে বাদ্যার দল বধিতে পরাগে॥

আমারও পালং সই বাঁশি বাজাইল।

সামাল করিতে পরান ইসারায় কঙ্গল॥

আইজ নিশি থাকরে বঙ্গু আমার বুকে শুইয়া।

আর না দেখিব মুখ পরভাতে উঠিয়া॥

মুম ভাঙতেই দেখে সামনে হুমরা বাইদ্যা দাঁড়ানো। হুমরা মহয়াকে নির্দেশ দেয় দুশমন নদের চাঁদকে মেরে সুজনকে বিয়ে করতে। সর্দীর মহয়ার হাতে তুলে দেয় বিষলক্ষ্মীর ছুরি। মৃত্যু আসল জেনে মহয়া বলে—

শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে।

জন্মের মতন বিদায় দেও এই মহয়ারে॥

শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়।

কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায়॥

জন্মিয়া না দেখলাম কতু বাপ আর মায়।

কর্মদোষে এত দিনে প্রাণ মোর যায়॥

বলতে বলতে মহয়া নিজের বুকেই ছুরি বিক্ষ করে। হুমরার আদেশে বেদের দল নির্মত্বাবে হত্যা করে নদের চাঁদকে।

অনুশোচনা জাগে হুমরা বাইদ্যার। ভালোবাসার অমলিন স্মৃতি জগিয়ে রেখে দুজনেই শায়িত হয় এক কবরে।

তাদের কবরে টুপ্টুগ বারে পড়ে পালক সইয়ের মতো নানা জনের চোখের জল।

[গদ্যে রূপান্তরিত]

শব্দার্থ ও টীকা

গারো পাহাড়

- ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো খাসিয়া পর্বতমালার অংশবিশেষ। এর কিছু অংশ ভারতের আসাম রাজ্য এবং কিছু অংশ বাংলাদেশের শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় অবস্থিত।

হিমানী পর্বত

- (হিমানী = বরফপুঞ্জ) বরফের পাহাড়। ভারতের উত্তর সীমানায় অবস্থিত সর্বদা তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণি।

শুল

- ষেল।

কচুরত

- কৌশল। দক্ষতা। নিপুণতা।

আগল ডাগল

- আগর-ডাগর।

পাঞ্চৱা

- পাশরা। বিস্মৃত হওয়া।



| | |
|-----------------|--|
| দইয়ল | - দোয়েল। |
| রাও চগালের হাড় | - রাজ-চগালের হাড়। চগালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাড়। বেদেরা তাদের বাজি করবার সময় এই হাড় ব্যবহার করে থাকে। |
| হেজা | - শজারু। শজারু > সেজা > হেজা। |
| বাইর বাড়ি | - বাড়ির বাইরের অংশ। বহির্বাটি। |
| বাইদ্যার খেলা | - বেদে দলের নানাজাপ খেলা বা শারীরিক কসরত। |
| সুদৱ | - সহোদর। |
| সুতের হেওলা | - প্রাতের শেওলা। এখানে আপনজনহীন। নিঃসঙ্গ। |
| পালঙ্কসই | - মহুয়ার সখী। যার নাম পালঙ্ক বা পালাং। |
| বিষ | - বিষ। গরল। |
| গৃহী জীবন | - সংসারী বা গার্হস্থ্য জীবন। |
| বাইদ্যা | - বেদে। যাযাবর। সাপুড়ে জাতিবিশেষ। |
| দেল | - দিল। হৃদয়। |
| জাতি দিয়া | - জাতি নষ্ট করে। নদের চাঁদ ব্রাক্ষণ হয়ে মহুয়ার রাঁধা ভাত খাওয়ায় সে জাতিএষ্ট হয়েছে। |
| ভোঞ্জন | - ভোজন। ভক্ষণ। |
| সাওরে | - সাগরে। |
| বিষলঙ্কা | - বিষমিত্রিত। |
| তাজি ঘোড়া | - উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবান অশ্ব। আরবি ঘোড়া। |
| উজান পাকে | - উজানে অবস্থিত জলঘূর্ণি। |
| উজান | - প্রাতের উৎস দিক। |
| তক্ষকের বিষ | - গিরগিটি জাতীয় একপ্রকার বিষধর সরীসূপের বিষ। |
| রসের নাগইয়া | - রসপূর্ণ নাগরিয়া। রসিক নাগর। |
| পরভাতে | - প্রভাতে। তোরবেলা। |
| সুজন | - বেদে-দলের যুবক সদস্য সুজন। হৃমরা বাইদ্যার আশা—সুজনই হবে দলের ভবিষ্যৎ সর্দার। দলের স্বার্থেই সে মহুয়াকে সুজনের সাথে বিয়ে দিতে চায়। |

পাঠ-পরিচিতি

দ্বিজ কানাই প্রণীত “মহুয়া” পালাটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গীতিকা (Ballad) ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর সংকলিত এবং ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ‘মৈমনসিংহ-গীতিকা’র প্রথম খণ্ড থেকে এ পালাটি গদ্যে রূপান্তর করে গৃহীত হয়েছে। পালাটিতে মহুয়ার দুর্জয় প্রেমশক্তি ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় কীভাবে মানবসৃষ্ট দুর্ঘাগে ধ্বংস হয়ে গেল তারই মর্মস্তুদ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গীতিকাটির কাহিনি গড়ে উঠেছে বর্ষ ও শ্রেণিবৈষম্যমুক্ত একটি মানবিক প্রগতিকে কেন্দ্র করে। একদিকে ছয় মাস বয়সী চুরি হওয়া কন্যা অনিন্দ্যকান্তি মহুয়া অন্যদিকে জমিদারপুত্র নদের চাঁদ। তাদের অদৃয় প্রেম সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু বেদে সর্দার হৃমরা সামাজিক, বৈষয়িক ও মনস্তান্ত্বিক কারণে এ প্রেমের প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঢ়ায়। ফলে নানা প্রতিকূলতা ডিঙিয়েও মিলনপিয়াসী দুটি মানব হৃদয় শেষ পর্যন্ত কান্তিকৃত লক্ষ্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়। মৃত্যুই হয় তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

পালাটিতে কাহিনি বর্ণনায় সংহত রচনারীতির ঘাটতি ও নানা অতিশয়োক্তি রয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপভাষায় রচিত ও নাটকীয় গুণসম্পন্ন এ পালাটিতে বর্ণনারীতির প্রাধান্য রয়েছে। এ অঞ্চলের তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতা সমূক্ষ পালাটি দুর্জয় প্রেমের অপূর্ব নির্দর্শন।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “মহয়া” কাহিনিতে বর্ণিত ধনু নদীর পাড়ে কোন গ্রাম?

| | |
|-----------------|------------------|
| ক. উলুয়াকান্দা | খ. বামনকান্দা |
| গ. কাঞ্চনপুর | ঘ. বালিয়াকান্দা |
২. অঙ্ককার রাতে বেদের দলের উত্তর দেশে পালিয়ে যাওয়ার কারণ কী?

| | |
|-----------------------------|--|
| ক. আগের জায়গা ভালো না লাগা | খ. নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস ভালো না লাগা |
| গ. নতুন জায়গা আবিক্ষার | ঘ. অমণবিলাসী মনোভাব |

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

রুস্তম জানেন বাবা-মা কিছুতেই আলেয়াকে মেনে নেবেন না। আলেয়ার বংশগৌরব রুস্তমের সমকক্ষ নয়। আলেয়াকে ছাড়া রুস্তম কিছু ভাবতে পারেন না। তাই তিনি এক রাতে আলেয়াকে নিয়ে অজানার পথে পাড়ি জমান।
৩. অনুচ্ছেদে “মহয়া” কাহিনির যে দিকগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো—
 - i. ভাবালুতা
 - ii. ভালোবাসা
 - iii. নিভীকতা

নিচের কোনটি ঠিক?

| | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
৪. ৩ নং প্রশ্নের উল্লিখিত দিকের নিচের কোন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে?

| | |
|---|--|
| ক. ঘুমস্ত মায়ের পায়ে প্রাণ করে বেরিয়ে পড়ে নদের চাঁদ | খ. তোমাকেই যদি না পাই তবে আর কেন বেঁচে থাকা |
| গ. মহয়া প্রতিষ্ঠা করে বকুকে নিয়ে দেশান্তরী হওয়ার | ঘ. মহয়া নদের চাঁদকে না মেরে নিজের বুকে বিন্দ করে ছুরি |

সূজনশীল প্রশ্ন

- সাগরের সাথে দুলির সম্পর্ক তার বাবা মেনে নেননি। তাই দুলিকে অন্যত্র বিয়ে দেন তারা। অনেকদিন পর দুলির শুশুরবাড়িতে ফেরিওয়ালার বেশে হাজির হল সাগর। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে দুলি তাকে চিনতে পারেন। আবারও জেগে ওঠে তাদের পুরনো আবেগ। সুযোগ বুঝে এক রাতে সাগরের হাত ধরে দুলি পালিয়ে যান। তার খোঁজে চারদিকে লোক পাঠানো হয় এবং তাদের অবস্থান খুঁজে পায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দুলি-সাগর একে অপরকে হারাতে রাজি নন। তাই তারা আজ্ঞাহৃতি দেন।
- ক. বেদের দল একদিন অঙ্ককার রাতে কোথায় পালিয়ে যায়?
 - খ. নদের চাঁদের হাতে মহয়াকে তুলে দিতে হুমরা বেদে সম্মত নন কেন?
 - গ. দুলির সাথে মহয়া চরিত্রের সাদৃশ্য নিরূপণ কর।
 - ঘ. সাগর-দুলির প্রেমের শাশ্বত রূপাই যেন “মহয়া” রচনার মূল উপজীব্য— মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।



বাংলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে জুন পঞ্চমবঙ্গের চাবিশ পরগনার কাঁচালপাড়া থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্বন্ধ উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্নাতকদের মধ্যে তিনি একজন। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। এ চাকরিরসূত্রে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করে তিনি নীলকরদারে অভ্যাচার দমন করেছিলেন। দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান; যোগ্য বিচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। বাংলা সাহিত্যচর্চায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন তিনি। উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনার বাইরে ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭২) পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ তাঁর অন্যতম কৌতুক। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। বঙ্গিমচন্দ্রের প্রচ্ছসংখ্যা ৩৪। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো : ‘কপালকুণ্ডল’, ‘মৃণালিনী’, ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’, ‘রাজসিংহ’, ‘সীতারাম’। ‘Rajmohons Wife’ নামে একটি ইংরেজি উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন। বঙ্গিমচন্দ্র ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা ও সমাজবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ‘লোকরহস্য’, ‘বিজ্ঞানরহস্য’, ‘কমলাকান্তের দণ্ডন’, ‘সাম্য’, ‘কৃষ্ণচরিত্র’, ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ ইত্যাদি তাঁর গদ্যগ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি ‘সাহিত্যসন্মাট’ উপাধিতে ভূষিত হন।

বঙ্গিমচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

- ১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভালো হইবে না। লেখা ভালো হইলে যশ আপনি আসিবে।
- ২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে এবং টাকাও পায়; লেখাও ভালো হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোকরঞ্জ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের কৃটি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জ করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।
- ৩। যদি মনে এমন বৃক্ষিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।
- ৪। যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্য লেখনী-ধারণ মহাপাপ।
- ৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া



রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ অকর্তব্য। এটি সোজা কথা কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পরিপাট্টের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবক্ষে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান কোটেশন বড় বেশি দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ভৃত করিবেন না।

৮। অলংকার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলংকার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাঙারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌছিবে— ভাঙারে না থাকিলে মাথা কুঁচিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাঙারে অলংকার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মতো কদর্য আর কিছুই নাই।

৯। যে স্থানে অলংকার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বঙ্গবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভালো না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়লে লেখকের নিজেরই আর উহা ভালো লাগিবে না—বঙ্গবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

১০। সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝানো।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, শুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি সংযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

১৩। বাঙালা সাহিত্য, বাঙালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙালার লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|------------|--|
| যশ | — সুখ্যাতি, সুনাম, কীর্তি। |
| লোকরঞ্জন | — জনসাধারণের মনোরঞ্জন বা সন্তোষবিধান। |
| ধর্মবিরক্ত | — নীতি-নৈতিকতার বিরোধী। |
| কোটেশন | — উদ্ভৃতি। অন্যের লেখা থেকে বক্তব্য উদ্ভার করে অপর লেখায় ব্যবহার। |



- ভূষণ, প্রসাধন, শোভা। ভাষার মাধুর্য ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এমন শুণ।
 - পরিহাস, বিদ্রূপ।
 - কথনও, কোনোকালে।
 - বাংলা। উনিশ শতকে বঙ্গিমচন্দ্রের কালে ‘বাংলা’কে ‘বাঙ্গলা’ বলে লেখা হতো।
শব্দটির পরিবর্তন হয়েছে এভাবে: বাঙ্গলা-বাঙ্গলা-বাংলা।

ପାଠ-ପରିଚିତି

বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকীয় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে পরিচিত। “বাঙালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন” রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘প্রচার’ পত্রিকায়, ১৮৮৫ সালে; পরে এটি তাঁর ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ নামক প্রত্নের অঙ্গভূক্ত হয়। সাধু রীতিতে লেখা এই প্রবন্ধটি আকারে ছোট হলেও চিন্তার মৌলিকত্বে অসাধারণ। বক্তব্যের তাৎপর্য বিচার করলে প্রবন্ধটির রয়েছে সর্বকালীন বৈশিষ্ট্য আবেদন। নতুন লেখকদের প্রতি তিনি যে পরামর্শ এখানে উপস্থাপন করেছেন তার প্রতিটি বক্তব্যই পালনযোগ্য। খ্যাতি বা অর্থের উদ্দেশ্যে লেখা নয়; লিখতে হবে মানুষের কল্যাণ সাধন কিংবা সৌন্দর্য সৃষ্টির অভিধায়ে। বঙ্গিমচন্দ্রের মতে, অসত্য, নীতি-নৈতিকতা বিরোধী কিংবা পরনিদ্রার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা স্বার্থতাড়িত লেখা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলতে চান, নতুন লেখকরা কিছু লিখে তাৎক্ষণিকভাবে না ছাপিয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করে পুনরায় পাঠ করলে লেখাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। যার যে বিষয়ে অধিকার নেই সে বিষয়ে লেখার চেষ্টা করা যেমন অনুচিত তেমনি লেখায় বিদ্যা জাহির করার প্রবণতাকেও তিনি নিন্দনীয় বলে মনে করেছেন। অনুকরণবৃত্তিকেও দূষণীয় বলেছেন। অন্যাবশ্যকভাবে লেখার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি বা পরিহাস করার চেষ্টাও তাঁর কাছে কাম্য নয়। সারলয়কেই তিনি সকল অঙ্গকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গকার বলে মনে করেছেন। সর্বোপরি বঙ্গমিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এভাবে এই ছোট লেখাটিতে তিনি লেখকের আদর্শ কী হওয়া উচিত তা অত্যাবশ্যকীয় শব্দ প্রয়োগে উপস্থাপন করেছেন। নবীন লেখকরা বঙ্গিমচন্দ্রের পরামর্শ মান্য করলে লেখক ও পাঠক সমাজ নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবেন; আমাদের মননশীল ও সৃজনশীল জগৎ সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধিতর হবে।

ବହୁନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ

१। लेखकेर 'लोकरञ्जन-प्रवृत्ति' प्रबल हये ओठे की कारणे?

- ক. পাঠকের রুচি বিবেচনায় আনলে
গ. সৌন্দর্য সংষ্ঠির উদ্দেশ্য থাকলে

খ. অর্থলাভের আশায় লিখলে
ঘ. বিদ্যা প্রকাশের প্রচেষ্টা থাকলে

২। বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘লেখা’ বিলম্বে ছাপাতে বলেছেন কেন?

- ক. উপযুক্ত প্রয়াণ সংযোজনের সুবিধার্থে
গ. লেখার ভুল-ক্রটি সংশোধন করতে

খ. পাঠকের মনে চাহিদার উদ্দেশ করতে
ঘ. মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধন করতে

উদ্বীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

“আপনারে যে ভেঙ্গের গড়তে চায় পরের ছাঁচে,
অঙীক, ফাঁকি, মেকি সে জন, নামটা তার কদিন বাঁচে।”

৩। কবিতাংশের ভাব ‘বাঙালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’ প্রবন্ধের লেখকের যে নিবেদনের সাথে
সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো—

- i. পরানুকরণে নিরুৎসাহিতা
- ii. অন্য লেখকদের অনুকৃতি
- iii. স্বকীয়তায় সচেষ্ট থাকা

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪। উক্ত নিবেদন রক্ষিত হলে নিচের কোনটি ঘটতো বলে প্রবক্ষিক মনে করেন?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ক. লেখক স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হতেন | খ. বাংলা সাহিত্যের ভাঙ্গার সমৃদ্ধ হতো |
| গ. অলংকার প্রয়োগ যথার্থ হতো | ঘ. রচনার পরিপাট্য বজায় থাকতো |

সূজনশীল প্রশ্ন

প্রথম বিশ্বযুক্ত পরবর্তী সময় বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, হতাশা ও হাহাকারের উপমহাদেশের জীবন ছিল নানা অভিযাতে বিপর্যস্ত ও ক্রপাঞ্চরিত। এমনই এক পরিবেশে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় বিনির্মাণ করলেন শাশ্বত কল্যাণ ও সাম্যবাদের মহাকাব্যিক এক আশাবাদী জগৎ। তিনি কলম তুলে নিলেন শোষণ-বন্ধনাহীন, শ্রেণিবৈষম্যহীন, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক এক জগৎ সৃষ্টি করতে। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সাম্যের গান গাইলেন। এক সময় তিনি হয়ে উঠলেন ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-গোত্র নির্বিশেষে সকল সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের কলমসেনিক। শোষণ, বন্ধনা ও সকল ধর্কার বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ আজও আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে বারংবার।

- ক. বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী?
- খ. অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ- বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
- গ. উদ্বীপকের কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনা ‘বাঙালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’ প্রবন্ধের কোন বৈশিষ্ট্যটির প্রতিফলন ঘটায় ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বাংলার নতুন লেখকদের প্রতি বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিবেদন উদ্বীপকে যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়েছে কি? উদ্বীপক ও প্রবন্ধের আলোকে তোমার মতামত দাও।



কারবালা-প্রান্তর মীর মশাররফ হোসেন

গেঁথক-পরিচিতি

১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়ায় মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। তাঁর পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশিদূর অগ্রসর না হলেও মীর মশাররফ হোসেন ফরিদপুর নবাব এস্টেটে ও দেলদুয়ার এস্টেটে চাকরি করে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। এরপর তিনি কলকাতা ও পরে পদমদিতে অনেক দিন অবস্থান করেন। ছাত্রজীবনেই ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। মুসলিম রচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমষ্টিগুরু ধারার প্রবর্তক হিসেবে তিনি খ্যাত। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে— নাটক : ‘বসন্তকুমারী’, ‘জমিদার দর্পণ’, ‘এর উপায় কি’; গদ্য : ‘বিষাদ-সিঙ্গু’, ‘নিয়তি কি অবনতি’, ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’, ‘গাজী মির্বার বস্তানী’, ‘ফাস কাগজ’ প্রভৃতি। মহররমের বিষাদময় ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত ‘বিষাদ-সিঙ্গু’ তাঁর বিশ্ময়কর সৃষ্টি। তাঁর রচিত মহাকাব্যধর্মী এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ।

মীর মশাররফ হোসেন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ শে ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম হোসেনের অধ্যের পদক্ষেপ শ্রবণ করিয়া এজিদের সৈন্যগণ চমকিত হইল। সকলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। সকলেই দেখিতে লাগিল, হোসেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে চক্ষের পলকে মহাবীর হোসেন যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উচ্চতরে বলিতে লাগিলেন, “ওরে পাপাআ এজিদ! তুই কোথায়? তুই নিজে দামেক্ষে থাকিয়া নিরীহ সৈন্যদিগকে কেন রণস্থলে পাঠাইয়াছিস? আজ তোকে পাইলে জ্ঞাতিবধবেদনা, আত্মপুত্র কাসেমের বিচেছদবেদনা এবং স্বীয় পুত্রগণের বিয়োগবেদনা, সমস্তই আজ তোর পাপশোণিতে শীতল করিতাম। ওরে অর্থলোভী পিশাচেরা, ধর্মভয় বিসর্জন দিয়া আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিস! আয় দেখি, কে সাহস করিয়া আমার অঙ্গের সম্মুখে আসিবি, আয়! আর বিলম্ব কেন?

এজিদপক্ষীয় সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আবদুর রহমান; হোসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে তাহার চিরসাধ। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই আবদুর রহমান অসি চালনা করিতে করিতে হোসেনের সন্মুখে আসিয়া বলিতে লাগিল, “হোসেন! তুমি আজ শোকে তাপে মহা কাতর; বোধহয়, আজ দশ দিন তোমার পেটে অন্ন নাই; পিপাসায় কষ্টতালু বিশুক; এই কয়েকদিন কেন বাঁচিয়া আছ বলিতে পারি না। আর কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, শীঘ্ৰই তোমার মনের দুঃখ নিৰ্বারণ করিতেছি। বড় দর্পে অশ্বচালনা করিয়া বেড়াইতেছ; এই আবদুর রহমান তোমার সন্মুখে দাঁড়াইল, যত বল থাকে, অঞ্চে তুমি আমাকে আঘাত কর। তোমার বল বুবিয়া দেখি; যদি আমার অস্ত্রাঘাত সহ্য করিবার উপযুক্ত হও, আমি প্রতিঘাত করিব; নতুবা ফিরিয়া যাইয়া তোমার ন্যায় হীন, ক্ষীণ, দুর্বল যোদ্ধাকে খুঁজিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিব।

হোসেন বলিলেন, “এত কথার প্রয়োজন নাই! আমার বৎশমধ্যে কিংবা জ্ঞাতিমধ্যে অঞ্চে অস্ত্র নিষ্কেপের রীতি থাকিলে তুমি এত কথা কহিবার সময় পাইতে না। অস্ত্রই বল পরীক্ষার প্রধান উপকরণ! কেন বিলম্ব করিতেছিস? যে কোনো অস্ত্র হটক, একবার নিষ্কেপ করিলেই তোর যুদ্ধসাধ মিটাইতেছি। বিলম্বে তোর মঙ্গল বটে, কিন্তু আমার অসহ্য।”

হোসেনের মন্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি উভোলনপূর্বক “তোমার মন্তকের মূল্য লক্ষ টাকা!” এই বলিয়া আবদুর রহমান ভীম তরবারি আঘাত করিল। হোসেনের বর্ণেপরি আবদুর রহমানের তরবারিসংলগ্ন হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ



বাহিগত হইল। রহমান লজিত হইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। হোসেন বলিলেন, “আগ্রে সহ্য কর, শেষে পলায়ন করিস।” কেহই আর হোসেনের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। বলিতে লাগিল, “যদি হোসেন আজ এ সময় পিপাসা নিবারণ করিতে বিন্দুমাত্রও জল পায়, তাহা হইলে আমাদের একটি প্রাণীও ইহার হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে না। যুদ্ধ যতই হউক, বিশেষ সতর্ক হইয়া দ্বিশূণ সৈন্য দ্বারা ফোরাতকূল এখন ঘিরিয়া রাখাই কর্তব্য। যে মহাবীর এক আঘাতে আবদুর রহমানকে নিপাতিত করিল, তাহার সম্মুখে কে সাহস করিয়া দাঢ়াইবে? আমরা রহমানের গৌরবেই চিরকাল গৌরব করিয়া বেড়াই, তাহারই যথন এ দশা হইল, তখন আমরা তো হোসেনের অশ্বপদাঘাতেই গলিয়া যাইব।” পরম্পর এইরূপ বলাবলি করিয়া সকলেই একমতে দ্বিশূণ সৈন্য দ্বারা বিশেষ সুদৃঢ়রূপে ফোরাতকূল বন্ধ করিল।

হোসেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমরাঙ্গনে কাহাকেও না পাইয়া শক্রশিবিরাভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন। তদৰ্শনে অনেকেরই প্রাণ উড়িয়া গেল। কেহ অশ্বপদাঘাতে নরকে গমন করিল, কেহ কেহ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া হোসেনের সম্মুখে সশন্ত হইয়া দাঢ়াইল।

অবশিষ্ট সৈন্যগণ কারবালা পার্শ্ব বিজন বনমধ্যে পালাইয়া প্রণৱক্ষা করিল। ওমর, সীমার, আবদুল্লাহ জেয়াদ প্রভৃতি সকলেই হোসেনের ভয়ে বনমধ্যে লুকাইলেন।

শক্রপক্ষের শিবিরস্থ সৈন্য একেবারে নিঃশেষিত করিয়া হোসেন ফোরাতকূলের দিকে অশ চালাইলেন। ফোরাতরক্ষীরা হঠাত পলাইল না, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ হোসেনের অসির আঘাত সহ্য করিয়া আর তিউন্তিবার সাধ্য হইল না। যে এজিদের সৈন্যকোলাহলে প্রচণ্ড কারবালা প্রান্তর, সুপ্রশংস্ত ফোরাতকূল ঘন ঘন বিকল্পিত হইত; এক্ষণে হোসেনের অঙ্গাঘাতে সেই কারবালা একেবারে জনশূন্য নীরব প্রান্তর; শীত্র শীত্র ফোরাতকূলে যাইয়া অশ হইতে অবতরণপূর্বক একেবারে জলে নামিলেন। জলের পরিকার স্নিফ্ফ ভাব দেখিয়া ইচ্ছা করিলেন যে, এককালে নদীর সমুদয় জল পান করিয়া ফেলেন। অঞ্জলিপূর্ণ জল তুলিয়া মুখে দিবেন, এমন সময় সমুদয় কথা মনে পড়িল; আলী আকবর প্রভৃতির কথা মনে পড়িল, পিপাসার্ত দুর্ঘাপোষ্য শিশুর কথা মনে পড়িল। একবিন্দু জলের জন্য ইহারা কত লালায়িত হইয়াছে, কত কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে, কত কষ্টভোগ করিয়াছে, “এই জলের নিমিত্তই আমার পরিজনেরা পুত্রহারা, পতিহারা, ভ্রাতৃহারা হইয়া মাথা ভাঙ্গিয়া মরিতেছে, আমি এখন শক্রহস্ত হইতে ফোরাতকূল উদ্ধার করিয়া সর্বাঙ্গেই নিজে সেই জল পান করিব।—নিজের প্রাণ পরিত্বষ্ট করিব। আমার প্রাণের মাঝাই কি এত অধিক হইল! ধীক আমার প্রাণে!—এই জলের জন্য আলী আকবর আমার জিহ্বা পর্যন্ত চুম্বিয়াছে। একপাত্র জল পাইলে আমার বৎশের উজ্জ্বল মণি মহাবীর কাসেম আজ শক্রহস্তে প্রাণত্যাগ করিত না। এখনো যাহারা জীবিত আছে তাহারাও তো শোকতাপে কাতর হইয়া পিপাসায় মৃতবৎ হইয়া রহিয়াছে। এ জল আমি কখনোই পান করিব না,—ইহজীবনেও আর পানি পান করিব না।” এই কথা বলিয়া—হস্তস্থিত জল নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়া তীরে উঠিলেন। একবার আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া পবিত্র শিরস্ত্রাণ শির হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া কোমর হইতে কোমরবক্ষ খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। ভ্রাতৃশোক, পুত্রশোক, সকল শোক একত্র আসিয়া তাহাকে যেন দৃঢ় করিতে লাগিল। অন্তর্ভুক্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফোরাতশ্রোতরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হোসেনের অশ প্রভুর হস্ত, পদ ও মন্তক শূন্য দেখিয়াই যেন মহাকষ্টে দুই চক্ষু হইতে অনবরত বাঞ্ছজল নির্গত করিতে লাগিল। আবদুল্লাহ জেয়াদ, ওমর, সীমার আর কয়েকজন সৈনিক যাহারা জঙ্গলে লুকাইয়াছিল তাহারা দূর হইতে দেখিল যে, ইয়াম হোসেন জলে নামিয়া অঞ্জলিপূর্ণ জল তুলিয়া পুনরায় ফেলিয়া দিলেন, পান করিলেন না। এতদৰ্শনে ঐ কয়েকজন একত্রে ধনুর্বাণ হস্তে হোসেনকে ঘিরিয়া ফেলিল। হোসেন ছিরভাবে দাঢ়াইয়া আছেন, কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না।



স্থিরভাবে স্থিরনেত্রে ধনুর্ধারী শক্রদিগকে দেখিতেছেন, মুখে কোনো কথা নাই। এমন নিরস্ত্র অবস্থায় শক্রহস্তে পতিত হইয়া মনে কোনো প্রকার শক্ষা নাই। অন্যমনক্ষে কৌ ভাবিতেছেন তাহা ঈশ্বরই জানেন, আর তিনি জানেন। ক্ষণকাল পরে তিনি ফোরাতকূল হইতে অরণ্যাভিমুখে দুই-এক পদ অঞ্চলের হইতে লাগিলেন। শক্রগণ চতুর্স্পার্শে দূরে দূরে তাহাকে ঘিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে জেয়াদ পশ্চাদ্বিক হইতে তাহার পৃষ্ঠ লক্ষ করিয়া এক বিষাক্ত লৌহশর নিষ্কেপ করিল। ভাবিয়াছিল যে, এক শরে পৃষ্ঠ বিন্দু করিয়া বক্ষস্থল ভেদ করিবে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে শর হোসেনের বামপার্শ দিয়া চলিয়া গেল, গাত্রে লাগিল না। শব্দ হইল, সে শব্দে হোসেনের ধ্যানভঙ্গ হইল না। তাহার পর ক্রমাগতই শর নিষ্কিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু একটিও ইয়ামের অঙ্গে বিন্দু হইল না। সীমার শরসন্ধানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না বলিয়াই খণ্ডের হস্তে করিয়া যাইতেছিলেন।

এত তীর নিষ্কিপ্ত হইতেছে, একটিও হোসেনের অঙ্গে লাগিতেছে না। কৌ আশ্র্য! সীমার এই ভাবিয়া জেয়াদের হস্ত হইতে তীরধনু প্রহপূর্বক হোসেনের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া একটি শর নিষ্কেপ করিলেন। তীর পৃষ্ঠে লাগিয়া গ্রীবাদেশের একপার্শ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। সেদিকে হাসানের ঝুক্ষেপ নাই। এমন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন যে, শরীরের বেদনা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। যাইতে যাইতে অন্যমনক্ষে একবার গ্রীবাদেশে বিন্দুস্থান হস্ত দিয়া ঘর্ষণ করিলেন। জলের ন্যায় বোধ হইল; -করতলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন জল নহে-গ্রীবানিষ্ঠসৃত সদ্যরক্ষ! রক্তদর্শনে হোসেন চমকিয়া উঠিলেন। আজ ভয়শূন্য মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সভ্যে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন- আবদুল্লাহ জেয়াদ, অলীদ, ওমর, সীমার এবং আর কয়েকজন সেনা চতুর্দিক ঘিরিয়া যাইতেছে। সকলের হস্তেই তীরধনু। ইহা দেখিয়াই চমকিত। যে সমুদয় বসনের মাহাত্ম্যে নির্ভয় হৃদয় ছিলেন- তৎসমুদয় পারিত্যাগ করিয়াছেন; তরবারি, তীর, নেজা, বল্লম, বর্ম, খণ্ডের কিছুই সঙ্গে নাই, কেবল দুখানি হাত যাত্র। অন্যমনক্ষত্বাবে দুই-এক পদ করিয়া চলিলেন; শক্ররাও পূর্ববৎ ঘিরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কিছু দূরে যাইয়া হোসেন আকাশপালে দুই-তিন বার চাহিয়া ভূ-তলে পড়িয়া গেলেন। বিষাক্ত তীরবিন্দু ক্ষতস্থানের জালা, পিপাসার জালা, শোকতাপ, বিয়োগ দুঃখ- নানা প্রকার জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িলেন। জেয়াদ এবং ওমর প্রভৃতি ভাবিল যে, হোসেনের মৃত্যু হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে হস্তপদ সংঘালনের ক্রিয়া দেখিয়া নিশ্চয় হোসেনের মৃত্যু মনে করিল না, মৃত্যু নিকটবর্তী জ্বাল করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে স্থিরভাবে দণ্ডয়ান রাখিল।

হোসেন জীবিত আছেন। উঠিবার শক্তি নাই। অন্যমনক্ষে কৌ চিন্তায় অভিভূত ছিলেন তিনিই জানেন। চক্ষু মেলিয়া বক্ষের উপর খণ্ডের হস্তে সীমারকে দেয়া বলিতে লাগিলেন, “তুমি ঈশ্বরের সৃষ্টি জীব- তুমি আমার বক্ষের উপর বসিলে?”

“সীমার! আমি এখনই মরিব! বিষাক্ত তীরের আঘাতে আমি অস্ত্র হইয়াছি। বক্ষের উপর হইতে নামিয়া আমায় নিষ্পাস ফেলিতে দাও। একটু বিলম্ব কর। একটু বিলম্বের জন্য কেন আমাকে কষ্ট দিবে? আমার প্রাণ বাহির হইয়া গেলে মাথা কাটিয়া দাও। একবার নিষ্পাস ফেলিতে দাও! আজ নিষ্পয়ই আমার মৃত্যু। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।”

অতি কর্কশবরে সীমার বলিল, “আমি তোর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছি, মাথা না কাটিয়া উঠিব না। যদি অন্য কোনো কথা থাকে, বল। বুকের উপর হইতে একটুও সরিয়া বসিব না।”

হোসেন বলিলেন, “সীমার! তাহা হইলে শ্বিষ্ঠাই মাথা কাটিয়া ফেল! অনর্থক আমাকে কষ্ট দিয়া তোমার কী লাভ হইতেছে? বন্ধুর কার্য কর।”

“আমি তো সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছি। খণ্ডের না কাটিলে আমি আর কী করিব।”

হোসেন বলিলেন, “সীমার! তোমার বক্ষের বসন খোল দেখি?”

“কেন?”

“কানগ আছে। তোমার বক্ষ দেখিলেই আমি জানিতে পারিব যে তুমি আমার কাত্তেল (হস্ত) কি না।”

“তাহার অর্থ কী?”

“অর্থ আছে। অর্থ না থাকিলে বৃথা তোমাকে এমন অনুরোধ করিব কী জন্য? মাতামহ বলিয়া গিয়াছেন, রক্ষমাংসে গঠিত দেহ হইলেও যে বক্ষ লোমশূন্য তাহার হস্তেই তোমার নিশ্চয় মৃত্যু। মাতামহের বাক্য অঙ্গভঙ্গনীয়। সীমার তোমার বক্ষ খুলিয়া ফেল। —আমি দেখি, যদি তাহা না হয় তবে তুমি বৃথা চেষ্টা করিবে কেন?”

সীমার গান্ধের বসন উন্মোচন করিয়া হোসেনকে দেখাইল। নিজেও দেখিল। হোসেন সীমারের বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুই হস্তে দুই চক্ষু আবরণ করিলেন। বার বার খণ্ডের ঘর্ষণে হোসেন বড়ই কাতর হইলেন। পুনরায় সীমারকে বলিতে লাগিলেন, “আর একটি কথা আমার মনে হইয়াছে, বুঝি তাহাতেই খণ্ডের ধার ফিরিয়া গিয়াছে, তোমার পরিশ্রম বৃথা হইতেছে, সীমার! মাতামহ জীবিতাবস্থায় অনেক সময় স্নেহ করিয়া আমার গলদেশ চুম্বন করিয়াছিলেন। সেই পবিত্র ওষ্ঠের চুম্বন মাহাত্ম্যেই তৈলুর অন্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।”

“না, তাহা কখনোই হইবে না। এরূপ কিছুতেই কায়সিঙ্ক হইবে না। দেখ নিশ্চাস ফেলিতে আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। শীষু শীষু তোমার কার্য শেষ করিলে তোমারও লাভ, আমারও কষ্ট নিবারণ। তুমি ঐ তীরবিন্দু স্থানে খণ্ডের বসাও, এখনই ফল দেখিতে পাইবে।”

“তোমার কথা শুনিলে আমার কী লাভ হইবে?”

“অনেক লাভ হইবে। আমি ধর্মত প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পরকালে তোমাকে অবশ্যই মুক্ত করাইব। পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের নাম করিয়া আমি ধর্মত প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে না পারিলে আমি কখনই স্বর্গের দ্বারে পদনিক্ষেপ করিব না। ইহা অপেক্ষা তুমি আর কী লাভ চাও ভাই?”

হোসেনের বক্ষ পরিবর্তন করিয়া সীমার তাঁহার পৃষ্ঠোপরি বসিল। ইমামের দুইখানি হস্ত দুইদিকে পড়িয়া গেল, —দেখাইতে লাগিল, “জগৎ দেখুক, আমি কী অবস্থায় চলিলাম। নূরনবী মোহাম্মদের দৌহিত্র, মদিনার রাজা, —মহাবীর আলীর পুত্র হইয়া শূন্যহস্তে সীমারের অঙ্গাঘাতে কীভাবে আমি ইহ সংসার হইতে বিদায় লইলাম! জগৎ দেখুক!”

আকাশ, পাতাল, অস্তরীক্ষ, অরণ্য, সাগর, পর্বত, বায়ু ভেদ করিয়া চতুর্দিক হইতে রব হইতে লাগিল, “হায় হোসেন! হায় হোসেন!!”

শব্দার্থ ও টীকা

পাপাজ্ঞা

— পাপে পূর্ণ আত্মা। এখানে পাপী।

দামেক্ষ

— ইরাকের একটি স্থান।

রণস্থল

— রণ অর্থ যুদ্ধ, স্থল অর্থ স্থান। রণস্থল হলো যুদ্ধ করার স্থান।

জ্ঞাতিবধবেদনা

— আজীয় হত্যার যন্ত্রণা।



বিচ্ছেদবেদনা

- বিচ্ছেদ বা দূরত্ব তৈরি হওয়ার জন্য বেদনা। মৃত্যুর ব্যথা অর্থেও বিচ্ছেদবেদনা ব্যবহৃত হয়।

শীয়

- নিজ।

বিয়োগবেদনা

- কারো মৃত্যুর কারণে তৈরি হওয়া ব্যথা।

পাপশোণিত

- পাপের রক্ত।

পিশাচ

- সাধারণত ভূত প্রেত ইত্যাদি বোঝায় শব্দটি দ্বারা। কিন্তু এখানে পাপী, অমানুষ হিসেবে বোঝানো হয়েছে।

অশ্পৃষ্ট

- ঘোড়ার পিঠ।

আরোহণ

- ওঠা। যেমন : ঘোড়ায় আরোহণ।

অসি

- তরবারি।

দর্প

- অহংকার।

জ্ঞাতি

- আত্মীয়স্বজন।

অঞ্চে

- আগে।

ভীম

- ভীষণ, ভয়ঙ্কর।

বহির্গত

- বের হওয়া।

নিবারণ

- নিবৃত্ত করা। থামানো।

ফোরাতকূল

- ফোরাত নদীর তীর। ইরাক অঞ্চলের নদী।

নিপাতিত

- পতিত করা।

অশ্পদাঘাত

- ঘোড়ার পায়ের আঘাত।

সমরাঙ্গন

- সমর ও অঙ্গ মিলে সমরাঙ্গন, অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র।

শক্রশিবিরাভিমুখ

- শক্র যেখানে অবস্থান করে সেই দিকে।

তদর্শনে

- তা দেখে।

বিজন

- জনমানব নেই এমন।

তিঠিবার

- অপেক্ষা করার, ধৈর্য ধরার, সহ্য করার ইত্যাদি বোঝায়।

কারবালা

- ইরাক অঞ্চলের বিখ্যাত ময়দান, এখানেই এজিদ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয় ইয়াম হোসেনের।

অবতরণপূর্বক

- নেমে।

অঞ্জলিপূর্ণ

- আঁজলা ভরা।

লালায়িত

- লোভযুক্ত।

মৃতবৎ

- মৃতের মতো।

শিরস্ত্রাণ

- বর্ম।

ধনুর্বাণ

- ধনুক ও তার তীর।

এতদর্শনে

- তা দর্শন করে, তা দেখে।

ধনুর্ধৰণী

- ধনুক ধারণ করে আছে যে।

অরণ্যাভিমুখে

- অরণ্যের অভিমুখে।



| | |
|---------------|---|
| চতুর্পার্শ্বে | - চার পাশে। |
| লৌহশর | - লোহার তির। |
| শরসন্ধানে | - নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ধনুকে তির স্থাপন। |
| খঙ্গর | - চাকু, ছুরি। |
| ঢীবাদেশ | - ঘাড়, গলদেশ। |
| নেজা | - বর্ণ। |
| বল্লম | - বর্ণ। |
| পূর্ববৎ | - আগের মতো। |
| ভূতল | - মাটি। |
| সঞ্চালন | - নড়ানো। |
| অন্তরীক্ষ | - আকাশ। |

পাঠ পরিচিতি

“কারবালা-প্রান্তর” গদ্যাংশটি মীর মশাররফ হোসেন রচিত ‘বিষাদ-সিঙ্গু’ উপন্যাসের একটি অংশ। এখানে দেখা যাচ্ছে, ফোরাত নদীর উপকূলে কারবালার প্রান্তরে এজিদ-বাহিনীর বিরুক্তে যুদ্ধ করছেন হোসেন। তিনি নবি হযরত মোহাম্মদের (সা.) কল্যা হযরত ফাতিমা (রা.) ও জামাতা হযরত আলির (রা.) পুত্র। ক্ষমতালোভী এজিদ বড়যন্ত্র করে হোসেনের ভাই হাসান, হাসানের পুত্র কাসেমসহ পরিবারের অনেক সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ‘কারবালা-প্রান্তরে’ দেখা যাচ্ছে হোসেন নিজেই যুদ্ধে নেমেছেন। যুদ্ধে এজিদ নিজে অনুপস্থিত দেখে হোসেন ক্ষেত্র প্রকাশ করলেন। কারণ এজিদ পাঠিয়েছে নিরীহ সৈনিকদের। তবু যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রচণ্ড লড়াই করে তিনি পরাজিত করলেন এজিদ-পক্ষের সেনাদের। এক সময় ত্রুষ্ণার্ত হয়ে ফোরাত নদীর পানি পান করতে গেলেন। তাঁর মনে পড়ল পানির অভাবে মৃত্যুবরণ করা পরিবার-স্বজনদের কথা। হোসেন আঁজলায় তুলে নেয়া পানি ফেলে দিলেন। মগ্ন হয়ে ভাবছিলেন হারানো স্বজনদের কথা। সে সময় লুকিয়ে থাকা শক্ররা তাঁকে আঘাত করল। সীমারের ছুঁড়ে দেয়া বিমাক্ষ তিরে বিদ্ধ হলেন তিনি। গভীর যন্ত্রণায় কাতর হলেন। হোসেনের হাতে তখন কেনে অন্ত নেই। সে সুযোগে সীমার তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করল। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। কেননা হযরত মোহাম্মদ (সা.) ছোট হোসেনকে আদর করে গলায় চুম্ব খেতেন। হোসেন সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে সীমারকে তাঁর পিঠের ওপর বসে ছুরি চালাতে বললেন। সীমারকে আখাস দিলেন মৃত্যুর পর সীমারকে না নিয়ে স্বর্গে যাবেন না। সীমার তা-ই করল। মর্মান্তিকভাবে শহিদ হলেন হোসেন। গঞ্জের এ অংশে প্রকাশিত হয়েছে হোসেনের বীরত্ব, স্বজনদের প্রতি ভালোবাসা, যুদ্ধনীতি ও আত্ম্যাগ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। এজিদ পক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কে?

- ক. সীমার
- গ. ওমর

- খ. আব্দুলাহ জেয়াদ
- ঘ. আবদুর রহমান



২। অঞ্জলিপূর্ণ জল তুলেও ইমাম হোসেন পান করলেন না কেন?

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ক. ফোরাতকূলের জল নোত্বা ছিল | খ. শক্রগঢ় বাধা দিয়েছিল |
| গ. স্বজনরা জলবিনা মারা গিয়েছিল | ঘ. ফোরাতকূলে পৌঁছে তৃষ্ণা ছিল না |

উদ্দীপকটি পড়ে ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৯৭১ সালের জুলাই মাস। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সারা দেশ উভাল। মা'র সাথে দেখা করতে এসে মুক্তিযোদ্ধা শফিক দেখলো পুরো গ্রাম জনশূন্য, প্রাচের স্কুলঘরকে পাকবাহিনী তাদের ক্যাম্প বানিয়েছে। দেরি না করে একাই আক্রমণ করে মিলিটারি ক্যাম্প। দু'একজন পালিয়ে বাঁচলেও অধিকাংশই শফিকের গুলিতে প্রাণ হারায়।

৩। উদ্দীপকের শফিক এর কাজ 'কারবালা-প্রান্তর' রচনার কোন চরিত্রের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- | | |
|----------|----------------|
| ক. এজিদ | খ. আবদুর রহমান |
| গ. সীমার | ঘ. ইমাম হোসেন |

৪. উক্ত সাদৃশ্যের কারণ-

- i. বীরত্ব
 - ii. দেশপ্রেম
 - iii. স্বাজ্ঞাত্যবোধ
- নিচের কোনটি ঠিক?
- | | |
|------------|----------------|
| ক. i. ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও।

উদ্দীপক-১

মোঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর অল্প বয়সেই মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারতের ইত্তাহীম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। আবার মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে বিশাল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপক-২

বাবরের ভারত সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা মেনে নিতে পারেনি রাজপুতগণ। তাই তরুণ বীর রণবীর চৌহান বাবরকে হত্যার উদ্দেশ্য দিল্লির পথে পথে ঘূরতে থাকে; ঘটনাক্রমে পেয়েও যায়। বাবরের এক মহত্ত্বের ঘটনায় চৌহান মৃত্যু হয় এবং অপরাধ স্থীকার করে শাস্তি প্রার্থনা করে। সমস্ত ঘটনা জেনে বাবর তাকে বুকে টেনে নেন এবং দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন।

ক. ইমাম হোসেনকে অস্ত্রহীন দেখে কে অনবরত অঞ্চ বিসর্জন করেছিল?

খ. 'ইহজীবনেও আর পানি পান করিব না'— ইমাম হোসেনের এই প্রতিভার কারণ বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপক-২ অংশে ইমাম হোসেন চরিত্রের যে বিশেষ দিকটির প্রতিফলন লক্ষণীয় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিল্ল হলেও সম্রাট বাবর ও ইমাম হোসেন যেন একই বৃন্তে দুটি কুসুম'— মন্তব্যের সঙ্গে যুক্ত দাও।



অপরিচিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। বিশ্বকবি অভিধায় সম্মানিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্বক ছোটগল্প রচয়িতা এবং বাংলা ছোটগল্পের প্রের্ণ শিল্পী। তাঁর সেখনীতেই বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল, বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। তাঁর ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের প্রের্ণ ছোটগল্পগুলোর সমতুল্য। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে মাত্র ঘোল বছর বয়সে “ভিখারিনী” গল্প রচনার মাধ্যমে ছোটগল্প লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর পর থেকে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ চৌধুরি বছরে তিনি অর্খণ্ড ‘গল্পগুচ্ছে’ সংকলিত ৯৫টি ছোটগল্প রচনা করেছেন। এর বাইরেও ‘সে’, ‘গল্পসংগ্রহ’ এবং ‘লিপিকা’ গ্রন্থে তাঁর আরও গল্প সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম “মুসলমানীর গল্প”।

পারিবারিক জগিদারি তদারকির সূত্রে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের কালই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ। ‘সোনার তরী’ কাব্যের প্রের্ণ কবিতাগুলোও তিনি একই সময়ে রচনা করেন। প্রকৃতির পটে জীবনকে স্থাপন করে জীবনের গীতয়ন বিশ্বজনীন প্রকাশই রবীন্দ্রগল্পের প্রের্ণ সম্পদ। তবে বিশ শতকে রচিত গল্পে প্রকৃতি ও গীতয়নভার স্থলে বাস্তবতাই প্রাথমিক পেয়েছে। গল্পকার হিসেবে তিনি যেমন বরেণ্য, উপন্যাসিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে ‘চোখের বালি’, ‘গোরা’, ‘চতুরঙ্গ’, ‘ঘরে-বাইরে’, ‘শেষের কবিতা’, ‘যোগাযোগ’ বাংলা উপন্যাসের প্রের্ণ সম্পদ। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের প্রের্ণস্থ অবিস্ময়দিত। তাঁর রচিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হলো : ‘রাজা’, ‘অচলায়তন’, ‘ডাকঘর’, ‘মুক্তধারা’, ‘রক্ষকরবী’।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২এ শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান ঘটে।

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে অমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিলু ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্যুপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্যুপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ-বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্ধপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।



আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্লুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুধির্যা লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গন্ধুষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাঝেই স্থীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত ধাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঁঝঁট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে— বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্মক্ষ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সমক্ষে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহোক শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উত্তলা করিয়া দিল। সে বলিল, “ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।”

কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাস করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিঞ্চাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই— থাকিবার মধ্যেও ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরম্ভুমির মধ্যে আমার দ্রদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল—আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্঵াস, তরুর্মর্মের তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, “মেয়ে যদি বল, তবে—”। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপঞ্জবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল ত্বর্ণাত।

আমি হরিশকে বলিলাম, “একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।”

হরিশ আসর জয়াইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার ধাতির। মামাও তাঁহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালে ইহাদের বৎশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘৃত ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বৎশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দিখা হইবে না।

এসব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বৎশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই— বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙ্গা পশ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন— কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তাকেই মামা আন্তর্মান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোঁকাগার পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলাম না।



কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিসতুতো ভাই। তাহার মতো কুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি ঘোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!"

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহ্য্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিনি দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চাল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গৌকে পাক ধরিতে আরঞ্জ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোবা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ। যে দৃষ্টি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল— ধনে মানে আমাদের হান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না— কোনো ফাঁকে একটা ছাঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে ভুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সমন্বে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অক্ষ তো হিঁর ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এসমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থুল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভাব যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশৰ্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সমস্ত আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা, এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ-ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধূম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-শুমারি করিতে হইলে কেরানি গ্রাথিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কঙ্গট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মন্ত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিল বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আঠটিতে হারেতে জরি-জহরতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে ঢিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া দিখিয়া ভাবী খণ্ডের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে চুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজ্ঞ নয়। মুখে তো কথাই নাই কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং



বিপুল-শ্বরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া, ন্যূনতার স্মিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কঙ্গট পাটির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিঞ্চ করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই এটা এস্পার-ওস্পার হইত ।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শভূনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন । কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শভূনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, “বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে ।” ব্যাপারখনা এই । —সকলের না হটক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে । মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না । তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন—বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না । বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সমস্কে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন—দেওয়া-ধোওয়া সমস্কে এ লোকটির শুধু মূখের কথার উপর ভর করা চলিবে না । সেইজন্য বাড়ির সেকরাকে সুন্দ সঙ্গে আনিয়াছিলেন । পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্ষপোশে এবং সেকরা তাহার দাঁড়িপাণ্ডা কষ্টপাথর প্রভৃতি লইয়া মেঝেয় বসিয়া আছে ।

শভূনাথবাবু আমাকে বলিলেন, “তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কলের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল ।”

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রাখিলাম ।

মামা বলিলেন, “ও আবার কী বলিবে । আমি যা বলিব তাই হইবে ।”

শভূনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সমস্কে তোমার কিছুই বলিবার নাই?”

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার ।

“আচ্ছা তবে বোসো, মেঝের গা হইতে সমস্ত গহনা ধূলিয়া আনিতেছি ।” এই বলিয়া তিনি উঠিলেন ।

মামা বলিলেন, “অনুপম এখানে কী করিবে । ও সভায় গিয়া বসুক ।”

শভূনাথ বলিলেন, “না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে ।”

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্ষপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন । সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা—হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়—যেমন মোটা তেমনি ভারী ।

সেকরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, “এ আর দেখিব কী । ইহাতে খাদ নাই—এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না ।”

এই বলিয়া সে মকরমুখ্য মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায় ।

মামা তখনই নেটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে । হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায়, দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি ।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল । শভূনাথ সেইটে সেকরার হাতে দিয়া বলিলেন, “এইটে একবার পরব্রহ্ম করিয়া দেখো ।”

সেকরা কহিল, “ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে ।”

শভূনাথ এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, “এটা আপনারাই রাখিয়া দিন ।”

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কল্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে বিষ্ট তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সঙ্গেগ হইতে বধিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, “অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে।”

শঙ্খনাথবাবু বলিলেন, “না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।”

মামা বলিলেন, “সে কী কথা। লগ্ন—”

শঙ্খনাথবাবু বলিলেন, “সেজন্য কিছু ভাবিবেন না—এখন উঠুন।”

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিষ্ট ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ত ছিল না। কিষ্ট রাখা ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শঙ্খনাথবাবু মামাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, “সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।”

এ সময়ে মামার কোনো মত্ত্বাকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?”

মৃত্তিমত্তী মাত্-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শঙ্খনাথবাবু মামাকে বলিলেন, “আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—”

মামা বলিলেন, “তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।”

শঙ্খনাথ বলিলেন, “তবে আপনাদের গাঢ়ি বলিয়া দিই?”

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।”

শঙ্খনাথ কহিলেন, “ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।”

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রাখিলেন।

শঙ্খনাথ কহিলেন, “আমার কল্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কল্যা দিতে পারি না।”

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যিক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তারপরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। বাড়লঠন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লঙ্ঘণ করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাস্ত রসনচৌকি ও কল্পট একসঙ্গে বাজিল না এবং অঙ্গের ঝাড়গুলো আকাশের তারার



উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কল্যার পিতার এত শুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, “দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।” কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ শয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি।

মন্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কল্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড়ো সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলকের দাগ কোন নষ্ট গ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, “বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল— পাকবস্ত্রটাকে সমস্ত অনন্যসুজ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।”

বিবাহের চুক্তিঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব বলিয়া মাঝ অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতেষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহ্য্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জন্ম হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গৌফের রেখায় তা দিতে দিতে এইচেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের শ্রাতের পাশাপাশি আর একটা স্নোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল— এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাঢ়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গুরু পাই, পাতার শব্দ শুনি— কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিলুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্ত্রির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিলুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি ফুলিস্তের মতো আমার মনের মাঝাখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফটোঘাস দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো একটি বাস্ত্রের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না? যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচল আসিয়া পড়ে না? হঠাতে বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না?

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মাঝ তো লজ্জায় বিবাহসংস্কারের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে তুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জ্বালিয়াছিল, কিন্তু সে পথ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চূল বাঁধিতে তুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, “আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।” হঠাতে কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, “মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।” মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, “কই কিছুই তো হয় নি বাবা।” বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের ঝুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্শ হইয়াছে তখন বাপের গ্রাগে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি



ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো ঝুপ ধরিয়া ফোস করিয়া উঠিল। সে বলিল, “বেশ তো, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমজ্জন হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।” কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ সে রাজহংসের ঝুপ ধরিয়া বলিল, “যেমন করিয়া আমি একদিন দম্ভযন্তীর পুল্পবনে শিয়াহিলাম, তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও—আমি বিবর্হিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।” তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, মুখ ফুলটি মুখ তুলিল—এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর সবাই আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

8

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখালি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ মায়া এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। বাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুঝরুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অঙ্ককার মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাশুলি চিরপরিচিত— আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ বাঞ্চ জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন একরকম হইয়া পড়িয়া আছি।

এমন সময়ে সেই অস্তুত পৃথিবীর অস্তুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, “শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।” মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটি প্রেণিভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া উঠে, “এমন তো আর শুনি নাই।”

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনিবচনীয়, আমার মনে হয় কষ্টস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিন্তুই দেখিলাম না। প্লাটফর্মের অঙ্ককারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষ লর্ণ নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের ঝুপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সূর, অচেনা কঠের সূর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি— চতুর্ভুজ কালের ক্ষুক্ষ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলভায় এতুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি সোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া—“গাড়িতে জায়গা আছে।” আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে যায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধায় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ ঝুপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে—শীত্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীত্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনে একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, তয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রে নামিয়া যায়।



পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট ফ্লাসের টিকিট-মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্লাটফর্মে সাহেবেদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট ফ্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময়ে সেকেন্ড ফ্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না—এখানে জায়গা আছে।”

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্র্যমধুর কষ্ট এবং সেই গানেরই ধূয়া—“জায়গা আছে।” ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফটোঘাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রাখিল—গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে—কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে—তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরাটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নববৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শৃচ্ছিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িয়া নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক-রজনীগঙ্কার শুভ মঞ্জুরীর মতো সরল বৃত্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না—ছেটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছেট হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্লের বই—তাহারই কোনো—একটা বিশেষ গল্ল শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্ল নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকর্ত্তের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্ল শোনে তখন গল্ল নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝর্ণা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উজ্জাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সংজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেঠিল করিয়াছে সে ঐ তরঙ্গীরই অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার। পরের স্টেশনে পৌছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুষ্ঠ কিনিয়া লইল এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্থীকার করিলাম না।



মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়াছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভৱ হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাতে কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসন্ধি এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বার বার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘূরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশি বেলওয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লটকাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, “এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।”

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, “না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।” সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, “না ছাড়িয়া উপায় নাই।”

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ঠতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, “আমি দৃঢ়বিত, কিন্তু—”

শুনিয়া আমি ‘কুলি কুলি’ করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, “না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বাসিয়া থাকুন।”

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, “এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।”

বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্লাটফর্মে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে অথবে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পর মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্ন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি জাজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থায়িল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত-স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছাড়িয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী মা।”

মেয়েটি বলিল, “আমার নাম কল্যাণী।”

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

“তোমার বাবা—”

“তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শশুন্নাথ সেন।”

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।



মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শশুন্নাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী
বলে, “আমি বিবাহ করিব না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন।”

সে বলিল, “মাতৃ-আজ্ঞা।”

কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুবিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ
করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরাটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেনে কোন
ওপারের বাঁশি—আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল—সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে
রাত্রির অঙ্ককারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল “জায়গা আছে”, সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধূয়া হইয়া
রাখিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে
ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক
রাত্রির অজানা কঠের মধুর সুরের আশা—জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের
পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া
দিই—আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে
না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

শব্দার্থ ও টীকা

‘এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের

হিসাবে বড়ো, না

গুণের হিসাবে।’

ফলের মতো গুটি

- গল্লের কথক চরিত্র অনুপমের আত্মসমালোচনা। পরিমাণ ও শুণ উভয়
দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত
হয়েছে।
- গুটি এক সময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো
হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবস্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল
জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা।

মাকাল ফল

- দেখতে সুন্দর অখচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শৌসযুক্ত খোওয়ার অনুপযোগী ফল।
বিশেষ অর্থে গুণহীন।
- অল্পে পরিপূর্ণ। দেবী দুর্গা।
- গজ (হাতি) আনন যার। গণেশ।



‘আজও আমাকে দেখিলে মনে
হইবে, আমি অগ্নিপূর্ণীর কোলে
গজাননের ছোটো ভাইটি ।’

ফলু

‘ফলুর বালির মতো তিনি
আমাদের সমস্ত সৎসারটাকে
নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া
লইয়াছেন ।’

গন্ধু

অঙ্গপুর

শ্বয়ংবরা

গুড়গুড়ি

বাঁধা ঝুঁকা

উমেদারি

অবকাশের মরুভূমি এক
কালে ইহাদের বৎশে লক্ষ্মীর
মঙ্গলঘট ভরা ছিল ।

পশ্চিমে

আভামান দ্বীপ

কোল্লগর

মনু

মনু সংহিতা

প্রজাপতি

পথঃশর

কল্পট

- দেবী দুর্গার দুই পুত্র; অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। দুর্গার কোলে
থাকা দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। ব্যঙ্গার্থে
প্রয়োগ ।
- ভারতের গয়া অঞ্চলের অঙ্গঃসলিলা মন্দি। মন্দীটির ওপরের অংশে বালির
আন্তরণ কিন্তু ভেতরে জলপ্রোত প্রবাহিত ।

- অনুপম তার মামার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে। সৎসারের
সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা এখানে উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত
করা হয়েছে।

- একমুখ বা এককোষ জল ।
- অন্দরমহল। ভেতরবাড়ি ।
- যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে ।
- আলবোলা। ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত হৃকাবিশেষ ।
- সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলে তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ ।
- প্রার্থনা। চাকরির আশায় অন্ত্যের কাছে ধরনা দেওয়া ।
- আনন্দহীন প্রচুর অবসর বোঝানো হয়েছে ।

- লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। মঙ্গলঘট তাঁর প্রতীক। কল্যাণীদের বৎশে
একসময় লক্ষ্মীর কৃপায় ঐশ্বর্যের ঘট পূর্ণ ছিল ।

- এখানে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে।
- ভারতীয় সীমানাভুক্ত বঙ্গোপসাগরের দ্বীপবিশেষ। অদেশি আন্দোলনের মুগে
রাজবন্দিদের নির্বাসন শাস্তি দিয়ে আভামান বা আন্দামানে পাঠানো হতো ।
- কলকাতার নিকটস্থ একটি স্থান ।
- বিধানকর্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ ।
- মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ ।
- জীবের শ্রষ্টা। ব্রহ্ম। ইনি বিয়ের দেবতা ।
- মদনদেবের ব্যবহার্য পাঁচ ধরনের বাণ ।
- মানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান ।



- সেকরা** — বর্ণবার, সোনার অলংকার প্রস্তুতকারক।
- ‘বৰৰ কোলাহলেৰ মন্ত্ৰ হস্তী
দ্বাৰা সংগীতসৱৰষ্টীৰ পঞ্চবন
দলিত বিদলিত কৱিয়া আমি
তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম’** — অনুপম নিজেৰ বিবাহযাত্রার পৱিষ্ঠিতি বৰ্ণনায় সুৱচ্ছন্য বিকট কোলাহলকে সংগীত সৱৰষ্টীৰ পঞ্চবন দলিত হওয়াৰ ঘটনাৰ সঙ্গে তুলনা কৱেছে।
- অভিষিক্ত** — অভিষেক কৱা হয়েছে এমন।
- সওগাদ** — উপচৌকন। ভেট।
- লোক-বিদ্যায়** — পাওনা পৱিষ্ঠোধ। এখানে অনুষ্ঠানেৰ শেষে পাওনাদারদেৱ পাওনা পৱিষ্ঠোধেৰ কথা বলা হয়েছে।
- দেওয়া-থোওয়া** — বিয়েৰ ঘোৰুক ও আনুষঙ্গিক খৰচ বোৰাতে কথাটি বলা হয়েছে।
- কষ্টিপাথৰ** — যে পাথৰে ঘষে সোনাৰ ঝাঁটিত্ত পৰীক্ষা কৱা হয়।
- মকৱমুখো মোটা একখানা বালা** — মকৱ বা কুমিৱেৱ মুখাকৃত্যুক্ত হাতে পৱিষ্ঠেয় অলংকাৰবিশেষ।
- এয়াৱিং** — কানেৰ দুল। Earring
- দক্ষযজ্ঞ** — প্ৰজাপতি দক্ষ কৰ্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এ যজ্ঞে পতিনিদা শুনে সতী দেহত্যাগ কৱেন। শ্ৰীৰ মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব অনুচৱসহ যজ্ঞস্থলে পৌছে যজ্ঞ ধৰণ্স কৱে দেন এবং সতীৰ শব কাঁধে তুলে নিয়ে প্ৰলয় নৃত্যে মন্ত্ৰ হন। এখানে প্ৰলয়কাণ্ড বা হট্টগোল বোৰাচ্ছে।
- ৱসনচৌকি** — শানাই, ঢোল ও কাসি— এই তিনি বাদ্যযন্ত্ৰে সৃষ্টি ঐকতানবাদন।
- অদ্র** — এক ধৰনেৰ খনিজ ধাতু। Mica
- অদ্রেৰ ঝাড়** — অদ্রেৰ তৈৱিৰ ঝাড়বাতি।
- মহানিৰ্বাণ** — সবৱকমেৱ বন্ধন থেকে মুক্তি।
- কলি** — পুৱাগে বৰ্ণিত চাৱ যুগেৱ শেষ যুগ। কলিযুগ। কলিকাল।
- কলি যে চাৱপোয়া** — কলিকাল পৱিপূৰ্ণৱাপে আত্মপ্রকাশ কৱল।
- হইয়া আসিল!** — পাকষ্টী।
- পাকষ্টী** — সন্ধ্যা।
- প্ৰদোষ** — একদিক খোলা তিনদিক ঢাকা বিশেষ ধৰনেৰ লক্ষ্টন, যা রেলপথেৰ সংকেত দেখানোৰ কাজে ব্যবহৃত হয়।
- একচক্ষু লক্ষ্টন** — মাটিৰ খোলেৱ দুপাশে চামড়া লাগানো এক ধৰনেৰ বাদ্যযন্ত্ৰ।
- মৃদঙ্গ** — গাড়ি লোহাৰ মৃদঙ্গে
- তাল দিতে দিতে চলিল।’** — চলন্ত রেলগাড়িৰ অবিৱাম ধাতব ধৰণি বোৰানো হয়েছে।

- ধূয়া
জড়িমা
মঞ্জরী
একপন্থ
কানপুর
'তার পরে বুবিলাম,
মাতৃভূমি আছে।'
- গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে ।
 - আড়ষ্টতা । জড়ত ।
 - কিশলয়যুক্ত কচি ডাল । মুকুল
 - একপন্থ ।
 - ভারতের একটি শহর ।
 - কল্যাণী যে দেশমাত্কার সেবায় আত্মানিয়োগ করেছে, অনুপমের এই আজ্ঞাপলঙ্কী এখানে প্রকাশিত ।

পাঠ-পরিচিতি

"অপরিচিতা" প্রথম প্রকাশিত হয় প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায় । এটি প্রথম প্রস্তুত হয় রবীন্দ্রগঙ্গের সংকলন 'গল্পসংক্ষ' -এ এবং পরে, 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭) ।

"অপরিচিতা" গঙ্গে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম কল্যাণী । অমানবিক যৌতুক প্রধার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতঃপূর্বে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । কিন্তু এই গঙ্গেই প্রথম যৌতুক প্রধার বিকল্পে নারী-পুরুষের সম্বিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনানোন তিনি । এ গঙ্গে পিতা শম্ভুনাথ সেন এবং কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্রবীক্ষা ও আচরণে সমাজে গেড়ে-বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে । পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং কন্যা কল্যাণীর দেশচেতনায় খন্দ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পাটি সার্থক ।

"অপরিচিতা" উন্নম পুরুষের জৰানিতে লেখা গল্প । গঙ্গের কথক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাণিজ যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র । তাকে দেখলে আজো মনে হয়, সে যেন যায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র । তারই বিয়ে উপলক্ষ্যে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবয়ননাকালে শম্ভুনাথ সেনের কন্যা-সম্পাদনে অসম্মতি গল্পাটির শীর্ষ মুহূর্ত । অনুপম নিজের গল্প বলতে গিয়ে ব্যাঙ্গার্থে জানিয়ে দিয়েছে সেই অঘটন সংঘটনের কথাটি । বিয়ের লগ্ন যখন প্রস্তুত তখন কন্যার লঘুভূষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অর্থচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আও আবির্ভাবকেই সংকেতবৎ করে তুলেছে । কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গঙ্গের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিপ্রদ আত্মপ্রকাশও ভবিষ্যতের নতুন নারীর আগমনীর ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত ।

'অপরিচিতা' মনস্তাপে ভেঙ্গেপড়া এক ব্যক্তিত্বীন যুবকের স্বীকারোভিতির গল্প, তার পাপস্থালনের অকপট কথামালা । অনুপমের আত্মবিবৃতির সূত্র ধরেই গঙ্গের নারী কল্যাণী অসামান্য হয়ে উঠেছে । গল্পাটিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফূরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি একই সঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশংসিত কীর্তিত হয়েছে ।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- | | |
|--|---------------------------|
| ২. মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলার কারণ, তার ক. প্রতিপত্তি | খ. প্রভাব গ. বিচক্ষণতা |
|--|---------------------------|

ନିଚେର ଉଦ୍‌ଦିଗ୍ଧକଟି ପଡେ ୩ ଓ ୪ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

পিতৃহীন দীপ্তির চাচাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। দীপ্তি শিক্ষিত হলেও তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। চাচা তার বিয়ের উদ্যোগ নিলেও যৌতুক নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে কন্যার পিতা অপমানিত বোধ করে বিয়ের আলোচনা ভেঙ্গে দেন। দীপ্তি মেয়েটির ছবি দেখে মন্দ হলেও তার চাচাকে কিছুই বলতে পারেননি।

৪. উক্ত চরিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে—

 - দৌরাত্ম্য
 - হীনস্মর্ণতা
 - লোভ

নিচের কোনটি ঠিক?

ନିଚେର କୋଣଟି ଠିକ?

- ক. i ও ii
গ. i ও iii

সুজনশীল পদ্ম

ମା ମରା ଛୋଟ ମେଯେ ଲାବନି ଆଜି ଶୁଣି ବାଡ଼ି ଯାବେ । ସୁଖେ ଥାକବେ ଏହି ଆଶାୟ ଦରିଦ୍ର କୃଷକ ଲତିଫ ମିଆ ଆବାଦେର ସାମାନ୍ୟ ଜମିଟୁଳୁ ବଞ୍ଚିକ ରେଖେ ପଗେର ଟାକା ଯୋଗାଡ଼ କରିଲେନ । କିନ୍ତୁ ତାତେଓ କିଛୁ ଟାକାର ସାଟିତି ରଯେ ଗେଲ । ଏହିକେ ବର ପାରଭେଜେର ବାବା ହାରନ ମିଆର ଏକ କଥା ସମ୍ପର୍କ ଟାକା ନା ପେଲେ ତିନି ହେଲେକେ ନିଯେ ଚଲେ ଯାବେନ । ବିସଯାଟି ପାରଭେଜେର କାନେ ଗେଲେ ସେ ବାପକେ ସାଫ ଜାନିଯେ ଦେଇ, ‘ମେ ଦରଦାମ ବା କେନାବୋଚାର ପଗ୍ନ ନନ୍ଦ । ମେ ଏକଜନ ମାନୁସକେ ଜୀବନସଙ୍ଗୀ କରିତେ ଏସେହେ, ଅପମାନ କରିତେ ନନ୍ଦ । ଫିରିତେ ହଲେ ଲାବନିକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେଇ ବାଡ଼ି ଫିରିବେ ।’

- ক. শশুলাথ সেকরার হাতে কী পরখ করতে দিয়েছিলেন?

খ. ‘বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে’
বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুপম ও পারভেজের চারিত্বিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবণিরা অপমানের শিকার হয়—
মন্তব্যাচ্চির যথার্থতা নিকৃপণ কর।

বৰ্ষা প্ৰমথ চৌধুৱী

লেখক-পৰিচিতি

প্ৰমথ চৌধুৱী ১৮৬৮ খ্ৰিষ্টাব্দেৰ ৭ই আগস্ট মশোৱ জেলায় জন্মগ্ৰহণ কৰেন। তাঁৰ পৈতৃক নিবাস পাৰ্বনা জেলাৰ হৱিপুৰ থামে। তাঁৰ পিতাৰ নাম দুর্গাদাস চৌধুৱী। শিক্ষাজীবনে তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্ৰ। ১৮৯০ খ্ৰিষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংৰেজি সাহিত্যে প্ৰথম শ্ৰেণিতে এমএ ডিপ্রি লাভ কৰেন। কৰ্মজীবনে তিনি ছিলেন ইংৰেজি সাহিত্যে অধ্যাপক। বাংলা সাহিত্যে প্ৰমথ চৌধুৱী ছিলেন চলিত গদ্যৱীতিৰ প্ৰবৰ্তক। সেই সঙ্গে পৰিশীলিত বাগবন্দৰ্ঘময় রম্যৱচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁৰ বহু গ্ৰচনা প্ৰকাশিত হয়েছে ‘বীৱল’ ছাঞ্চনামে। বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষাবীতিৰ প্ৰথম মুখ্যপত্ৰ ‘সুবৃজপত্ৰ’ পত্ৰিকাটি ছিল তাঁৰই সম্পাদিত। রবীন্দ্ৰনাথসহ সমকালীন বিখ্যাত মননশীল লেখকদেৱ অনেকেই ছিলেন এই পত্ৰিকাৰ লেখক। প্ৰমথ চৌধুৱীৰ গদ্যশৈলীৰ নিদৰ্শন রয়েছে ‘চার ইয়াৱি কথা’, ‘বীৱলেৰ হালখাতা’, ‘ৱায়তেৰ কথা’, ‘তেল-নুন-লকড়ি’ ইত্যাদি গদ্যগ্ৰন্থ। ‘সনেট পত্ৰশাখা’ তাঁৰ উল্লেখযোগ্য কাৰ্যগ্ৰহণ। গল্পকাৰ ও সনেটকাৰ হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁৰ বিশিষ্ট অবস্থান রয়েছে।

প্ৰমথ চৌধুৱী ১৯৪৬ খ্ৰিষ্টাব্দেৰ দোসৱা সেপ্টেম্বৰ শাস্তিনিকেতনে মৃত্যুবৰণ কৰেন।

এমন দিনে কী লিখতে মন যায়?

আজ সকালে ঘূৰ থেকে উঠে দেখি যে, যে দিকে যতদূৰ দৃষ্টি যায় সমগ্ৰ আকাশ বৰ্ষায় ভৱে গিয়েছে। মাথাৰ উপৰ থেকে অবিৱাম অবিৱল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিৰ ধাৰা পড়ছে। সে ধাৰা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূল নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আৱ কানে আসছে তাৰ একটানা আওয়াজ; সে আওয়াজ কখনো মনে হয় নদীৰ কুলুধনি, কখনো মনে হয় তা পাতাৰ মৰ্ম। আসলে তা একসঙ্গে ও দুই-ই; কেননা আজকেৰ দিনে জলেৰ স্বৰ ও বাতাসেৰ স্বৰ দুই মিলে-মিশে এক সুৰ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনক হয় তাৰ কাৰণ তাৰ সকল মন তাৰ চোখ আৱ কানে এসে ভৱে কৰে। আমাদেৱ এই চোখ-পোড়ানো আলোৱ দেশে বৰ্ষাৰ আকাশ আমাদেৱ চোখে কী যে অপূৰ্ব স্মৃক্ষ প্ৰলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঞ্ছিলি মাঝেই জানে। আজকেৰ আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়াৰ রঞ্জেৰ কোনো পাখিৰ পালক দিয়ে বৰ্ষা তাকে আগামোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তাৰ স্পৰ্শ আমাদেৱ চোখেৰ কাছে এত নৱম, এত মোলায়েম।

তাৰ পৰ চেয়ে দেখি গাছপালা মাঠঘাট সবাৱাই ভিতৰ যেন একটা নতুন প্ৰাণেৰ হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে প্ৰাণেৰ আনন্দে নাৱকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে, আৱ তাৰদেৱ মাথাৰ বাকড়া চুল কখনো-বা এলিয়ে পড়ছে, কখনো-বা জড়িয়ে যাচ্ছে। আৱ পাতাৰ চাপে যেসব গাছেৰ ডাল দেখা যায় না, সেসব গাছেৰ পাতাৰ দল এ ওৱ গায়ে ঢলে পড়ছে, পৱন্স্পৱ কোলাকুলি কৰছে; কখনো-বা বাতাসেৰ স্পৰ্শে বেঁকে-চুৰে এমন আকাৰ ধাৰণ কৰছে যে, দেখলে মনে হয় বৃক্ষলতা সব পত্ৰপুটে ফটিকজল পাল কৰছে। আৱ এই খামখেয়ালি বাতাস নিজেৰ খুশিমতো একবাৰ পাঁচ মিনিটেৰ জন্য লতা-পাতাকে নাচিয়ে দিয়ে বৃষ্টিৰ ধাৰাকে ছড়িয়ে দিয়ে আৰাব থেমে যাচ্ছে। তাৰপৰ আৰাব সে ফিৰে এসে যা ক্ষণকালেৰ জন্য ছিৱ ছিল তাকে আৰাব ছঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে যে তাৰ স্পৰ্শে যা-কিছু জীৱন্ত অথচ শাস্ত সে সবই প্ৰথমে কেঁপে উঠবে, তাৰ পৰ ব্যতিবাস্ত হবে, তাৰপৰ মাথা নাড়বে, তাৰপৰ হাত-পা ছুড়বে; আৱ জলেৰ গায়ে ফুটবে পুলক। বৃষ্টিৰ সঙ্গে বৃক্ষপত্রবেৰ সঙ্গে সমীৱগেৰ এই লুকোচুৰি খেলা আমি চোখ ভৱে দেখছি আৱ কান পেতে পেতে শুনছি। মনেৰ ভিতৰ আমাৰ এখন আৱ কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, আছে শুধু এমন-একটা অনুভূতি যাৱ কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, কোনো নিৰ্দিষ্ট নাম নেই।

মনেৰ এমন বিক্ষিণ্ণ অবস্থায় কী লেখা যায়? যদি যায় তো সে কবিতা, প্ৰবন্ধ নয়।



ଆନନ୍ଦେ-ବିଷାଦେ ମେଶାନୋ ଏ ଅନାମିକ ଅନୁଭୂତିର ଜମିର ଓପର ଅନେକ ଛୋଟୋଖାଟୋ ଭାବ ମୁହଁରେ ଜନ୍ୟ ଫୁଟେ ଉଠିଛେ, ଆବାର ମୁହଁରେଇ ତା ମିଲିଯେ ଯାଚେ । ଏହି ବର୍ଷାର ଦିନେ କତ ଗାନେର ସୁର ଆମାର କାନେର କାହେ ଶୁଣୁଣ କରିଛେ, କତ କବିତାର ଶ୍ଲୋକ, କଥନେ ପୁରୋଗୁର କଥନେ ଆସିଥାନା ହେଁ ଆମାର ମନେର ଭିତର ଘୁରେ ବେଡ଼ାଚେ । ଆଜକେ ଆମି ଇଂରେଜି ଭଲେ ଗିଯେଛି । ସେବ କବିତା ସେବ ଗାନ ଆଜ ଆମାର ମନେ ପଡ଼ିଛେ ସେବବିହ ହୁଏ ସଂକ୍ଷତ, ନଯ ବାଙ୍ଗା, ନଯ ହିନ୍ଦି ।

ମେଘର୍ମେଦୁରଶ୍ଵରୀ ବନଭୂବନ୍ୟାମାତ୍ରମାଲକ୍ଷ୍ମୀ

ମୀତଗୋବିନ୍ଦେର ଏହି ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଯେ ବାଙ୍ଗଲି ଏକବାର ଭନେଛେ ଚିରଜୀବନ ସେ ଆର ତା ଭୁଲାତେ ପାରବେ ନା । ଆକାଶେ ସମସ୍ତଟା ହଲେଇ ତାର କାଳେ ଓ-ଚରଣ ଆପନା ହତେଇ ବାଜାତେ ଥାକବେ । ସେଇସଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼େ ଯାବେ ମନେର କତ ପୁରନୋ କଥା, କତ ଲୁକାନୋ ବ୍ୟଥା । ଆମି ଭାବାଛି ମାନୁସ ଭାଷାଯ ତାର ମନେର କଥା କତ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ଆର କତ ବୈଶି ଅବ୍ୟକ୍ତ ରହେ ଯାଏ । ଭାଷାଯ ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଜନ୍ୟଇ ଯୀରା ଏ ପୃଥିବୀତେ ଭଲ୍ଲାହଳପ କରେଛେ ତାଁରାଓ, ଅର୍ଥାଏ କବିର ଦଲଖ, ଆମାର ବିଶ୍ୱାସ, ତାଁଦେର ମନକେ ଅର୍ଧେକ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ, ଅର୍ଧେକ ଗୋପନ ରେଖେଛେ । ଆଜକେର ଦିନେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଏକଟି ପୁରନୋ ଗାନେର ପ୍ରଥମ ଛତ୍ରଟି ମୁରେ-ଫିରେ ଝରାଯେ ଆମାର କାଳେ ଆସଛେ – ‘ଏମନ ଦିନେ ତାରେ ବଲା ଯାଏ’ । ଏମନ ଦିନେ ଯା ବଲା ଯାଏ ତା ହସତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥାଙ୍କ ଆଜ ପର୍ମଣ୍ଠ ବଲେନ ନି, ଶେକ୍ଷ୍ଣପିଯରଙ୍ଗ ବଲେନ ନି । ବଲେନ ଯେ ନି, ସେ ଭାଲୋଇ କରେଛେ । କବି ଯା ବ୍ୟକ୍ତ କରେନ ତାର ଭିତର ଯଦି ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତର ଇଞ୍ଜିତ ନା ଥାକେ ତା ହଲେ ତାଁର କବିତାର ଭିତର କୋନୋ mystery ଥାକେ ନା, ଆର ଯେ କଥାର ଭିତର mystery ନେଇ, ତା କବିତା ନୟ – ପଦ୍ୟ ହତେ ପାରେ ।

সে যাই হোক, আজ আমার কানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের সুর লেগে নেই, সেইসঙ্গে তিনি বর্ষার যে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন সেইসব চিত্র বায়োফোপের ছবির মতো আমার চোখের সুমুখ দিয়ে একটির পর আর-একটি চলে যাচ্ছে। ভালো কথা — এটা কখনো ভেবে দেখেছেন যে, বাংলার বর্ণা রবীন্দ্রনাথ আবিক্ষার করেছেন, ও-খাতুর ঝর্ণ-রস-গঞ্জ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর, তার ভীমমূর্তি আর তার কান্তমূর্তি, দুইই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, দুইই তাঁর ভাষায় সমান সাকার হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে সেকালের একটা কবিতা আছে যা একাই একশো—

ରଙ୍ଜନୀ ଶାଙ୍କଳ ସନ ସନ ଦେଖା ଗରଜନ
 ବିମ୍ବିକିମି ଶବଦେ ବରିଯେ ।
 ପାଲକେ ଶୟାମ ରଙ୍ଜେ ବିଗଲିତ ଚୀର ଅନ୍ଦେ
 ନିନ୍ଦ ଯାଇ ମନେର ହରିଯେ ॥

সংগীত হিসেবে এ কবিতা গীতগোবিন্দের তুল্য। আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। আজ আমার মনের ভিতর দিয়ে যেসব কথা আনাগোনা করছে সেসব এতই বিচ্ছিন্ন এতই এলোমেলো যে, সেসব যদি ভাষায় ধরে তার পর লেখায় পুরে দেওয়া যায় তা হলে আমার প্রবক্ষ এতই বিশৃঙ্খল হবে যে, পাঠক তার মধ্যে ভাবের গোলকধার্থায় পড়ে যাবেন। আর যদি এমন পাঠকও থাকেন যিনি বাংলাদেশের ছেলেভুলানো ছড়া-পাঁচালির অনুরূপ অসম্বন্ধ গদ্যরচনা মনের সুধে পড়তে পারেন তা হলেও আমি আজ মন খুলে লিখতে প্রস্তুত নই। অনেক কথা যা আজ মনে পড়ছে তার যা-কিছু মূল্য আছে তা আমার কাছেই আছে, অপর কারো কাছে নেই। বহুকাল-মৃত বহুকাল-বিস্মৃত কোনো শুকনো ফুলের পাপড়ি যদি হঠাতে আবিক্ষার করা যায় তা হলে যে সেটিকে এককালে সজীব অবস্থায় সাদরে সংশ্লিষ্ট করে রেখেছিল, একমাত্র তারই কাছে সে শুক্ষপুষ্পের মূল্য আছে, অপরের কাছে তা বর্ণগঙ্গায় আবর্জনা যাত্র। মানুষের স্মৃতির ভিতরও এমন অনেক শুকনো ফুল সংশ্লিষ্ট থাকে যা অপরের কাছে বার করা যায় না। কিন্তু এমন দিনে তা আবিক্ষার করা যায়।

ଆବାର ଘୋର କରେ ଏଲ, ବାତି ନା ଜୁଲିଯେ ଲେଖା ଚଲେ ନା; ଆର କାଲିର ଅପବ୍ୟଯ କରା ଯତ ସହଜ ବାତିର ଅପବ୍ୟଯ କରା ତତ ସତଜ ନୟ । ଅତ୍ରେବ ଏଇଥାନେହି ଏ ଲେଖା ଶେଷ କରି ।

ফর্ম-৬. সাহিত্যপাঠ একাদশ, দ্বাদশ ও আলিম প্রেণি

শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|------------------|---|
| মর্মর | শুকনো পাতার খসখস ধ্বনি। |
| হিল্ডেল | চেউ। |
| এলিয়ে | শিথিল হয়ে। |
| পত্রপুট | পাতা দিয়ে তৈরি ঠোঙা। |
| ফটিকজল | স্বচ্ছ পানি। |
| অনামিক অনুভূতি | নাম দেয়া যায় না এমন অনুভূতি। |
| শ্লোক | ছন্দোবদ্ধ বাক্য। |
| ‘মেইঘ... মৈ’ | মেঘেতে মেদুর আকাশ, তাল তমালে শ্যামা বনভূমি। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের বর্ষা বর্ণনা। জয়দেবের বর্ষার এই সহজ-সরল রূপ বাঙালির চিরচেনা। |
| গীতগোবিন্দ | কবি জয়দেবের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। |
| ঘনঘটা | মেঘের আড়ম্বর। |
| ছত্র | পঞ্জি। লাইন। |
| Mystery | রহস্য। |
| বায়োক্সেপ | চলচ্চিত্র। ছায়াছবি। |
| কান্তমূর্তি | সুন্দর বা কমনীয় মূর্তি। |
| সাকার | আকার বিশিষ্ট। |
| ঘন | মেঘ। |
| দেয়া | আকাশ। মেঘ। |
| বরিষে | বর্ষিত হচ্ছে। |
| রঙে | আনন্দে। আমোদে। |
| বিগলিত চীর অঙ্গে | অঙ্গের শিথিল বা অবিন্যস্ত পোশাকে। |
| নিন্দ | নিদ্রা। |
| হরিষে | আনন্দে। |
| গোলকধৰ্ম্মাদা | প্রাহেলিকা। |
| পঁচালি | গীতাভিনয়। |

পাঠ-পরিচিতি

প্রথম চৌধুরীর “বর্ষা” প্রবন্ধটি তাঁর ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’ (১৯৫২) থেকে সংকলিত এবং ঈষৎ সংক্ষেপিত। নদীমাত্রক এই দেশে বর্ষা খাতু অত্যন্ত পরিচিত। অবিরাম বৃষ্টিতে বৃক্ষরাজির অবস্থা, মানব মনের আনন্দ-বিষাদ মাধ্যানো অনুভূতি, বর্ষার গান ও কবিতা, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের বর্ষার চিত্র প্রাবন্ধিকের মন জুড়ে বয়ে চলেছে। এমন দিন প্রতিটি বাঙালি ভাবুকজনের কাছেই শুরুত্তপূর্ণ, কিন্তু এর অনুভূতি অন্যের কাছে প্রকাশ করা কঠিন। মন্তব্য এই প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। বর্ষা মানবহৃদয়কে যে ভাবাবেগে আপ্নুত করে, একই সঙ্গে করে তোলে সজীব ও স্মৃতিকাতর, নৈওসঙ্গ্যানুভূতিতে জর্জর ও সৃষ্টিমূখর- তারই মর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে এ রচনায়। বর্ষা প্রক্রিতিতে যে সজীবতা ও আনন্দানুভূতির সংগ্রাম করে তা মানবের প্রাণকেও আন্দোলিত করে গতীরভাবে। এই গতীর হৃদয়ানুভূতি “বর্ষা” প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে; যার মধ্য দিয়ে এ রচনার ভাষা হয়ে উঠেছে নান্দিনিক অনুভব-সংগ্রাম বক্তব্য প্রকাশের বিশেষ উপযোগী।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। প্রাবন্ধিকের মতে বাংলায় বর্ষা কে আবিক্ষার করেছেন?

- ক. জয়দেব
- গ. কায়কোবাদ

- খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ঘ. জসীমউদ্দীন

২। ‘আনন্দে-বিষাদে মেশানো অনামিক অনুভূতি’ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?

- ক. মন খারাপ করা
- গ. মনের বিক্ষিপ্ততা

- খ. আত্মভোলা
- ঘ. উচ্ছ্বসিত মন

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

আজি বারো বারো মুখৰ বাদৰ দিনে

জানি নে, জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না।

...

মেঘমল্লারে সারা দিনমান বাজে কৰনার গান
মন হারাবার আজি বেলা পথ ভুলিবার খেলা
মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চির খণ্ণে।

৩। উক্ত কবিতাংশটির প্রাকৃতিক অবঙ্গা “বর্ষা” প্রবন্ধের কোন বিষয়টির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

- ক. অবিরাম বর্ষণের
- গ. সাহিত্য রচনায় অনীহার

- খ. বর্ষায় উন্মান মনের
- ঘ. শুষ্কতা থেকে মুক্তির

৪। প্রকৃতির এই অবঙ্গা প্রমথ চৌধুরীকে উদাস করে তোলে, কারণ—

- i. বর্ষা মানবমনকে আলোড়িত করে
- ii. বর্ষায় মানুষ স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠে
- iii. বর্ষার আগমনে প্রকৃতি চপ্পল হয়

নিচের কোনটি ঠিক?

- ক. i ও ii
- গ. ii ও iii

- খ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

‘এইখানে ছিল প্রমতা নদী। বর্ষায় এই নদীর জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে এক অচুত সুরের জন্ম দিত। আজ এখানে খরা। কতকাল বৃষ্টির শব্দ শুনি না। জলের ফোঁটা পাতার উপর পড়ায় পাতার যে শিহরণ তা দেখে মন ভরে যেত। বাড়ো বৃষ্টির দাপটে গাছগুলো যেন দাঁড়িয়ে থাকা ভুলে গিয়ে দৌড়ে বেঢ়াতে চাইত।’ এভাবেই কাশেম মাঝি তার নাতনিকে বর্ষার গঞ্জ শোনাচ্ছেন। কেন এমন হলো তা কাশেম মাঝি জানেন না। শুধু শুনেছেন পৃথিবীর মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ে যা খুশি তাই করছে। আর এই কারণে প্রকৃতি আজ এমন বিরূপ। তাহলে কি পৃথিবী থেকে বর্ষা বিদায় নেবে? মানুষ আর বর্ষার রিমিম শব্দে উদাস হবে না! এই সব ভাবতে ভাবতে কাশেম মাঝির দৃচোখ জলে ভরে উঠে।

ক. প্রমথ চৌধুরী বর্ষার আকাশকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

খ. বর্ষার বাতাসকে ‘খামখেয়ালি’ বলা হয়েছে কেন?

গ. অনুচ্ছেদের প্রথমাংশে কাশেম মাঝির অনুভূতিতে “বর্ষা” প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদটি “বর্ষা” প্রবন্ধের সমষ্টি আবহকে ধারণ করতে পেরেছে কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।



বিলাসী শরঞ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

শরঞ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর পঞ্চিম বাংলার হগলি জেলার দেৱানন্দপুর থামে জন্মহণ করেন। তাঁৰ পিতাৰ নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, জননী ভূবনমোহিনী দেৱী। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই উপন্যাসিকের ছেলেবেলা কাটে দারিদ্র্যের মধ্যে। চৰিশ বছৰ বয়সে মনেৰ মৌকে সন্ম্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ কৰেছিলেন শরঞ্চন্দ্র। সংগীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিৰ সুত্রে ঘটনাচক্ৰে এক জমিদারেৰ বজ্র হয়েছিলেন তিনি; জীবিকাৰ তাগিদে দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন বৰ্মা মুঠুকে অৰ্ধাং বৰ্তমান যিয়ানমারে।

শরঞ্চন্দ্র তাঁৰ জীবনেৰ নানা অভিজ্ঞতা ও বিচিত্ৰ সব মানুষেৰ চৰিত্ৰ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁৰ বিভিন্ন উপন্যাসে। বিশেষ কৰে সমাজেৰ নিচু তলার মানুষ তাঁৰ সৃষ্টি চৰিত্ৰে অপূৰ্ব মহিমা নিয়ে চিহ্নিত হয়েছে। কথাশিল্পী শরঞ্চন্দ্রেৰ শিল্পীমানসেৰ মোলাবেশিষ্ট্য মানবতা ও মানুষেৰ প্রতি ভালোবাসা।

শরঞ্চন্দ্রেৰ প্ৰথম মুদ্রিত রচনা কৃষ্ণলীন পুৰুষারণাঙ্গ “মন্দিৰ” নামে একটি গল্প। তাঁৰ বিখ্যাত উপন্যাসগুলোৰ মধ্যে রয়েছে : ‘দেবদাস’, ‘পদ্ম-সমাজ’, ‘চৱিত্ৰীন’, ‘শ্ৰীকান্ত’, ‘গৃহদাহ’, ‘দেনাপাওলা’ ইত্যাদি। এসব উপন্যাসে বাঙালি নারীৰ প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁৰ বহু উপন্যাস ভাৰতবৰ্ষেৰ বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত ও চলচ্চিত্ৰায়িত হয়েছে। তাঁৰ কয়েকটি উপন্যাস বিদেশি ভাষায়ও অনুদিত হয়েছে। সাহিত্যকৰ্মেৰ সীকৃতি হিসেবে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বৰ্ণপদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট ডিপ্রি প্রদান কৰে।

শরঞ্চন্দ্র ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দেৰ ১৬ই জানুয়াৰি কলকাতায় মৃত্যুবৰণ কৰেন।

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অৰ্জন কৰিতে যাই। আমি একা নই-দশ-বাবোজন। যাহাদেৱই বাটী পন্থিয়ামে, তাহাদেৱই ছেলেদেৱ শতকৱা আশিজনকে এমনি কৱিয়া বিদ্যালাভ কৰিতে হয়। ইহাতে শান্তেৱ অক্ষে শেষ পৰ্যন্ত একেবাৰে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাৰ কৱিবাৰ পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা কৱিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদেৱ সকাল আটটাৰ মধ্যে বাহিৰ হইয়া যাতায়াতে চাৰ ক্রোশ পথ ভাষ্টিতে হয়-চাৰ ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, চেৱ বেশি-বৰ্ষাৰ দিনে মাথাৰ ওপৰ মেঘেৰ জল পায়েৰ নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্ৰীষ্মেৰ দিনে জলেৰ বদলে কড়া সূৰ্য এবং কাদাৰ বদলে ধূলিৰ সাগৰ সাঁতাৰ দিয়া স্কুল-ঘৰ কৱিতে হয়, সেই দুৰ্ভীগা বালকদেৱ মা-সৱস্বতী খুশি হইয়া বৰ দিবেন কি, তাহাদেৱ যত্নণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তাৰপৱে এই কৃতবিদ্য শিশুৰ দল বড় হইয়া একদিন গ্ৰামেই বসুন, আৱ ক্ষুধাৰ জ্বালায় অন্যত্ৰই যান-তাঁদেৱ চাৰ ক্রোশ হাঁটা বিদ্যাৰ তেজ আত্মপ্ৰকাশ কৱিবেই কৱিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদেৱ ক্ষুধাৰ জ্বালা, তাঁদেৱ কথা না হয় নাই ধৰিলাম কিন্তু যাদেৱ সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্ৰলোকই বা কী সুখে গ্ৰাম ছাড়িয়া পলায়ন কৰেন? তাঁৰা বাস কৱিতে থাকিলে তো পন্থিৰ এত দুৰ্দশা হয় না।

ম্যালেৱিয়া কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক, কিন্তু ওই চাৰ ক্রোশ হাঁটাৰ জ্বালায় কত ভদ্ৰলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্ৰাম ছাড়িয়া শহৰে পালান তাহার আৱ সংখ্যা নাই। তাৰপৱে একদিন ছেলে-পুলেৰ পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহৰেৰ সুখ-সুবিধা কৃচি লইয়া আৱ তাদেৱ গ্ৰামে ফিৰিয়া আসা চলে না। কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই-দুক্রোশেৰ মধ্যে এমন আৱও তো দুই তিনখালি গ্ৰাম পাৱ হইতে হয়। কাৱ বাগানে আম পাকিতে শুৱ কৱিয়াছে, কোন বনে বইটি ফল অপৰ্যাঙ্গ ফলিয়াছে, কাৱ গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কাৱ মৰ্তমান রঞ্জিৰ কাঁদি কাটিয়া লইবাৰ অপেক্ষা মাত্ৰ, কাৱ কানাচে ঝোপেৰ মধ্যে আনাৱসেৰ গায়ে রং ধৰিয়াছে, কাৱ পুকুৱপাড়েৰ খেজুৱমেতি কাটিয়া খাইলে ধৰা পড়িবাৰ সংস্কাৰনা অঞ্চ, এই সব খবৰ লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসলে যা বিদ্যা-কামক্ষটকাৰ রাজধানীৰ নাম কী এবং সাইবেৱিয়াৰ খনিৰ মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে- এ সকল দৱকাৱি তথ্য অবগত হইবাৰ ফুৱসতই মেলে না।



কাজেই একজামিনের সময় এডেন কী জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার বন্দর, আর হ্যায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক থা এবং আজ চাহিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় একরকমই আছে—তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল রাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙ্গালো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্বী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না— সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ওই থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।

তাহার ফৌর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রাপ্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কঁচালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ি, আর ছিল এক জাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কর কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ালো, ওই বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—ওপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ওই আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বস্তরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে, সেইদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিন হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু খন স্বীকার করা তো দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে, এ কথাও কোনো বাপ তদু সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালোপাড়ার এক বুড়া মালো তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেক দিন তাহার যিষ্টান্নের সন্ধ্যায় করিয়াছি— মনটা কেমন করিতে সাগিল, একদিন সন্ধ্যায় অদ্বিতীয়ে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচন্দে ভিতরে চুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জলিতেছে, আর ঠিক সম্মুখেই তক্ষপোষের ওপর পরিক্ষার ধৰ্মে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কক্ষালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুরা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার জটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়ারে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাত মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই বারিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, “কে, ন্যাড়া?”

বলিলাম, “হুঁ।”

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুজ্ঞয় দুই-চারিটি কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনের দিন সে অজ্ঞান অচেতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েক দিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন, সে কত বড় শুরুতার। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রা, কত ধৈর্য, কত রাতজাগা। সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তি এই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাত্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি? বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জয়াট অঙ্ককারের মতো বোধ হইতেছিল, পথ দেখা তো দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, “পৌছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।”

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকর্ষিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, “একলা যেতে ভয় করবে না তো? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?”

মেয়ে মানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না তো। সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যন্তে শুধু একটা “না” বলিয়াই অসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, “মন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।”

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম, উঁঁদেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথ পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুজ্ঞকে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অঙ্ককারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছল্য হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকলা রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুজ্ঞ তো যে-কোনো মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কী করিত। কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত।

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অঙ্ককার রাত্রি-বাতীতে ছেলে-পুলে, চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তার সদ্যবিধিবা স্তী আর আমি। তার স্তী তো শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাশাগ? আর এই রাতেই গ্রামের পাঁচজন যদি নদীর তীরের কোনো একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় তো পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? এমনি কত কি। কিন্তু আমার তো আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাঢ়ায় খবর দেওয়া চাই-অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, “ভাই, যা হবার সে তো হইয়াছে, আর বাইরে গিয়া কী হইবে? রাতটা কাটুক না।”

বলিলাম, “অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।”

তিনি বলিলেন, “হোক কাজ, তুমি বসো।”



বলিলাম, “বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে”, বলিয়া পা বাড়াইবামাছেই তিনি চিন্কার করিয়া উঠিলেন, “ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।”

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুবিলাম, যে স্বামী জ্যান্ত থাকতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহে তাঁর মৃতদেহটা এই অঙ্ককার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে তো সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অতিপ্রাপ্য নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত স্মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোনো মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটি শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোনো সম্ভান পায় না।

কিন্তু সহসা সে শক্তির পরিচয় যখন কোনো নরনারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামি করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় তো হোক, কিন্তু মানুষের যে বন্ধটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপন অঙ্গ বিসর্জন না করিয়া কোনো মতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস দুই মৃত্যুগ্রহের খবর লই নাই। যাহারা পল্লিশাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে, অত বড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই। তাহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াসুন্দ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে, একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লিশামে ছিল কি না, কিন্তু একালে তো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কালে গেল, মৃত্যুগ্রহের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, প্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্রির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না—অকালকুশ্মাণ্ডো একটা সাপুড়ের মেঘে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই তো হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে – ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই ওই এক কথা—অ্যাঁ এ হইল কী? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল।

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো। তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাহার কি ডাঙ্কাৰ-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুন সবাই। কিন্তু আর তো চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ যে মিত্রির বৎশের নাম ডুবিয়া যায়। গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক যিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্রির বৎশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদল দর্শন না হয় এইজন্য।

মৃত্যুগ্রহের পোড়োবাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙ্গা বারান্দায় একধারে রুটি গড়িতেছে। অকস্মাত লাঠিসোটা হাতে এতগুলি লোককে উঠিলের ওপর দেখিয়া ভয়ে শীলবর্ণ হইয়া গেল। খুড়া ঘরের মধ্যে উকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুগ্রহ ওইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃত্যুপ্রাপ্য মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহ্য্য, জগতের কোনো খুড়া কোনো কালে বোধ করি ভাইপো-স্ত্রীকে উরুগ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে, মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেঘে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়েছে জানো?



খুড়ো বলিলেন তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীরদর্পে ছংকার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রামস্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে।

এইখানে একটা অবাস্তুর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি প্রেছদেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, ঝীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কী কথা! সন্তান হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নরনারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, “বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাহিরে শিয়াল কুকুরে খেয়ে যাবে-রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।”

মৃত্যুঞ্জয় কুন্দ ঘরের মধ্যে পাগলের মতো মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা থাক।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লিগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত তাহা হইলে তো আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা-এ তো একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা কিন্তু কাল করিল যে ওই ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শ্যাশ্যাশ্যী কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুটি নয়, সদেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়। ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ। সে তো আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না। তা নইলে পল্লিগাঁয়ের লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার ক্রেশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে তারাই তো একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীগাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কী করিয়া!

এই তো ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ওই বিধবার এবং পাছে তাহা বেছাত হয় এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে গ্রামের বারোয়ারি পূজাবাদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণি-উন্নত ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমনকি, পথে আসিতে অনেকেই দশের এবং দেশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক তাদের বাড়িতে যাইতে, মাসে মাসে এমন সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?



কিন্তু যাক। মহত্বের কাহিনি আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লিবাসীর দ্বারেই স্তুপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লিতে অনেকদিন মুরিয়া গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইৎরাজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসরখানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইন্তিফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ দুই দূরের মালোপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাত দেখি, একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুজ্ঞয়। তাহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাঢ়ি-চুল, গলায় রংব্রাঙ্ক ও পুঁতির মালা—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুজ্ঞয়। কায়ছের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদ্বন্দ্বির সাপুড়ে হইয়া গিয়াছে। মানুষ কত শীত্র যে তাহার চৌক্ষ পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ত্রাক্ষণের ছেলে মেথরানি বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদৰাক্ষণের ছেলেকে এন্টার্গ পাস করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে শুচনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শুয়ার চরায়। ভালো কায়ছ—সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে সহজে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোনো কালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেরই শুই একই হেতু। আমার তাই তো মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লিগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চাশ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু যাক। বৌকের মাথায়, হয়ত বা অনধিকারচর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে যে, আমি কোনোমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নবহই জন নরনারীই ওই পল্লিগ্রামেরই মানুষ এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই—ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুজ্ঞয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুরুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, “তুমি না আগলালে সে রাস্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্য না জানি কত মার তুমি খেয়েছিলে।”

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম, আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের ওপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখরা সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধা হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। কিন্তু মৃত্যুজ্ঞয়কে প্রস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শুশ্রের শিষ্য, সুতরাং মন্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাত এমন প্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছেড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ করিতে মৃত্যুজ্ঞয় পথ পাইল না। সাপ ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কবজিতে ওয়ুধ সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দৃষ্টরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে—

—ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—



মনসা দেবী আমার মা—
 ওলটপালট পাতাল—ফোড়—
 টোড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ টোড়ারে দে—
 —দুধরাজ, মণিরাজ।
 কার আঙ্গা—বিষহরির আজ্ঞা।

ইহার মানে যে কী তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এই মন্ত্রেরও দ্রষ্টা খৃষি ছিলেন—নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কথনও পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল ততদিন সাপ ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হাঁ, ন্যাড়া একজন শুণী লোক বটে। সন্মানসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় উদ্ভাদ হইয়া অহংকারে আমার মাটিতে পা পড়ে না, এমনি যো হইল।

বিশ্঵াস করিল না শুধু দুই জন। আমার শুরু যে, সে তো ভালো মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব তয়ঃকর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো। বস্তুত বিষদাংত ভাঙ্গা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রস্তুতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব মনে পড়লে আমার আজও গা কাঁপে।

আসলে কথা হইতেছে এই যে, সাপ ধরাও কঠিন নয় এবং ধরা সাপ দুই চারদিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাংত ভাঙ্গাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের শুরুশৈয়ের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে জানের ব্যবসা শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পালাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছাঁকা দিতে হয়। তারপর তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক বা একটা কাঠিই দেখান হোক, সে কোথায় পালাইবে তা ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, “দেখ, এমন করে মানুষ ঠকায়ো না।”

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, “সবাই করে—এতে দোষ কী?”

বিলাসী বলিত, “করুক গে সবাই। আমাদের তো খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই।” আর একটা জিনিস আমি বারবার লক্ষ করিয়াছি। সাপ ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত—আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার তো একরকম নেশার মত হইয়া দাঢ়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উপেজিত করিতে চেষ্টার ক্ষতি করিতাম না। বস্তুত ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভালো করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। যেটে ঘরের যেবো থানিকটা খুড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাগুড়ের যেয়ে—সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, “ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয় একজোড়া তো আছে বটেই হয়ত বা বেশি থাকিতে পারে।”



মৃত্যুঞ্জয় বলিল, “এরা যে বলে একটাই এসে চুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।”

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, “দেখছ না বাসা করেছিল?”

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “কাগজ তো ইন্দুরেও আনতে পারে।”

বিলাসী কহিল, “দুই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছে আমি বলছি।”

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্মাণ্ডিকভাবেই সোদিন ফলিল। মিনিট-দশকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় ‘উঁঁ’ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উলটা পিঠ দিয়ে বারবার করিয়া রক্ত পড়িতেছিল। প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পালাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি তো ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্ধ্বে আর উঠিবে না, বরং সেই ‘বিষহরির আজ্ঞা’ মন্ত্রটা সতেজে বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত শুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সম্ভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির ওপর একবারে আছাড় থাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, বিষহরির দোহাই বুবি-বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারিজন শুন্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনও-বা একসঙ্গে কখনও আলাদা তেক্রিশ কোটি দেবদেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন শুবা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে মৃত্যুঞ্জয় তো মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ধ্বন্তাধ্বনির পরে রোগী তাহার বাপ মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শুশ্রের দেওয়া মন্ত্রোষধি সমস্ত যিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের জীলা সাঙ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনিটি আর বাঢ়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাত দিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার যাথার দিবিয় রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না।

আমার মাদুলি-কবচ তো মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে করবে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নহে এবং সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে তো আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

শুড়া মশাই ঘোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজের মতো চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, তো হবে কার? পুরুষমানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে তো তেমন আসে যায় না—না হয় একটু নিদাই হতো। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেল কেন? নিজে মরলো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হলো একটা ভুজ্য উচ্ছুল্য। গ্রামের লোক একবাবক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কী! অল্পপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শিত্ব আছে।



বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায় ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুজ্ঞয় তো পল্লিওমেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই তো মানুষ। তবু অত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরম্পরারের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিম্নার সামঘাতী, যে দেশে নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার শর্যংকর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনোটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মসনাদ, কিন্তুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদীর্ঘ বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অভ্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাত করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিষ্ক �Contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া Document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুজ্ঞয়ের অন্তর্পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধী গৃহিণী—অক্ষয় সঙ্গীলোক তাহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি কিন্তু সেই সাপুড়ের মেঝেটি যখন একটি পীড়িত শয়াগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কণামাত্র হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুজ্ঞয় হয়ত নিভান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিত্তের নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথ্য সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিম্না করিব না। করিলেও মুখের ওপর কড়া জবাব দিয়া যাহারা বলিবেন, এই হিন্দু সমাজ তাহার নির্ভুল বিধিব্যবস্থার জোরেই অত শতাদ্ধীর অতঙ্গে বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যন্তে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মতো দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মতো দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শিক্ত করার মত পাপ হয় না।

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|--------------|---|
| মা-সরস্বতী | - হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বীণাপাণি। বাস্তুদেবী। |
| কৃতবিদ্য | - বিদ্যা অর্জন করেছেন এমন পদ্ধতি। বিদ্বান। |
| বাঁচি | - কাঁটাযুক্ত একরকম ছোট গাছ ও তার ফল। |
| রঞ্জার কাঁদি | - কলার ছড়া। |
| কানাচ | - ঘরের পেছন দিককার লাগোয়া জায়গা। |
| খেজুরমেতি | - খেজুর গাছের মাথার কাছের নরম মিষ্টি অংশ। |
| কামচাট্কা | - প্রকৃত উচ্চারণ কামচাট্কা (Kamchatka) রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ওখটক সাগর ও উত্তর-পূর্বে বেরিং সাগর। উপদ্বীপটি পার্বত্য, তুঙ্গা ও বলময়। বহু উষ্ণ প্রস্তুবণ ও সতেরোটি জীবন্ত আঘেয়গিরি আছে এখানে। প্রচুর স্যামন মাছ পাওয়া যায় বলে দীপটি স্যামন মাছের দেশ নামে পরিচিত। রাজধানী শহরের নাম—পেত্রোপাত্লোভস্ক। |



- সাইবেরিয়া**
- এশিয়ার উত্তরে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এশিয়া মহাদেশের এক ভূভৌগিক অঞ্চল এর মধ্যে পড়েছে। তুঙ্গা, সরলবঙ্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, স্টেপ তৃণভূমি ও পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ 'বৈকাল' এখানে অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রাঙ-সাইবেরিয়ান চালু হওয়ার পর এখানে বহু শহর গড়ে উঠেছে।
- এডেন**
- লোহিতসাগর ও আরব সাগরের প্রবেশপথে আরব দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত।
- পারশিয়া**
- পারস্য বা ইরান দেশ।
- হুমায়ুন**
- মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র এবং দ্বিতীয় মোগল সম্রাট। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের পিতা।
- তোগলক খাঁ**
- ভারতবর্ষের ইতিহাসে তোগলক খাঁ নামে কোনো সম্রাট ছিলেন না। ইতিহাসে যে তিনজন বিখ্যাত তোগলক সম্রাটের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন : গিয়াসউদ্দিন তোগলক, মুহাম্মদ তোগলক ও ফিরোজ তোগলক।
- চল্লিশের কোঠা**
- এখানে চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত বয়সসীমা।
- থার্ড ক্লাস**
- বর্তমান অষ্টম শ্রেণি। সেকালে মাধ্যমিক শিক্ষার শ্রেণি হিসাব করা হতো ওপর থেকে নিচের দিকে। দশম শ্রেণি তখন ছিল ফার্স্ট ক্লাস, নবম শ্রেণি ছিল সেকেন্ড ক্লাস।
- প্রত্নতাত্ত্বিক**
- পুরাতত্ত্ববিদ। প্রাচীন ধর্মসাবশেষ, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি।
- ফোর্থ ক্লাস**
- এখনকার সপ্তম শ্রেণি।
- সেকেন্ড ক্লাস**
- এখনকার নবম শ্রেণি।
- গুলি**
- আফিমের তৈরি একরকম মাদক যা বড়ির মতো গুলি পাকিয়ে ব্যবহার করা হয়।
- ওপরের আদালতের হুকুমে**
- স্বীকৃত নির্দেশে।
- এমনি সুনাম**
- দুর্মাম বোঝাতে বিক্রম করা হয়েছে।
- মালো**
- এ গল্পে সাপের ওরা অর্থে ব্যবহৃত। সাধারণত এরা সাপ ধরে, সাপের কামড়ের চিকিৎসা ও সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে মালো বলতে এমন একটি সম্প্রদায়কেও বোঝায় যাদের পেশা মাছ ধরা।
- সন্দ্যয় করিয়াছি**
- অপব্যয় করেছি বোঝাতে ব্যক্ত তরে বলা হয়েছে।
- কঙ্কালসার**
- অস্তিচর্মসার অবস্থা যেন প্রায় কঙ্কাল।
- যমরাজ**
- ধর্মরাজ। এখানে মৃত্যু অর্থে।
- তিলার্ধ**
- তিল পরিমাণ সময়ের অর্ধ, মুহূর্তমাত্র।
- জনশ্রুতি**
- লোকপরম্পরায় শেনা কথা, জনরব, লোকশ্রুতি।
- সত্যযুগ**
- হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের প্রথম যুগ যখন সমাজে অসত্য অন্যায় একেবারেই ছিল না বলে ধারণা করা হয়।
- রসাতলে গেল**
- অধঃপাতে বা উচ্চেরে গেল।

- অকালকুম্ভাও**
- নিকা**
- কলি**
- বদন দক্ষ না হয়**
- নারায়ণের কৃত্তপক্ষেরও**
- চক্রুলজ্জ্বা হইবে**
- বিলাত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠদেশে**
- সন্মাতন হিন্দু এ**
- কুসংস্কার মানে না**
- শ্রাব্য-অশ্রাব্য**
- দেবী বীগাপাণির বরে**
- সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে**
- আসিবে কী করিয়া**
- প্রাতঃস্মরণীয়**
- সেটা কাশীই বটে**
- বারওয়ারি**
- সুদক্ষিণা**
- ফলাহার**
- ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল**
- মহত্ত্বের কাহিনি**
- এন্ট্রাল**
- ধূচনি**
- পঞ্চমুখ**
- অসময়ে ফলেছে এমন কুমড়ো। এখানে অকর্মণ্য ব্যক্তি।
 - আরবি শব্দ নিকাহ; বিয়ে। বিধবাবিবাহ বা পুনর্বার বিবাহ।
 - হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। পুরাণ মতে, এ যুগে অন্যায়, অসত্য ও অধর্মের বাড়াবাঢ়ি ঘটবে।
 - মুখ যেন না পোড়ে। সুনাম যেন নষ্ট না হয়।
 - কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে একদিকে সর্বভারতীয় রাজারা একপক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নিরন্তর রথ-সারথি। সেখানে নারায়ণের নিরপেক্ষ আচরণ ছিল কাপুরুষ-সুলভ। সেই নারায়ণের পথাবলম্বীরাও এরপ আচরণকে ভীরুতা বলতে লজ্জিত হবে। বাক্যাংশটিতে প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যে— ওদের আচরণ এতই বৰ্বর ছিল যে তা কাপুরুষতার চেয়েও লজ্জাজনক ছিল।
 - ইংল্যান্ডসহ ইউরোপীয় দেশসমূহে যেখানে হিন্দু সমাজের আচারধর্মের কোনো বালাই নেই।
 - এখানে হিন্দু ধর্মের সংক্ষারাচ্ছন্নতাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।
 - শোনার যোগ্য ও অযোগ্য। শ্লীল-অশ্লীল অর্থে ব্যবহৃত।
 - এখানে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে— দেবী সরস্বতীর প্রকৃত মান্যতার অভাবে এরা সংকীর্ণতাসর্বত্ব হয়ে পড়েছে।
 - প্রাতঃকালে স্মরণ করার যোগ্য। অতি শুক্রেয়।
 - কাশী ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত ও সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। সেখানে সাধু-সন্ত-পুণ্যার্থীর সমাবেশ যেমন হয় তেমনি দুর্চরিত লোকজনের আখড়াও সেখানে জমে। যুথোপাধ্যায় যহাশয়ের বিধবা পুত্রবধুকে যেখান থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল তা কাশী হলেও তীর্থস্থান ছিল না বরং পতিতালয় বা অনুরূপ কোনো স্থান ছিল এখানে সেই ইঙ্গিতই করা হয়েছে।
 - অনেকের সমবেত চেষ্টায় যা করা হয়। সর্বজনীন। বারোয়ারি।
 - পুরোহিতের সম্মানী বা সেলামি।
 - জলযোগ। ফলার।
 - সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।
 - মহানুভবতার কথা। ব্যঙ্গার্থে নীচতার কাহিনি।
 - প্রবেশিকা পরীক্ষা। বর্তমান মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য।
 - চাল ইত্যাদি ধোয়ার জন্য বহু ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশের ঝুড়ি।
 - পাঁচ মুখে যে কথা বলে। মুখর।



- পঞ্চামের পুরুষদের
সুখ্যাতিতে**
- ব্যঙ্গ করে সুখ্যাতি বলা হয়েছে। বক্ষত লেখক প্রামের পুরুষদের সমালোচনা ও নিম্না করেছেন।
- মন্ত্রসিদ্ধ**
- মন্ত্রে সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করেছেন এমন যার উচ্চারিত মন্ত্র অব্যর্থভাবে কার্যকর।
- মনসা**
- হিন্দু ধর্মানুসারে সাপের দেবী।
- মন্ত্রের দ্রষ্টা**
- যিনি প্রথম মন্ত্র লাভ করেন। মন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ শোকবিশ্বাস এই যে, মন্ত্র কেউ তৈরি করেন না। তা কোনো ভাগ্যবান দৈববলে পেয়ে থাকেন। যার কাছে প্রথম মন্ত্র আবির্ভূত হয় তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা।
- কামাখ্যা**
- ভারতের আসাম রাজ্যে অবস্থিত প্রাচীন তীর্থস্থান। তান্ত্রিক সাধক ও উপাসকদের তত্ত্বমন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত।
- চক্ৰ তুলিয়া**
- ফণ তুলে।
- খরিশ গোখরা**
- খুব বিশাক্ত এক প্রজাতির গোখরা সাপ।
- বিষহরির দোহাই**
- মনসার মন্ত্রশক্তি।
- মৃত্যুঞ্জয় নাম**
- মৃত্যুঞ্জয় নামের অর্থ— যিনি মৃত্যুকে জয় করেন। বিষকষ্ট শিব বা মহেশ্বরের অন্য নাম মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা-মা তাদের পুত্রের নাম মৃত্যুঞ্জয় রাখলেও সে মৃত্যুকে জয় করতে পারল না। তার নাম মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।
- শুশ্রের দেওয়া মন্ত্রোষধি**
- মৃত্যুঞ্জয় তার শুশ্রের কাছ থেকে অমোগ মন্ত্রোষধি পেয়েছিল বলে জনশ্রুতি ছিল।
- ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা**
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা হস্তুম যা পালন করা বাধ্যতামূলক। ম্যাজিস্ট্রেট চলে গেলেও হস্তুম বহাল থাকে।
- বাঙালির বিষ**
- লেখক ব্যঙ্গার্থে বলতে চান, বাঙালির ক্রোধ, বিদ্রে ইত্যাদি মুখের বাকেয়েই সীমাবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী। তা সাপের বিষের মতো অব্যর্থভাবে কার্যকর নয়।
- পিণ্ডি**
- শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মৃতের উদ্দেশে দেওয়া চালের গোলাকার ডেলা।
- ভূজ্য উচ্চুগ্য**
- মৃতের আত্মার সদগতি কামনা করে ত্রাক্ষণকে যে ভোজ্য উৎসর্গ করা হয় তা।
- বহুদশী**
- জ্ঞানী। অনেক দেখেছেন এমন। বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
- ভূদেববাবু**
- ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করে আধুনিক মানস গঠনের লক্ষ্যে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’, ‘সামাজিক প্রবন্ধ’, ‘আচার প্রবন্ধ’ ইত্যাদি এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।
- অতিকায় হস্তী**
- মহাগজ। Mammoth। হাতির এই প্রজাতি বর্তমান কালের হাতির চেয়ে অনেক বড় ছিল। এই প্রজাতির হাতি প্রাণিগণক থেকে লুণ হয়েছে প্রাগেতিহাসিক যুগে। তাদের অতিক্রে চিহ্ন রয়ে গেছে তাদের কক্ষালে।

পাঠ-পরিচিতি

শরৎচন্দ্রের “বিলাসী” গল্পটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ‘ভারতী’ পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) বৈশাখ সংখ্যায়। “ন্যাড়া” নামের এক যুবকের নিজের জীবনিতে বিবৃত হয়েছে এ গল্প। এই গল্পের কাহিনিতে শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।

“বিলাসী” গল্পে বর্ণিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী দুই মানব-মানবীর চরিত্রের অসাধারণ প্রেমের মহিমা, যা ছাপিয়ে উঠেছে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা। গল্পে সংঘটিত একের পর এক ঘটনা এবং বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংঘাতের মাধ্যমেই কাহিনি অঙ্গসর হয়। ঘটনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনিতে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। লেখক কোন অবস্থান থেকে কাহিনি বলছেন, সেটা অনেক সময় কাহিনি বর্ণনায় শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখক সর্বদর্শী অবস্থান থেকেও কাহিনি বর্ণনা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি সবগুলো চরিত্র ও ঘটনা-নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে বর্ণনা করেন। যেমনটি দেখা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ উপন্যাস এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মাসি-পিসি” গল্পে। পক্ষাঙ্গের গল্পটি উভয় পুরুষের ভাবেও বর্ণিত হতে পারে। এক্ষেত্রে গল্পে আমি, আমাকে ইত্যাদি সর্বনাম এসে যায়। এরকম ক্ষেত্রে কখনো-কখনো লেখক নিজেই কাহিনির একটা চরিত্রের ভূমিকা নেন, হয়ে উঠেন কখক। “বিলাসী” গল্পে লেখক সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সংকলনের “অপরিচিতা”, “আহ্বান” ও “ভাজমহল” গল্পে উভয়পুরুষের ভাষ্য গৃহীত হয়েছে।

“বিলাসী” গল্পের নাম চরিত্র কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমত্তী ও সেবাবৃত্তি বিলাসী; শরৎসাহিত্যের অন্যান্য উজ্জ্বল নায়িকাদের মতোই একজন। যে প্রেমের জন্যে নির্ধিধায় বেছে নিয়েছে ষেছামৃত্যুর পথ আর তার প্রেমের মহিমাময় আলোয় ধরা পড়েছে সমাজের অনুদারতা ও রক্ষণশীলতা, জীবনের নিষ্ঠুর ও অঙ্গত চেহারা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “ঘন জঙ্গলের পথ। এককু দেখে পা ফেলে যেয়ো।”— উক্তিটি কার? :

ক. ন্যাড়ার

খ. মৃত্যুঘর্ষের

গ. বিলাসীর

ঘ. খুড়ার

২. ‘মহস্তের কাহিনি আমাদের অনেক আছে’। এখানে ‘মহস্ত’ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ব্যঙ্গার্থে

খ. প্রশংসার্থে

গ. ক্ষোভার্থে

ঘ. নিন্দার্থে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

নিলুফা শহরে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। তার শহরে কাজ করার বিষয়টি গ্রামের কিছু মানুষ পছন্দ করেন না। ছুটিতে বাড়ি গেলে গ্রামের ওই মানুষগুলো নিলুফার নামে বিচার বসান। তারা নিলুফাকে জোর করে ধাম থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নিলুফা তাতে প্রতিবাদ করেন। অসুস্থ মাকে রেখে তিনি এসময় কিছুতে কোথাও যাবেন না।

৩. অনুচ্ছেদের সঙ্গে ‘বিলাসী’ গল্পের যে দিকের সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো—

i. নারীর প্রতি নির্যাতন

খ. i ও iii

ii. কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ

iii. গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা

ঘ. i, ii ও iii

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

গ. ii ও iii



৪. এই অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, নিলুফা ও বিলাসী উভয়েই-

- i. প্রতিবাদী নারীসন্তা
- ii. নির্যাতিত নারী
- iii. কুসংস্কারের শিকার

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

উজ্জয়নীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার প্রথ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহপুত্র মিহিরের খনা। একদিন পিতা বরাহ এবং পুত্র মিহির আকাশের তারা গণনা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে খনা এ সমস্যার সমাধান দেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর শুগে মুক্ষ হন। গণনা করে খনার দেওয়া পূর্বাভাসে রাজ্যের কৃষকরা উপকৃত হতেন বলে রাজা বিক্রমাদিত্য খনাকে দশম রঞ্জ হিসেবে আখ্যা দেন। কিন্তু খনার এই খ্যাতি ও সম্মান অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর জীবনে বিড়ম্বনা নিয়ে আসে। রাজসভায় প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে ও নারীর জ্ঞানের কাছে নিচু হওয়ার লজ্জায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বরাহের আদেশে মিহির খনার জিহ্বা কেটে দেন। এর কিছুকাল পরে খনার মৃত্যু হয়।

ক. ধূঢ়া কোন বৎশের?

খ. ‘ইহা আর একটি শক্তি’- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. বিলাসী চরিত্রের কোন দিকটি খনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা বর্ণনা কর।

ঘ. ‘মৃত্যুঝয় ও মিহির পরম্পর বিপরীত চরিত্রের মানুষ।’— মন্তব্যটি যাচাই কর।



গৃহ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

লেখক-পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অঙ্গরত পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জাহিরউদ্দীন আবু আলী হায়দার সাবের এবং মাতা রাহাতুল্লেসা চৌধুরী। তাঁর প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন এবং বৈবাহিক সূত্রে নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। রোকেয়ার পিতা বহু ভাষায় সুগভিত হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল। বড়ভাই-বোনের সাহচর্যে রোকেয়া বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ভালোভাবেই রঞ্জ করেন এবং জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৮৯৮ সালে উর্দ্বভাষী ও বিপদ্ধীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্থামীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তাঁর জ্ঞানার্জনের পথ অধিকতর সুগম হয়। বিবৃৎ সমালোচনা ও নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মুখেও তিনি কখনই নারীশিক্ষার লক্ষ্য থেকে সরে আসেন নি; বরং পর্দাপ্রধা ও শিক্ষাবিদ্য মুসলিমান মেয়েদের শিক্ষার আলোকিত করার জন্য বাড়িতে ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন। রোকেয়া বাংলা গদ্দের বিশিষ্ট শিঙ্গী। সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দ্বারা করার জন্য তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী গদ্য রচনা করেন। তাঁর সব রচনাই সমাজ জীবনের গভীর উপলক্ষ থেকে উৎসারিত। ‘যতিচূর’ ও ‘অবরোধবাসিনী’ তাঁর তাংপর্যপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। এছাড়া ‘সুলতানার কপ’ ও ‘পঞ্চারাগ’ নামে দুটি উপন্যাসও তিনি রচনা করেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন বুঝায়— যেখানে দিবাশেষে গৃহী কর্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। গৃহ গৃহীকে বৌদ্ধ বৃষ্টি হিয় হইতে রক্ষা করে। পশ্চ পক্ষীদেরও গৃহ আছে। তাহারাও স্ব গৃহে আপনাকে নিরাপদ মনে করে।

পিপাসা না থাকিলে জল যেমন উপাদেয় বোধ হয় না, সম্ভবত সেইরূপ গৃহ ছাড়িয়া কতকদিন বিদেশে না থাকিলে গৃহসূখ মিষ্টি বোধ হয় না। পুরুষেরা যদিও সর্বদা বিদেশে যায় না, তবু সমস্ত দিন বাহিরে সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া অপরাহ্নে গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য উৎসুক হয়— বাড়ি আসিলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

এখন আমাদের গৃহ সমষ্টে দুই একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসূখে বঞ্চিত। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকদের বাটীকে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবনে যে সুবী নহে, সে নিজেকে পরিবারের একজন গণ্য বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে, তাহার নিকট গৃহ শান্তিনিকেতন বোধ হইতে পারে না। কুমারী, সখবা, বিধবা— সকল শ্রেণির অবলার অবস্থাই শোচনীয়। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি অঙ্গপুরের একটু একটু নমুনা দিতেছি। এরূপে অঙ্গপুরের পর্দা উঠাইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখাইলে আমার আত্মগণ অভ্যন্তর ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

আমরা একবার (বেহারে) জামালপুরের নিকটবর্তী কোন শহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের জনৈক বন্ধুর বাড়ি আছে। সে বাটীর পুরুষের সহিত আমাদের আজীয় পুরুষদের বন্ধুত্ব আছে বলিয়া শরাফত উকিলের বাটীর ক্লিনিককে দেখিতে আমাদের আগ্রহ হয়। দেখিলাম, মহিলা কয়টি অতিশয় শাঙ্ক শিষ্ট মিষ্টভাষণী, যদিও ক্ষেপমঙ্গুক! তাহারা আমাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে শরাফতের পত্নী হসিনা,



ଭଙ୍ଗୀ ଜମିଲା, ଜମିଲାର କନ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରବଧୁ ପ୍ରଭୃତି ଉପଥିତ ଛିଲେନ । ଅତଃପର ଜମିଲାକେ ଯଥନ ଆମାଦେର ବାସାଯ ଯାଇତେ ଅନୁରୋଧ କରିଲାମ, ତଥନ ତିନି ବଲିଲେନ ଯେ ତୁହାରା କୋନ କାଳେ ବାଡ଼ିର ବାହିର ହନ ନା, ଇହାଇ ତୁହାଦେର ବଂଶଗୌରବ । କଥନେ ଘୋଡ଼ାର ଗାଡ଼ି ବା ଅନ୍ୟ କୋନ ଯାନବାହନେ ଆରୋହଣ କରେନ ନାହିଁ । ଆମି ସବିଶ୍ୱରେ ବଲିଲାମ, “ତବେ ଆପନାରା ବିବାହ କରିଯା ଶ୍ଵରବାଡ଼ି ଯାନ କରିଲେ? ଆପନାର ଭାତ୍ରବଧୁ ଆସିଲେନ କି କରିଯା?” ଜମିଲା ଉତ୍ତର ଦିଲେନ, “ଇନି ଆମାଦେର ଆଆୟ-କନ୍ୟା- ଏ ପାଡ଼ାୟ କେବଳ ଆମାଦେରଇ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ପାଶାପାଶି ଦେଖିବେ ।” ଏହି ବଲିଯା ତିନି ଆମାକେ ଅନ୍ୟ ଏକଟା ଘରେ ଲଈଯା ଶିଯା ବଲିଲେନ, “ଏହି ଆମାର କନ୍ୟାର ବାଡ଼ି; ଏଥନ ଆମାର ବାଡ଼ି ଚଲ ।” ତିନି ଆମାକେ ଏକଟା ଅପ୍ରକଟ ଗଲିର ଭିତର ଦିଯା ଘୁରାଇଯା ଫିରାଇଯା ଲଈଯା ଗେଲେନ । ତୁହାର ସକଳଙ୍ଗ୍ଲି କଷ ଦେଖାଇଲେନ । କଷଙ୍ଗ୍ଲି “ଅସୂର୍ଯ୍ୟମ୍ପଶ୍ୟ” ବଲିଯା ବୋଧ ହଇଲ । ଅତଃପର ଏକଟି ଦ୍ୱାର ଖୁଲିଲେ ଦେଖିଲାମ ଅପରଦିକେ ହସିନାର ପୁତ୍ରବଧୁ ଆଛେ! - ଜମିଲା ବଲିଲେନ, “ଦେଖିଲେ ଏହି ଦ୍ୱାରେ ଓପରେ ଆମାର ଭାଇୟେର ବାଡ଼ି, ଏପରେ ଆମାର ବାଡ଼ି । ଓ କଷେ ବଧୁ ଥାକେନ ବଲିଯା ଏ ଦ୍ୱାରାଟି ବନ୍ଦ ରାଖି । ଆମାଦେର ସଞ୍ଚାରିର ଦରକାର ହୟ ନା କେନ, ତାହା ଏଥନ ବୁଝିଲେ?” ଏଇପେ ସକଳ ବାଡ଼ିଇ ପ୍ରଦଶିଳ କରା ଯାଯ ।

ପାଠିକା କି ମନେ କରେନ ଯେ ହସିନା ବା ଜମିଲା ଗୃହେ ଆଛେନ? ଅବଶ୍ୟ ନା; କେବଳ ଚାରି ଥାଚିରେର ଭିତର ଥାକିଲେଇ ଗୃହେ ଥାକା ହୟ ନା । ଏଦେଶେ ବାସରଘରକେ “କୋହିବର” ବଲେ, କିନ୍ତୁ “କବର” ବଲା ଉଚିତ!! ବାଡ଼ିଖାନା ତ ଶରାଫତେର, ସେଥାନେ ଯେମନ ଏକ ପାଲ ଛାଗଲ ଆଛେ, ହସ କୁକୁଟ ଆଛେ, ସେଇରଗ ଏକଦଲ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କ ଆଛେନ! ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଦେର “ବନ୍ଦିନୀ” ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ!

ସାଧାରଣତ ପରିବାରେର ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷଟି ମନେ କରେନ ଗୃହଖାନା କେବଳ “ଆମାର ବାଟୀ”- ପରିବାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକେରା ତୁହାର ଆଶ୍ରିତା । ଯାଲଦହେ କରେକବାର ଆମରା ଏକ ବାଟୀତେ ଯାତ୍ତାଯାତ କରିଯାଇଛି । ଗୃହସ୍ଵାମୀ କଲିମେର ସ୍ତ୍ରୀକେ ଆମରା କଥନେ ଫ୍ରୂଫ୍ରୁମ୍ବୁଥୀ ଦେଖି ନାହିଁ । ତୁହାର ପ୍ଲାନ ମୁଖଖାନି ମୀରବେ ଆମାଦେର ଆନ୍ତରିକ ସହାନୁଭୂତି ଆକର୍ଷଣ କରିତ । ଇହାର କାରଣ ଏହି- କଯ ବନ୍ସର ଅତୀତ ହଇଲ, କଲିମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଯରା ଭାଇୟେର ସହିତ ବିବାଦ କରିଯାଇଛେ; ତାହାର କଲେ କଲିମେର ପତ୍ନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଙ୍ଗୀର ସହିତ ଦେଖା କରିତେ ପାନ ନା! ତିନି ଏତୁକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଯା ବଲିତେ ପାରେନ ନା, “ଆମାର ଭଙ୍ଗୀ ଆମାର ନିକଟ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେନ ।” ହାଯ! ବାଟୀ ଯେ କଲିମେର! ତିନି ଯାହାକେ ଇଚ୍ଛା ଆସିତେ ଦିବେନ, ଯାହାକେ ଇଚ୍ଛା ଆସିତେ ଦିବେନ ନା! ଆବାର ଓଦିକେ ଓ ବାଟୀଖାନା ସଲିମେର! ସେଥାନେ କଲିମେର ପତ୍ନୀର ପ୍ରବେଶ ନିବେଧ!

ବଲା ବାହୁଣ୍ୟ କଲିମେର ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ନ, ବଜ୍ର ବା ଅଳଂକାରେର ଅଭାବ ନାହିଁ । ବଲା, ଅଳଂକାର କି ଶିତ୍ମାତ୍ମୀୟା ଅବଲାର ଏକମାତ୍ର ଭଙ୍ଗୀର ବିଛେଦ-ୟତ୍ତପା ଭୁଲାଇତେ ପାରେ? ଶୁନିଲାମ, ତିନି ସପତ୍ନୀ-କଟ୍ଟକ ହିତେଓ ବିମୁକ୍ତ ନହେ! ଏରପ ଅବହ୍ଲାୟ ତୁହାର ନିକଟ ଗୃହ କି ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବଲିଯା ବୋଧ ହୟ?

ଆମରା ରମାସୁନ୍ଦରୀକେ ଅନେକଦିନ ହିତେ ଜାନି । ତିନି ବିଧବୀ; ସନ୍ତାନ ସନ୍ତୁତିଓ ନାହିଁ । ତୁହାର ସ୍ଵାମୀର ପ୍ରଭୃତି ଆଛେ, ଦୁଇ ଚାରିଟି ପାକା ବାଡ଼ିଓ ଆଛେ । ତୁହାର ଦେବର ଏଥନ ସେ ସକଳ ସମ୍ପଦିର ଅଧୀଶ୍ଵର । ଦେବରଟି କିନ୍ତୁ ରମାକେ ଏକମୁଠୀ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଆଶ୍ରଯଦାନେଓ କୁଣ୍ଡିତ । ଆମରା ବଲିଲାମ, “ଇନି ହୟତ ଦେବର-ପତ୍ନୀର ସହିତ କୌଦଳ କରେନ ।” ଏ କଥାର ଉତ୍ସରେ ଏକଜନ ବଲିଲେନ, “ରମା ସବ କରିତେ ଜାନେ, କେବଳ କୌଦଳ ଜାନେ ନା । ରମା ବେଶ ଜାନେ, କି କରିଯା ପରକେ ଆପନ କରିତେ ହୟ; କେବଳ ଆପନାକେ ପର କରିତେ ଜାନେ ନା ।”

“ଏତ ଶୁଣ ସତ୍ତ୍ଵେ ଦେବରେର ବାଡ଼ି ଥାକିତେ ପାନ ନା କେନ?”



“কপালের দোষ!”

আমরা একটি রাজবাড়ি দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়িখানি কবি-বর্ণিত অমরাবতীর ন্যায় মনোহর। বৈঠকখানা বিবিধ মূল্যবান সাজসজ্জায় বালমল করিতেছে; এদিকে সেদিকে ৫/৭ খানা রজত-আসন শূন্য হৃদয়ে রাজাকে আহ্বান করিতেছে!

রাণীর ঘর কয়খানাতেও টেবিল, টিপাই, চেয়ার ইত্যাদি সাজসজ্জা আছে। কিন্তু তাহার উপর ধূলার স্তর পড়িয়াছে। রাজা কোন কালে এসব কক্ষে পদার্পণ করেন বলিয়া বোধ হইল না।

রাণীকে দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম। কারণ বৈঠকখানা দেখিয়া আমি রাণীর যেৱপ মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, এ মূর্তি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পরমা সুন্দরী বলিকা— পরিধানে সামান্য লালপেঁড়ে বিলাতি ধূতি; মাথায় রংক্ষ কেশের জটা— অনুমান পনের দিন হইতে তৈলের সহিত চুলগুলির সাক্ষাৎ হয় নাই, মুখখানি এমনই করণ ভাবে পূর্ণ যে রাণীকে মূর্তিমতী “বিষাদ” বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকের মতে চক্ষু মনের দর্পণ স্বরূপ। রাণীর নয়ন দুঁটিতে কি কি হৃদয়বিদারক ভাব ছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

আমাদের একটি বর্ষীয়সী সঙ্গীনী বলিলেন, “তুমি রাজার রাণী, তোমার এ বেশ কেন? এস আমি চুল বেঁধে দিই।” রাণী উত্তর দিলেন, “জানি না কি পাপে রাণী হয়েছি!” ঠিক কথা! অথচ লোকে এই রাণীর পদ কেমন বাঞ্ছনীয় বোধ করে!

“মহমূদীয় আইন” অনুসারে আমরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হই— “আমাদের বাড়ি”ও হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, — বাড়ির প্রকৃত কর্তা স্বামী, পুত্র, জামাতা, দেবর ইত্যাদি হন। তাঁহাদের অভাবে বড় আমলা বা নায়েবতি বাড়ির মালিক! গৃহকর্ত্ত্ব এই নায়েবের ক্ষেত্রাপ্তুল মাত্র। নায়েব কর্ত্ত্বকে যাহা বুবায়, অবোধ নিরক্ষর কর্ত্ত্ব তাহাই বুবোন।

ঐরূপ আরও কত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। খদিজা প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তাঁহার স্বামী হাশেম দরিদ্র কিন্তু কুলীন বিদ্বান। হাশেম ছলে কৌশলে সমস্ত জমিজমা আত্মসাং করিয়া লইলেন; খদিজার হাতে এক পয়সা নাই। খদিজার পৈত্রিক বাড়িতে বসিয়াই হাশেম আর দুই তিনটা বিবাহ (?) করিয়া তাঁহাকে সতীনী জালায় দক্ষ করিতে লাগিলেন। এরূপ না করিলে আর ক্ষমতাশালী পুরুষের বাহাদুরি কি? ইহাতে যদি খদিজা সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করেন, তবে প্রবীণ মহিলাগণ তাঁহার হৃদয়ে স্বামীভূতির অভাব দেখিয়া নিন্দা করেন।

আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভাতা ভগ্নীগণ হয়ত মনে করিবেন যে আমি কেবল ভাত্বন্দকে নরাকারে পিশাচরূপে অক্ষিত করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছি। তাহা নয়। আমি ত কোথাও ভাতাদের প্রতি কটু শব্দ ব্যবহার করি নাই— কাহাকেও পাপিষ্ঠ, পিশাচ, নির্তুর বলিয়াছি কি? কেবল রমণীহৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে, “বলিতে আপন দুঃখ পরিনন্দা হয়”, এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে— ভগ্নীর দুঃখ বর্ণনা করিতে ভাত্বন্দ হইয়া পড়িয়াছে।

সুখের বিষয় আমাদের অনেক ভাতা এরূপ আছেন, যাহারা স্ত্রীলোকদিগকে যথেষ্ট শাস্তিতে গৃহসুখে রাখেন। কিন্তু দুঃখের সহিত আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে অনেক ভাতা আপন আপন বাটীতে অন্যায় স্বামীত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন।



যখন আমাদের চালের উপর খড় থাকে না, দরিদ্রের জীর্ণতম কুটিরের শেষ চালখানা বাঞ্ছনিলে উড়িয়া যায়, – টুপ-টাপ বৃষ্টিধারায় আমরা সমস্ত রাত্রি ভিজিতে থাকি, – চপলা-চমকে নয়নে ধাঁধা লাগে, – বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে, এবং আমাদের বুক কাঁপে– প্রতি মুহূর্তে ভাবি, বুবি বজ্রপাতে মারা যাই– তখনও আমরা অভিভাবকের বাটীতেই থাকি!

যখন আমরা রাজকন্যা, রাজবধূরাপে প্রাসাদে থাকি, তখনও প্রভু-গৃহে থাকি। আবার যখন ঐ প্রাসাদতুল্য প্রিতল অট্টালিকা ভূমিকম্পে চূর্ণ হয়, – সোপান অতিক্রম করিয়া অবতরণ কালে আমাদের মাথা ভাঙে, হাত পা ভাঙে– রক্ষাক কলেবরে হতজ্জান ধ্বায় অবস্থায় গোশালায় গিয়া আশ্রয় লই, – তখনও অভিভাবকদের বাটীতে থাকি!!

অথবা গৃহস্থের বৌ-বি রূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি; আর যখন চৈত্র মাসে ঘোর অমানিশীথে প্রভুর বাটীতে দুষ্টলোক কর্তৃক লঙ্ঘাকাণ্ডের অভিনয় হয়, –সব জিনিসপত্রসহ ঘরগুলি দাউদাউ করিয়া জলিতে থাকে, – আমরা একবসনে প্রাণটি হাতে করিয়া কোনমতে দৌড়াইয়া গিয়া দুর্বিত্ত একটা কূলগাছতলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকি, – তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি!!!

ইংরেজিতে (Home) বলিতে যাহা বুঝায়, “গৃহ” শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই। শারীরিক আরাম ও মানসিক শাস্তিনিকেতন যাহা, তাহাই গৃহ। বিধবা হইলে স্বামীগৃহ একরূপ বাসের অযোগ্য হয়; হতভাগিনী তখন পিতা, আতার শরণাপন্ন হয়। একটা হিন্দি প্রবাদ আছে:

“ঘর কি জলি বনমে গেয়ী–বনমে লাগি আগ
বন বেচারা কিয়া করে,- করম্মে লাগি আগ!”

অর্থাৎ “গৃহে দক্ষ হইয়া বনে গেলাম, বনে লাগিল আগুন; বন বেচারা কি করিবে, (আমার) কপালেই লাগিয়াছে আগুন।”

তাই বলি, গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্যন্তুর নাই। প্রাণি-জগতে কোন জন্মই আমাদের মত নিরাশয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে– নাই কেবল আমাদের।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|----------|--------------------|
| বিরাম | – বিশ্রাম |
| নিকেতন | – বাড়ি। |
| শ্রান্ত | – কাজ করে ক্লান্ত। |
| গৃহী | – গৃহে বসবাসকারী। |
| উপাদেয় | – সুস্থানু। |
| বাটী | – বাড়ি। |
| অন্তঃপুর | – ভেতর বাড়ি। |

- কৃপমঙ্গল
যথোচিত
 - অসূর্যস্পন্দ্য
সওয়ারি
 - কোহুবর
 - কুকুট
 - প্রফুল্লমুখী
 - সপত্নী-কর্টেক
 - অধীশ্বর
 - কোদল
 - অমরাবতী
 - মনোহর
 - টিপাই
 - বৈঠকখানা
 - বিলাত
 - ব্যবহৃত
 - বর্ষীয়সী
 - নায়েব
 - ক্রীড়াপুতুল
 - প্রভৃত
 - কুলীন
 - আআসাঞ্চ
 - নরাকার
 - পিশাচ
 - বাঞ্ছানিল
 - চপলা-চমক
 - বজ্জনাদ
- স্বল্পজ্ঞানী।
 - যথোর্থ।
 - সূর্যের আলো দেখতে পায় না এমন।
 - যাত্রী। এখানে গাড়িতে চড়ে যাত্রী হওয়ার দরকার পড়ে না বোঝানো হয়েছে।
 - কল্পনার স্বর্গ (ফাঃ)।
 - মোরগ, মুরগি।
 - আনন্দিত।
 - সতীনকে এখানে কাঁটা বা যন্ত্রণা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
 - মালিক।
 - কোদল বা বিবাদের কথ্য রূপ।
 - স্বর্গ।
 - মন হরণকারী।
 - ইংরেজি teapoy শব্দ থেকে এসেছে। হালকা খাবার পরিবেশনের জন্য তিনি পা বিশিষ্ট ছোট টেবিল।
 - বসার ঘর।
 - আরবি ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ। বিদেশ, ইংল্যান্ড, ইউরোপ ইত্যাদি বোঝাতে হয়।
 - বয়স্ক।
 - নায়েব ফারসি শব্দ। প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। জমিদারি ব্যবস্থায় নায়েবরা জমিদারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন।
 - খেলার পুতুল।
 - প্রচুর, অনেক।
 - উচ্চ বংশজাত।
 - অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হয়েছে এমন।
 - মানুষ সরূপ।
 - নিষ্ঠুর, লোভী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
 - বাড়ের বাতাস।
 - বিদ্যুচ্চমক।
 - বজ্জ্বর শব্দ।



| | |
|-----------|---|
| মেদিনী | — পৃথিবী। |
| ঝিল | — তিন তলা বিশিষ্ট। |
| অট্টালিকা | — দালান। |
| সোপান | — সিঁড়ি। |
| কলেবর | — দেহ, শরীর। |
| গোশালা | — গোয়ালঘর। |
| অমানিশীথ | — অঙ্ককার রাত্রি। |
| লক্ষ্মাণ | — রাম-রাবণের যুদ্ধ। এখানে ‘দুষ্টলোক কর্তৃক লক্ষ্মাণের অভিনয়’ বলতে বোঝানো হয়েছে বাজে লোকের আক্রমণ। |
| শরণাপন্ন | — শরণ অর্থ সাহায্য বা আশ্রয়। শরণ ও আপন শব্দ দু'টি যুক্ত হয়ে শরণাপন্ন, অর্থাৎ আশ্রয় বা সাহায্যপ্রার্থী। |
| পর্ণকূটীর | — পাতার ঘর। |
| নিরাশয়া | — আশ্রয়হীন। |

পাঠ-পরিচিতি

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সাধারণত বলা হয়ে থাকে, নারীর জন্য বরাদ্দ ‘ঘর’, আর পুরুষের জন্য আছে ‘বাহির’। অর্থাৎ পুরুষ সম্মূজ্জ্বল থাকবে বাহিরের জীবন ও জগতের সঙ্গে। অন্য দিকে, গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে নারী। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সামজে পুরুষের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে; নারীকে করে তোলে ঘরের সামগ্রী। কিন্তু নারীর সত্যিই কোনো ঘর বা গৃহ আছে কিনা— এ নিয়েই তৈরি হতে পারে প্রশ্ন; রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ প্রশ্নটিই তুলেছেন ‘গৃহ’ প্রবন্ধে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতাসূত্রে তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কাছে নারীর ঘরও বিপন্ন, ঘর বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই। নারীর অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ও জীবনযাপন— প্রায় সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে পুরুষ। পারিবারিকভাবে প্রাণ সম্পদ ও সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে পুরুষ। প্রবন্ধটিতে বেশ কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করে রোকেয়া দেখিয়েছেন পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্তে নিজস্ব গৃহের আনন্দ ও অনুভূতি থেকে নারী প্রবলভাবে বঞ্চিত। পুরুষতাত্ত্বিক সমাজে নারীর অবস্থান চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষ গৃহ বা ঘর প্রকৃতপক্ষে মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির স্থান।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘গৃহ’ রচনায় প্রাবন্ধিক কাদেরকে ‘কৃপমভূক’ বলেছেন?

- | | |
|---------------|-------------|
| ক. পুরুষদের | খ. মহিলাদের |
| গ. সমাজপতিদের | ঘ. রাজাদের |



২। ‘সকলেরই গৃহ আছে— নাই কেবল আমাদের’— প্রাবন্ধিকের একথা বলার কারণ কী?

- | | |
|---------------|-----------------------|
| ক. দরিদ্রতা | খ. অধিকারহীনতা |
| গ. গৃহবিমুখতা | ঘ. গৃহ সম্মীভূত হওয়া |

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ মৎ প্রশ্নের উত্তর দাও।

দিশাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্ভাস্ত ঘরে। সুশিক্ষিত দিশা স্বামী-সৎসারে স্বাধীনভাবে বসবাস করছেন। চাকরির পাশাপাশি ঘরকলার কাজও করেন। সব কাজে-কর্মে সবাই সহযোগিতা করেন সবাই তাকে ভালোবাসেন। তিনিও আত্মনির্ভরশীল ও পরিত্বষ্ট।

৩। উদ্দীপকের দিশার মধ্যে ‘গৃহ’ প্রবন্ধের কোন্ দিকটি অনুপস্থিত?

- | | |
|---------------|------------------|
| ক. স্বকীয়তা | খ. স্বাধীনতা |
| গ. অভাবঘস্ততা | ঘ. পুরুষ-অধিপত্য |

৪। উক্ত বৈশিষ্ট্যটি নিচের যে বাক্যে পাওয়া যায়—

- i. অধিকাংশ ভারত-নারী গৃহ সুখে বঞ্চিত
- ii. প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি
- iii. অনেক ভাতা আপন আপন বাটীতে অন্যায় স্বামীত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন।

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

দাও হেন বর সাগরের মত

গঞ্জীর যার বাণী,

আন-ভুবনের অজানা সুরভি

পরানে মিলাবে আনি,

দাও হেন স্বামী যে আমার পানে

চাহিবে সহজ সুখে,

যে চোখে শ্যামল প্রাঙ্গন চায়

উষার অরূপ মুখে,

(কাব্য সংক্ষয়ন – সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

ক. অনেকের মতে চক্ষু কীসের দর্পণ?

খ. ‘বলিতে আপন দুঃখ পরিদ্বা হয়’— একথা বলার কারণ কী?

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘গৃহ’ রচনার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্দীপকটি যেন প্রাবন্ধিকের মূল চাউয়া’— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।



শিক্ষাচিন্তা

কাজী আবদুল ওদুদ

সেখক-পরিচিতি

কাজী আবদুল ওদুদ ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রামে মামা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী সমীরউদ্দীন ও মাতা খোদেজা খাতুন। অসাধারণ মেধাবী কাজী আবদুল ওদুদ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে এমএ ডিপ্লি লাভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র বসু, বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি আবীন আহমদ প্রমুখ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, ফারসি, উর্দু ও আরবি ভাষাসহ দক্ষতা অর্জন করেন। ছাইবছাইয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথ হন এবং সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান ঢাকা কলেজে) বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এ সময় ঢাকায় ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের সদস্যরা ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলন পরিচালনা করেন। কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন এ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক যুগদ্ধর পুরুষ। কাজী আবদুল ওদুদ বাংলা সরকারের টেক্সট বুক কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে কলকাতা যান। সেখানে অবস্থানকালে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ‘সংকলন’ এবং ‘তত্ত্বপত্র’ নামে দুটি পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— গল্প : ‘মীরপুরিবার’; উপন্যাস : ‘নদীবক্ষে’, ‘আজাদ’; প্রবন্ধ : ‘নবপর্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড)’, ‘রবীন্দ্রকাব্যপাঠ’, ‘সমাজ ও সাহিত্য’, ‘শাশ্বতবঙ্গ’, ‘আজকার কথা’, ‘নজরুল প্রতিভা’, ‘কবিশুরু রবীন্দ্রনাথ’, ‘বাংলার জাগরণ’ ইত্যাদি। এছাড়া ‘ব্যবহারিক শব্দকোষ’ নামে একটি অভিধান তিনি সংকলন করেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে মে কাজী আবদুল ওদুদ কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

বর্তমান জগতে মানুষের জীবন বড় জটিল ও অস্বাক্ষরণ হয়ে পড়েছে। কি তার জন্য কাম্য, কি নয়, এই নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদের আর অস্ত নেই। ‘ক্ষব বলে’ কোথাও কিছু আছে কি না এই সংশয় জনসাধারণে পর্যন্ত সংক্রমিত হচ্ছে।

তবু যে-সব দেশ ভাগ্যবান সে-সব দেশে এই বিপদ কাটিয়ে উঠবার চেষ্টাও কম হচ্ছে না। মানুষের এতদিনের জ্ঞান ও বিশ্বাসের সবকিছুই যদি ঝালিয়ে নিতে হয় তবে তা নিতে হবে এ সকল যাদের অস্তরে প্রবল তাঁদের জন্য বেশীর ভাগ বিপদ কেটে গেছে বলা যেতে পারে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, নানা-অভাবে-জর্জরিত আমাদের এ দেশেও এই ধরণের এক ভাগ্যবন্ত দেশ। তাঁদের মতে, ভারতবাসী আজ নিষ্ক্রিয় নয়, তাদের সামনে সকল লক্ষ্যের বড় লক্ষ্য রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এসব কথার বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়া হয়ত অশোভন। কিন্তু সন্দেহ কীট যাদের অস্তরে প্রবেশ করেছে তাদের পক্ষে মৌলের মাধ্যম উপভোগ করাও সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশের আধুনিক চিন্তা যে কত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে দেশের শিক্ষার অবস্থা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে।

যে ভাষা আমাদের মাত্তাষা নয় তার সাহায্যে শিক্ষালাভ করলে তাতে অনেক ক্ষটি যে অনিবার্য হয়ে পড়ে এ-বিষয়ে আমাদের দেশের চিন্তাশৈলেরা বোধ হয় একমত। এই সমস্যার মীমাংসার চেষ্টাও এতদিনে হয়ত আরম্ভ হতো যদি নানা অনিবার্য রাজনৈতিক কারণে শিক্ষা-সমস্যা আমাদের দেশের লোকদের চোখে নগণ্য



হয়ে না পড়ত। কিন্তু শিক্ষার বাহনের সুমীমাংসা হলো শিক্ষার অবস্থা যে আশানুরূপ সুন্দর হবার পথে দাঁড়াবে সে আশায় আশাস্থিৎ হওয়া শক্ত এই একটি কারণে যে, শিক্ষাদান গ্রহণ করবে যে-মন তার অবস্থায় যদি কিছু স্বাভাবিক থাকে তবে শুধু শিক্ষাদানের ভাষার পরিবর্তনে বাস্তুত ফলাফল লাভ হওয়া সম্ভবপর। এই সুব্যবস্থিত মনের অভাব নানা কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুপ্রকট হয়ে উঠেছে এই অভিযোগ আজকাল শিক্ষার্থীদের গুরুজনের অনেকেরই মুখে শোনা যায়। কিন্তু সমস্যা যদি এই হতো তবে ব্যাপার মোটেই কঠিন হতো না, কেননা জ্ঞানের ক্ষেত্রে যারা প্রবেশার্থী তাদের ত্রুটি নগণ্য। এই মনের গভগোল আমাদের দেশে এর চাইতেও জটিল- এ ব্যাধিতে হয়ত বেশী করে ভুগছেন শিক্ষার্থীদের গুরুস্থানীয়েরাই।

এই ব্যাধি দেশের গুরুস্থানীয়দের আক্রমণ করেছে এই সব দিক থেকে: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনযাপন প্রণালীর সংঘর্ষ; একালের প্রাচ্য জীবনে যে-সব চিন্তাধারা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে দেশের বৃহস্তর জীবনের সঙ্গে সে-সবের কি যোগ সে-সব অনুধাবনে অনিছ্টা; দারিদ্র্য।

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, পাশ্চাত্য প্রভাবে আমরা জীবনে আদর্শহীন হয়ে পড়েছি বেশী। কিন্তু পাশ্চাত্য লোকেরা বাস্তবিকই তো আদর্শহীন নন, আর পাশ্চাত্য আদর্শের পরিবর্তে অন্য আদর্শ (তা হোকনা দেশের প্রাচীন আদর্শ) তারা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন কেন, এ সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক উভয় তাদের মুখে শুনি নি। দারিদ্র্য তাঁদের এ অবনতির কারণ বলা চলে না, কেননা, যে-সব শিক্ষক দারিদ্র্য নন আদর্শ নির্ণয় অভাব তাঁদের ভিতরেও কর লক্ষ্যযোগ্য নয়।

কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাব ও দারিদ্র্য আমাদের জীবনে যে বিশ্বজ্ঞানা এনে দিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী বিশ্বজ্ঞানা এনে দিয়েছে একালে আমাদের দেশে যে সব চিন্তাশৈলের জন্য হয়েছে তাদের প্রভাব। প্রতিভাবান শক্তিমান নিচ্ছয়ই কিন্তু তাঁর সাহচর্য বা অনুবর্তিতা করতে হয় সজাগভাবে, কেননা, শক্তিমান বলেই ব্যক্তিত্বেও বিশেষত্ব-বর্জিত তিনি নন, আর সে-বিশেষত্ব যুগ-ধর্মের প্রভাবে গঠিত; তাই এক যুগের যথাপুরুষের অনুবর্তিতা অন্য যুগের লোকদের করতে হয় যথেষ্ট সচেতন হয়ে, নইলে; তাঁদের জন্য যেটি সব চাইতে বাস্তুত- তাদের যুগে সমসাময়িক জগতে তাঁদের জীবনকে সার্থক করা— তা থেকেই তাঁরা বঝিত হন।

সার্থক জীবন-যাত্রার জন্য বিচারপরায়ণতা আমাদের চাই-ই, তা যত ভুলক্রটির ভিতর দিয়েই সে বিচার চলুক— সেই বড় প্রয়োজন শিক্ষকরা এমনি গভগোল সমাধান করতে পারছেন না, বা করছেন না।

শিক্ষকরা এই মানসিক বিশ্বজ্ঞানার জন্য যথেষ্ট অস্বত্তি অনুভব করছেন না কেন তার দুটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে— একটি, দেশের রাজনৈতিক গভগোল, সেই গভগোলে আত্ম-অস্বৈষণ প্রায় অসম্ভব; অপরটি, জনসাধারণের অস্তিত্ব ও ঔদাসীন্য। পুত্রকন্যার শিক্ষাদানে যে অর্থ ব্যয় তাঁদের হচ্ছে তার বিনিয়য়ে তারা কি পাচ্ছেন এ প্রশ্ন তাঁরা নিজেদের ভালো করে করতে পারছেন না এজন্য যে কিছুদিন আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ যোগাড় করতে পারলেই অন্নের ব্যবস্থা একরকম হতে পারত, সেই মোহ আজো পুরোপুরি কাটে নি। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নিচ্ছয়ই, কিন্তু সদুপারে অর্থার্জনও ঘৃণার সামগ্রী আদৌ নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষের ভিতরকার সুপ্ত সৃষ্টি-শক্তিকে সচেতন করা, তবে যে শিক্ষা মানুষের প্রয়োজনীয় জীবিকা আহরণের জন্য সাহায্য করে না, সে-শিক্ষা কেন আদৌ শিক্ষা নামে খ্যাত হবে, এ প্রশ্ন জনসাধারণের মনে জাগলে শিক্ষকদের হাঁশিয়ার হয়ে উঠতে হবে অনেকখানি। কিন্তু দায়িত্বে মানুষ গ্রহণ করতে পারে ইচ্ছুক হয়ে বা অনিচ্ছুক হয়ে।



দেশের জনসাধারণ যখন দেশের শিক্ষকদের প্রদত্ত শিক্ষার মূল্য যাচাই করতে চাইবেন তখন সে পরীক্ষা যদি তাঁরা শ্রদ্ধার ভাবে প্রহ্ল করতে পারেন তবে সেইটিই হবে দেশের জন্য কল্যাণকর ।

সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য যেমন নাবিক, সমাজ বা দেশের পক্ষেও তেমনি শিক্ষক । আরোহীরা কত বিচ্ছিন্ন খেয়াল ও খুশীর ভিতর দিয়ে দিন কাটাতে থাকেন, নাবিকরা সে সব দেখেন, সময় সময় তাঁদের বুকও আন্দোলিত হয়, তবু জাহাজ চালনা তাদের বড় লক্ষ্য এ-ব্যাপারে ভুল হওয়া মারাত্মক । সমাজ বা দেশের বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রাও তেমনি শিক্ষকের বুকে স্পন্দন জাগাতে পারে, কিন্তু সর্বাঙ্গে তিনি শিক্ষক— মানুষের মনের লালন, শৃঙ্খলা-বিধান তাঁর বড় কাজ, এবং সেই জন্য তিনি স্বদেশ-প্রেমিক বা বিশেষ-ধর্ম-প্রেমিক ইত্যাদি যাই হোন তারও উপরে তিনি বৈজ্ঞানিক, man of science, বিচারবুদ্ধি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন— একথা বিস্মৃত হলে মানুষের সেবাও আর তাঁর দ্বারা হয় না ।

আমাদের দেশের শিক্ষক-সমাজ আজ মনোজীবী নন, বড়-জোর ভাবপ্রবণ মনে হয়, শিক্ষা-ব্যাপারে এ একটা বিষম সংকট ।

[মুসলিম সাহিত্য-সমাজের ষষ্ঠিবার্ষিক অধিবেশনে পঠিত । চৈত্র, ১৩৩৮]

শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|-----------------|---|
| ক্রম | - চিরস্তন । |
| সংক্ষিপ্ত | - প্রভাবিত |
| সংশয় | - দিধা । |
| আলিয়ে নিতে হয় | - আলানো অর্থ নতুন করে নেয়া । আলিয়ে নিতে হয় বলতে নতুন করে নেয়ার কথা বলা হচ্ছে ।। |
| সন্দেহ কীট | - সন্দেহ তৈরি করে এমন বুঝানো হয়েছে । কীট বলতে এখানে আক্ষরিকভাবে পোকা বুঝাচ্ছে না । |
| প্রবেশার্থী | - প্রবেশ করছে যারা । |
| গভর্নেল | - হইচই, সমস্যা । |
| সর্বান্তরণকরণে | - মনে প্রাপ্তে । |
| অনুবর্ত্তিতা | - অনুসরণ, অনুগমন । |
| আরোহণ | - আরোহণ করেছে যারা । |
| মনোজীবী | - মন ও মনন নিয়ে যারা ভাবেন । |

পাঠ-পরিচিতি

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। মানুষের চিন্তা ও কল্পনা, যুক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটায় শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষা প্রসঙ্গে অনেক ধরনের বিতর্ক আছে। কেউ মনে করেন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শিক্ষার স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। কারো মতে মাতৃভাষায় শিক্ষা না দেয়ায় শিক্ষাদান অথর্ব হয় না। অনেকে মনে করেন পাঞ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের জীবন আদর্শহীন হয়ে পড়েছে। কারো মতে, দারিদ্র্যও শিক্ষার পথে বাধা। কেউ কেউ তাই মনে করেন শিক্ষা হয়ে উঠবে অর্থ উপর্যুক্ত উপায়। কাজী আবদুল গুদুদ এই বিতর্কগুলো উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি দেখিয়েছেন শিক্ষকবৃন্দও এ ধরনের বিতর্কের সমাধান দিতে পারছেন না। কারণ তাঁরাও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও থেকে যাচ্ছে সংকট। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের একার পক্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম দাবি। শিক্ষা ও শিক্ষক সবার সব ধরনের দাবি মেটাতে সক্ষম নয় – এটা স্বাভাবিক। তবু শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য জ্ঞানজ্ঞানের পথ সৃষ্টি করা এবং মানুষের সুপ্ত সৃজনশীল শক্তিকে সচেতন করে তোলা। আর এসবের নেতৃত্বে থাকেন মূলত শিক্ষক। সমুদ্রে জাহাজ যেমন নাবিকের নির্দেশনায় চলতে থাকে, দেশ ও সমাজের গতিপথ ঠিক করে দিতে পারেন শিক্ষক। তিনি মানুষের মনের পরিচর্যা করেন, মনের ভেতর শৃঙ্খলা তৈরি করেন। তিনি দেশপ্রেম ও বিচারবুদ্ধির উৎস। আর তাই দেশ, জাতি ও সমাজের বিকাশ নির্ভর করে শিক্ষকবৃন্দের ওপর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘শিক্ষা-সমস্যা’ আমাদের দেশের লোকের চোখে’ নথগ্য হ্বার কারণ কী?

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ক. অনিবার্য রাজনৈতিক কারণ | খ. আদর্শ নিষ্ঠার অভাব |
| গ. নিঃসীম ক্ষুধা-দারিদ্র্য | ঘ. মানসিক বিশ্রঙ্খলা |

২। ‘সুব্যবস্থিত মনের অভাব’ বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ক. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান | খ. জাতীয় জীবনে পাঞ্চাত্য প্রভাব |
| গ. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবস্থার অস্বাভাবিকতা | ঘ. আমাদের জীবনে চিন্তাশীলদের প্রভাব |

উকীলকাটি পড়ে ৩ ও ৪ নথর প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৮৮৩ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে, শিক্ষায় ইংরেজি ও বাংলায় আপেক্ষিক শুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, “ইংরেজিতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলা সাহিত্য উন্নতি লাভ করক ও অবশেষে বঙ্গ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।”



৩। উদ্দীপকে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে ‘শিক্ষাচিন্তা’ প্রবক্ষের যে প্রসঙ্গটি পরিস্কৃত হয়েছে তা হলো—

- i. শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব
- ii. বিদেশি ভাষার অপ্রয়োজনীয়তা
- iii. শিক্ষাগুরুর ভূমিকা

নিচের কোনটি ঠিক?

- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. i ও iii
- ঘ. ii ও iii

৪। উক্ত প্রসঙ্গটি যথাযথ অনুসৃত না হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে কাজী আবদুল গুদুদের বক্তব্য কী?

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ক. পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটে | খ. রাজনৈতিক অন্তিশীলতা সৃষ্টি হয় |
| গ. চিন্তাশীল মনে বিশ্বজ্ঞলা দেখা দেয় | ঘ. শিক্ষাধীনের শিক্ষালাভ ক্রটিপূর্ণ হয় |

সূজনশীল প্রশ্ন

উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে উইলিয়াম বেন্টিং পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষের চারিত্বিক বলিষ্ঠতা, মনের প্রসারতা ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। তাই তিনি ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন এবং শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী গড়ে তুলে মনুষ্যত্ববোধের শিক্ষার জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তপোবনের ছায়াতলে মাতৃভাষায় জ্ঞানদানের পাশাপাশি পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সংযোগ ঘটানোর প্রয়াসও অব্যাহত ছিল। শিক্ষকদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিযন্ত, ‘বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্ত বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিমশক্তির দ্বারা আমি তাহাদিগকে পুণ্যকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না।’

ক. ‘শিক্ষাচিন্তা’ প্রবক্ষে লেখক দেশের শিক্ষক-সমাজকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?

খ. ‘আমাদের দেশের শিক্ষক-সমাজ আজ মনোজীবী নন, বড়-জোর ভাবে ব্যবহৃত’—বলতে কী বোবানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে রবীন্দ্রনাথের অভিযন্ত ‘শিক্ষাচিন্তা’ প্রবক্ষের যে দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘ওপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াসের প্রতিচিত্র যেন দেখতে পাই কাজী আবদুল গুদুদের ‘শিক্ষাচিন্তা’ প্রবক্ষে’ মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।



আত্মান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পঞ্চিমবঙ্গের চবিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর থামে মামাবাড়িতে জন্মাই হন। তাঁর পিতৃনিবাস একই জেলার ব্যারাকপুর থামে। বিভূতিভূষণের বালা ও কৈশোরকাল কাটে অত্যন্ত দারিদ্র্য। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯১৬ সালে আইএ – উভয় প্রীক্ষাকার্য প্রথম প্রিভাগে এবং ১৯১৮ সালে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস করেন। তিনি দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং এর পাশাপাশি শহর থেকে দূরে অবস্থান করে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনা করেছেন। বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের জীবনকে তিনি তাঁর অসাধারণ শিল্পসুবিমান ভাষায় সাহজিক সারলে প্রকাশ করেছেন। মানুষকে তিনি দেখেছেন গভীর মর্মত্ববোধ ও নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে। তাঁর গদ্য কাব্যময় ও চিত্রাত্মক বর্ণনায় সমৃদ্ধ।

বিভূতিভূষণের কালজয়ী যুগল উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিতা’। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— উপন্যাস : ‘দৃষ্টি প্রদীপ’, ‘আরণ্যক’, ‘দেববান’ ও ‘ইছামতি’; গল্পগুহ্য : ‘মেঘমন্ত্রী’, ‘মৌরীফুল’, ‘যাত্রাবদ্ধ’ ও ‘কিল্লার দল’।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায় মৃত্যুবরণ করেন।

দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই। পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটিতে জঙ্গল গঁজিয়েছে। এ অবস্থায় একদিন গিয়েছি দেশে কিসের একটা ছুটিতে।

গ্রামের চকোতি মশায় আমার বাবাৰ পুৱাতন বস্তু। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন—কতকাল পৱে বাবা মনে পড়ল দেশের কথা? প্রশান্ত করে পায়ের ধূলা নিলাম। বললেন—এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও। বাড়িঘর করবে না?

—আজে সামান্য মাইনে পাই—

—তাতে কী? গ্রামে ছেলে থামে বাস করবে, এতে আৱ সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কী? আমি খড় বাঁশ দিচ্ছি, চাঙাঘৰ তুলে ফেল, মাৰো মাৰো যাতায়াত করো।

আৱও অনেকে এসে ধৰল, অন্তত খড়ের ঘৰ উঠাতে হবে। অনেক দিন পৱে গ্রামে এসে লাগছে ভালোই। বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমগাছের ছায়ায় একটি বৃক্ষার চেহারা, ডান হাতে নড়ি ঠকঠক কৱতে কৱতে বোধহয় বাজারের দিকে চলেছে।

বুড়িকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। জিঞ্জসা কৱলাম, কোথায় যাবে?

—বাজারে বাবা।

বুড়ি আমায় ভালো না দেখতে পেয়ে কিংবা না চিনতে পেয়ে ডান হাত উঠিয়ে তালু আড়ভাৰে চোখের ওপৰ ধৰল। বলল, কে বাবা তুমি? চেনলাম না তো?

—চিনবে না। আমি অনেক দিন গাঁয়ে আসি নি।

—তা হবে বাবা। আমি আগে তো এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না। তিনি থাকতি অভাৰ ছিল না কোনো জিনিসেৱ। গোলাপোৱা ধান, গোয়ালপোৱা গৰু।



—তোমাকে তো চিনতে পারলাম না, বুড়ি?

—আমার তো তেনার নাম করতে নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন।

বললাম, তোমার ছেলে আছে?

—কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। এক নাত-জামাই আছে তো সে মোরে ভাত দেয় না। আমার বড় কষ্ট। ভাত জোটে না সবদিন।

বুড়িকে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম।

—ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা চুকল না।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময় সেই বুড়ি লাঠি ঠকঠক করতে করতে হাজির উঠোনে। থাকি এক জাতি খুড়োর বাড়ি। তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্তৰি। অনেকদিন আগে মরে গিয়েছে জমির। বুড়ি উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকল, ও বাবা।

বোধহয় চোখে একটু কম দেখে।

বললাম, এই যে আমি এখানে।

আমার খুড়োমশায় বুড়িকে বুবিয়ে দিলেন আমি কে। সে উঠোনের কাঁঠালতলায় বসে আপন মনে খুব খানিকটা বকে গেল।

পরদিন কলকাতা চলে গেলাম, ছুটি ফুরিয়ে গেল।

কয়েক মাস পরে জ্যেষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার নতুন তৈরি খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম। কলকাতাতে কর্মব্যস্ত এই কংমাসের মধ্যে বুড়িকে একবারও মনে পড়েনি বা এখানে এসেও মনে হঠাত হয়ত হতো না, যদি সে তার পরের দিনই সকালে আমার ঘরের নিচু দাওয়ায় এসে না বসে পড়ত।

বললাম, কী বুড়ি, ভালো আছ?

ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রাণ থেকে পোটাকতক আম খুলে আমার সামনে মাটিতে রেখে বলল, আমার কি মরণ আছে রে বাবা।

জিজ্ঞাসা করলাম, ও আম কীসের।

দস্তহীন মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, অ গোপাল আমার, তোর জন্ম নিয়ে আলাম। গাছের আম বেশ কড়া মিষ্টি, খেয়ে দেখ এখন।

বড়ো ভালো লাগল। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই। একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সঙ্গে করার লোকের দেখা পাই নি বাল্যকালে মা-পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে।

বুড়ি বললে, খাও কোথায় হ্যাঁ বাবা?

—খুড়ো মশায়ের বাড়ি।

—বেশ যত্ন করে তো শুনারা?

—তা করে।

—দুধ পাচ ভালো?

—ঝুঁটি গোয়ালিনী দেয়, মন্দ না।

—ও বাবা, ওর দুখ! অর্ধেক জল— দুখ খেতি পাচ না ভালো সে বুঝোচি।

পরদিন সকাল হয়েছে সবে, বুড়ি দেখি উঠোনে এসে ডাকছে, অ গোপাল।

বিছানা ছেড়ে উঠে বললাম, আরে এত সকালে কী মনে করে। হাতে কী?

বৃন্দা হাতের নড়ি আমার দাওয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, এক ঘটি দুখ আনলাম তোর জন্য।

—সে কী! দুখ পেলে কোথায় এত সকালে?

আমায় মা বলে ডাকে ওই হাজরা ব্যাটার বউ। তারও কেউ নেই। মোর চালাঘরের পাশে ওর চালাঘর। ওরে কাল রান্তিরে বলে রেখে দিয়েছিলাম, বলি বউ আমার, গোপাল দুখ খেতি পায় না। তাই আজ ভোরে উঠে দেখি আমারে ডাকচে, মা ওঠো, তোমার গোপালের জন্য দুখ নিয়ে যাও।

—আচ্ছা কেন বলতো তোমার এসব! এ রকম আর কখনও এনো না। কত পয়সা দাম দিতে হবে বল। কতটা দুখ?

বুড়ি একটু ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলে, কেন বাবা, পয়সা কেন?

—পয়সা না তো তুমি দুখ পাবে কোথায়?

—ওই যে, বললাম বাবা, আমার মেয়ের বাড়ি থেকে।

—তা হোক, তুমি পয়সা নিয়ে যাও। সেও তো গরিব লোক।

বুড়ি পয়সা নিয়ে চলে গেল বটে কিন্তু সে যে দমে গিয়েছে তার কথাবার্তার ধরনে বেশ বুঝতে পারলাম। মনে একটু কষ্ট হলো বুড়ি চলে গেলে। পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েছে কি? বুড়ির কী রকম হয়ত মন পড়ে গিয়েছে আমার ওপর, স্নেহের দান— এমন করা ঠিক হয়নি। বুড়ি কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাথল না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই সে এসে জুটবে।

—অ গোপাল, এই দুটি কটি শসার জালি মোর গাছের, এই ন্যাও। বুন দিয়ে খাও দিকিন মোর সামনে!

—বুড়ি তোমার চলে কীসে?

—ওই যারে মেয়ে বলি, ও বড় ভালো। লোকের ধান ভানে, তাই চাল পায়, আমায় দুটো না দিয়ে খায় না।

—একা ধাক?

—তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল। আমি নতুন খাজুর পাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েছিলাম তোমারে বসতি দেবার জন্য।

সেবার বুড়ির বাড়িতে আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। নানাদিকে ব্যস্ত থাকি। অনেক দিন পরে গ্রামে এসেছি তো! যে কদিন গ্রামে থাকি বুড়ি রোজ সকালে আসতে ভুলবে না। কিছু না কিছু আনবেই। কখনো পাকা আম, কখনো পাতি লেবু, কখনো বা একচূড়া কাঁচকলা কি এক-ফালি কুমড়ো।

পুনরায় গ্রামে এলাম পাঁচ-ছয় মাস পরে, আশ্বিন মাসের শেষে। কয়েকদিন পরে ঘরে বসে আছি, বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কে যেন জিজ্ঞাসা করলে; বাবু ঘরে আছেন গা?

বাইরে এসে দেখি গত জৈষ্ঠ মাসে যাকে বুড়ির সঙ্গে দেখেছিলাম সেই মধ্যবয়সী ঝীলোকটি। আমায় দেখে সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করে সে বললে, বাবু কবে এসেছেন?

—দিন পাঁচ-ছয় হলো। কেন?

—আমার সেই মা পেটিয়ে দিলে, বলে দেখে এসো গিয়ে।

—কে?



—ওই সেই বুড়ি— এখানে যিনি আসত। তেনাৰ বজ্জ অসুখ। এবাৰ বোধহয় বাঁচবে না। গোপাল কৰে আসবে, গোপাল কৰে আসবে— অস্থিৱ, আমাৱে রোজ শুধায়। একবাৰ দেখে আসুন গিয়ে, বজ্জ খুশি হবে তাহলি।

বিকেলেৰ দিকে বেড়াতে যাবাৰ পথে দেখতে গেলাম বুড়িকে। বুড়ি শয়ে আছে একটা মাদুৱেৰ ওপৱ, মাথায় মলিন বালিশ। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ি চোখ মেলে আমাৰ দিকে চাইল। পৱে আমাকে চিনে ধড়মড় কৱে বিছানা ছেড়ে উঠবাৰ চেষ্টা কৱতেই আমি বললাম, উঠো না, ও কী?

বুড়ি আহুদে আটখানা হয়ে বলল, ভালো আছ অ মোৱ গোপাল? বসতে দে গোপালকে। বসতে দে।

—বসবাৰ দৱকাৱ নেই, থাক।

—গোপালেৰ ওই খাজুৱেৰ চটখানা পেতে দে।

পৱে ঠিক যেন আপনাৰ মা কি পিসিমাৰ মতো অনুযোগেৰ সুৱে বলতে লাগল, তোৱ জন্যি খাজুৱেৰ চাটাইখানা কদিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুৱনো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তুই একদিনও এগি না গোপাল। অসুখ হয়েছে তাুও দেখতে এলি না।

বুড়িৰ দুচোখ বেয়ে জল বেয়ে পড়ছে গড়িয়ে। আমায় বলল, গোপাল, যদি মৱি, আমাৰ কাফনেৰ কাপড় তুই কিনে দিস।

আসবাৰ সময় বুড়িৰ পাতানো মেয়েটিৰ হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলেৰ জন্য। হয়ত আৱ বেশি দিন বাঁচবে না, এই অসুখ থেকে উঠবে না।

বুড়ি কিষ্ট সে যাত্রা সেৱে উঠল।

বছৰখানেক আৱ গ্ৰামে যাইলি। বোধহয় দেড় বছৰও হতে পাৱে। একবাৰ শৱতেৰ ছুটিৰ পৱ তখনও দুইদিন ছুটি হাতে আছে। গ্ৰামেই গেলাম এই দুইদিন কাটাতে। গ্ৰামে চুকতেই প্ৰথমে দেখা পৱশু সৰ্দাৱেৰ বউ দিগঘৰীৰ সঙ্গে। দিগঘৰী অবাক হয়ে বলে, ওমা আজই তুমি এলো? সে বুড়ি যে কাল রাতে মাৱা গিয়েছে। তোমাৰ নাম কৱলো বজ্জ। ওৱ সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বলছেল।

আমি এসেছি শুনে বুড়িৰ নাতজামাই দেখা কৱতে এল। আমাৰ মনে পড়ল বুড়ি বলেছিল সেই একদিন— আমি মৱে গেলে তুই কাফনেৰ কাপড় কিনে দিস বাবা। ওৱ স্নেহাতুৰ আত্মা বহু দূৱ থেকে আমায় আহ্বান কৱে এনেছে। আমাৰ মন হয়ত ওৱ ডাক এবাৰ আৱ তাচ্ছিল্য কৱতে পাৱেনি।

কাপড় কেনবাৰ টাকা দিলাম। নাতজামাই বলে গেল, মাটি দেওয়াৱ সময় একবাৰ যাবেন বাবু। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন।

শৱতেৰ কাঁচুতিঙ্গ গঞ্জ ওঠা বনৰোপ ও মাকাল-লতা দোলানো একটা প্ৰাচীন তিতিৱাজ গাছেৰ তলায় বৃক্ষাকে কৱৰ দেওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম। আবদুল, শুকুৱ মিয়া, নসৱ, আমাদেৱ সঙ্গে পড়ত আবেদালি, তাৱ ছেলে গণি। এৱা সকলে গাছেৰ ছায়ায় বসে।

প্ৰৱীণ শুকুৱ মিয়া আমায় দেখে বলল, এই যে বাবা, এসো। বুড়িৰ মাটি দেওয়াৱ দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে না? তোমায় যে বজ্জ ভালোবাসত বুড়ি।

দুজন জোয়ান ছেলে কৱৰ খুঁড়ছে। কৱৰ দেওয়াৱ পৱ সকলে এক এক কোদাল মাটি দিল কৱৱেৰ উপৱ। শুকুৱ মিয়া বলল, দ্যাও বাবা— তুমিও দ্যাও।

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত,— অ মোৱ গোপাল।

[সংক্ষেপিত]



শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|-------------|---|
| চকোলী | — ‘চক্ৰবৰ্তী’ উপাধিৰ সংক্ষিপ্ত রূপ। পূজারী ব্ৰাহ্মণেৰ উপাধিবিশেষ। |
| নড়ি | — লাঠি। |
| অঙ্গেৰ নড়ি | — অসহায়েৰ একমাত্ৰ অবলম্বন। |
| গোলাপোৱা | — গোলাভৱা। |
| গোয়ালপোৱা | — গোয়ালভৱা। |
| কৰাতেৰ কাজ | — কাঠ চেৱাই কৰাৰ পেশা। |
| কৰাতি | — কৰাত দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নিৰ্বাহ কৰে যে। |
| দাওয়া | — ৰোয়াক। বাৰান্দা। |

পাঠ-পরিচিতি

“আহ্বান” গল্পটি বিভূতিভূমণ বন্দেয়পাধ্যায়েৰ রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি একটি উদার মানবিক সম্পর্কেৰ গল্প। মানুষেৰ স্নেহ-মমতা-গ্ৰীতিৰ যে বাঁধন তা ধনসম্পদে নয়, হৃদয়েৰ নিবিড় আন্তরিকতাৰ স্পর্শেই গড়ে ওঠে। ধনী-দৱিদ্ৰেৰ শ্ৰেণিবিভাগ ও বৈষম্য, বিভিন্ন ধৰ্মেৰ মানুষেৰ মধ্যে যে দূৰত্ব সংক্ষার ও গোড়ামিৰ ফলে গড়ে ওঠে তাৰও ঘুচে যেতে পাৱে— নিবিড় স্নেহ, উদার হৃদয়েৰ আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টিৰ ফলে। দারিদ্ৰ্য-পীড়িত গ্ৰামেৰ মানুষেৰ সহজ-সৱল জীবনধাৰার প্ৰতিফলনও এই গল্পেৰ অন্যতম উপজীব্য। এ গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধৰ্ম, বৰ্ণ ও আৰ্থিক অবস্থানে বেড়ে-ওঠা চৱিত্ৰেৰ মধ্যে সংকীৰ্ণতা ও সংক্ষারযুক্ত মনোভঙ্গিৰ প্ৰকাশ ঘটিয়েছেন। গ্ৰামীণ লোকায়ত প্ৰাণিক জীবনধাৰা শান্তীয় কঠোৱতা থেকে যে অনেকটা মুক্ত সে-সত্যও এ গল্পে উন্মোচিত হয়েছে।

বহুনিৰ্বাচনি প্ৰশ্ন

১. “আহ্বান” গল্পে কথকেৰ সহপাঠী কে ছিলেন?

ক. আবদুল

খ. আবেদালি

গ. শুকুর মিয়া

ঘ. নসৱ

২. বুড়ি কেন বাৰবাৰ গোপালেৰ কাছে যেতেন?

ক. পয়সা পাওয়াৰ লোতে

খ. স্নেহ ভালোবাসাৰ টানে

গ. নিঃসঙ্গতা দুৰ কৰতে

ঘ. অতিথি পৱায়ন বলে



নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

অকালে বিধবা হয়ে প্রতিমা আজ থেকে ৩০ বছর আগে এসেছিলেন সুদীপ্তির বাড়িতে, সুদীপ্তির বয়স তখন তিনি মাস। ব্যস্ত চিকিৎসক বাবা-মার অনুপস্থিতিতে প্রতিমার কাছেই সুদীপ্তি বেড়ে উঠে। আজ সুদীপ্তি ও একজন চিকিৎসক। উচ্চশিক্ষার জন্য সে আমেরিকা চলে যাবে শুনে প্রতিমা তাকে বলেন— বাবা, যেখানে থাকিস আমার মৃত্যুর পর তুই মুখ্যান্বিত করতে আসিস।

৩. সুদীপ্তি “আহ্বান” গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

- | | |
|--------------|--------------------|
| ক. আনন্দুলের | খ. জমির কর্মাত্তির |
| গ. আবেদালির | ঘ. কথকের |

৪. প্রতিমা ও গল্পের বুড়ি চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে—

- i. লেহ
- ii. নির্ভরতা
- iii. দায়িত্ববোধ

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন দিন মজুর কেরামত। হঠাৎ দেখতে পান মৃতপ্রায় একটি শিশু পথের ধারে পড়ে আছে। পরম যত্নে তিনি শিশুটিকে ঘরে তুলে আনেন। নিজের ছেলে-মেয়ে নিয়ে অভাবের সংসারে স্ত্রী প্রথমে খানিকটা আপত্তি করলেও শিশুটির অবস্থা দেখে তিনিও বুকে জড়িয়ে ধরেন— বড় করতে থাকেন নিজের সন্তান পরিচয়ে।

ক. বুড়িকে মা বলে ডাকত কে?

খ. “ল্লেহের দান এমন করা ঠিক হয়নি”— কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. কেরামত দম্পতির মধ্য দিয়ে “আহ্বান” গল্পের কোন বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উক্ত বিশেষ দিকটিই অনুচ্ছেদ ও “আহ্বান” গল্পের মূল উপজীব্য’— বিশ্লেষণ কর।

আমার পথ

কাজী নজরুল ইসলাম

গেঞ্জি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুক্লিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফরিদ আহমেদ, মায়ের নাম জাহেদা খাতুন।

সত্য প্রকাশের দুর্বল সাহস নিয়ে নজরুল আমৃত্যু সকল অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার, প্রতিবাদী। এজন্য বাংলা সাহিত্যের ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। আবার একই সঙ্গে কোমল দরদি মন নিয়ে ব্যথিত বিষিত মানুষের পাশে থেকেছেন তিনি। এক হাতে বাঁশি আরেক হাতে রংগুল্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল; আর এসেই প্রচলিত শিল্পাখাসমূহকে পাটে নিয়ে নতুন বিষয় ও নতুন শব্দে বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে করেছেন সম্মুখতর। দরিদ্র পরিবারে জলা নেওয়া নজরগলের কর্মজীবনও ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। মসজিদের ইমামতি, লেটোর দলে যোগদান, ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগদান, সাম্যবাদী ধারার রাজনীতি, পত্রিকা সম্পাদনা কিংবা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়াসহ বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন ছিল পূর্ণ। মাত্র তেতোশ্শে বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় এই খদ্দ ও সম্ভাবনাময় জীবন আমৃত্যু নির্বাক হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বহুবক্তু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং জাতীয় কবির মর্যাদা নিয়ে সমস্মানে এদেশে বরণ করে নেওয়া হয়। এর কিছুকাল পরে কবির মৃত্যু হলে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে পূর্ণ রাস্তীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়। কবি হলেও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও তিনি বিচরণ করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে ‘বাঁধনহারা’, ‘মৃত্যু-কুধা’, ‘কুহেলিকা’ এবং গল্পগুলোর মধ্যে ‘ব্যাথার দান’, ‘রিক্তের বেদন’, ‘শিউলিমালা’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘যুগ-বাদী’, ‘দুর্দিনের যাত্রী’, ‘রন্ধ-মঙ্গল’, ‘রাজবন্দির জবাবদি’ তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি। কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে আগস্ট (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-গুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি—নমস্কার করছি আমার সত্যকে। যে-পথ আমার সত্যের বিরোধী, সে পথ আর কোনো পথই আমার বিপথ নয়। রাজন্য— লোকভয় কোনো ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না। আমি যদি সত্য করে আমার সত্যকে চিনে থাকি, আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই আমার কিছু করতে পারবে না। যার মনে মিথ্যা, সে-ই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজেকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্ণিশ করে না— অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না। এই যে, নিজেকে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথপ্রদর্শক কাঞ্চারি বলে জানা, এটা দস্ত নয়, অহংকার নয়। এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি। আর যদি এটাকে কেউ ভুল করে অহংকার বলে মনে করেন, তবু এটা মনের ভালো— অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়। ওতে মানুষকে ঝর্মেই ছোট করে ফেলে, মাথা নিচু করে আনে। ও রকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক-অনেক ভালো।

অতএব এই অভিশাপ-রথের সারধির স্পষ্ট কথা বলাটাকে কেউ যেন অহংকার বা স্পর্ধা বলে ভুল না করেন।



স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে; কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। নিজের চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর আটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর আটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজি। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, “আমি আছি” এই কথা না বলে সবাই বলতে সাগলাম “গান্ধীজি আছেন”। এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ঠিয় করে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কী করে? আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়। নিজে নিষ্ঠিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাপ্তিগ্রহণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তাহলে এই দেশ এতদিন প্রাধানী থাকত না। আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে বড় মনে করার দস্ত— আর যাই হোক ভঙ্গামি নয়। এ-দস্ত শির উঁচু করে, পুরুষ করে, মনে একটা ‘ডোট কেয়ার’-ভাব আনে। আর যাদের এই তথ্যকথিত দস্ত আছে, শুধু তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

যার ভিত্তি পচে গেছে, তাকে একদম উপড়ে ফেলে নতুন করে ভিত্তি না গৌঢ়লে তার ওপর ইমারত যতবার খাড়া করা যাবে, ততবারই তা পড়ে যাবে। দেশের যারা শক্ত, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভঙ্গামি, যেকি তা সব দূর করতে প্রয়োজন হবে আগুনের সম্মার্জন। আমার এমন শুরু কেউ নেই, যার খাতিরে সে আগুন-সত্যকে অস্বীকার করে কারুর মিথ্যা বা ভঙ্গামিকে প্রশ্রয় দেবে। আমি সে-দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি কোনো দিনই কারুর বাণীকে বেদবাক্য বলে মেনে নেব না, যদি তার সত্যতা প্রাপ্তে তার সাড়া না দেয়। না বুঝে বোবার ভঙ্গামি করে পাঁচ জনের শ্রদ্ধা আর প্রশংসা পাবার লোভ আমি কোনো দিনই করব না।

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গৌঢ় বজায় রাখবার জন্যে ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিতে যাবে। একমাত্র মিথ্যার জলই এই শিখাকে নিষ্ঠাতে পারবে। তাছাড়া কেউ নিষ্ঠাতে পারব না।

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাপ্তের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশ্মনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের বাস্তা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।

[সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|--------------------|--|
| কর্ণধার | — নেতৃত্ব প্রদানের সামর্থ্য আছে এমন ব্যক্তি। |
| কুর্নিশ | — অভিবাদন। সম্মান প্রদর্শন। |
| অভিশাপ-রথের সারাধি | — সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজরক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। এ কথা জেনেও নজরুল তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অভিশাপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। নিজেই বসেছেন রথচালক তথা সারাধির আসনে। |
| যেকি | — মিথ্যা। কপট। |
| সম্মার্জনা | — ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা। |
| আগুনের বাস্তা | — অগ্নিপতাকা। আগুনে সব শুন্দি করে নিয়ে সত্যের পথে উড়ানো নিশান। |

পার্ট-পরিচিতি

প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত প্রবন্ধসমূহ ‘রংদ্র-মঙ্গল’ থেকে সংকলিত হয়েছে। “আমার পথ” প্রবন্ধে নজরুল এমন এক ‘আমি’র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ; সত্য প্রকাশে তিনি নিউইক অসংকোচ। তাঁর এই ‘আমি’-ভাবনা বিন্দুতে সিদ্ধুর উচ্ছ্বাস জাগায়। নজরুল প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক ‘আমি’র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন; একইসঙ্গে, এক মানুষকে আরেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে ‘আমরা’ হয়ে উঠতে চেয়েছেন। স্বনির্ধারিত এই জীবন-সংকলনকে তিনি তাঁর মতো আরও যারা সত্যগথের পথিক হতে অস্থী তাদের উদ্দেশে ছড়িয়ে দিতে চান। এই সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। তিনি তাই অনায়াসে বলতে পারেন, ‘আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য।’ রংদ্র-তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে নজরুলের এই ‘আমি’ সম্ভা। তাঁর পথনির্দেশক সত্য অবিনয়কে মেনে নিতে পারে কিন্তু অন্যায়কে সহ্য করে না। সমাজ ও সমকাল পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখেছেন যে, সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা, আহত হয় আমাদের ব্যক্তিত্ব। নজরুলের কাছে এই ভয় আত্মবিশ্বাসের প্লানি গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিবর্তে তিনি প্রয়োজনে দাঙ্গিক হতে চান; কেননা তাঁর বিশ্বাস— সত্যের দম্পত্তি যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের পক্ষেই কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

নজরুল এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, তিনি ভুল করতে রাজি আছেন কিন্তু ভঙ্গামি করতে প্রস্তুত নন। ভুল জেনেও তাকে ঠিক বলে চালিয়ে দেবার কপটতা কিংবা জেদ তাঁর দৃষ্টিতে ভঙ্গামি। এই ভুল ব্যক্তির হতে পারে, সমাজের হতে পারে কিংবা হতে পারে কোনো প্রকার বিশ্বাসের। তবে তা যারই হোক আর যেমনই হোক এর থেকে বেরিয়ে আসাই নজরুলের একান্ত প্রত্যাশা। তিনি জানেন, এই বেরিয়ে আসা সম্ভব হলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাপের সম্পর্ক ঘটানো সম্ভব হবে। মনুষ্যত্ববোধে জাহাত হতে পারলেই ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে, এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের বিরোধ মিটে যাবে। সম্ভব হবে গোটা মানব সমাজকে এক্যবন্ধ করা; আর এই একেব্র মূল শক্তি হলো সম্প্রীতি। এই সম্প্রীতির বন্ধন শক্তিশালী হলে মানুষের মধ্যে সহনশীলতা বাঢ়ে। ভিন্ন ধর্ম-মত-পথের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগে। আর এই সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে উৎকৃষ্ট মানব সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজী নজরুল ইসলাম কোনটিকে নমস্কার জানিয়েছেন?

ক. ভারত্যকে

খ. সত্যকে

গ. রাজত্বকে

ঘ. লোকভয়কে

২. ভুলের মধ্য দিয়ে কীভাবে সত্যকে পাওয়া যায়?

ক. বার বার ভুল করে

খ. ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে

গ. ভুল চেপে রেখে

ঘ. ভুল স্বীকার করে



নিচের কবিতাংশটি পড়ে ও ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বধনা।

৩. “আমার পথ” প্রবন্ধের যে যে বাক্য কবিতাংশের বক্তব্যটির প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো—

- i. আমার পথ দেখাবে সত্য
- ii. নমস্কার করছি সত্যকে
- iii. এই আগন্তুর বাস্তা দুলিয়ে বাহির হলাম

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উক্ত প্রতিনিধিত্বের কারণ, সত্যই—

- i. সুন্দরতম
- ii. মুক্তির পথ
- iii. আলোর দিশারী

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

আবদুল মালেক সারাটি জীবন শিক্ষকতা করেছেন, গড়েছেন আলোকিত মানুষ। অবসর গ্রহণের পর তিনি গড়ে তুলেছেন ‘তারুণ্য’ নামে সেবা-সংগঠন। বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি পথশিখদের শিক্ষাদান, দুনীতি-বিরোধী অভিযান, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করেন তিনি। অনেকে তাঁর কাজের প্রশংসা করেন আবার নিম্না ও কটুকি করতেও ছাড়েন না কেউ কেউ। তিনি তরুণদের উদ্দেশে বলেন—

মনেরে আজ কহ যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

- ক. কাজী নজরুল ইসলামের মতে কোনটি আমাদের নিষ্পত্তি করে দেয়?
- খ. কবি নিজেকে “অভিশাপ রথের সারাধি” বলে অভিহিত করেছেন কেন?
- গ. উদ্দীপকে আবদুল মালেকের মাধ্যমে “আমার পথ” প্রবন্ধের যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশের বক্তব্য চেতনায় ধারণ করে আলোকিত পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।— প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

তাজমহল

বন্ধুল

লেখক-পরিচিতি

বন্ধুল ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই বিহারের পূর্ণিয়ার মণিহারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস হৃগলির শিয়াখালায়। সাহিত্য জগতে 'বন্ধুল' ছদ্মনামে খ্যাত ছোটগল্পকার, নাট্যকার, উপন্যাসিক ও কবির আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। পেশায় ডাঙ্কার এই লেখক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করলেও তাঁর স্বচ্ছন্দ দক্ষতার অসাধারণ পরিচয় রয়েছে ছোটগল্পে। সেখানে উঠে এসেছে বিচির সব মানুষের জীবনছবি, যাদের সামৃদ্ধ তিনি পেয়েছেন পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁর রচিত শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জন্ম', 'স্থাবর', 'হাটে বাজারে', 'ভূবন সোম', 'গল্প সংগ্রহ', 'কিছুক্ষণ', 'রাত্রি', 'ডানা' ইত্যাদি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'শ্রীমধুসূদন' নাটক তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা। তাঁর বেশকিছু উপন্যাস ও গল্প অবলম্বনে চলচিত্র নির্মিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি পেয়েছেন। তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'আনন্দ পুরস্কার', 'জগতারিণী স্বর্ণপদক'সহ বহু পদক ও সমানে ভূষিত হয়েছেন।

বন্ধুল ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথম যখন আঘা গিয়েছিলাম তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম। প্রথম দর্শনের সে বিস্ময়টা এখনও মনে আছে। ট্রেন তখনও আঘা স্টেশনে পৌছায়নি। একজন সহযাত্রী বলে উঠলেন— ওই যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়লাম।

ওই যে—

দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দয়ে গেলাম। চুনকাম-করা সাধারণ একটা মসজিদের মতো— ওই তাজমহল! তবু নির্নিমিত্তে চেয়ে রইলাম। হাজার হোক তাজমহল। শাহজাহানের তাজমহল। ... অবসর আপরাহ্নে বল্দি শাহজাহান আঘা দুর্দের অলিন্দে বসে এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের বড় সাধের তাজমহল। ... আলমগীর নির্ময় ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি তিনি ... মহাসমারোহে মিহিল চলেছে ... সন্মাট শাহজাহান চলছেন প্রিয়া সন্নিধানে? আর বিচ্ছেদ সইল না ... শৰাধার ধীরে ধীরে নামছে ভূগর্ভে ... ওই তাজমহলেই মমতাজের ঠিক পাশে শেষ-শয়া প্রস্তুত হয়েছে তাঁর। আর একটা কবরও ছিল ... হয়ত এখনও আছে ... ওই তাজমহলেরই পাশে। দারা সেকোর ...

চুনকাম-করা সাধারণ মসজিদের মতো তাজমহল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

পূর্ণিয়ার প্রবালিন। তখনও চাঁদ উঠেনি। জ্যোৎস্নার পূর্বাভাষ দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। সেই দিন সক্ষ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্কুট মর্মর-ধ্বনি কানে এলো। বাট-বীথি থেকে নয়— মনে হলো যেন সুন্দর অতীত থেকে; মর্মর-ধ্বনি নয়, যেন চাপা কান্না। ইষৎ আলোকিত অঙ্ককারে পুঁজীভূত তমিন্দ্রার মতো স্ফুরীকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্সর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল কুমশ। শুন্দ্র আভাসও ফুটে বেরতে লাগলো অঙ্ককার ভেদ করে। তারপর অকস্মাত আবির্ভূত হলো— সমন্টটা মূর্ত হয়ে উঠলো যেন সহসা বিশ্বিত চেতনা-পটে। চাঁদ উঠলো। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজ-রাজেশ্বরী শাহজাহান-মহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুঝ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর অনেক দিন কেটেছে।



কোন কন্ট্রাক্টার তাজমহল থেকে কত টাকা উপর্যুক্ত করে, কোন হোটেল-ওয়ালা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে গেল, ফেরিওয়ালাশুলো বাজে পাথরের ছেট ছেট তাজমহল আর গড়গড়ার মতো সিগারেট পাইপ বিক্রি করে কত পয়সা পেত রোজ, নিরীহ আগমনিকদের ঠকিয়ে টাঙ্গাশুলো কি ভীষণ ভাড়া নেয়- এ সব খবরও পুরোনো হয়ে গেছে। অঙ্ককারে, জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায়, উষায়, শীত-শ্রীম-বর্ষা-শরতে বহুবার বহুরপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে। এতবার যে আর চোখে লাগে না। চোখে পড়েই না। ... পাশ দিয়ে গেলেও নয়। তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল। আগ্নার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি। তাজমহল সম্বন্ধে আর মোহ নেই। একদিন কিন্তু- গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে।

সেদিন ‘আউট ডের’ সেরে বারান্দা থেকে নামছি, এক বৃক্ষ মুসলমান গেট দিয়ে চুকলো। পিঠে প্রকাণ একটা ঝুড়ি বাঁধা। ঝুড়ির ভারে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে বেচারির। ভাবলাম কোনও মেওয়াওয়ালা বুঝি। ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম, ঝুড়ির ভেতর- মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা বসে আছে একটি। বৃক্ষের চেহারা অনেকটা বাউলের মতো, আলখাল্লা পরা, ধপধপে সাদা দাঢ়ি। এগিয়ে এসে আমাকে সেলাম করে চোস্ত উর্দু ভাষায় বললে- নিজের বেগমকে পিঠে করে বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে বলে। নিতান্ত গরিব সে। আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ‘কি’ দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য তার নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে-

কাছে যেতেই দুর্গন্ধি পেলাম একটা। হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে বোরখা খুলতেই (আপন্তি করেছিল সে চের) ব্যাপারটা বোঝা গেল। ক্যাংক্রাম অরিস! মুখের আধখানা পচে গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধি কাছে দাঁড়ানো যায় না। দূর থেকে পিঠে করে বয়ে এনে এ রোগীর চিকিৎসা চলে না। আমার ইনডোরেও জায়গা নেই তখন। অগত্যা হাসপাতালের বারান্দাতেই থাকতে বললাম। বারান্দাতেও কিন্তু রাখা গেল না শেষ পর্যন্ত। ভীষণ দুর্গন্ধি। অন্যান্য রোগী আপন্তি করতে লাগল। কম্পাউন্ডার, ড্রেসার, এমনকি মেঘের পর্যন্ত কাছে যেতে রাজি হলো না। বৃক্ষ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্রি সেবা করে চলেছে। সকলের আপন্তি দেখে সরাতে হলো বারান্দা থেকে। হাসপাতালের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। তারই তলায় থাকতে বললাম। তাই থাকতে লাগল। হাসপাতাল থেকে রোজ শুধু নিয়ে যেত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ইনজেকশন দিয়ে আসতাম। এভাবেই চলছিল।

একদিন মুশলিমারে বৃষ্টি নামল। আমি ‘কল’ থেকে ফিরছি, হঠাতে চোখে পড়ল বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা! মোটর ঘোরালাম। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুশলিমারা আটকায় না। বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠক ঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বললাম- “হাসপাতালের বারান্দাতেই নিয়ে চল আপাতত।” বৃক্ষ হঠাতে প্রশংস করলে- “এর বাঁচবার কোনও আশা আছে হজুর?”

সত্যি কথা বলতে হলো- ‘না।’

বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম।

পরদিন দেখি গাছতলা খালি। কেউ নেই।

আরও কয়েকদিন পরে- সেদিনও কল থেকে ফিরছি- একটা মাঠের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে দেখতে পেলাম। কী যেন করছে বসে বসে। বাঁ বাঁ করছে দুপুরের রোদ। কী করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমৰ্শ বেগমকে নিয়ে বিত্রত হয়ে পড়েছে না কি? এগিয়ে গেলাম। কতগুলো ভাঙা ইট আর কাদা নিয়ে বুড়ো কী যেন গাঁথছে।

“কী হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব-”

বৃক্ষ সম্মুখে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুকে সেলাম করলে আমাকে।

“বেগমের কবর গাঁথছি হজুর।”



“কবর?”

“হ্যাঁ হজুর।”

চুপ করে রইলাম। ধানিকঙ্গ অস্বত্তির নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম— “তুমি থাক কোথায়?”

“আঘার আশে-পাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরিব-গরবয়।”

“দেখিলি তো কখনও তোমাকে। কী নাম তোমার?”

“ফকির শাজাহান।”

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শব্দার্থ ও টীকা

অলিন্দ

— চাতাল। বারান্দা।

দারা সেকো

— দিল্লির সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আওরঙ্গজেব তাঁকে যুক্তে পরাজিত করে বন্দি ও হত্যা করেন। তিনি উদার-হৃদয় ও বিনয়ী ছিলেন। পারস্য ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ করায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তিনি।

তমিস্ত্রা

— অঙ্ককার। অঙ্ককার রাত।

মিনারেট

— মিনারসদৃশ উচু স্তম্ভ। Minaret।

গম্বুজ

— গোলাকার ছুঁচালো ছাদ।

গড়গড়া

— ছেট এক রকমের আলবোলা। মাটিতে রাখা হয় এমন লম্বা নলযুক্ত ঝুঁকো।

টাঙ্গা

— দুই চাকাওয়ালা এক ধরনের ঘোড়ার গাড়ি।

মেওয়াওয়ালা

— ফলবিক্রিতা।

আলখাল্লা

— পা পর্যন্ত লম্বা এক রকম ঢিলা জামা।

চোস্ত

— নিপুণ। ঝটিলীন।

ক্যাংক্রাম অরিস

— গলিত মুখক্ষত। Cangium oris।

ড্রেসার

— ক্ষতঙ্গান শুশুম্বাকারী। Dresser।

গরিব-গরবয়

— গরিব-গুর্বা। দীন-দরিদ্র।

পাঠ-পরিচিতি

বনফুলের “তাজমহল” গল্পটি তাঁর ‘অদ্যশ্যলোকে’ গল্প-সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পে অবিস্মরণীয় মহিমা পেয়েছে সমাজের নিচুতলার মানুষ ফকির শাজাহানের পত্নীপ্রেম। সে সম্রাট শাহজাহানের মতো তাজমহল নির্মাণ করতে না পারলেও ইট-বালি দিয়ে নিজের মতো করে মৃত বেগমের কবর গড়েছে।

কাহিনি, ঘটনা ও চরিত্র ঝরায়নের দিক থেকে “তাজমহল” গল্পটি বিস্তৃত পরিসরের নয়। খুব সংহত শিল্প বিন্যাসই এ গল্পের বৈশিষ্ট্য। বনফুল তাঁর অন্যান্য গল্পের মতো এ গল্পেও অত্যন্ত সচেতনভাবে মিতবাক। এ গল্পের শেষ দুটি বাক্য না পড়লে গল্পের অঙ্গরূপ তাৎপর্য ধরা পড়ে না। অঙ্গুত চমকের ভেতর দিয়ে সেখানে প্রকাশিত হয় এক গভীর জীবনসত্ত্ব। এখানে মানবিক অনুভূতির বাস্তব চিরের প্রকাশ ঘটেছে, যেখানে লেখক যুগ্ম্য ধরে গড়ে উঠা মানবিক সম্পর্ককে মহিমাপ্রিত করেছেন। এ গল্পে লেখক নিরপেক্ষ দর্শকের মতো ঘটনা সাজিয়েছেন নিরাসক বর্ণনায়। গল্পটি উভয়ে বর্ণিত হওয়ায় কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র কোনো কিছু সম্পর্কেই লেখক কেননো মন্তব্য ও বিশ্লেষণ যোগ করেননি। নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বর্ণনা ও সংজ্ঞাপের বাইরে নেই কোনো বাছল্য। সবচেয়ে বড় কথা, এ গল্পে যে জীবনসত্ত্ব ফুটে উঠেছে তা গল্পকার পাঠককে সরাসরি বলেননি। গল্প তাঁর নিজস্ব প্রতিনিয়ায়ই পাঠককে দিয়ে তা উপলব্ধি করিয়ে নেয়।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তাজমহল কোথায় অবস্থিত?

ক. দিল্লি খ. আঘা

গ. মদ্রাজ ঘ. মুঘাই

২. তাজমহল সমৰ্পণে লেখকের মোহ নেই কেন?

ক. সৌন্দর্যের প্রতি নির্ণোহ খ. মোঘলদের প্রতি বিরূপতা

গ. একাধিকবার দর্শন ঘ. তাজমহলের শুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা

নিচের কবিতাখণ্টি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ

তাই নিয়ে প্রতু পুঁজের প্রাণ কর মোরে প্রতিদান।

৩. কবিতাংশে “তাজমহল” গল্পের যে বিশেষ দিকটি প্রতিভাবত হয়েছে তা হলো—

i. প্রিয়জনের প্রতি গভীর ভালোবাসা

ii. পরাহিতব্রতে আত্মলিনতা

iii. আর্ত-পীড়িতের সুস্থতা কামনা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. বিবৃতির বৈশিষ্ট্য “তাজমহল” গল্পে কার মধ্যে বিদ্যমান?

ক. লেখকের খ. বৃক্ষের

গ. ড্রেসরের ঘ. মেথরের

সূজনশীল প্রশ্ন

i. মেডিকেল কলেজের ছাত্র থাকাকালীন আবির হাসান যখন কর্মবাজারে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন তার উৎসাহ-উদ্বৃত্তির শেষ ছিল না। তাদের গাড়ি চট্টগ্রাম অভিযুক্তে যাওয়ার সময় আবির গাড়ির জানলায় মুখ বাড়িয়েছিলেন কখন পাহাড় আর সমুদ্রের অপরাপ সৌন্দর্য তার চোখ জুড়াবে। আজ কর্মসূত্রে কর্মবাজারে আছেন ডা. আবির। অথচ সমুদ্রের তীরে যাওয়া হয়ে ওঠে না তার, উচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দেখা হয় না সুর্যাস্ত।

ii. অফিসরূপে বসেই অলস সময় কাটাচ্ছিলেন ডা. আবির। একজন বৃক্ষ এলেন তাঁর সাথে দেখা করতে। আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারলেন যে, তিনি অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর নামে গড়েছেন হাসপাতাল ও এতিমধ্যান। চালু করেছেন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার এমন দৃষ্টান্ত আবির হাসানকে মুঝে করে।

ক. স্মাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুঁজের নাম কী?

খ. “মুঝ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম”— কেন?

গ. প্রথম অনুচ্ছেদে “তাজমহল” গল্পের যে দিকটির ইঙ্গিত করা হয়েছে— তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বৃক্ষ, মোগল স্মাট শাহজাহান ও “তাজমহল” গল্পের মুসলমান বৃক্ষ যেন একসূত্রে গাঁথা— বিশ্লেষণ কর।



ভুলের মূল্য

কাজী মোতাহার হোসেন

লেখক-পরিচিতি

কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০এ জুলাই কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি উপজেলার লক্ষ্মীপুরে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বৃহত্তর ফরিদপুরের রাজবাড়ি জেলার পাঞ্চা উপজেলার বাগমারা প্রামে। তাঁর পিতার নাম কাজী গওহর উকীন আহমদ, যায়ের নাম তসিরুল্লেসা। পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র মোতাহার হোসেন কর্মজীবনে অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭৫ সালে ‘জাতীয় অধ্যাপক’ পদে ভূষিত হওয়া প্রথম তিনজনের অন্যতম ছিলেন তিনি। বিশ্ব ও বিশেষ দশকে ঢাকায় ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’ নামে পরিচিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক এবং ওই আন্দোলনের মুখ্যপত্র বিখ্যাত ‘শিখ’ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। মননশীল লেখক কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। তিনি বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি নিয়ে অনেক তথ্যসমূহ মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছ হচ্ছে— প্রবন্ধ সংকলন : ‘সপ্তর্ণ’ ও ‘নির্বাচিত প্রবন্ধ’; সমালোচনাপ্রচ্ছ : ‘নজরুল কাব্য পরিচিতি’; পাঠ্য বিজ্ঞানপ্রচ্ছ : ‘গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস’, ‘আলোক বিজ্ঞান’ ইত্যাদি। যুক্তিশীলতা ও স্বচ্ছতা কাজী মোতাহার হোসেনের গদ্যরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কাজী মোতাহার হোসেন ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

চিন্তা-ভাবনা এবং কার্যকলাপে ভুল করা মানুষের পক্ষে শুধু যে স্বাভাবিক তাই নয়, অপরিহার্যও বটে। স্বাভাবিক এইজন্য যে মানুষ বড় দুর্বল, সর্বদা নানা ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সংগ্রামে জয়ী হতে পারে না। অপরিহার্য এইজন্য যে তার জ্ঞান অতি সংকীর্ণ, —কোনটি ভুল, কোনটি নির্ভুল তা নির্ধারণ করাই অনেক সময় কঠিন, এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখানে কেবল যে দুর্বলচেতা ও স্বল্পজ্ঞান মানুষের কথা বলছি তা নয়। এ মন্তব্য সবল-দুর্বল এবং অজ্ঞ-বিজ্ঞ-নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই খাটে।

প্রতারক, দস্যু, মাতাল, ঘোড়দৌড়ের খেলোয়াড় প্রত্যেকেই জানে যে তার কাজ ঠিক হচ্ছে না—সে ভুল পথে চলেছে। কিন্তু সে পথ হতে ফিরবার ক্ষমতা তার কোথায়? তার বিবেক হয়ত দংশন করছে, কিন্তু প্রবৃত্তি বশ মানছে না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিবেক-বুদ্ধিই শিথিল অথবা শক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে। অন্য কথায়, সে নিজের কাজের সমর্থক যুক্তি বের করে বিবেকের উত্তীর্ণকে প্রশংসিত করে নিচ্ছে। প্রবৃত্তির হাতে বিবেকের এই নিষ্ঠাহই মানুষের দুর্বলতার প্রধান পরিচয়। তাছাড়া মানুষ এমন সব ঘটনার ঘূর্ণিপাকে পড়ে যায় যে, তাকে বাধ্য হয়ে খেলার পুতুলের মতো নিরূপায়ভাবে একটার পর আর একটা ভুল করে যেতে হয়, একটা ভুল ঢাকতে শিয়ে আরও দশটার আশ্রয় নিতে হয়।

মানুষ বড় জটিল জীব। তাকে দশ দিক বজায় রেখে কাজ করতে হয়। আবার পৃথিবীও এমন কঠিন ঠাই যে, অনেক সময় এক কূল বজায় রাখতে গেলে আর-এক কূলে ভাঙ্গে লাগে। জীবনে এইগুলোই সবচেয়ে বড় সমস্যা, এইখানেই ভুল হয় বেশি। আবার এখানেই মানুষের বিশেষত্বও ফুটে ওঠে অপূর্বভাবে। এইরূপ নানা বিচিত্র ঘটনাবর্তের ভেতর দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা দিতে দিতে যেতে হয় বলেই তার শ্রেষ্ঠত্ব, আর এই আত্ম-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে ভুলবার মধ্যেই তার সৌন্দর্যের বিকাশ এবং যোগ্যতার পরিচয়।

পুরৈই বলেছি, মানুষের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ। ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন জ্ঞানভাষ্পের খুলে যাচ্ছে, আর পুরনো জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন, রাজনীতি, ধর্মীতি, ব্যবহারিক জ্ঞান, কলা-বিদ্যা প্রভৃতি সমুদয় ক্ষেত্রেই এর এত অধিক দৃষ্টান্ত বর্তমান যে, তার উদাহরণ দেওয়া বাহ্যিক মাত্র। এর থেকে বোঝা যায়, আজ যেটি সত্য এবং নির্ভুল মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে সেটি হয়ত মিথ্যা অথবা আঘাতিক সত্য বলে প্রামাণিত হতে পারে। এজন্য আমরা আজকাল যে আদর্শ ধরে চলছি, তা নিয়ে অতিরিক্ত উল্লাসের সাথে আক্ষলন করতে পারিনে—যেহেতু, আমাদের আজকার উক্ত অহংকার কালকার দীন লজ্জায় পরিণত হতে পারে।

মানুষের প্রকৃত যে জ্ঞান, তা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তি দিয়েই আসে। শিশুকে আগন্তনের শিখা, ছুরির ধার, মরিচের ঝাল, এসব থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। যদি তা পারা যেত, তবে বোধ হয়, সে চিরকাল



শিশুই থাকত। শিশুর পক্ষে যা, পরিপত মানুষের পক্ষেও কঠকটা তাই সত্য। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যেখানে অভাব, সেখানে সমস্ত জ্ঞানই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যে কোনো দিন পথ ভোলার কষ্ট ভোগ করে নাই, সে কখনো ঠিক পথে চলার আনন্দ উপভোগ করতে পারে না; যে কোনো দিন পানিতে পড়ে হাবুড়ুরু না খেয়েছে, সে কখনো নিরাপদে নৌকায় চড়ার সুখ ভালো করে বুঝতে পারে না।

মানুষ ভূল করে, পরে সেই ভূল সংশোধন করেই সত্যের সঞ্চান পায়। সাধারণের ধারণা, ‘ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শেখাই’ বুঝিমানের কাজ। কিন্তু ‘অতি বৃদ্ধির গলায় দড়ি’ বলেও একটা কথা আছে। নিরবেগ আপদহীনতার ভেতরেই অনেক সময়ে বিপদের বীজ প্রচল্ল থাকে। আসল কথা, জীবনের অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতিলক্ষ যে জ্ঞান ও শিক্ষা, বাস্তবিকই তার তুলনা নাই। স্বল্প পরিসর টবের ভেতরে জীবন ধারণ করার চেয়ে, বাইরের বিস্তৃতির ভেতরে আনন্দে বিকশিত হওয়া অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। তবে অন্যের দুর্দশা দেখেও অবশ্য শিক্ষা লাভ করতে হবে। কারণ একজনের পক্ষে সকল রকম অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। আমাদের এই বর্তমান—কোটি কোটি অভিজ্ঞতারই ফল, সুতরাং জীবন-যাত্রায় অন্যের অভিজ্ঞতারও যে প্রয়োজন আছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। অন্যের নিকট থেকে পাওয়া অসম্পূর্ণ বা অপরাক্ষিত জ্ঞানকে নিজের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচাই করে নিজস্ব করে নিতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিপূর্ণ জীবনের এই-ই ধারা।

মানুষ এইরকম ভূলের ওপর চরণ ফেলে ফেলে সত্যকে খুঁজে পাচ্ছে এবং এভাবেই ক্রমশ অগ্রসর হয়ে চলেছে। ভূল না করলে যেন সত্যের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না,— এ যেন আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা। যেমন একটা মূলকে নানাভাবে চারদিক থেকে দেখলে তার নতুন নতুন সৌন্দর্য চোখে পড়ে, এক্ষেপ সত্যকেও নানা ঘটনার ভেতরে দিয়ে নানাভাবে পরাখ করে দেখতে হয়; তবেই তার সমগ্র রূপ ধরা পড়ে। কোনো বৃহৎ সত্যই এ পর্যন্ত সমগ্রভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়েছে কিনা সন্দেহ। তবে যে-সত্যের যত বেশি ব্যক্তিক্রম আমাদের চোখে পড়েছে, তা আমরা ততই ভালো করে বুঝতে পেরেছি।

দুঃখ যত প্রবলভাবে মানুষের মনে আঘাত করে, সুখ ততটা করে না। সুখকে কোনো কোনো লোকে যত নিস্পত্তিবে গ্রহণ করতে পারে, চেষ্টা করলেও দুঃখকে তত সহজে মনের গোপনে শুকিয়ে রাখতে পারে না। এজন্য জীবনে দুঃখের মূল্য বড় বেশি। আগে দুঃখ পেতে হবে, তবেই সমস্ত অনুভূতি সজাগ ও তীক্ষ্ণ হবে। ভূল করে যে দুঃখ পায়, তাহার ভূল করা সার্থক। আর ভূল করলেও যে নির্বিকার,— আজ্ঞা-বিচার যার নাই— তার কাছে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, অর্ধশূন্য শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যক্তিগত জীবনে ভূলের সবচেয়ে বড় সার্থকতা এখানে যে, ভূল মানুষকে দুঃখ ও অনুশোচনার আগনে পুড়িয়ে তাকে বিশুল্ক করে তোলে এবং মনুষ্যত্ব-সাধনের দিকে অনেক দূর অগ্রসর করে দেয়।

ভূল সবক্ষে আর-একটা বড় কথা, এই যে ভূল না করলে বুঝি-বা লোকে প্রেমময় হতে পারে না। তার কারণ, প্রেমের মূল উৎস হচ্ছে সহানুভূতি। নিজের ভূল করে যার অহংকার চূর্চ হয়নি, সে মুখে যতই বলক না কেন তার ব্যবহারের মধ্যে প্রায়ই প্রচলিতভাবে একটা আক্ষুণ্ণন প্রতি অভিজ্ঞতা এবং অন্যের প্রতি অতি কঠোর বিচারের প্রয়োগ করেন এবং এ কারণেই তাঁরা সামাজিক হতে পারেন না। কিন্তু যখন বিচারের সেই নিষ্ঠুর মাপকাঠি দিয়ে নিজের (বা প্রিয়াস্পন্দনের) জীবন যাচাই করে দেখবার সময় আসে, তখনই প্রথম চোখে পড়ে, ভূল করা কর স্বাভাবিক, কত অবশ্যিকী। তখন তার দৃষ্টি বদলে যায়, করণায় প্রাণ-মন ভরে উঠে; তখন তার কল্পনার মোহ ভেঙে যায়। তখনই সে প্রথম বুঝতে পারে, সে রক্ষণাত্মক মানুষ। আক্ষুণ্ণন ভূল মানুষকে ঘৃণা থেকে নিবৃত্ত করে, প্রেমময় হতে শেখায়, সকল মানুষের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা বোধ জনায়। একথা শুনতে অস্তুত লাগে বটে, কিন্তু এ সত্য। ভূলের মতো একটা সাধারণ ব্যাপার, যা অহরহ ঘটছে, তাই আবার মানুষের এতখানি কাজে লাগে, এটি বিশ্বের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সত্যোদ্যান্তের প্রচেষ্টার চেয়েও বেধ হয় ভূলের এই কার্যকরিতা বেশি কল্যাণপ্রসূ হয়েছে।

বাস্তবিক, ভূল আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর। ভূল না থাকলে পৃথিবীর দয়া, মায়া, ক্ষমা, ভালোবাসা প্রভৃতি কোমল শুণগুলির এত অবকাশ ও বিকাশ হতো কিনা সন্দেহ। তাছাড়া ভূল না থাকলে এত দিন মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং অগ্রগতি কবে রুক্ষ হয়ে সমস্ত অসাড় নিষ্পন্দ হয়ে যেত। এখানেই ভূলের মূল্য।



শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|--------------------------|---|
| পারিপার্শ্বিক | - চতুর্দিকঙ্ক। পার্শ্ববর্তী। |
| দুর্বলচেতা | - দুর্বল চিত্ত এমন। |
| অজ্ঞ-বিজ্ঞ-নির্বিশেষ | - মূর্খ-জ্ঞানী সকলেই। |
| বিবেক | - মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি; যার দ্বারা ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, ধর্মাধর্ম বিচার করা যায়। ন্যায়-অন্যায় বোধ। |
| প্রবৃত্তি | - স্পৃহা। আকাঙ্ক্ষা। ইচ্ছা। |
| উগ্রতাকে প্রশংসিত | - রুচিতা বা তীব্রতাকে শাস্ত বা নিবারণ করা। |
| ঘূর্ণিপাক | - বায়ু বা পানির প্রচৰ আবর্ত। |
| ঘটনাবর্ত | - ঘটনার আবর্ত। ঘটনাবলি। |
| ‘অতি বৃদ্ধির গলায় দড়ি’ | - একটি প্রবাদ বাক্য। অতি চালাকের মন্দ পরিণতি বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। |
| পরিপুষ্ট | - অতিশয় পুষ্ট। সুপুষ্ট। |
| নিষ্পত্তিভাবে | - স্পৃহাহীনভাবে। কামনা-বাসনাহীনভাবে। |
| আত্মস্তুতি | - অহংকার। দম্পত্তি। |
| গোঢ়া | - ধর্মমতে অন্নবিশ্বাসী ও একগুঁয়ে। অন্নতত্ত্ব। |
| নীতিবাচীশ | - নীতি-নিষ্ঠা সম্পর্কে দাস্তিক। |
| প্রিয়স্পদ | - প্রিয়ভাজন। প্রিয়পাত্র। |
| আত্মকৃত | - নিজে সম্পাদিত। নিজের করা যা। |
| নিষ্পত্তি | - বিরত। ক্ষান্ত। |
| সত্যোদ্ঘাটন | - সত্য + উদ্ঘাটন = সত্যোদ্ঘাটন। প্রকৃত সত্য ঝুঁজে বের করা। |
| কল্যাণপ্রসূ | - কল্যাণ বা শুভকর এমন। |

পাঠ-পরিচিতি

কাজী মোতাহার হোসেন রচিত “ভুলের মূল্য” প্রবন্ধটি তাঁর রচনাবলির ১ম খণ্ড (১৯৮৪) থেকে সংকলিত। এই প্রবন্ধে লেখক মানবজীবনে ভুলের গুরুত্ব বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। মানবজাতির চিরস্তন আকাঙ্ক্ষা সাফল্য লাভ। সেই পথ-পরিক্রমায় কর্ম ও চিন্তায় অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলেই কঘবেশি ভুল করে থাকে। অনেক সময় প্রবৃত্তির তাড়নায়ও মানুষ ভুল পথে হাঁটে। লেখকের মতে, ভুল মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পৃথিবীর বিচির ঘটনাবর্ত অতিক্রমণে যোগ্যতা ও প্রেষ্ঠাত্তের পরিচয় দেওয়াই মানুষের বিশেষত্ব। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সংশোধিত হওয়াই বৃদ্ধিমানের কাজ। ভুলের মধ্য দিয়েই মানুষ সত্যে পৌছে। আত্মকৃত ভুলের শিক্ষা মানুষকে দুঃখ ও অনুশোচনার আগুনে পুড়িয়ে খাটি করে। মানুষকে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও প্রেমময় করে তোলে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ভুলের কার্যকারিতা সত্যোদ্ঘাটনের শক্তির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে লেখকের কাছে মনে হয়েছে, ভুলই পৃথিবীর অগ্রযাত্রার অন্যতম চালিকা শক্তি। এ রচনায় লেখক জীবনের এক ধরনের দর্শনকেই যেন ব্যক্ত করেছেন।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের প্রকৃত জ্ঞান আসে কিসের মাধ্যমে?

ক. পড়াশোনার

খ. শিক্ষাগুরুর

গ. অভিজ্ঞতার

ঘ. ভ্রমণের

২. ভুল না করলে যেন সত্ত্যের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না। কারণ-

ক. মানুষের স্বভাব ভুল করা

খ. সত্ত্যের পূর্বশর্ত হলো ভুল করা

গ. ভুল মানুষকে পরিশুল্ক দান করে

ঘ. ভুলের মাধ্যমে মানুষ সত্ত্যের সন্ধান পায়

নিচের কথিতাঙ্কটি পড়ে ও ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাপে পুণ্যে সুখে দুখে পতনে উঠানে

মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

৩. পঞ্জিকান্দের বক্তব্য “ভুলের মূল্য” প্রবক্ষের যে যে বাক্যকে সমর্থন করে তা হলো-

i. ভুল না করলে সত্ত্যের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না

খ. ii ও iii

ii. অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান আসে

ঘ. i, ii ও iii

iii. ভুল আছে বলে পৃথিবীটা এত সুন্দর

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

গ. i ও iii

৪. উক্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে শিক্ষণীয় বিষয় কোনটি?

ক. জীবনে পদে পদে ভুল করা

খ. ভুল থেকে সংশোধিত হওয়া

গ. মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া

ঘ. ঠেকে না শিখে দেখে শেখা

সূজনশীল প্রশ্ন

i. নাসির সাহেবের স্ত্রী সবকিছুতে শুরুতেই নেতৃত্বাচক ধারণা পোষণ করেন। হেলে-মেয়েদের কোনো ভুল তিনি সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না। ফলে, তিনি যেমন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, তেমনি সন্তানেরাও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দ্বিধা-ঘন্টে ভোগে।

ii. অফিস থেকে ফিরে নাসির সাহেব দেখলেন, তার স্ত্রী সন্তানদের বকাবকি করছেন— নিশ্চয়ই তারা কোনো ভুল করেছে। তিনি স্ত্রীকে বললেন— ভুল করা খুব স্বাভাবিক বিষয়, একটি ভুল মানুষকে শত ভুল না করার শিক্ষা দেয়। ভুল করা ছাড়া মানুষ পরিশুল্ক লাভ করতে পারেন না, আর ভুল আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর।

ক. ভালোবাসা বা প্রেমের মূল উৎস কী?

খ. জ্ঞেবক ভুলকে একই সাথে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য বলেছেন কেন?

গ. অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে “ভুলের মূল্য” প্রবক্ষের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নাসির সাহেবের স্ত্রীর মানসিকতা পরিবর্তনে “ভুলের মূল্য” প্রবক্ষের বক্তব্য কতটুকু কার্যকর বলে তুমি মনে কর। মতের পক্ষে যুক্তি দাও।



জীবন ও বৃক্ষ মোতাহের হোসেন চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুরে। তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’ নামে পরিচিত বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির এক মুগান্তকারী আন্দোলনের অন্যতম কাঞ্চারি হিসেবে। সাহিত্যের অঙ্গে ও বাস্তব জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সৌন্দর্যবোধ, মুক্তবুদ্ধি-চেতনা ও মানবপ্রেমের আদর্শের অনুসারী। তিনি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখের সহযোগী। মননশীল, চিন্তা-উদ্বীপক ও পরিশীলিত গবেষণার রচয়িতা হিসেবে বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন। তাঁর গ্রন্থ ‘সংস্কৃতি কথা’ বাংলাদেশের প্রবন্ধ-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন। তাঁর প্রকাশিত অন্য দুটি গ্রন্থ হচ্ছে ক্লাইভ বেল-এর ‘Civilization’ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত ‘সভ্যতা’ এবং বারট্রাউন রাসেলের ‘Conquest of Happiness’ গ্রন্থের অনুবাদ ‘সুখ’। বাংলা একাডেমি তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্ত রচনা রচনাবলি-আকারে প্রকাশ করেছে।

চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সমাজের কাজ কেবল ঠিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আছাই জাগিয়ে দেওয়া। বংশপ্রাণ স্তুলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সৎসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অস্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠার ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তাঁরই চরণে তাঁরা নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার- এ সবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তাঁরা বলে। কিন্তু তাঁতে নেশা ধরে না, মনে হয় আভরিকতাশূন্য, উপলব্ধিহীন বুলি।

এদের স্থানে এনে দিতে হবে বড় মানুষ- সূক্ষ্মবুদ্ধি উদারহৃদয় গভীরচিত্ত ব্যক্তি, যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ, কেবল ঠিকে থাকা নয়। তাদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন ছাঁচ বা কল নয়, সজীব বৃক্ষ- যার বৃক্ষ আছে, গতি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ। বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার, নইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তাঁর জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টিক্ষণ আর নেই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মনে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধ হয়, ফুলের ফোটায় নয়। ফুলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়- তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে তাকালে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন। তপোবনপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলেন না বোঝা মুশকিল।

জানি, বলা হবে : নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানোয় তা তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন।



উত্তরে বলব : চর্মচক্রকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্রকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়। আর বৃক্ষের সাধনায় যেমন একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের সাধনায়ও তেমনি একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর এটাই হওয়া উচিত নয় কি? অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিযুক্ত, নদীতে নয়। তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

সাধনার ব্যাপারে প্রাণি একটা বড় জিনিস। নদীর সাগরে পতিত হওয়ায় সেই প্রাণি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সে তো প্রাণি নয়, আত্মবিসর্জন। অপরপক্ষে বৃক্ষের প্রাণি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছা হয় : এই তো সাধনার সার্থকতা। বৃক্ষে প্রাণি ও দান। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাণি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। যা তার প্রাণি তা-ই তার দান।

বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন। বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গদে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেননি। বললে ভালো হতো। তাহলে নিজের ঘরের কাছেই যে সার্থকতার প্রতীক রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম।

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃক্ষি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরঙ্গতা ও জীবজ্ঞনের বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আআ সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপন্থতা, তাই তো আজ্ঞা। এই আত্মারূপ ফল স্তুষ্টার উপভোগ্য। তাই মহাকবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় : ‘Ripeness is all’— পরিপন্থতাই সব। আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে। নইলে তা স্তুষ্টার উপভোগের উপযুক্ত হবে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতির দ্বারা আত্মার পরিপূষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। তাই তাদের সাধনাই মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। কেননা, তাতে আত্মার উন্নতি হয় না— জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয় না; তা হয় সাহিত্য-শিল্পকলার দ্বারা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এত মূল্য।

ওপরে যে বৃদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নির্দশন। বৃক্ষের অঙ্গুরিত হওয়া থেকে ফলবাল হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস। বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি— জীবনের গৃহ্ণ অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে।

বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়— প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুত্বার বহন করে।

শব্দার্থ ও টীকা

সূলবৃদ্ধি

— সূক্ষ্ম বিচারবৃদ্ধিইন। অগভীর জ্ঞানসম্পন্ন।

জবরদস্তিপ্রিয়

— গায়ের জোরে কাজ হাসিলে তৎপর। বিচার-বিবেচনাইন।

বিকৃতবৃদ্ধি

— বৃদ্ধির বিকার ঘটেছে এমন। যথাযথ চিন্তাচেতনাইন।

এদের প্রধান দেবতা অহংকার

— যথাযথ বিচার-বিবেচনা ও চিন্তাচেতনাইন লোকেরা এত গর্বোদ্ধৃত হয়ে থাকে যে মনে হয় যেন অহংকারই তাদের প্রধান উপাস্য বা দেবতা।



| | |
|---------------------------------|--|
| বুলি | <ul style="list-style-type: none"> — এখানে গং-বাঁধা কথা হিসেবে ব্যবহৃত। যথাযথ অর্থ বহন করে না এমন কথা যা অভ্যাসের বশে বলা হয়ে থাকে। |
| মনুষ্যত্ব | <ul style="list-style-type: none"> — মানবোচিত সদগুণাবলি। মানুষের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। |
| তরোপন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ | <ul style="list-style-type: none"> — প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের মতো রবীন্দ্রনাথও ছিলেন অরণ্য ও বৃক্ষপ্রেমিক। তাঁর অনেক কবিতায় বৃক্ষের বন্দনা স্পষ্ট। |
| তপোবন | <ul style="list-style-type: none"> — অরণ্যে ধৰ্মির আশ্রম। মুনি ধৰ্মিরা তপস্যা করেন এমন বন। |
| অনুভূতির চক্র | <ul style="list-style-type: none"> — মনের চোখ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূতির বা উপলক্ষ্মির ক্ষমতা, সংবেদনশীলতা। |
| নতি | <ul style="list-style-type: none"> — অবনত ভাব। বিনয়, ন্যাতা। |
| বৃক্ষের প্রাণি ও দান | <ul style="list-style-type: none"> — বৃক্ষের অর্জন হচ্ছে তার ফুল ও ফল। এগুলো সে অন্যের হাতে তুলে দেয়। ফলে বৃক্ষ যুগপৎ প্রাণি ও দানের আদর্শ। |
| সৃষ্টিধর্ম | <ul style="list-style-type: none"> — সৃষ্টি বা সৃজনের বৈশিষ্ট্য। |
| আত্মিক | <ul style="list-style-type: none"> — মনোজাগতিক। চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্র। |
| পরিপূর্ণতা | <ul style="list-style-type: none"> — সুপরিগতিজ্ঞাত। পরিপূর্ণ বিকাশসাধন। |
| বন্তজগতের রহস্য উন্মোচন-অম্বেষা | <ul style="list-style-type: none"> — বন্তজগতের রহস্য উন্মোচন-অম্বেষা। বন্তজগৎ সম্পর্কে জানার আবশ্যিক। |
| গৃঢ় অর্থ | <ul style="list-style-type: none"> — প্রচল্ল গভীর তাৎপর্য। |

পাঠ-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর “জীবন ও বৃক্ষ” প্রবন্ধটি তাঁর ‘সংস্কৃতি কথা’ এছ থেকে সংকলিত হয়েছে।

পরার্থে আত্মনিবেদিত সুকৃতিময় সার্থক বিবেকবোধসম্পন্ন মানবজীবনের মহত্তম প্রত্যাশা থেকে সেখক মানুষের জীবনকাঠামোকে তুলনা করেছেন বৃক্ষের সঙ্গে। তিনি দেখিয়েছেন, বৃক্ষের বিকাশ, পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার পেছনে রয়েছে তার নীরব সাধনা। বৃক্ষ যেমন করে ফুলে ফলে পরিপূর্ণতা পায়, আর সে সব অন্যকে দান করে সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে হয়ে উঠে, মানব-জীবনের সার্থকতার জন্য তার নিজের সাধনাও তেমনি হওয়া উচিত। তাহলেই স্বার্থপর, অহংকারী, বিবেকহীন, নিষ্ঠুর জীবরদস্তিপ্রবণ মানুষের জায়গায় দেখা দেবে প্রেমে, সৌন্দর্যে, সেবায় বিকশিত বিবেকবান পরিপূর্ণ ও সার্থক মানুষ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কাকে মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন?

ক. মদীকে

খ. বৃক্ষকে

গ. ধর্মকে

ঘ. আত্মাকে

২. ‘প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম’-উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. পরোপকারিতা

খ. সহনশীলতা

গ. উদারতা

ঘ. সংবেদনশীলতা



উদ্দীপকটি পড়ে ও ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

তমাল মেধাবী। দেশের স্বনামধন্য মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে ফিরে যান নিজ গ্রামে। প্রতিষ্ঠা করেন দাতব্য চিকিৎসালয়। শহরে প্রাকটিস করে অনেক টাকা রোজগারের পরিবর্তে নিজ গ্রামের সাধারণ মানুষের সেবাকে তিনি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন।

৩. উদ্দীপকের তমালের সাথে “জীবন ও বৃক্ষ” প্রবন্ধের কার সাদৃশ্য আছে?

- | | |
|------------|-----------|
| ক. বৃক্ষের | খ. জীবনের |
| গ. লেখকের | ঘ. নদীর |

৪. উদ্দীপকের ভাবার্থ নিচের কোন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে?

- | |
|--|
| ক. বৃক্ষ কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। |
| খ. বৃক্ষ যে কেবল বৃক্ষির ইশারা তা নয়, প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। |
| গ. যা তার প্রাণি তাই তার দান। |
| ঘ. নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। |

সূজনশীল প্রশ্ন

এই যে বিটপি শ্রেণি হেরি সারি সারি—

কি আচর্য শোভাময় যাই বলিহারি।

কেহবা সরল সাধু দ্বন্দয় যেমন,

ফলভারে নত কেহ গুণীর মতন।

এদের স্বভাব ভালো মানবের চেয়ে,

ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্ঞানচক্ষে চেয়ে।

যখন মানবকুল ধনবান হয়,

তখন তাদের শির সমুদ্ভূত রয়।

কিন্তু ফলশালী হলে এই তরঙ্গগ,

অহংকারে উচ্চ শির না করে কখন।

ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুদ্ভূত,

নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত।

ক. মোতাহের হোসের চৌধুরী কোন আন্দোলনের কাণ্ডারি ছিলেন?

খ. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন কেন?

গ. ‘বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলক্ষি সহজ হয়’— প্রবন্ধের এ উক্তিটি উদ্দীপকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্দীপকের ‘বৃক্ষ’ এবং “জীবন ও বৃক্ষ” প্রবন্ধের ‘বৃক্ষ’ কি একসূত্রে গাঁথা?’— তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।



মানব-কল্যাণ আবুল ফজল

লেখক-পরিচিতি

আবুল ফজলের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জুলাই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। তাঁর পিতার নাম ফজলুর রহমান। তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকায় তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। স্কুল শিক্ষক হিসেবে কর্জীবন শুরু করে থায় ত্রিশ বছর কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সমাজ ও সমকাল-সচেতন সাহিত্যিক এবং প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি সমধিক খ্যাত। ছাত্রজীবনেই যুক্ত হন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে; অন্যদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম সাহিত্য সমাজ। কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করলেও তিনি ছিলেন মূলত চিঞ্চোশীল প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় বিধৃত। আধুনিক অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, স্বদেশ ও ঐতিহ্যবৈত্তি, মানবতা ও শুভবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— উপন্যাস : ‘চৌচির’, ‘রাঙা প্রভাত’; গল্পগ্রন্থ : ‘মাটির পৃথিবী’, ‘যুতের আত্মহত্যা’; প্রবন্ধ : ‘সাহিত্য সংস্কৃতি সাধনা’, ‘সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন’, ‘সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র’, ‘মানবতা’, ‘একুশ মানে মাধ্য নত না করা’; দিনলিপি : ‘রেখাচিত্র’, ‘দুর্দিনের দিনলিপি’। সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মে চট্টগ্রামে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

মানব-কল্যাণ— এ শিরোনাম আমার দেওয়া নয়। আমাদের প্রচলিত ধারণা আর চলাতি কথায় মানব-কল্যাণ কথাটা অনেকখানি সন্তো আর মাঝুলি অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকেও আমরা মানব-কল্যাণ মনে করে থাকি। মনুষ্যত্ববোধ আর মানব-মর্যাদাকে এতে যে স্কুল করা হয় তা সাধারণত উপলব্ধি করা হয় না।

ইসলামের নবি বলেছেন, ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ। নিচের হাত মানে যে মানুষ হাত পেতে গ্রহণ করে, ওপরের হাত মানে দাতা— যে হাত তুলে ওপর থেকে অনুগ্রহ বর্ষণ করে। দান বা ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা তার সর্ব অবয়বে কীভাবে প্রতিফলিত হয় তার বীভৎস দৃশ্য কার না নজরে পড়েছে?

মনুষ্যত্ব আর মানব-মর্যাদার দিক থেকে অনুগ্রহকারী আর অনুগ্রহীতের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। এ কথা ব্যক্তির বেলায় যেমন সত্য, তেমনি দেশ আর রাষ্ট্রের বেলায় বরং অধিকতর সত্য। কারণ, রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু প্রশাসন চালানোই নয়, জাতিকে আত্মর্মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলাও রাষ্ট্রের এক বৃহত্তর দায়িত্ব। যে রাষ্ট্র হাতপাতা আর চাটুকারিতাকে দেয় প্রশংস, সে রাষ্ট্র কিছুতেই আত্মর্মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারে না।

তাই মানব-কল্যাণ অর্থে আমি দয়া বা করণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাতকে মনে করি না। মনুষ্যত্বের অবয়নলা যে ক্রিয়াকর্মের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি তাকে কিছুতেই মানব-কল্যাণ নামে অভিহিত করা যায় না। মানব-কল্যাণের উৎস মানুষের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি আর মানবিক চেতনা বিকাশের মধ্যেই নিহিত। একদিন এক ব্যক্তি ইসলামের নবির কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল। নবি তাকে একখালি কুড়াল কিনে দিয়ে বলেছিলেন, এটি দিয়ে তুমি বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা রোজগার করো গে। এভাবে তিনি লোকটিতে শুধু স্বাবলম্বনের পথ দেখাননি, সে সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মর্যাদাবান হওয়ার, মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের উপায়ও।



মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং মানবিক-বৃত্তির বিকাশের পথেই বেড়ে উঠতে হবে আর তার যথাযথ ক্ষেত্র রচনাই মানব-কল্যাণের প্রাথমিক সোপান। সে সোপান রচনাই সমাজ আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সমাজের ক্ষুদ্রতম অঙ বা ইউনিট পরিবার- সে পরিবারকেও পালন করতে হয় এ দায়িত্ব। কারণ, মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা সেখান থেকেই। ধীরে ধীরে ব্যাপকতর পরিধিতে যখন মানুষের বিচরণ হয় শুরু, তখন সে পরিধিতে যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে— তা শিক্ষা কিংবা জীবিকা সংক্রান্ত যা হোক না তখন সে দায়িত্ব ঐসব প্রতিষ্ঠানের ওপরও বর্তায়। তবে তা অনেকখানি নির্ভর করে অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্র গড়ে তোলার ওপর।

মানব-কল্যাণ স্বয়ম্ভু, বিচ্ছিন্ন, সম্পর্ক-রহিত হতে পারে না। প্রতিটি মানুষ যেমন সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি তার কল্যাণও সামগ্রিকভাবে সমাজের ভালো-মন্দের সঙ্গে সম্যুক্ত। উপলব্ধি ছাড়া মানব-কল্যাণ স্বেক্ষণ দান-খয়রাত আর কাঙালি ভোজনের মতো মানব-মর্যাদার অবমাননাকর এক পদ্ধতি না হয়ে যায় না, যা আমাদের দেশ আর সমাজে হয়েছে। এসবকে বাহবা দেওয়ার এবং এসব করে বাহবা কুড়োবার লোকেরও অভাব নেই দেশে।

আসল কথা, মানুষের মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে স্বেক্ষণ তার জৈব অস্তিত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল এ ধরনের মানব-কল্যাণ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হতে পারে না। এ হেন মানব-কল্যাণের কৃত্তিত ছবি দেখার অন্য দূরবৃত্তান্তে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের আশে-পাশে, চারদিকে তাকিয়ে দেখলেই তা দেখা যায়।

বর্তমানে মানব-কল্যাণ অর্থে আমরা যা বুঝি তার প্রধানতম অস্তরায় রাষ্ট্র, জাতি, সম্পদায় ও গোষ্ঠীগত চেতনা— যা মানুষকে যেলায় না, করে বিভক্ত। বিভক্তিকরণের মনোভাব নিয়ে কারো কল্যাণ করা যায় না। করা যায় একমাত্র সমতা আর সহযোগ-সহযোগিতার পথে।

সত্যিকার মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল। বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভারা সবাই মানবিক চিন্তা আর আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। দুঃখের বিষয়, সে উত্তরাধিকারকে আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারিনি। বিদ্যাপতি চৌধুরী থেকে লালন প্রযুক্তি কবি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সবাইতো মানবিক চেতনার উদাত্ত কর্তৃত্ব। বক্ষিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক উক্তি : “তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?” এক গভীর মূল্যবোধেরই উৎসারণ।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত উক্তিও শ্মরণীয় : “Relationship is the fundamental truth of the world of appearance.” কবি এ উক্তিটি করেছিলেন তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায়। অস্তর-জগতের বাইরে যে জগৎকে আমরা অহরহ দেখতে পাই তার মৌলিক সত্য পারম্পরিক সংযোগ-সহযোগিতা, কবি যাকে Relationship বলেছেন। সে সংযোগ বা সম্পর্কের অভাব ঘটলে মানব-কল্যাণ কথাটা স্বেক্ষণ ভিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে পরিণত হয়।

মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু নয়— এ এক জাগতিক মানবধর্ম। তাই এর সাথে মানব-মর্যাদার তথা Human dignity-র সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আজ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে কী দেখতে পাই? দেখতে পাই দুষ্ট, অবহেলিত, বাস্তুহারা, স্বদেশ-বিভাগিত মানুষের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। সে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে রিলিফ, রিহেবিলিটেশন ইত্যাদি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ। রেডক্রস ইত্যাদি সেবাধর্মী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধিই কি প্রয়াণ করে না মানব-কল্যাণ কথাটা স্বেক্ষণ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে? মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আর মর্যাদার স্বীকৃতি আর প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানব-কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত না হয়ে পারে না।

কালের বিবর্তনে আমরা এখন আর tribe বা গোষ্ঠীবন্ধ জীব নই— বৃহত্তর মানবতার অংশ। তাই Go of humanity-কে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কিংবা খণ্ডিতভাবে দেখা বা নেওয়া যায় না। তেমনি নেওয়া যায় না তার কল্যাণকর্মকেও খণ্ডিত করে। দেখতে মানুষও অন্য একটা প্রাণী মাত্র, কিন্তু ভেতরে মানুষের মধ্যে রয়েছে এক

অসীম ও অনন্ত সম্ভাবনার বীজ। যে সম্ভাবনার স্ফুরণ-স্ফুটনের সুযোগ দেওয়া, ক্ষেত্র রচনা আর তাতে সাহায্য করাই শ্রেষ্ঠতম মানব-কল্যাণ। সেটা তুচ্ছ-ভাষিল্য কিংবা কোনো রকম অপমান-অবমাননার পথে হতে পারে না। হালে যে দর্শনকে অস্তিত্ববাদ নামে অভিহিত করা হয়, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Existentialism তারও মূল কথা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দান।

বল প্রয়োগ কিংবা সামরিক শাসন দিয়ে মানুষকে তাঁবেদার কিংবা চাটুকার বানাতে পারা যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠা করা যায় না মানব-মর্যাদার আসনে। সব কর্মের সাথে শুধু যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে তা নয়, তার সামাজিক পরিণতি তথা Social consequence-ও অবিচ্ছিন্ন। যেহেতু সব মানুষই সমাজের অঙ্গ, তাই সব রকম কল্যাণ-কর্মেরও রয়েছে সামাজিক পরিণতি। এ সত্যটা অনেক সময় ভুলে থাকা হয়। বিশেষত যখন দৃষ্টি থাকে উর্ধ্ব দিকে তথা পরলোকের পানে।

শ্রেফ সদিচ্ছার দ্বারা মানব-কল্যাণ সাধিত হয় না। সব ধর্ম আর ধর্ম-প্রবর্তকেরা বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের ভালো করো, মানুষের কল্যাণ করো, সুখ-শান্তি দান করো মানুষকে। এমনকি সর্বজীবে হিতের কথাও বলা হয়েছে।

অতএব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। নতুন পদ্ধতিতে— যা হবে বৈজ্ঞানিক, র্যাশনাল ও সুরুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত। সমস্যা যত বড় আর যত ব্যাপকই হোক না তার মোকাবেলা করতে হবে সাহস আর বুদ্ধিমত্তার সাথে। এড়িয়ে গিয়ে কিংবা জোড়াতালি দিয়ে কোনো সমস্যারই সমাধান করা যায় না।

আমাদের বিশ্বাস মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় সুপরিকল্পিত পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব। একমাত্র মুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বন্দ্বের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে করা যায় নিয়োগ। তা করা হলেই মানব-কল্যাণ হয়ে উঠবে মানব-মর্যাদার সহায়ক।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|-------------|---|
| অনুগ্রহীত | — অনুগ্রহ বা আনুকূল্য পেয়েছে এমন। উপকৃত। |
| মনীষা | — বুদ্ধি। মনন। প্রতিভা। মেধা। প্রজ্ঞা। |
| র্যাশনাল | — বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। বিচক্ষণ। যুক্তিসম্মত। Rational। |
| মুক্তবুদ্ধি | — সংকীর্ণতা ও গৌড়ামিমুক্ত উদার মানসিকতা। |

পাঠ-পরিচিতি

আবুল ফজলের “মানব-কল্যাণ” প্রবন্ধটি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। এটি প্রথম ‘মানবতত্ত্ব’ প্রচ্ছে সংকলিত হয়। এই রচনায় লেখক মানব-কল্যাণ ধারণাটির তাংপর্য বিচারে সচেষ্ট হয়েছেন। সাধারণভাবে অনেকে দুষ্ট মানুষকে করুণাবশত দান-খরারাত করাকে মানব কল্যাণ মনে করেন। কিন্তু লেখকের মতে, এমন ধারণা খুবই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। তাঁর মতে, মানব-কল্যাণ হলো মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস। এ কল্যাণের লক্ষ্য সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উন্নৰণ ঘটানো। লেখকের বিশ্বাস, মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় পরিকল্পনামূলক পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা করা সম্ভব।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “মানব-কল্যাণ” প্রবন্ধটি লেখকের কোন প্রক্ষেপ থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. চৌচির

খ. রাঙ্গা প্রভাত

গ. মানবতত্ত্ব

ঘ. মাটির পৃথিবী



২. ‘আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে’— এখানে ‘দৃষ্টিভঙ্গি’ বলতে বোঝানো হয়েছে—

- ক. মানসিকতার সংক্ষার
- খ. সংক্ষার
- গ. দেখার কৌশল
- ঘ. দেখার ইচ্ছা

কবিতাখণ্ডটি পঢ়ে ঢ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

আপনারে লয়ে বিব্রত রাখিতে

আসে নাই কেহ অবনী পরে

সকলের তরে সকলে আমরা

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

৩. উদ্দীপকের ভাবার্থ “মানব-কল্যাণ” প্রবক্ষের যে ভাব নির্দেশ করে তা হলো—

- ক. পারম্পরিক সৌহার্দ্যের মধ্যে মানব-কল্যাণ নিহিত।

খ. মানব-কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ. অন্যকে বিপদযুক্ত করলেই মানব-কল্যাণ হয় না।

ঘ. অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমেই মানব-কল্যাণ সম্ভব।

৪. নির্দেশিত ভাবটি নিচের কোন বাক্যে বিদ্যমান?

- ক. সভ্যকার মানব-কল্যাণ মহৎ চিঞ্চা-ভাবনার ফসল।

খ. মানব-কল্যাণ স্বয়ম্ভু, বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখিত হতে পারে না।

গ. মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু নয়—এ কাজ জাগতিক মানবধর্ম।

ঘ. তুমি অথব তাই বেলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন

আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,

সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই।

আমার একার আলো সে যে অঙ্কার,

যদি না সবারে অংশ দিতে পাই।

সকলের সাথে বঙ্গ, সকলের সাথে,

যাইব কাহারে বল; ফেলিয়া পশ্চাতে।

এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি,

এসো বঙ্গ, এ জীবন সুমধুর করি।

ক. ‘ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ’— কথাটি কে বলেছেন?

খ. ‘রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক’— উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. কবিতাখণ্ডটি “মানব-কল্যাণ” প্রবক্ষের কোন দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিতাখণ্ডটি “মানব-কল্যাণ” প্রবক্ষের আংশিক প্রতিচ্ছবি— তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।



গন্তব্য কাবুল

সৈয়দ মুজতবা আলী

লেখক-পরিচিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর পিতার কর্মসূল আসামের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বৃহত্তর সিলেট জেলায়। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সিকান্দার আলী। মুজতবা আলীর শিক্ষাজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে শাস্তিনিকেতনে। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে স্নাতক ডিপ্লি লাভ করেন। জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিপ্লি অর্জন করেন।

আফগানিস্তানের কাবুলে কৃষিবিজ্ঞান কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন তিনি। এছাড়াও দেশে-বিদেশে বহুস্থানে তিনি কর্মসূত্রে গমন করেছেন। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মানসহ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষ অনুবাদী। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁর ছিল বিশেষ পাণ্ডিত্য। সাহিত্যিক রসবোধ সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনার মুখ্য প্রবণতা। তাঁর রচনায় বিচ্ছিন্ন জীবনপ্রবাহের নানা অনুষঙ্গ কৌতুক ও ব্যঙ্গে রসাবৃত হয়ে উপস্থাপিত হয়। সৈয়দ মুজতবা আলীর উপ্রেখ্যমোগ্য প্রচ্ছের মধ্যে রয়েছে : ‘দেশে বিদেশে’, ‘পঞ্চতন্ত্র’, ‘চাচাকাহিনি’, ‘শবনম’, ‘কত না অক্ষুঙ্গল’ প্রভৃতি।

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

চাঁদনি থেকে নয়সিকে দিয়ে একটা শার্ট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালির জন্য ইয়োরোপিয়ান থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আলাগোনা করত।

হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গি হেঁকে বলল, “এটা ইয়োরোপিয়ানদের জন্য।”

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, “ইয়োরোপিয়ান তো কেউ নেই। চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।” এক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, “বাংলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুষ্ঠার ঘোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরেজি শব্দের প্রাগদেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবি ইংরেজি হয়।” অর্থাৎ পয়লা সিলেবলে অ্যাকসেন্ট দেওয়া খারাপ রাখায় লঙ্ঘ ঠেসে দেওয়ার মতো— সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাংলায় এরই নাম গাঁক গাঁক করে ইংরেজি বলা। ফিরিঙ্গি তালতলার নেটিভ, কাজেই আমার ইংরেজি শব্দে ভারি খুশি হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল।

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ত্রুটৈই চুপসে আসছিল। এতদিন পাসপোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলুম, অন্য কিছু ভাববার ফুরসত পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হলো সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনোচিত— মনে হলো আমি একা।

ফিরিঙ্গিটি লোক ভালো। আমাকে শুন হয়ে শুনে থাকতে দেখে বলল, “এত মনমরা হলে কেন? গোয়িং ফার?” দেখলুম, বিলিতি কায়দা জানে। “হোয়ার আর ইউ গোয়িং?” বলল না।

তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারিতা আরম্ভ হলো। তাতে লাভও হলো। সম্ভ্যা হতে না হতেই সে প্রকাও এক চূবড়ি খুলে বলল, তার ‘ফিয়াসে’ নাকি উৎকৃষ্ট ডিলার তৈরি করে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরাদ্রষ্টর পল্টন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে আমিও কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিভ বস্ত, হয়ত বড় বেশি ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হলো, সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন করে আলাকার্ড ভোজন, যার যা খুশি থাবে।

সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল, আমার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জয়ে যেতে লাগল। সেই শিক্কাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগি মুসল্লাম, আলু-গোস্ত। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে।



এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিছি মিলিয়ে একই মাল বেরোতে লাগল। এমনকি শিককাবাবের জায়গায় শামিকাবাব নয়, আলু-গোল্ডের বদলে কপি-গোল্ড পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, “ব্রাদার, আমার ফিয়াসে নেই, এসব জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে কেনা।”

একদম ছবছ একই স্বাদ। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমারও আবছা আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গাঢ়গোল্ড ফিরিছি মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই কিনতে দেখেছি। ফিরিছিকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফিয়াসের একটা বর্ণনা দিতে, কিন্তু থেমে গেলুম।

ভোর কোথায় হলো মনে নেই। জ্বল মাসের গরম পশ্চিমে গৌরচন্দ্রিকা করে নামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে টেরচা হয়ে গাড়িতে ঢেকে আর বাকি দিনটা কী রকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয়।

গাড়ি যেন কালোয়াত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, কোনো গতিকে রোদুরের তবলাচিকে হার যানিয়ে যেন কোথাও শিরে ঠাঞ্চায় জিরোবে। আর রোদুরও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক উর্ধ্বশ্বাসে। সে পাঞ্চায় প্যাসেজারদের প্রাণ যায়। গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে। দাঢ়ি লম্বা হয়েছে, টিকি খাটো হয়েছে, নাদুসনন্দুস লালাজিদের মিষ্টি মিষ্টি ‘আইয়ে বৈঠিয়ে’ আর শোনা যায় না। এখন ছ-ফুট লম্বা পাঠানদের ‘দাগা, দাগা, দিলতা, রাওড়া,’ পাঞ্চাবিদের ‘তুবি, অসি’, আর শিখ সর্দারজিদের জালবক্ষ দাঢ়ির হরেক রকম বাহার।

সামনের বুড়ো সর্দারজিই প্রথম আলাপ আরঞ্জ করলেন। ‘গোয়িঙ ফার?’ নয়, সোজাসুজি ‘কহি জাইয়েগা?’ আমি ডবল তসলিম করে সবিনয় উত্তর দিলুম— অদ্বুতে ঠাকুরদার বয়সী আর জবরজঙ্গ দাঢ়ি-গৌফের ভিতর অতি মিষ্ট মোলায়েম হাসি। জিজ্ঞাসা করলেন, পেশাওয়ারে কাউকে চিনি? না হোটেলে উঠব। বললুম ‘বন্ধুর বন্ধু স্টেশনে আসবেন, তবে তাঁকে কখনো দেখিনি, তিনি যে আমাকে কী করে চিনবেন সে সম্বন্ধে ঈষৎ উদ্বেগ আছে।’

সর্দারজি হেসে বললেন, “কিছু ভয় নেই, পেশাওয়ার স্টেশনে এক গাড়ি বাঞ্চালি নামে না, আপনি দু-মিনিট সবুর করলেই তিনি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেবেন।”

আমি সাহস পেয়ে বললুম, “তা তো বটেই, তবে কিনা শার্ট পরে এসেছি—” সর্দারজি এবার অঞ্চল করে বললেন, “শার্ট যে এক ফুট জায়গা ঢাকা পড়ে তাই দিয়ে মানুষ মানুষকে চেনে নাকি?”

আমি আমতা আমতা করে বললুম, “তা নয়, তবে কিনা ধূতি-পাঞ্চাবি পরলে হয়ত ভালো হতো।”

সর্দারজিকে হারাবার উপায় নেই। বললেন, “এও তো তাজ্জবকি বাত- পাঞ্চাবি পরলে বাঞ্চালিকে চেনা যায়?” আমি আর এগলুম না। বাঞ্চালি ‘পাঞ্চাবি’ ও পাঞ্চাবি কুর্তায় কী তফাত সে সম্বন্ধে সর্দারজিকে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়ত আমাকে আরও বোকা বানিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরঞ্চ উনিই কথা বলুন, আমি শুনে যাই। জিজ্ঞাসা করলুম, “সর্দারজি শিলওয়ার বানাতে ক-গজ কাপড় লাগে?”

বললেন, “দিল্লিতে সাড়ে তিনি, জলদিরে সাড়ে চার, লাহোরে সাড়ে পাঁচ, লালমুসায় সাড়ে ছয়, রাওলপিণ্ডিতে সাড়ে সাত, তারপর পেশাওয়ার এক লক্ষে সাড়ে দশ, খাস পাঠানমুঞ্চক কোহাট খাইবারে পুরো থান।”

‘বিশ গজ!’

“হ্যাঁ, তাও আবার খাকি শার্ট দিয়ে বানানো।”

আমি বললুম, “এ রকম এক বস্তা কাপড় গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করে কী করে? মারপিট, খুন-রাহাজানির কথা বাদ দিন।”

সর্দারজি বললেন, “আপনি বুঝি কখনো বায়ক্ষেপ যান না? আমি এই বুড়োবয়সেও মাঝে মাঝে যাই। না গেলে ছেলে-ছেকরাদের মতিগতি বোঝাবার উপায় নেই— আমার আবার একগাল নাতি-নাতনি। এই সেদিন দেখলুম, দুশো বছরের পুরোনো গল্লে এক মেমসায়েব ফ্রকের পর ফ্রক পরেই যাচ্ছেন, পরেই যাচ্ছেন— মনে নেই, দশখানা না বারোখানা। তাতে নিদেনপক্ষে চল্লিশগজ কাপড় লাগার কথা। সেই পরে যদি মেমরা নেচেকুন্দে থাকতে পারেন, তবে মন্দ পাঠান বিশগজি শিলওয়ার পরে মারপিট করতে পারবে না কেন?” আমি খানিকটা ভেবে বললুম, “হক কথা; তবে কিনা বাজে খরচ।”



ইত্তোমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেয়ে গিয়েছি যে পাঠানযুল্লকের প্রবাদ, “দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের।” শুনে গর্ব অনুভব করেছি বটে যে বন্দুকধারী পাঠান কামানধারী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিন্তু বিন্দুমাত্র আরাম বোধ করিনি। গাড়ি পেশাওয়ার পৌছবে রাত নয়টায়। তখন যে কার রাজত্বে গিয়ে পৌছব তাই মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি; এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল।

২

প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ করলুম যে ছ-ফুটি পাঠানদের চেয়েও একমাথা উঁচু এক অন্দুলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের বাঙালিত্ব জাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে এক হাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর দুহাতে সেটি লুকে নিয়ে দিলেন এক চাপ-পরম উৎসাহে, গরম সংবর্ধনায়। সে চাপে আমার হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর দুই থাবার ভিতর তখন লুকোচুরি খেলছে।

খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি অন্দুলোক আমাকে চেনেন না, জানেন না, আমি বাঙালি তিনি পাঠান। তবে যে এত সংবর্ধনা করছেন তার মানে কী? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না আর সে অতিথি যদি বিদেশি হয় তা হলে তো আর কথাই নেই।

৩

আরবি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে “ইয়োম উস সফর, নিস্ফ উস সফর”— অর্থাৎ কিনা যাত্রার দিনই অর্ধেক অয়গ। পূর্ব বাংলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়, ‘উঠোন সমুদ্র পেরলেই আধেক মুশ্কিল আসান।’ আহমদ আলীর উঠোন পেরোতে গিয়ে আমার পাক্ষা সাতদিন কেটে গেল। আটদিনের দিন সকালবেলা আহমদ আলী শ্বয়ৎ আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্য বিস্তর দিব্যদিলাশা দিয়ে বিদায় নিলেন। হাওড়া স্টেশনে মনে হয়েছিল ‘আমি একা’, এখন মনে হলো ‘আমি ভয়ংকর একা’। ‘ভয়ংকর একা’ এই অর্থে যে নো ম্যানস ল্যান্ডই বলুন আর খাস আফগানিস্তানই বলুন, এসব জায়গায় মানুষ আপন আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত।

সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি এসব দেশে এরকম কথাই কর। তবু আফগানিস্তান স্বাধীন সভ্য দেশ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুন-খারাবির প্রতি এত বেমালুম উদাসীন নয় তখন তাঁদেরও তো কিছু একটা করবার আছে এই ভেবে দু-চারটে পুলিশ দু-একদিন অকৃত্তলে ঘোরাঘুরি করে যায়।

ডানদিকে ড্রাইভার শিখ সর্দারজি। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাঢ়ি ও পরে জানতে পারলুম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য। সব ভাষাই জানেন অর্থেক বলতে গেলে এক ফরাসি ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরেজি না বোঝেন তবে তিনি ভাবখানা করেন যেন আপনিই যথেষ্ট ইংরেজি জানেন না, তখন তিনি ফরাসির যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনো যদি আপনি তাঁর বজ্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়েন। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে কথা বলবার ঝকঝারি আর তিনি কত পোহাবেন? অর্থেক পরে দেখলুম অন্দুলোক অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বিপন্নের সহায়। তাঁরও পরে বুঝতে পারলুম ভাষা বাবদে অন্দুলোকের এ দুর্বলতা কেন যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পাঞ্জিয়ের দাবি করে বেতারে চাকরি পেয়েছেন।



বাসের পেটে একপাল কাবুলি ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, থামোফেন, রেকর্ড, পেলেট-বাসন, বাড়-লঠন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজ-সরঞ্জাম, কেতাব-পুঁথি, এক কথায় দুনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। বাদবাকি প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্থান থেকে, কিছুটা রূপ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্য আফগান সরকারের বাণিজ্য প্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্র মারলেই হয়।

সে সব পরের কথা। পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হলো। তারপর খাইবার গিরিসংকট।

8

দুদিকে হাজার ফুট উচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবারপাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্যের গা ঘেঁষে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট খচর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সংকীর্ণতম স্থলে দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতলের মতো টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে শিয়েছে যে, যে কোনো জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডানে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

ফিষ্টহর সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে—তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে।

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুঁতিন (ফার) ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার শুভারকোট গায়ে দিয়ে খচর খেদিয়ে খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। সর্দারজিরকে রহস্য সমাধানের অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, যাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সত্যই এরকম পুরু জামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম চুক্তে পারে না, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। যাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই বা কি? এরা তার খোড়াই পরোয়া করে। এইক্ষুনি বলতে বলতেই দেখলুম গরমের হস্তা মুখে চুকে সর্দারজির গলা শুকিয়ে দিল। গল্প জয়বাব চেষ্টা বৃথা।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত চঙ্গের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অন্ত-গাদাবন্দুক থেকে আরঞ্জ করে আধুনিকতম জর্মন মাউজার। দামেক্ষের বিখ্যাত সুদর্শন তরবারি, সুপারি কাটার জাঁতির মতো ‘জামখর’ যোগল ছবিতে দেখেছিলুম, বাস্তবে দেখলুম হৃষ্ণ সেই রকম গোলাপি সিঙ্গের কোমরবক্ষে পৌঁজা। কারো হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা বকবকে বর্ণ। উঠের পিঠে পশ্চমে রেশমে বোনা কত রঙের কাপেটি, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা বাদাম আখরোট কিসমিস আলুবুখারা চলেছে হিন্দুস্থানের বিরিয়ানি পোলাওয়ের জোলুস বাড়াবার জন্য। আরও চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবক্ষের নিচে, ইঝেরের ভাঁজে, পুঁতিনের লাইনিংয়ের ভিতরে আফিং আর হাসিস না কক্ষেই, না আরও কিছু।

সবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মহুরে।

পাঠান দু-বার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথকৃপে গ্রহণ করলুম। ‘হস্তদস্ত হওয়ার মানে শয়তানের পল্লায় চলা।’ কে বলে বিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না? আমার সকল সমস্যা সমাধান করেই যেন ধড়াম করে শব্দ হলো। কাবুলি তড়িৎ গতিতে চোখের ফেটা খুলে আমার দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল, আমি সর্দারজির দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শান্তভাবে গাঢ়িখানা এক পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, টায়ার কেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।’

প্রয়োজন ছিল না, তবু সর্দারজি আমদানির স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খাইবার পাসের রাস্তা দুটো সরকারের বটে, কিন্তু দুদিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরোছ। আড়ালে-আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে। নামলেই কড়াক- পিণ্ড। তারপর কী কায়দায় সব কিছু হৃণ করে তার বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই।

পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের ওপর রাহাজানি না করে তার জন্য খাইবার পাসের দুদিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ দু-টাকা করে বছরে খাজনা দেয়। পরে আরেকটি শর্ত অতি কষ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদি আফ্রিদিতে বাগড়া বাধলে রাস্তার এপারে ওপারে যেন বন্দুক না মারা হয়।



মোটর আবার চলল। কাবুলির গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিড়বিড় করে যা বলছিলেন, তার নির্যাস-কিছু ভয় নেই সায়েব- কালই কাবুল পৌছে যাচ্ছি। সেখানে পৌছে ক্ষেত্রে কাবুল নদীতে ডুব দেব। বরফগলা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আমি বললুম, “আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।”

হঠাতে দেখি সামনে একি! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বঙ্গ করে গেট কেন? মোটর থামল। পাসপোর্ট দেখাতে হলো। গেট খুলে গেল। আফগানিস্তানে ঢুকলুম। বড়ো বড়ো হরফে সাইনবোর্ডে লেখা-

কাবুলি বললেন, “দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবারপাস পাস করা। আলহামদুলিল্লাখুদাকে ধন্যবাদ।”

আমি বললুম, “আমেন।”

৫

খাইবার পাস তো দুখে-সুখে পেরোলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমলো বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ-চালা রাস্তা ছিল—তা সে সংকীর্ণ হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির ওপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের ওপর দিয়ে পণ্যবাহিনীর যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়িদায়ক হতে পারে তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গোরুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে— যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোশক না থাকে এবং ছোটবড় বুড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

লাভিকেটাল থেকে দক্ষা দশ মাইল।

সেই মরপ্রান্তের দক্ষাদুর্গ অত্যন্ত অবাস্তর বলে মনে হলো। মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে আশপাশের রঞ্জের সঙ্গে রং মিলিয়ে— ফ্যাকাশে, য়ালা, ঘিনঘিনে হলদে রং। দেয়ালের ওপরের দিকে এক সারি গর্ত; দুর্গের লোক তারই ভিতরে দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শুরুকে শুলি করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অঙ্কের উপড়ে নেওয়া চোখের শূল্য কোটির।

কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বাঁ দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছেন— তান দিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে।

কাবুলি বললেন, “চলুন দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারি কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তাহলে সন্ধ্যার আগেই জালালাবাদ পৌছতে পারব।”

দুর্গের অফিসার আমাকে বিদেশি দেখে প্রচুর খাতির-যত্ন করলেন। দক্ষার মতো জায়গায় বরফের কল থাকার কথা নয়, কিন্তু যে শরবত খেলুম তার জন্য ঠাণ্ডা জল কুঁজোতে কী করে তৈরি করা সম্ভব হলো বুঝতে পারলুম না।

৬

আফগানিস্তানের অফিসার যদি কবি হতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে পির হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন-তিনবার চাকা ফাটালো, আর ইঞ্জিন সর্দারজির ওপর গোসা করে দুবার শুম হলেন। চাকা সারাল হ্যাজি য্যানন - তদারক করলেন সর্দারজি।

জালালাবাদ পৌছবার কয়েক মাইল আগে সর্দারজির কোমরবন্ধ অথবা নীবিবন্ধ কিংবা বেল্ট- যাই বলুন, ছিঁড়ে দুটুকরো হলো। তখন খবর পেলুম সর্দারজি ও রাতকানা। রেডিওর কর্মচারী আমার কানটাকে মাইক্রোফোন ভেবে ফিস ফিস করে প্রচার করে দিলেন, “অদ্যকার মতো আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত হলো। কাল সকাল সাতটায় আমরা আবার উপস্থিত হব।”



আধ মাইলটাক দূরে আফগান সরাই। বেতারের সাথে ও আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললুম। বাদবাকি আর সকলে হৈ-হস্তা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল।

সর্দারজি তথ্বী করে বললেন, “একটু পা চালিয়ে। সম্ভ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।”

সরাই তো নয়, ভীষণ দুশ্মনের মতো দাঁড়িয়ে এক চৌকো দুর্গ। “কর্মঅন্তে নিভৃত পাছশালাতে” বলতে আমাদের চোখে যে স্মিন্খতার ছবি ফুটে উঠে এর সঙ্গে তার কোনো সংশ্বব নেই। ত্রিশ ফুট উচু হলদে মাটির নিরেট চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা— তার ভেতর দিয়ে উট, বাস, ডবল-ডেকার পর্যন্ত অন্যায়ে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভেতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরোতে হবে না।

চুকেই থমকে দাঁড়ালুম। কত শত শতব্দীর পুঞ্জীভূত দুর্গক আমাকে ধাক্কা মেরেছিল বলতে পারি নে, কিন্তু মনে হলো আমি যেন সে ধাক্কায় তিন গজ পিছিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা কী বুঝতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না। এলাকাটা মৌসুমি হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না— যথেষ্ট উচু নয় বলে বরফও পড়ে না। আশেপাশে নদী বা বারনা নেই বলে ধোয়ামোছার জন্য জলের বাজে খরচার কথাও শোঠে না। অতএব সিকন্দরশাহি বাজিবাজ থেকে আরম্ভ করে পরগুদিনের আন্ত ভেড়ার পাল যে সব ‘অবদান’ রেখে গিয়েছে, তার স্তুলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে যে, তায় হয় ধাক্কা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

সূচিভেদ্য অঙ্ককার দেখেছি, এই প্রথম সূচিভেদ্য দুর্গক শুকলুম।

৭

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গে আজান শুনে। নামাজ পড়ালেন বুধারার এক পুস্তিন সদাগর। উৎকৃষ্ট আরবি উচ্চারণ শুনে বিস্ময় মানলুম যে ভুক্তিতে এত ভালো উচ্চারণ টিকে রাইল কী করে। বেতারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, “আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না।” আমি বললুম, “কিছু যদি মনে করেন?” আমার এই সংকোচে তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে বুঝতে পারলুম, খাস প্রাচ্য দেশে অচেনা-অজানা লোককে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই। পরে জানলুম, যার সবক্ষে কৌতুহল দেখানো হয় সে তাতে বরঞ্চ খুশিই হয়।

মোটরে বসে তারই খেই তুলে নিয়ে আগের রাতের অভিজ্ঞতার জ্ঞানধরচা নিতে লাগলুম।

চোখ বন্ধ অবহায়ই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রথম পরশ পেলুম; খুলে দেখি সামনে সবুজ উপত্যকা— রাস্তার দুদিকে ফসল ক্ষেত। সর্দারজি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, “জালালাবাদ”। তখন দুদিকেই সবুজ, আর লোকজনের ঘরবাড়ি। সামান্য একটি নদী স্মৃদ্রতম সুযোগ পেলে যে কী মোহন সবুজের লীলাখেলা দেখাতে পারে জালালাবাদে তার অতি মন্তব্য তসবির। এমনকি যে দু-চারটে পাঠান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেহারাও যেন সীমান্তের পাঠানের চেয়ে মোলায়েম বলে মনে হলো। লঙ্ক করলুম, যে পাঠান শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের বেপর্দামি নিন্দা করে তারই বউ-ব্যি ক্ষেতে কাজ করছে অন্য দেশের মেয়েদেরই মতো। মুখ তুলে বাসের দিকে তাকাতেও তাদের আপত্তি নেই। বেতার কর্তাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি গঞ্জিতভাবে বললেন, “আমার যতদূর জানা, কোনো দেশের গরিব মেয়েই পর্দা মানে না, অস্তত আপন গাঁয়ে মানে না। শহরে গিয়ে যথ্যবিক্রেতের অনুকরণে কখনো পর্দা মেনে ‘ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করে’ কখনো কাজ-কর্মের অসুবিধা হয় বলে গাঁয়ের রেওয়াজই বজায় রাখে।”

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “আববের বেদুইন মেয়েরা”।

তিনি বললেন, ‘আমি ইরাকে তাদের বিনা পর্দায় ছাগল চরাতে দেখেছি।’

গাড়ি সদর রাস্তা ছেড়ে জালালাবাদ শহরে ঢুকল। কাবুলিরা সব বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এক মিনিটের ভেতর অস্তর্ধান। কেউ একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, বাস ফের ছাড়বে কখন। আমার তো এই প্রথম যাত্রা, তাই সর্দারজিকে শুধালাম “বাস আবার ছাড়বে কখন?” সর্দারজি বললেন, আবার যখন সবাই জড়ে হবে। জিজ্ঞেস করলুম সে কবে? সর্দারজি যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, “আমি তার কী জানি? সবাই খেয়েদেয়ে ফিরে আসবে যখন তখন।”



বেতারকর্তা বললেন, “ঠায় দাঁড়িয়ে করছেন কী? আসুন আমার সঙ্গে।” আমি শুধালাম, “আর সব গেল কোথায়? ফিরবেই বা কখন?”

তিনি বললেন, “ওদের জন্য আপনি এত উদ্ধিষ্ঠ হচ্ছেন কেন, আপনি তো ওদের মালজালের জিম্মাদার নন।”

আমি বললুম, “তা তো নই-ই। কিন্তু যেরকম ভাবে হট করে সবাই নিরাম্বদ্ধেশ হলো তাতে তো মনে হলো না যে ওরা শিগগির ফিরবে। আজ সন্ধ্যায় তা হলে কাবুল পৌছব কী করবে?”

বেতারকর্তা বললেন, ‘সে আশা শিকেয় তুলে রাখুন। এদের তো কাবুল পৌছবার কোনো তাড়া নেই। বাস যখন ছিল না, তখন ওরা কাবুল পৌছত পনেরো দিনে, এখন চার দিন লাগলেও তাদের আগম্বনি নেই। জালালাবাদে পৌছেছে এখানে সকলেরই কাকা-মামা-শালা, কেউ-না-কেউ আছে, তাদের তত্ত্বালাপ করবে, খাবে-দাবে, তারপর ফিরে আসবে।’

৮

মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পৌছবার আর কোনো ভরসাই রইল না। পেশাওয়ার থেকে জালালাবাদ একশ মাইল, জালালাবাদ থেকে কাবুল আরও একশ মাইল। শান্তে লেখে, সকলে পেশওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জালালাবাদ পৌছবে। পরদিন ভোরবেলা জালালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই বোবা উচিত ছিল যে, শান্ত মানে অল্প লোকেই। পরে জানলুম একমাত্র মেল বাস ছাড়া আর কেউ শান্তনির্দিষ্ট বেগে চলে না। সন্ধ্যা কাটল নালার পারে, নারগিস বনের এক পাশে, চিনার মর্মরের মাঝখানে। সূর্যাস্তের শেষ আভারুকু চিনার-পল্লব থেকে মুছে যাওয়ার পরে ডাক-বাংলোর খানসামা আহার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে সেখানেই চারপাই আনিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শেষরাত্রে ঘূম ভাঙল অপূর্ব মাধুরীর মাঝখানে। হঠাৎ শুনি নিতান্ত কানের পাশে জলের কুলকুলু শব্দ আর আমার সর্বদেহ জড়িয়ে নাকমুখ ছাপিয়ে কোন অজানা সৌরভ সুন্দরীর মধুর নিঃশ্বাস।

শেষরাত্রে নৌকা যখন বিল ছেড়ে নদীতে নামে তখন যেমন নদীর কুলকুলু শব্দে ঘূম ভেঙে যায়, জানলার পাশে শিউলি গাছ থাকলে শরতের অতি ভোরে যে রকম তন্ত্র টুটে যায়, এখানে তাই হলো কিন্তু দুয়ে মিলে গিয়ে। এ সংগীত বহুবার শুনেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এহেন সৌরভসোহাগ জীবনে আর কখনো পাইনি।

সেই আধা-আলো-অন্ধকারে চেয়ে দেখি দিনের বেলার শুকনো নালা জলে ভরে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে নারগিসের পা ধূয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। বুবলুম নালার উজানে দিনের বেলায় বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করা হয়েছিল— ভোরের আজানের সময় নিমলার বাগানের পালা; বাঁধ খুলে দিতেই নালা ছাপিয়ে জল ছুটেছে— তারই পরশে নারগিস নয়ন মেলে তাকিয়েছে। এর গান ওর সৌরভে মিশে গিয়েছে।

আর যে-চিনারের পদপ্রান্তে উভয়ের সংগীতে সৌরভ উচ্ছিত হয়ে উঠেছে, সে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মির নবীন অভিষেকের জন্য। দেখতে-না-দেখতে চিনার সোনার মুকুট পরে নিল- পদপ্রান্তে পুঁপুবনের গঞ্জধূপে বেতালিক মুখরিত হয়ে উঠল।

এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল ধার
আজি ধাতে সূর্য ওঠা
সফল হলো কার?

ভোরের নামাজ শেষ হতেই সর্দারজি ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হলো তিনি ঘনস্থির করে ফেলেছেন, আজ সন্ধ্যায় যে করেই হোক কাবুল পৌছবেন।



শব্দার্থ ও টীকা

- হাওড়া স্টেশন** – পশ্চিমবঙ্গের একটি রেলস্টেশন। আয়তনের দিক থেকে এটি ভারতের একটি বৃহত্তর রেলস্টেশন। বর্তমানে এই স্টেশনে ২৬টি প্লাটফর্ম আছে।
- প্রাগদেশ** – কোনো কিছুর শুরুতে। পূর্বদেশ। পূর্বস্থান।
- ফিরিঙ্গি** – ফার্সি থেকে আগত শব্দ। এর অর্থ হলো ফরাসি বা ইউরোপিয়ান। তবে ব্রিটিশাসিত ভারতবর্ষে সাদা চামড়ার বিদেশি মাঝেই ফিরিঙ্গি বলে অভিহিত হতেন।
- নেটিভ** – ব্রিটিশাসিত ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের নেটিভ বলে অভিহিত করতেন। এর মানে হলো স্বদেশি। যে ব্যক্তি যে-দেশে বা যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ওই দেশের বা পরিবেশের নেটিভ।
- ফিল্যাসে** – ভালোবাসার নারী। প্রাচীন ফরাসি ভাষায় এর অর্থ প্রতিজ্ঞা।
- আলাকার্ত** – Ala carte। ফরাসি শব্দ। এর অর্থ খাদ্যতালিকা অনুযায়ী।
- জাকারিয়া স্ট্রিট** – কলকাতার একটি স্থান। হোটেলের জন্য বিখ্যাত। সব ধরনের খাবার পাওয়া যায়।
- গৌরচন্দ্রিকা** – ভূমিকা। প্রাক্কর্কখন।
- কালোয়াত** – ক্রপদ, খেয়াল ইত্যাদি। সংগীতে পারদর্শী শিল্পী। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো দ্রুত লয়ে।
- পেশোয়ার স্টেশন** – পাকিস্তানের পেশোয়ারে অবস্থিত রেলস্টেশন।
- দিল্লি** – ভারতের রাজধানী শহর। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহর হিসেবে পরিচিত। আয়তনের দিক থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় শহর এবং ভারতের প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম।
- জলন্ধর** – ভারতের পাঞ্চাব প্রদেশের অতি প্রাচীন শহর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে পরিচিত।
- রাওয়ালপিণ্ডি** – পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে নয় মাইল দূরের শহর রাওয়ালপিণ্ডি। পাকিস্তানের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর।
- পেশোয়ার** – পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন প্রদেশের সবচেয়ে বড় শহর পেশোয়ার। খাইবার পাস-এর শেষ পূর্ব প্রান্তের হুদের পাশে শহরটি অবস্থিত। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে শহরটি সমৃদ্ধ।
- টাঙ্গা** – টাটু ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাঢ়ি।
- খাইবার পাস** – শিরিপথ। এই শিরিপথের মাধ্যমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম রাস্তার মধ্যে এটি অন্যতম। আলেকজান্ডার দ্রি প্রেট ও চেঙ্গিস খান থেকে শুরু করে মুসলিম শাসকগণ তাদের বিশ্ব বিজয়ে খাইবার পাস ব্যবহার করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুদ্রাকৌশলের অংশ হিসেবে ব্রিটিশরা এই খাইবার পাস দিয়ে একটি ভারি রেলওয়ে নির্মাণ করে। বর্তমানে এই পথ দিয়ে আমেরিকা তাদের সৈন্যদের জন্য আফগানিস্তানে রসদ নিয়ে যায়।
- বুখারা** – উজবেকিস্তানের পঞ্চম বৃহৎ শহর। প্রাচীন এই শহর ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতিচর্চা ও ধর্মচর্চার জন্য বিখ্যাত। একদিকে প্রচুর স্থাপত্যকর্ম এবং অন্যদিকে মসজিদ-মাদ্রাসা এই শহরটিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

- জর্মন মাউজার**
- জার্মানের একটি অস্ত্র তৈরির কারখানার নাম মাউজার (Mauser)। পল মাউজার এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৪ সালের ২৩এ মে কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনো এই প্রতিষ্ঠানের ডিজাইনকৃত রাইফেল ও পিস্টল সারা পৃথিবীতে বিক্রি হয়।

সামোভার

 - গরম পানির পাত্রবিশেষ।

দামেক

 - সিরিয়ার রাজধানী। সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র। চার হাজার বছর আগে শহরটি নির্মিত হয়।

কানজোখা

 - কাঁধ পরিমাণ।

আফ্রিদি

 - পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সাহসী উপজাতি বিশেষ। পশ্চিম পেশোয়ারের প্রায় এক হাজার বর্গমাইলব্যাপী এদের বাস।

লাভিকোটাল

 - পাকিস্তানের উপজাতি শাসিত অঞ্চলের একটি শহর। খাইবার পাস-এর পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই শহর অবস্থিত।

পুন্তিন

 - চামড়ার জামা বা কোট

জালালাবাদ

 - আফগানিস্তানের একটি শহর। আদিনাপুর নামে খ্যাত। কাবুল নদী, কুনার নদী ও লাগমান দ্বীপের সংযোগস্থলে শহরটি অবস্থিত। পাকিস্তানের নিকটবর্তী আফগানিস্তানের সবচেয়ে শুরুতপূর্ণ শিঙ্গানগরী জালালাবাদ।

পাঠ-পরিচিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত “গন্তব্য কাবুল” শীর্ষক ভ্রমণকাহিনীটি তাঁর ‘দেশে বিদেশে’ (১৯৪৮) এছ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই রচনাটির মধ্য দিয়ে আমরা সৈয়দ মুজতবা আলীর অসাধারণ ভ্রমণ-সাহিত্যের সঙ্গেই শুধু পরিচিত হই না, অধিকস্তু তাঁর জীবনবোধ, সাহিত্যকৃতি ও নিজস্ব শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারি। সৈয়দ মুজতবা আলী বিচ্ছি এক জীবন যাপন করেছেন। কত জনপদ, কত মানুষ আর কত ঘটনার সঙ্গে যে তিনি এক জীবনে পরিচিত হয়েছেন তার ইয়ন্তা নেই। আর সেই জনপদ, সেই মানুষ আর সেই সব ঘটনাকেও তিনি দেখেছেন কখনো রসিকের চোখে, কখনো ভাবুকের চোখে এবং কখনোবা বিদ্যুৎ পাইক্যের মনন ও নিষ্ঠার চোখে। ফলে অনিবার্যভাবেই তাঁর সব সৃষ্টির মতো ভ্রমণ-সাহিত্যও হয়ে উঠেছে তুরোড় এক জীবনচার্চাল্যে ভরপুর কথামালা। “গন্তব্য কাবুল” তার ব্যক্তিগত নয়। হাওড়া স্টেশন থেকে কাবুলের উদ্দেশে যে যাত্রাটি তিনি শুরু করেছিলেন তাতে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ রসঘন এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের প্রতিটি পর্বে কত যে কৌতুক, কৌতুল, হাসি-ঠাণ্ডা, রম্য-রসিকতা আর প্রজ্ঞা ও মনন পাঠকের জন্য অপেক্ষা করে তার কোনো তুলনা চলে না। যাত্রার শুরুতেই গাড়িতে উঠতে গেলে একজন ইংরেজ হাঁক দিয়ে বলেছিলেন “ওটা ইয়োরোপিয়ানদের জন্য”। এই একটি মাঝে উক্তির মধ্যে ব্রিটিশশাসিত দুইশ বছরের ইতিহাসের একটি মাঝা অনুভব করা যায়। আবার সেই ফিরিসির সঙ্গেই যখন শান্তিপূর্ণ ও বস্তুতপূর্ণ যাত্রা শুরু হয় আর ভাগ-বাঁটোয়া করে খাওয়া হয় নিজেদের সঙ্গে করে আনা বিচ্ছি খাবার তখন অন্য এক ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। সেই ইতিহাস যানবিকতার, সাম্যের, সৌন্দর্যের। এই বিচ্ছি মানুষ-জনের সঙ্গে মিলেগিশে আছে নানা ধরনের প্রকৃতি, ভূগোল, ইতিহাস ও নানা সংস্কৃতি। এই রচনায় সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতার একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লাভিকোটাল থেকে দক্ষার দূরত্ব কত মাইল?

ক. নয়

গ. এগারো

খ. দশ

ঘ. বারো



২. “এর গান ওর সৌরতে মিশে গিয়েছে”-উদ্ভিটি ঘারা কী বোঝানো হয়েছে?

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ক. গান ও সৌরভ ভিন্নতাসূচক | খ. সুর ও সুগন্ধ একাকার |
| গ. গান সুগন্ধের সৃষ্টি করে | ঘ. সুর সৌরভের পরিপূরক |

উদ্ভীপকটি পড়ে ও ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

মিথুনের পাহাড় দেখার শখ অনেক দিন থেকেই। তাই এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি গিয়েছিলেন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি। সেখানে আঁকা-বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা আর দুইধারে ঘন বন-জঙ্গল দেখে তিনি অভিভূত হন। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা রিসাং বারলার সুশীতল জল আর আলুটিলার গুহায় রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তাছাড়া বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের পাহাড়ি অধিবাসীদের সাথে মিশে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়।

৩. “গন্তব্য কাবুল” রচনার কোন বৈশিষ্ট্য উদ্ভীপকে প্রকাশিত হয়েছে?

- | | |
|---------------------|---------------|
| ক. আন্তরিকতা | খ. দেশপ্রেম |
| গ. সৌন্দর্যপ্রিয়তা | ঘ. উচ্চাভিলাষ |

৪. প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যটি যে যে বাক্যে বিদ্যমান তাহলো—

- দুইদিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়
- কত দেশের কত রকমের লোক পণ্য বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে
- এর গান ও সৌরতে মিশে গিয়েছে

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

মানুষ যে কেবল নিজেকেই জানিতে চায় তাহাই নহে, বাহিরের জগতের আহ্বানে প্রতিনিয়তই তাহাকে টানিতেছে। এই আহ্বানে প্রলুক হইয়া অনেক লোক দেশভ্রমণে বর্ষিগত হয়। নানা দেশ, নানা জাতি, তাহাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন রূপে ধরা দেয়। বাহিরের এই বন্ধসন্তাকে লেখক মানসরসে প্রত্যক্ষ করিয়া তথ্যসংবলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই জাতীয় প্রচ্ছে বন্ধসন্তার প্রাধান্য থাকিলেও উহার মধ্যে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকিতে পারে।

ক. ফিরিঙ্গি কী?

খ. সর্দারজিকে লেখকের ভালো লাগার কারণ কী?

গ. “গন্তব্য কাবুল” রচনায় উদ্ভীপকের কোন সন্তান বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপর্যুক্ত সন্তানটি “গন্তব্য কাবুল” রচনার শেষ কথা নয়।— বিশ্লেষণ কর।



মাসি-পিসি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ মে জন্মাইহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি চাকার বিক্রমপুরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁর পিতৃপ্রসন্ন নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম মানিক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন শূল ও কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন।

মাত্র আটচল্লিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিএসসি পড়ার সময়ে মাত্র বিশ বছর বয়সে বঙ্গদের সঙ্গে বাজি ধরে তিনি প্রথম গল্প “অতসীমামী” লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর জীবনের বাকি আটাশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে গেছেন। মাঝে বছর তিনেক মাত্র তিনি চাকরি ও ব্যবসায়িক কাজে নিজেকে জড়ালেও বাকি পুরো সময়টাই তিনি সার্বিক্ষণিকভাবে সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখক হিসেবে মানিক বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান। অঙ্গ সময়েই প্রচুর গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি করেন। সেই সঙ্গে লিখেছেন কিছু কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ও ডায়েরি। বিজ্ঞানমনস্ক এই লেখক মানুষের মনোজগৎ তথ্য অন্তর্জীবনের জগতকার হিসেবে সার্থকতা দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে সমাজবাস্তবতার শিল্পী হিসেবেও স্বাক্ষর রেখেছেন। ‘জননী’, ‘দিবারাত্রির কাব্য’, ‘পদ্মানন্দীর মাতি’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, ‘চিহ্ন’ প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ‘প্রাণিত্বহাসিক’, ‘সরীসৃপ’, ‘সমুদ্রের ঘান’, ‘কুঠরোগীর মৌ’, ‘টিকটিকি’, ‘হলুদ পোড়া’, ‘আজ কাল পরশুর গল্প’, ‘হারানের নাতজামাই’, ‘ছোট বঙ্গলপুরের যাত্রী’ প্রভৃতি। কলকাতায় ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের তেসরো ডিসেম্বর তিনি শেষ নিষ্ঠাস ত্যাগ করেন।

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙ্গা ইটপাটকেল ও ওজনে ভারি আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটিবাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মন্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সী, বেঁটে, জোয়াল, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আরেকটা সালতি, দু-হাত চওড়া হয়নি না হয়। দু-মাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ় বিধবা লম্বি ঠেলছে, ময়লা মেটা থানের আঁচল দুজনেরই কোমরে বাঁধা। মাঝাখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অন্নবয়সী একটি বৌ। গায়ে জামা আছে, নকশা পাড়ের সন্তা সাদা শাড়ি। আঁটসাঁট থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

“মাসি-পিসি ফিরছে কৈলেশ”, বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসি-পিসির সালতি দু-হাতের মধ্যে এসে গেছে।

“ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।”

সামনের দিকে লম্বি পুঁতে মাসি-পিসি সালতির গতি ঠেকায়, অঙ্গুদি সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, “বেলা আর নেই কৈলেশ।” পেছনে থেকে পিসি বলে, “অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।”



মাসি-পিসির গলা বরবারে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঘৃঢ়কার আছে। কৈলাশের খবরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দু-মাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে বলা। মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে থরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহুদি যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

“বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি”, কৈলাশ শুরু করে, “মেয়াকে একদম ঝঞ্জরবর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড় সোমন্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষমানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো—”

মাসি বলে, “খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দাকথাটা কী তাই কও, বললে না যে খপর আছে, কী?”
পিসি বলে, “খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।”

মাসি-পিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগভ্য ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, “জগুর সাথে দেখা হলো কাল। খড় তুলে দিতে সাঁবা হয়ে গেল, তা দোকানে এটুটু-মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।”

মাসি বলে, “চায়ের দোকান না কিসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কী?”

পিসি বলে, “সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কী বললে জগু?”

কৈলাশ ফাঁপরে পড়ে আড়চোখে চায় আহুদির দিকে, হঠাত বেমুকা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে, তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসি-পিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে, “ওসব একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সেই জগু নেই। বৌকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এল তা মেয়া দিলে না, তাই তো নিতে আসে না আর। আমি বলি কী, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দেও মেয়াকে।”

মাসি বলে, “গেট শুকিয়ে লাখি বাঁটা খেতে? কলকেপোড়া ছাঁকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়িবাঁধা হয়ে থাকতে দিনভর রাতভর?”

পিসি-বলে, “মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই-আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস?”

মাসি বলে, “ফের আসুক, আদরে রাখব যদিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।”

পিসি বলে, “নে কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।”

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছলছল চোখে একবার তাকায় আহুদির দিকে। তার মেয়েটা ঝঞ্জরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছেট অবুব মেয়ে। তার ভালোর জন্মেই তাকে জোর-জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আহুদির সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নাই। বয়সে সে ছিল অনেক ছেট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগ। তবু আহুদির ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আহুদির দিকে।



কৈলাশ বলে, “তবে আসল কথাটা বলি। জগৎ মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বৌ নেবার জন্য। তার বিয়ে করা বৌকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুবলাম, মামলা জগৎ করবেই আজকালের মধ্যে। যদিবে তোমরা জান মাসি, জান পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।”

আহুদি একটা শব্দ করে, অস্কুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কয়েক বার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, “জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?”

বলে মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লাগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তরতর করে পিছনে গিয়ে লাগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারদিকে।

শুকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শুকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অন্ন দূরে আরেকটা গাছের দিকে। ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি!

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহুদির। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীর একটা রোগে, কলেরায়, সে, তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসি-পিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেক দিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্য বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছু তারা রোজগার করত ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড় বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন-খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, ঝর্পোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে, আহুদির বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জঙ্গের লাখির চোটে মরমর যেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে? মাসি-পিসির সেবা-যত্নেই আহুদি অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপ-মাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কী করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি-বা সম্ভব, অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাঞ্চা দিয়ে মাসি-পিসি আহুদির জীবনের জন্য লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে, না-পেল যদি তো না-খেয়েই। অবস্থা বখন তাদের অতি কাহিল, চারদিকে না-খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি; একদিন মাসি বলে পিসিকে, “একটা কাজ করবি যেয়াইন? তাতেও তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।”

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁথেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া-আসাও একার ঘারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারো সাথে হয়ত মাসি বদোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরন্টের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসি-পিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসি-পিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একদূরে বাস, পরম্পরের কাছে ছাড়া সুধ-দুঃখের কথা তারা কাকেই-বা বলবে, কেই-বা শুববে। তবে হিংসা দেয় রেশারেয়িও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে।



পিসি এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খৌচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শাস্তি দুষ্টী মানুষ মনে হতো এমনি তাদের, কিন্তু ঘণ্টা বাধলে অবাক হয়ে যেতে হতো তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গৌ! মনে হতো এই বুবি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুবি কাটে বাঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়ামাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উড়ে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহুদির ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের পেট ভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহুদি আছে। খাইয়ে পরিয়ে যদে রাখতে হবে তাকে, খুশেরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জ্বাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আহুদিকে হয়ত শুণেরবাড়ি যেতে হতো, মাসি-পিসিও বিশেষ কিছু বলতো কি না সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসি-পিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়েছিল, আহুদিকে পাঠানো হবে না। আহুদিকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঞ্চটে মেরে যায়? বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহুদিকে বর্তেছে, জগুর বৌ নেবার আঘাতও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুকতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহুদিকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনে মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহুদিকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, ‘ড্রাস্নি আহুদি। তাঁওতা দিয়ে আমাদের দম্যাবার ফিকির সব। নয় তো কৈলেশকে দিয়ে শুসব কথা বলায় যোদের?’

পিসি বলে, ‘দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে, কই না, আমি তো শুসব কিছু বলি নি কৈলেশকে।’

মাসি বলে, ‘চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা। মা-মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা, জামাই এলে বুবিয়ে বলব।’ পিসি বলে, ‘ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহুদি। তোর পিসে ছিল জগুর মতো। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপি চুপি এসে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে, বসতে বলি তো বসে।’

মাসি বলে, ‘তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কী ছ্যাচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহুদি, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ি ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।’

পিসি বলে, ‘তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ড্রাস্নি, ডর কিসের?’

বাড়ি ফিরে দীপ জ্বলে মাসি-পিসি রাখ্মাবাহ্নি সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহুদির পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসি-পিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাচড়া, মোহরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসি-পিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসি-পিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কি না যাচাই করবার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কত রকমের দর



দিয়েছে মাসি-পিসির কাছে। মাসি-পিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসি-পিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মাঝের বাড়া তার এই মাসি-পিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসি-পিসিকে এত যত্নণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শুগুরবরের লাঞ্ছনা সইত, জঙ্গ লাখি থেত। ঈষৎ তন্দুর ঘোরে শিউরে ওঠে আহুদি। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসি-পিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহুদিকে ডাকবে। ভাগভাগি কাজ তাদের এমন সহজ হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঙ্গনে মূল দেবে এ কথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে মূলের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহুদির কথা, আহুদির সুখদুঃখ, আহুদির সমস্যা, আহুদির ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপর্যুক্ত দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষমানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত নয়, এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব দেখাবে মাসি-পিসি—আহুদিকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে যেন আহুদে গদগদ হ্বার ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই, সে যেন অনুভব করে, সে-ই এখানকার কর্তা, সে-ই সর্বেসর্বী।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসি-পিসি পরম্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিঞ্চাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দু-জনের। এখন এল চৌকিদার কানাই। হাঙ্গামা না আসে রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন মুমোচ্ছে।

রসুই চালায় বাঁপ এঁটে মাসি-পিসি বাইরে যায়। শুল্কপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ ছাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাইয়ের সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসি-পিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি-আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, ‘কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।’

মাসি বলে, ‘এত রাতে?’

পিসি বলে, ‘মরণ নেই?’

কানাই বলে, ‘দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবেগো দিদিঠাকরণৱাং। বেঁধে নিয়ে যাবার হুক্ম আছে।’

মাসি-পিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি যেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসি-পিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুণ্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটি-বাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটাইর পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনস্টেবলের সঙ্গে। ওরা এসে আহুদিকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, ‘মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?’

পিসি বলে, ‘আমি যাই চলো?’

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসি-পিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, ‘কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।’

পিসি বলে, ‘হাত ধুয়ে আসি, একদণ্ড লাগবে না।’



তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদার মতো মন্ত্র একটা কাটারি।

মাসি বলে, ‘কানাই, কতাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে নজ্জা করে। কাল সকালে যাব।’
পিসি বলে, ‘এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ভাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই?’

কানাই ফুঁসে উঠে, ‘না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।’

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, ‘বটে? ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।’

পিসি বলে, ‘আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না! কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।’

দু-পা এগোয় তারা দ্বিভাবে। মাসি-পিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যাই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উচু হয় মাসি-পিসি।

মাসি বলে, ‘শোনো কানাই, এ কিন্তু একি নয় ঘোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েনোক পারব না জানি কিন্তু দুটো-একটাকে মারব জথম করব ঠিক।’

পিসি বলে, ‘মোরা নয় মরব।’

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসি-পিসি হঠাত গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর ঘোগ দেয় পিসি। আশপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বার্ষাকুর। ও ঘোষ মশায়! ও জনাদন! ওগো কানুর মা! বিপিন! বংশী ...’

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হঞ্জোলের পর আরও নিরুম আরও ধূমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আলুদিকে মাঝাখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসি-পিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চৌদপুরুষ উদ্বার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসি-পিসি। তারা হাঁকডাকি শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হলো সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বত্ত্ব বোধ করে মাসি-পিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, ‘জানো বেয়াইন, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি।’

পিসি বলে, ‘তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুম্ববাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় সোনাদের ঘরে মাঝারাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।’

খানিক চৃপচাপ ভাবে দুজনে।

মাসি বলে, ‘সজাগ রাইতে হবে রাতটা।’

পিসি বলে, ‘তাই ভালো। কাঁধা কম্বলটা ছবিয়ে রাখি জালে, কী জানি কী হয়।’

আতে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহুদির ঘূম না ভাবে। অতি সম্পর্ণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহুদির বাপের আমলের গোরটা নেই, গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মেটা কাঁধে আর পুরনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো যাতে সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসিতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বাঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

- সালতি** — শালকাঠি নির্মিত বা তালকাঠির সরু ডোঙা বা নৌকা।
- কদমছাঁট** — মাথার চুল এমনভাবে ছাঁটা যে তা কদমফুলের আকার ধারণ করে।
- লগি** — হাত ছয়েক লম্বা সরু বাঁশ। নৌকা চালানোর জন্য ব্যবহৃত বাঁশের দণ্ড।
- খপর** — ‘খবর’ শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ।
- মেয়া** — ‘মেয়ে’ শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ।
- সোমন্ত** — সমর্থ (সংসারধর্ম পালনে), যৌবনপ্রাণ।
- খুনসুটি** — হাসি-তামাশাযুক্ত বিবাদ-বিসম্বাদ বা বাগড়া।
- বেমুকা** — হান-বহির্ভূত। অসংগত।
- পেটে শুকিয়ে লাঘি ঝাঁটা** — পর্যাঙ্গ খাবার না-জুগিয়ে কষ্ট দেওয়ার পাশাপাশি লাঘি ঝাঁটার মাধ্যমে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা।
- কলকেপোড়া হঁ্যাকা** — তামাকসেবনে ব্যবহৃত হুকার উপরে কলকেতে যে আগুন থাকে তা দিয়ে দুর্ঘ করা।
- ডালের বড়ি** — চালকুমড়া ও ডাল পিষে ছেট ছেট আকারে তৈরি করা খাদ্যবস্তু যা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং সবজি-মাছ-মাংসের সঙ্গে রান্না করে খাওয়া হয়।
- পাঁশুটে** — ছাইবর্গবিশিষ্ট। পাঁত্বর্ণ। পাঁকুর। ফ্যাকাশে।
- ব্যঙ্গন** — রান্না-করা তরকারি।
- বাজারের তোলা** — বাজারে বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায়করা খাজনা।
- রসুই চালা** — যে চালার নিচে রান্না করা হয়। রান্নাঘর।
- কাটবার অন্ত** — কাটবার অন্ত।
- একি** — ‘ইয়ার্কি’ শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ। হাস্য-পরিহাস বা রসিকতা।

পাঠ-পরিচিতি

“মাসি-পিসি” গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬)। পরে এটি সংকলিত হয় ‘পরিচ্ছিতি’ (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পঘন্টে। বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে ‘প্রতিহ্য’ প্রকাশিত মানিক-রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড থেকে।

স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর করুণ জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে “মাসি-পিসি” গল্প। আহুদি নামক শুই তরুণীর মাসি ও পিসি দুজনই বিধবা ও নিঃস্ব। তারা তাদের অস্তিত্বরক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞপ বিশ্ব থেকে আহুদিকে রক্ষার জন্য যে বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে সেটাই গল্পটিকে তৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা-উন্নত জোতদার, দারোগা ও গুন্ডা-বদমাশদের আক্রমণ থেকে আহুদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে অসহায় দুই বিধবার দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবনযুক্ত খুবই প্রশংসনীয়। দুর্ভিক্ষের মর্মস্পন্দনী স্মৃতি, জীবিকা নির্বাহের কঠিন সংগ্রাম, নারী হয়ে নৌকাচালনা ও সবজির ব্যবসায় পরিচালনা প্রভৃতি এ গল্পের বৈচিত্র্যময় দিক।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কানাইয়ের সাথে গোকুলের কতজন পেয়াদা এসেছিলেন?

- | | |
|---------|---------|
| ক. দুই | খ. তিনি |
| গ. চারি | ঘ. পাঁচ |

২. মাসি-পিসি আহুদিকে জগুর কাছে পাঠাতে চায়নি কেন?

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ক. নির্যাতনের ভয়ে | খ. স্নেহের আভিশয়ে |
| গ. দারিদ্র্যের কারণে | ঘ. আহুদি যেতে চায়নি বলে |

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেখি নাই যারে, চিনি নাই যারে
 শুনি নাই নাম কভু
 তিনিই আজিকে দেবতা আমার
 তিনিই আমার প্রভু।

৩. উদ্দীপকের প্রভু ‘মাসি-পিসি’ রচনার কার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- | | |
|------------|------------|
| ক. লেখকের | খ. জগুর |
| গ. কৈলেশের | ঘ. গোকুলের |

৪. উভয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা হলো :

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. আধিপত্য | খ. পাণ্ডিত্য |
| গ. স্বেরাচারী | ঘ. অহংবোধ |

সৃজনশীল প্রশ্ন

শাটোর্ফ বিধবা ফাতেমা বেগম। নিঃসন্তান এ বৃক্ষার আগন বলতে কেউ নেই। একদিন সকালে হাঁটতে বেরিয়ে হঠাৎ তিনি একটি মেয়েকে রাস্তায় কাঁদতে দেখেন। বৃক্ষাত শুনে তিনি মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং স্বামীর অত্যাচারে অভিষ্ঠ মেয়েটিকে মাতৃন্মেহে আশ্রয় দেন। স্বামীপক্ষ খবর পেয়ে তাকে নিয়ে যেতে চান। মেয়েটি কোনোভাবেই যেতে ইচ্ছুক নন। বৃক্ষাও মেয়েটিকে যেতে দেননি। এতে তাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে বৃক্ষা মেয়েটিকে সমুদয় সম্পত্তি দান করে যান।

ক. ‘ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়’— উক্তিটি কার?

খ. ‘যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি’— উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের মেয়েটি “মাসি-পিসি” গল্পের আহুদির সাথে কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “মাসি-পিসি” গল্পের মাসি-পিসি ও উদ্দীপকের বৃক্ষা একসূত্রে গাঁথা— মন্তব্যটি যাচাই কর।



সৌদামিনী মালো

শওকত ওসমান

লেখক-পরিচিতি

শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর ইহমান। শওকত ওসমান তাঁর সাহিত্যিক নাম। তাঁর জন্ম ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের দেসমু জানুয়ারি পঞ্চমবঙ্গের হৃগলি জেলার সবল সিংহপুরে।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক শওকত ওসমানের সাহিত্যকর্ম তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন ও প্রগতিশীল ভাবধারার শৈলীক ফসল। শওকত ওসমান দীর্ঘদিন সরকারি কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষকতার আগে তিনি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

শওকত ওসমান গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, রচনালি, অনুবাদ ও শিশুতোষ রচনা মিলে আশ্চর্যের বেশি বই লিখেছেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ‘বনি আদম’, ‘জননী’, ‘ক্ষীতিদাসের হাসি’, ‘চৌরসঞ্চি’, ‘রাজা উপাখ্যান’, ‘নেকড়ে অরণ্য’, ‘পতঙ্গ পিঞ্জর’, ‘জাহারাম হইতে বিদায়’ ইত্যাদি উপন্যাস; ‘পিঙ্গাপোল’, ‘প্রস্তর ফলক’, ‘জন্ম যদি তব বদ্দে’ ইত্যাদি ছোটগল্পগুলি। ‘ক্ষীতিদাসের হাসি’ তাঁর ব্যাপক আলোচিত একটি উপন্যাস।

সাহিত্যসাধনার সীকৃতি হিসেবে তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: আদমজি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, ফিলিপ্স সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই মে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

একটু দাঁড়াও।

আমার বকুল নাসির মোল্লা কোর্টের প্রাঙ্গণে হাঁটতে হাঁটতে হাতে হেঁচকা টান দিয়ে বললে।

কী ব্যাপার?

ব্যাপার আছে। কোর্টের পেছনে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখে আসা যাক।

আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা। খাজনাসংক্রান্ত একটা মামলা ছিল তার পরের দিন। নচেৎ এখানে এই টল্লি-দালাল উকিল-মোকাবের দদলে আর এক তিসি দাঁড়াতে যন চায় না। কিন্তু আমার মামলায় তদবির, যুক্তি-পরামর্শ উকিলের দরদন্তর নাসিরই করে। এদিকে আমার মগজ দৌড়ায় না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে খানা খেতে হয়।

আমার আরও আপনি ছিল অন্য কারণে। আদালতের পেছনে যাওয়া কতটা বিলাত ঘুরে মুক্তা আসার মতো। কোর্ট টিলার ওপর। পেছনে যেতে হলে এক ধাপ নিচে নেমে আবার ওপরে উঠতে উঠতে জান খারাপ। রীতিমতে হাঁপানি ধরে যায়।

তবু নাসিরের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

আমরা দুজনেই চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। এখনও সংসারের গেরো কাটেনি। আর সময় কাটবে কী করে? কিছু না কিছু কাজে লেগে থাকতেই হয়। নাসির পাকাপোক লোক। তার হাতে হাত সঁপেই আমি নিশ্চিন্ত। এই ক্ষেত্রে আর যাড় বাঁকিয়ে জোয়ালের ভার আরও বাড়াতে রাজি নই।

কিন্তু টিলাপথে যথারীতি নেমে আবার ওপরে ঝঠার সময় তামাশা দেখা গেল। আদালতের পেছনে এক ফালি মাঠের ওপর বেশ ভিড় জমে গেছে একটা পান্তিকে ঘিরে। যিশুখ্রিস্টের সেবকটিকে আমরাও দেখতে পাচ্ছি। সামনে টাক-পড়া মাথা, ফরসা লম্বাটে চেহারা। গলায় ক্রস বুলছে।

এ তো আমার চেনা লোক! ব্রাদার জন। নাসির হঠাতে বলে উঠল।



আমরা ক্রমশ ওপরে উঠছি। ধাপে ধাপে পা ফেলতে ফেলতে নাসির উচ্চারণ করে, আরে তুমি চিনবে না। এ হচ্ছে ব্রাদার জন। একবার কেরোসিন ব্ল্যাকম্যার্কেট করার অপরাধে আমার কোটে ব্যাটা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। পরে সে কাহিনি বলব। এখন পা চালাও, দুজনে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। বৃক্ষকালে পাহাড়-চড়া অত সহজ নয়। অকুস্থলে দেখা গেল, লোকজন কম জমেনি। ব্যাপার কী? ব্রাদার জন তখন চিৎকার করছে, এই সম্পত্তি খুব ভালো আছে। Very good ভেরি শুভ।

আমরা দুই কৌতুহলী দর্শক। গিজগিজ ভিড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

পাত্রি হাঁকছে, দর্শকমণ্ডলী। আমি তখন নাসিরকে বললাম, বেশ বাংলা বলে তো।

বহুদিন এই দেশে আছে, বলবে না কেন? নাসির জবাব দিয়েই আবার পাত্রির ওপর চোখ ফেলল। পাত্রি হাঁকতে লাগল, দর্শকমণ্ডলী! এই সম্পত্তি খুব ভালো সম্পত্তি আছে। এক প্লটে বারো ‘কানি’ জমি। পুরুর। আরও আছে তিন একর জমির ওপর বসতবাড়ি, পুরুর, গাছপালা, দশটা নারিকেল গাছ, লিচুগাছ পাঁচটা আরও ফুট-ফলের গাছ আছে। এখন নিলাম ডাকা হবে। প্রস্তুত- ব্রাদার জন দয় নিল।

কৌতুহলী শ্রোতা দর্শক এবার উৎকর্ণ। একজন নেপথ্যে জানতে চাইল, সম্পত্তি কার?

এই সম্পত্তির মালিক হচ্ছে সৌদামিনী মালো সিস্টার।

আজব নাম!

পাত্রি ব্যঙ্গ স্বর শুনে আরও বিনয় সহকারে ঈষৎ জোর-গলায় বলে উঠল, সৌদামিনী মালো চার্টের সিস্টার-বহেন, ভগী ছিল। তিনি এক মাস হয় মারা গেছেন। চার্ট তার সম্পত্তি নিলাম করছে। শ্রোতাদের মধ্যে এবার একটু চাপ্পল্য দেখা যায়, কারণ আকাশের রোদুর বেশ নির্দয়। হঠাত গরম পড়ছে। নেপথ্যে একজন বললে, সাহেব জলদি করো।

অলরাইট উচ্চারণের পর ব্রাদার জন হেঁকে উঠল, সৌদামিনী মালো, সৌদামিনী মালো, তারই সম্পত্তি এবার নিলাম শুরু হবে। আমাদের পয়লা ডাক পাঁচ হাজার। তারপর আপনারা বিড়ি করুন। ‘হায়েস্ট বিড়ার’ উচ্চতম মূল্যে যিনি ডাকবেন, তিনিই পাবেন।

পাত্রির সঙ্গে দুজন কুলি শ্রেণির মুবক ছিল। তাদের দিকে চোখ ইশারামতো একজন হেঁকে উঠল, পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার।

তার ডাকের মধ্যে জনান্তিকে একজন ডাক দিলে, পাঁচ হাজার পাঁচশ। পাত্রির সহকারী হাঁকলে পাঁচ হাজার পাঁচশ। আর কেউ ডাকবেন। কিন্তু আর কারো হাঁকডাক শোনা যায় না। অবিশ্য দর্শক-মধ্যে গুজগুজুনি চলছে নানা কথা। পাত্রি-সহকারী আবার হাঁক দিলে, পাঁচ হাজার পাঁচশ-এক-পাঁচ হাজার পাঁচশ - দুই-। হঠাত একজন ডাক বাঢ়ালে, ছ-হাজার।

ভেরি শুভ, ব্রাদার জন বলে উঠল। তার সহকারী ছ-হাজার রবে আরও কয়েকবার হাঁক দিলে। শেষে আর একজন ডাকিয়ে বাঢ়াল। সে সাত হাজার দাম তুলে দিলে।

আমরা বেশ মজা দেখছিলাম। কিন্তু বাড়তি টাকা তো নেই। পেনশনে যে কটা টাকা পাই তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলে। নচেৎ এত বড় সম্পত্তি পাওয়া যেত। বড় আফসোস হতে লাগল। দাঁড়িয়ে ছিলাম, সম্পত্তি কোন ভাগ্যবানের পাতে যায় তা দেখার জন্যে।

নিলাম জমে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যে। কিন্তু ন-হাজারের পর আর দাম শতে শতে শাফ দিয়ে যায় না। একজন ডাকলে ন-হাজার ন-শ পঞ্চাশ। আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়ল। দশ হাজার।

পাত্রি-সহকারী হাঁক দিতে লাগল দশ হাজার এক - দশ হাজার দুই -। তারপর সে স্তব্র। জনতা নীরব। তিন বলার আগে একজন মাত্র পঁচিশ টাকা যোগ দিলে। দশ হাজার পঁচিশ।

গুদিকে রোদুর বাড়ছে। বৃক্ষকালে তবু কেন দাঁড়িয়েছিলাম? আজ বলতে লজ্জা নেই। হয়ত সম্পত্তির লোডে। ক্ষুধার্ত কালেভদ্রে অপরের খাওয়া দেখেও নাকি শান্তি পায়।

শেষ পর্যন্ত আরও পঁচাঙ্গের টাকা দাম বাড়ল। অর্থাৎ দশ হাজার একশ। বোঝা গেল, নিলাম ডাকিয়েদের পক্ষে শুকিয়ে যাচ্ছে। রস নাদারাখ। যিনি শেষ পঁচিশ টাকা বাড়িয়েছিলেন, ভিড়ে তাঁকে দেখা গেল না। তবে হাত নাড়ছিল সে অপরের কাঁধের ওপর দিয়ে।

পাঞ্জি-সহকারী হাঁক দিলে, দশ হাজার একশ-এক, - দশ হাজার একশ-দুই-। সে থামলে তারপর। পাঁচ ছ-মিনিট কেটে গেল। আর তিন উচ্চারণ করে না সে। এবার লোকটাকে দেখলাম, যে দশ হাজারের ওপর একশ বাড়িয়েছিল। মাঝবয়সী লোক, কিন্তু বুড়োবুড়ো ঠেকে। প্যান্ট-কোট-টাই সমন্বিত। মাথায় মখমলের টুপি। বাজি মেরে দিয়েছে, এই ভাব চোখেমুখে। কতক্ষণ আর নিলাম-ঘর চুপ থাকতে পারে? কিন্তু ‘তিন’ আর উচ্চারিত হয় না। দর্শক অধৈর্য। সেও জবাব চেয়ে বসল।

এখন বেশ মজা দেখে গেছে। কৌতুহলী দর্শক তাই দাঁড়িয়ে থাকে। রোদুর সত্ত্বেও নড়ে না। ব্রাদার জনের মুখের দিকে তাকাই। সেখানে কালো আর ফিকে সবুজ রং খেলা করছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কিন্তু একটা কাশি দিয়ে হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে উঠে সে হাঁক মারলে, দর্শকমঙ্গলী।

কৌতুহল আরও বেড়ে যায়। নিলামদাতা এবার কী করবে।

ব্রাদার জন মুখ খুললে, যেন গির্জার পুলপিট অর্থাৎ প্রচারবেদি থেকে সার্বান দিচ্ছে এমনই কষ্টস্বর : ভ্রাতৃগণ, আজ নিলাম এখানেই রহিত থাকবে। আগামীকল্য পুনরায় ডাকা হবে। আজ লোক খুবই কম। কাল দশ হাজার এক শ হইতেই আরম্ভ হইবেক। আমেন।

দর্শকদের মধ্যে অনেক শুল্কানি শুরু হলো। আর টুপিপরা সেই শেষ পৌঁচ-মারা নিলাম-শিল্পী তো রেশেই খুন। ব্রাদার জনের চারদিকে জটলা পেকে গেছে। সেখানে ভদ্রলোক জোর গলায় বলছে, This is sheer hypocrisy এটা জোচুরি... ইত্যাদি। আমার কৌতুহলের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ভিড়ের সাম্মিধ্য এই ক্ষেত্রে আরামদায়ক। আমি তাই পা বাড়াই। নাসির আমার হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে বললে, আরে ভিড়ে সেইও না।

একটু মজা দেখে যাই।

-মজা দেখে আর কাজ নেই। যা গরম সর্দিগর্মি হয়ে যাব, চলো বাড়ি যাই।

-একটু দেখে যাই না।

-দেখে কাজ নেই। আমার কাছ থেকেই সব ব্রতান্ত শুনে নিও। আকাশ সূর্য তখন দোজথের পিণ্ড বললেই চলে। আমি নাসিরের কথা মেনে নিলুম।

আবার ঢাক্কাই-উত্তরাই। ঝঠানামার ব্যাপারটা এমন কষ্টকর। নাসির হেসে বললেন, আরও মজা দেখতে গেলে আমাদের মাজা ভেঙে যেত।

ব্রাসিকতার দিকে আমার খেয়াল ছিল না। আমি বললাম, নাসির, ব্যাপার কী?

সে বেশ মাথা দুলিয়ে হঠাৎ ব্যঙ্গ আর ত্রুটা-মাখানো এক রকমের হাসি ছাড়িয়ে শেষে মুখ খুলল, বাবা, এর নাম ব্রাদার জন।

জন?

হাঁ, ও এক জন বটে। আমার কোটে কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেটের দায়ে অভিযুক্ত। আমি জিজেস করেছিলাম, What have you to say তোমার কী বলার? জন জবাব দিল End justifies the means. উদ্দেশ্য দিয়েই উপায়ের বিচার করা উচিত। আমি ব্ল্যাকমার্কেট করিয়াছি ভিক্ষুকদের লঙ্ঘনানায় ভাত প্রদানের জন্য।



-অপরাধ স্বীকার করলে?

-হ্যা। প্রথম অপরাধ। তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ব্যাটা পাকা বদমাশ। আজ দেখলে না, কীভাবে ম্যানেজ করলে।

-কী ম্যানেজ?

-ওই সম্পত্তির দাম কমসে কম পঁচিশ হাজার। দশ হাজারে ছাড়তেই পারে না।

নাসির আমার দিকে মুখ কুঁচকে চোখ নাচিয়ে, জনের বাহাদুরির অবস্থাটা ফোটাতে চাইলে।

-কিন্তু সৌদামিনী মালোর সম্পত্তি, আর নিলাম করছে ব্রাদার জন? এ ব্যাটারটা কী?

নাসির তার সাদাচুল মাথা দুলিয়ে চোখের কোনায় হাসি মাথিয়ে জবাব দিলে, সেটাই তো মজা।

-মজা?

-শোনো। সে অনেক কথা। ব্রাদার জনের মত চিজকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক বয়ান প্রয়োজন।

-তো বয়ান করো।

বেলার দিকে খেয়াল আছে? খেয়েদেয়ে এসো সঙ্গ্যের আমার বাড়ি, তখন সব সবিস্তার বলৰ ব্রাদার জন-সৌদামিনী মালো উপাখ্যান।

-না, অত দেরি করতে পারব না। খেয়ে একটু জিরিয়েই বিকেলে আসছি। বিকেলের চা তোমার ওখানেই খাব।

-বেশ।

কথায় কথায় আমরা রাস্তায় এসে পড়েছি। উত্তরাই শেষ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাতে লাগলুম।

জানো সাজ্জাদ, তাৰছি কোথা থেকে আৰষ্ট কৰব। ব্যাপারটা বেশ জটিল। নাসির মোঝা এখন বুঢ়ো হয়ে এসেছে বলতে পারো। তাই তয় পাছে। তবে শুরু করতে হয়।

সৌদামিনী মালো নবীগঞ্জের অধিবাসিনী। নবীগঞ্জে যে ব্যাপটিস্ট মিশন আছে, তারই কাছাকাছি। তুমি ওই অঞ্চলে কত দিন সার্কেল অফিসার ছিলে, জায়গাটা তো চেনই। অবিশ্য তখন ওখানে মিশনের পাদ্রি ছিল ফাদার জনসন। লোকটা ভালোই। এদের আবার ভালোমন্দ কী? ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত পাকা করতে এদের এখানে সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হতো, যেন দরকার মতো আউটপোস্টের কাজ করতে পারে। গরিব দেশে এখানে-ওখানে দু-চারটে দাতব্য ডিসপেন্সারি কি এক আখটা স্কুল চালায়। লোকেরা ভাবে, আহা কী সব দয়াৱ প্রাণ; ব্রিটিশৰা ভালোই জানত, The nearest way to poor man's heart is down their throat- ইংৰেজৰই প্ৰবাদ। ওৱা এইভাবে কিছু কিছু খ্রিষ্টানও বানায়। তারা তো ইংৰেজের খয়ের খাঁ বনে যেত। বলতে পারো- ইংৰেজ বাহাদুর এমনভাৱে কিছু দেশি বাচ্চা তৈৰি কৰত। নদীয়াৱ কাছে তো কত মুসলমানকে ওৱা এইভাবে খ্রিষ্টান কৰে ফেলে। পড়োনি নজুকলের ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’? আসলে এৱা কেউ যিশুখ্রিষ্টের ভূত্য নয়, এৱা ব্রিটিশ সম্রাজ্যের ভূত্য। হ্যা, কোথা থেকে কোথা এসে পড়লাম। একটু ধৈৰ্য ধৰে শোনো। বৃন্দকালে তাল রাখা দায়। কথায় কথায় অনেক দূৰ চলে গেছি।

হ্যা, সৌদামিনীৰ স্বামী জগদীশ মালো ছিল পেশায় আৱদালি। কিন্তু বেজায় তুখোড় লোক। প্রভুৰ মন জুগিয়ে চলা শিল্প সে বেশ রঞ্চ কৰেছিল। যে কোনো অফিসারকেই খুশি কৰার পছ্টা আবিঙ্কারে দক্ষ জগদীশ মালো। ফলে, কলা-মূলো ভালোই পেত। বখশিসে মোটা পেট, এমন আৱদালি তুমি দুটি খুঁজে বেৰ কৰতে পাৱবে না। আমি অবিশ্য তাকে দেখিনি। আমারও শোনা কথা। সন্তাৱ বাজার। পুৱা বেতন বাঁচল, তার ওপৰ উপরি ইনকাম। আৱ সে তো মিশনের স্মার্ট হতে চাহিনি। চেয়েছিল, গ্রামে দু-চার বিঘে জমি-জিৱেত, একটু অন্টন-মুক্ত দিন-ঘাপন। পনেৱ-বিশ বছৱেৰ চাকৰিতে জগদীশ তা পুৰিয়ে নিলে। কিন্তু বেচাৱাৰ একটা বেশ দুঃখ ছিল। ছেলেপুলে নেই। সৌদামিনীৰ স্বামী ছিল কৰলে, আৱ একটা বিয়েই যুক্তিযুক্ত; অস্তত চেষ্টা কৰে দেখা যাক। বংশ তো শুম কৰে দেওয়া চলে না? কিন্তু বেচাৱা বৱ সাজাৱ অবসৱ পায়নি। হঠাত মৱে গেল।



অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক। তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে গেছে। কু-লোকেরা রাটিয়ে দিলে সৌদামিনী তাকে বিষ খাইয়েছে। বৎশ রঞ্জ হোক, কিন্তু অপরের সন্তানে নয়। সৌদামিনী ভিতরে হয়ত এমন একটা দুর্ঘট পণ করে বসেছিল। এসব খোদাকেই মালুম। এসব ক্ষেত্রে কোনো ঘেয়ে কী করে, বোঝা দায়। কিন্তু তৃতীয় বলছ, স্বামীকে হত্যা করবে— তা অনুমান করা মুশকিল। মুশকিল কিছুই নয়। এমন হতে তো পারে। আমিও বলছি, শুজবের কথা। কারণ, এসব নিয়ে আর কোনো তদাকর হয়নি। তখন সৌদামিনীর বয়স চাল্লিশ পার। জগন্মীশ পঞ্চাশের সামান্য এদিক কি ওদিক। হয়ত ঘোবনের খাই নেই, তবু সতীন বা সতীনের ছেলে আসবে— তা সৌদামিনী মনের সঙ্গে মেলাতে পারেন। অতএব ‘দুষ্ট গৱৰ্ম চেয়ে শূন্য গোয়াল’ আচ্ছা। আমিও বলছি, অনুমানের কথা। যাক, ও-পাট চুকল। সৌদামিনী তখন একা। কিন্তু সেও ছঁশিয়ার ঘেয়ে। আর রবদব ছিল জোর। তখনও দেহ আছে, তার ওপর সম্পত্তি। গ্রামের দু-চার জন ছাঁচের মতো হয়ত হোঁ হোঁ শব্দে ঘুরঘূর করছিল। কিন্তু সৌদামিনী গোপনেও জগন্মীশেরই বউ হয়ে থাকল। অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। অবিশ্য জগন্মীশ একটা কাজ করে যেতে পারত। কোনো আজীয়ের নামে সম্পত্তি লিখে পড়ে সৌদামিনীকে জীবনস্ত্রের অধিকারী করে দিতে পারত।

কিন্তু তা হওয়ার জো ছিল না। এক নিকট আজীয় ছিল জেঠেভুতো দাদা। সে স্বদেশি করত। জগন্মীশ সরকারের পেয়ারের লোক। অন্য দিকে স্বদেশি বাবু। সাপে-নেউলে আর কী দিয়ে বস্তুত হবে। এসব কথা তোমাকে শোনাচ্ছি, তাহলে সব বুঝতে পারবে। জগন্মীশ তো মরল। কিন্তু জের কাটল না। বিধবার সম্পত্তির দিকে ওই আজীয়ের লোভ সহজে কি মেটে। অবশিষ্ট আট দশ বছর এইভাবে কেটে গেছে। স্বদেশি বাবুর নাম মনোরঞ্জন মালো। তারও বয়স হয়ে গিয়েছিল। ছেলেপুলে আছে। জেল-টেল খেটে গ্রামে ফিরে সে নামে স্বদেশি বাবু রইল। সাদা টুপিটা পকেটে গুঁজে অথবা দরকার হলে মাথায় দিয়ে সেও মন দিলে সংসার গোছাতে। গ্রাম্য দলাদলির মধ্যে মাথা গলান এবং তৎ-মন্ততার দুচার পয়সার দালালি বা টান্নিগিরি কমিশনে একটা আয়ের পথ তো খোলা যায়। এককথায়, স্বদেশি বাবুর শুভ্রতা তার টুপির মধ্যেই নিবন্ধ রইল। পাশাপাশি বাড়ি, সুতরাং বিধবা বৌদির দিকে নজর পড়া স্বাভাবিক। তুল বললাম, বৌদি নয়, সম্পত্তির দিকে। কিন্তু সৌদামিনীর শরীর গৌর আর মুখ সুন্দর হলেও, কর্তৃর হওয়ার মতো যথেষ্ট তেজ ছিল। অবরে-সবরে এই মানুষ আবার ইরার চেয়ে শক্ত হতে পারে। যত বাগড়া তো সেইখানে। নচেৎ মনোরঞ্জন মালো কবে দুর্গ ফতে করে ফেলত। মনোরঞ্জন মালো প্রথম প্রথম কতগুলো স্ট্র্যাটেজি— পাঁয়তারা কষে নিলে। একদিন হয়ত সকালে দেখা গেল, সৌদামিনীর কলাবাগান থেকে কয়েক কাঁদি পাকা ফল গায়ে। কিছু চারাগাছ মাড়ানো। কিন্তু বিধবা পাড়াপড়শিদের খুব মিষ্ট ভাষায় ব্যাপারটা জানিয়ে এল। আর কিছু না। তারপর মাঝে মাঝে রাত্রে সে বন্দুক ছুড়ত। কমিশনার সাহেবে জগন্মীশকে নিজের বন্দুক দিয়েছিলেন বখশিসকরণে। অন্তর্খানা তখনও সৌদামিনীর কাছে আছে। তাছাড়া তার তাক আশ্চর্য। বাড়ির উঠানে চিল চুকতে সাহস পায় না। মনোরঞ্জন ফেল মারলে। বৌদির চেহারা সুন্দর, কিন্তু তেজ তেমনি অপর্যাপ্ত। অবিশ্য সৌদামিনীর হাতে কয়েকটা সোক ছিল। তার জমিনের চাষি, কয়েকজন। তারা বলত, মায়ের অন্তে প্রতিপালিত, মার তো অপমান হতে দিতে পার নে। স্বদেশি বাবুর সেও একটা ভয়। ছোটো লোকগুলো কখন কী করে বসে, বলা যায় না। আর সৌদামিনীর অন্তর ছিল। বিপদে-আপদে সে বহু মানুষকেই সাহায্য করত। বেড়ার মধ্যে গেরহুব মুরগি দেখলে জিতে জল-সরা শেয়াল যেমন ঘন ঘন তাকায় আর লোভের চোটে ছটফট করে, মনোরঞ্জন মালো সেই রকম অবস্থায় নতুন পাঁয়তারা ভাঁজতে লাগল। কী করা যায়, কী করা যায়। অবিশ্য সময়ও এদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, তা মনে রেখো। বছর যাচ্ছে বছর আসছে। সৌদামিনীর চুল ক্রমশ সাদা, দেহে প্রোঢ়ত্বের রেখা। কিন্তু আদাওতি ঠিক চলছে। সৌদামিনী বনাম স্বদেশি বাবু।

ঠিক এই পর্যায়ে দেখা দিল ব্রাদার জন। সে তো পরকালের চেয়ে ইহকালের খবর চের বেশি রাখে। তারপর মিশনের অবস্থা ভালো নয়। ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেঁধেছিল। ফলে ডেনারারা আর খাত-মতো চাঁদা পাঠায় না বা হার দিয়েছে কমিয়ে। সুতরাং আয়বৃদ্ধির উপায় একটা করতেই হয়। ব্রাদার জন এলাকার খবর জানত।



মনোরঞ্জনের সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। কারণ, বাবু এলাকার সবচেয়ে ভালো ইংরেজি কইয়ে-বলিয়ে। ভাষা মাঝেক্ষণিক একটা অদৃশ্য যোগসূত্র গড়ে উঠে। অবিশ্বাস্য তখন পাদ্রির ভূমিকা তত প্রকট হয়নি। আর বাবুর সঙ্গে কী কথাবার্তা হতো তা খোদাকেই মালুম।

কিন্তু সৌদামিনী সকলের মুখে ছাই দিয়ে বসল।

ব্যাপারটা বলছি। সৌদামিনী মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আট-দশ-বিশ-মাইল দূরে দূরে তার মাত্তুলোর কিছু ভাইবোন কুটুম আছে। এক জায়গায় থেকে থেকে মানুষের প্রাণ তো হাঁপিয়ে উঠে। সৌদামিনী বছরে এমন দু-একবার দম ফেলতে বেরুত। তখন ঘর পাহাড়া দিত তার চারি এবং কামিনেরা। সৌদামিনী এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ, ওরা রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে আর কোনো আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এবার সে শুধু বেড়িয়ে এলো না, সঙ্গে নিয়ে এলো একটা বছর দুয়েকের শিশু। এক আত্মীয়ের কাছ থেকে আনা। পোষ্যপুত্র রাখবে সৌদামিনী। পোষ্যপুত্র? সম্পত্তির দিকে যারা চোখ রাখছিল, তারা এবার আকাশের দিকে চোখ তুললে। সম্পত্তির নতুন মালিক জুটে গেছে। আর শুধু মালিক নয়, চিরহায়ী উত্তরাধিকারী। সৌদামিনী তাকে মানুষ করে তুলতে নিজের সামান্যতম আরাম পর্যন্ত বিলিয়ে দিলে। এবার সৌদামিনী জননী; যেন সদ্য আঁতুড়ঘর-ছাড়া। চরিষ্ণ প্রহর চোখে চোখে রাখতে লাগল ছেলেটাকে। নাম রাখলে হরিদাস। হরিদাস বেড়ে উঠতে লাগল। চেহারাটা ফরসা, বেশ খাড়া নাক। আর চোখ দুটো খিলিকে ঠাসা। সৌদামিনী হরিদাসের মধ্যে জীবনের সমস্ত পূর্ণতার একটা প্রতীক খুঁজে পেলে যেন। বেশি বাইরে যেতে দিত না তাকে। কারণ, পাঢ়াপড়াশির চক্ষুশূল। ওর জন্যে আলাদা একটা শিক্ষকই রেখে দিলো বাড়ি এসে পড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। আরও পাঁচ-ছ বছর এভাবেই কেটে গেল। সৌদামিনীর অবিশ্বাস চুল পেকে গেছে। চেহারা নিষ্পত্তি। কিন্তু তার মুখাবয়বে একটা পরিত্তির আভা ছিল। সেই মুখের দিকে তাকালে তোমার চোখ খুঁজে পাবে স্নিফ্ফতা, দয়াসংজ্ঞাত এক রকমের তাপহর স্পর্শ। অবিশ্বাস মনোরঞ্জন বসে নেই। তারও বয়স বাড়ছে। আর তৎসঙ্গে সংস্কার। অর্থাৎ সর্ব রকমের বোঝা। সম্পত্তির দিকে চাইলে এখন চোখ পুড়ে যায়। নতুন শরিক এসে জুটেছে। হরিদাসের বয়স বারো। একটা যেমের মানুষের কাছে হেরে যাবে মনোরঞ্জন মালো? একটা কিছু করতে হয়। ব্রাদার জনের যিশন চলছে না ঠিকমতো। কুজি-রোজগার প্রয়োজন। একদিন ওদিকে গেলে কিছু একটা যুক্তি করা যায়। মনোরঞ্জন মনে মনে এসব লক্ষাভাগ করেছিল নিশ্চয়। আঁচ করতে পারো সাজ্জাদ। ... হ্যাঁ, জ্ঞাতি শক্র বড় শক্র। মনোরঞ্জন মালো এবার একটা বোম ফাটালে, স্বদেশি আমলে স্বাত্তাসবাদীদের সঙ্গে থেকেও যা সে করতে সাহস পায়নি।

সে গ্রামবয় প্রচার করে দিলে সৌদামিনীর পোষ্যপুত্র জাতে নমশ্নূন্দ নয়, প্রাক্ষণ। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ। কী তয়ানক শাস্ত্রবিরক্ত পাপকর্ম। প্রাক্ষণের জাত যেরেহে এক শূদ্রাণী। রাম, রাম। মনোরঞ্জন এই চিলে পাখিকে কাত করে ছাড়লে। আগে শক্রতা বা ঈর্ষা যা বলো, ছিল ব্যক্তিগত। এবার তা সমাজগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। গ্রামে দু-চার ঘর প্রাক্ষণ-কায়েত-মহিয় ছিল, তারা দাঁতে আঙুল কাটলো। ছি ছি, এমন কথা কে কোনদিন শুনেছে। যাদের বয়স বেশি তারা মন্তব্য করল : কলি কাল। সৌদামিনীকে গ্রাম-সমাজের কঠিনগতায় দাঁড়াতে হলো। সে বেশি জোর দিয়ে হলপ্রক করে বললে, হরিদাস শুন্দু- তার দূরসম্পর্কীয় এক গরিব আত্মীয়ের ছেলে। পরিস্থিতি আপাতত এখানে চুকল। কিন্তু সৌদামিনীর বিরক্তে তো মনোরঞ্জন একা নয়। আরও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আছে। সুতরাং গ্রামের অচল নিষ্কর্মী প্রহর তারা সহজে যেতে দিলে না। খৌজ নিয়েই দেখা যাক। যদিও বিশ মাইল দূরে, কিছু রাহ খরচ যাবে, যাক। আহা, ভগবান যাকে ডাক দেয় সে তো হেঁটে হেঁটে বারানসী চলে যায় তৌর করতে। এই দশ ক্রোশ পথ আর তারা সামাল দিতে পারবে না? বোঝা গেল ওদের সেবার ভগবান ডাক দিয়েছিল। একজন দেব-উৎসর্গিত প্রাণ বারোয়ারি রাহা-খরচে সৌদামিনীর সেই আত্মীয় বাড়ি থেকে খৌজ নিয়ে ফিরল। বাজিমাতা মজকুর ব্যক্তির কোনো ছেলেই নেই। সব যেয়ে। সৌদামিনী ঝুট বলেছে, মিথ্যাবাদীনী। সমস্ত গ্রাম তোলপাড়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ছিল, সেটা যুধিষ্ঠিরের দল থামাতে চায়। তো নচেৎ কল তো ভেঙে যেতে পারে। সৌদামিনী এবার তো বেশ রোয়াবের সঙ্গে জবাব দিলে কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করলে না। সমস্ত গ্রাম তার বিরক্তে। আর জ্ঞানুম

শুরু হলো। তার ছাগল মাঠ থেকে আর ফিরল না, দুধেল দুটো গাই হারিয়ে গেল। এমন ছোটোখাটো নিভা নির্বাচন। একদিন ব্রাদার জন এই সময় থামে এল। ইহকালের খবর সে পরকালের চেয়ে কম রাখে না, আগেই বলেছি। ব্রাদার জন সব শুনে গ্রামবাসীদের ঘিটিয়ে ফেলতে বলল ব্যাপারটা, সৌদামিনীর সামনেই। একটা ছেলে মানুষ করছে ... মানুষ ... সে শূন্দ আছে না কাহেত আছে গড় এসব দেখিতে বারণ করিয়াছে ... এই জাতীয় নানা বাণী ছাড়লে। সৌদামিনী কাঁদতে কাঁদতে ব্রাদার জনকে উকিল পাকড়ালে একটা মিটমাটের জন্যে। মনোরঞ্জন মালোর সঙ্গেও একপাশে চুপি চুপি কী কথা হলো তা ব্রাদার জনের গড়ই জানে। বিষয় নিষ্পত্তি প্রয়োজন। কিন্তু মনোরঞ্জন মালো তো সম্পত্তি নিষ্পত্তি চায়। ব্রাদার জন বললে, দুদিন সবুর করো, আমি ফয়সালা করিয়ে দিবে। আর মনে রেখ, সৌদামিনী এখন কোণঠাস। এক হঞ্চায় তার চুল শন হয়ে গেছে। আগে তো বুড়ি মনে হতো না, এখন তো শৃশানযাত্রীর শামিল ধরে নিতে পার। বুড়ি সেই অবস্থায় ওকে যারা দেখেছিল, তাদের কাছেই শুনেছি। হরিদাস আর বাড়ির বাইরে যেত না। যেতে চাইলে সৌদামিনী কেঁকেকেটে বাধা দিত। চতুর্দিকে ঘোলাটে আবহাওয়া। ব্রাদার জন এই থামে আসে কিন্তু সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করে না। শেষে কয়েকজন মরিয়া-ধর্মপুত্র তো একদিন সৌদামিনীর বাড়ি হামলা করে বসল। কিন্তু শান্ত প্রকৃতির বুড়ো মানুষ এই সৈশ্বর-প্রাণ ব্যক্তিদের থামল। সৌদামিনী বাপের বেটি। বাপের দুধ খেয়েই বোধ হয় মানুষ- বেরিয়ে এল একদম নিরন্ত্র, যদিও বাড়িতে বন্দুক আছে। কিন্তু জাতীয় সামনে সে এবার বোমা ফাটাল। বোমাও বোধ হয় এত শব্দ তুলতে পারত না। সৌদামিনী চোখ থেকে শিবের মতো আগুন ছড়িয়ে বললে... কী বললে শোন। তার কথাটাই মুখজবানি পেশ করতে হয়। সৌদামিনীর ওপর তখন যেন কিছু ভর করেছিল।

-শোন আভাগির ব্যাটারা, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের দল ... আমার হরিদাস শূন্দও নয়, ত্রাঙ্গণও নয়। শোন, কী। তোরা তো জানিস। আমি বছরে একবার-দুবার আজীয়বাড়ি যাই। তখন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, একদম পুরো কোটাল। গাঁয়ে গাঁয়ে হাজার দু-হাজার লোক মরছে হঞ্চায়। আমি ফিরছিলাম হরিষ্টক থেকে ... আলোকডাঙ্গার কাছাকাছি আসতে বেহারাদের তেষ্টা লাগল। একটা আমগাছের তলায় পালকি রেখে ওরা গেল খেতে। পুরুর আছে, বিষে দুই জমি দূরে। আমার সামনে আবার একটা ধানক্ষেত, ধান পেকে গেছে। আর পনের দিন বাঁচলে কত লোক বেঁচে যেত নিজের ক্ষেত্রের চাল খেয়ে; কিন্তু তা আর হলো কই। হঠৎ শুনলাম, ধানক্ষেত থেকে শিশুর কান্না আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা লোক জমিন আঁকড়ে মরে পড়ে আছে। মুখে দাঢ়ি। তার পাশে একটা মরা মেয়ে। তার পাশে একটা ছেলে বসে মরা মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে থেকে থেকে; আবার উঠে বসছে। কিন্তু সেও চিটিটি করছে। ধুকছে। ছেলেটার পানে চাইতে আমার দিকে হাত বাড়াল। চোখের চাউলি কী করুণ। আমিও অজানিতে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বছর তিনেকের ছেলে, কিন্তু অনাহারে অনাহারে দেড় বছরের বেশি দেখায় না। কোলে তুলে নিলাম ... নিয়ে এলাম ... পালকির ভেতরে ঝুকিয়ে রাখলাম ... আফিম ধাই, সঙ্গে দুধ ছিল ... দুধ দিতে ছেলেটা সুমিয়ে পড়ল। বেহারারা টের পেলে না। এক আজীয়ের কাছে তিন মাসের জন্যে রেখে এলাম দুশ টাকা দিয়ে। ভালো খাওয়া দাওয়ায় ছেলেটা বেশ তাজা হয়ে উঠল। তার পর নিয়ে এলাম। ওর আসল বাবা সেই মুসলমান চার্ষি ... আমার হরিদাস মুসলমান ... যেন বাজ পড়ল উপস্থিত জনতার ওপর।

রেশ কাটল কয়েক মুহূর্ত পর। কিন্তু সৌদামিনীকে কেউ একটা উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেল না। তামাশা দেখতে দু-চার জন মুসলমান পর্যন্ত জুটেছিল। এখন ব্যাপার আরও গভৰ্ণে গঢ়াতে পারে, তাই ধর্মপুত্রারা যে যার মানে মানে বাড়ি ফিরলে। বুবাল আর গোলমাল বিধেয় নয়। ব্যাপার আরও থিতিয়ে দেখা যাবে।

মনোরঞ্জন অস্ত তা-ই ভেবেছিল। তাই ভেগেছিল।

সেই রাত্রে হরিদাস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সৌদামিনী ব্রাদার জনকে ডাকিয়ে আনলে এক হঞ্চা অপেক্ষার পর। সে খ্রিষ্টান হবে। ব্রাদার জন প্রথমে বারণ করলে, উপদেশ দিলে, ধর্ম ত্যাগ ভালো নয়। শোনা কথা বলছি। ধরে নাও তা হতেও পারে। নৌকা ঠেলে দিয়ে বিয়াইকে ‘আজ থাকলে হতো’ বলার মতো।



সৌদামিনী প্রিষ্টান হয়ে গেল। তিনি চার দিনের মধ্যে তার সমস্ত সম্পত্তি মিশনের নামে লিখেপড়ে দিলে পর্যন্ত। নিজে উঠে গেল মিশনের বাড়িতে। ব্রাদার জন সম্পত্তি দেখার জন্যে নতুন লোক নিয়োগ করলে। সৌদামিনী এক মাসের মধ্যে পাগল হয়ে গেল। বদলি হওয়ার আগে এক সিস্টারের মুখে শুনেছিলাম, সৌদামিনী কাঁদত আর চিংকার দিত :

... আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলে— হে যিশু, ও হরি, হে আল্লা, আমার যবন হরিদাসকে ফিরিয়ে দে— ফিরিয়ে দে—

আজই জানতে পারলাম, এতদিনে হতভাগিনীর হাড় জুড়িয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

গেরো

— বঙ্গন। বাঁধন।

টন্নি

— এটর্নি। আমরোজার।

মোগলের সাথে খানা খেতে হয়

— বাধ্য হয়ে নতি স্থাকার করতে হয়। পরিস্থিতির চাপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মতি দিতে হয়। ‘পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে’ — প্রবাদটির অনুসরণে রচিত বাক্যবন্ধ।

অকুস্তুল

— ঘটনাস্তুল।

উৎকর্ণ

— কান খাড়া করে আছে এমন।

বিড়িৎ

— নিলামে দাম হাঁকা।

হায়েস্ট বিডার

— সবচেয়ে বেশি দাম হাঁকিয়ে।

জনান্তিকে

— সংগোপনে। জনগণের আড়ালে।

শুজগুজুনি

— শুণুন।

নাদারাঙ

— বিহীন। শূন্য। অভাব। নাই।

সার্মান

— শির্জার বেদি থেকে প্রদত্ত ধর্মীয় বা নৈতিক অভিভাবণ।

sheer

— পুরোদস্তুর। নির্ভেজাল।

hypocrisy

— কথায় এক কাজে আরেক। ভঙ্গামি। মোনাফেকি।

লঙ্গরখানা

— বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের স্থান। অন্নস্তু।

বয়ান

— বিবরণ। বর্ণনা।

ব্যাপ্টিস্ট মিশন

— প্রিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রচার ও দীক্ষা কেন্দ্র। baptist mission.

সার্কেল অফিসার

— কার্যক্রম পরিমণ্ডলের কর্মকর্তা। circle officer.

খাই

— কামনা-বাসনা। উচ্চাভিলাষ। চাহিদা।

রবদব

— জাঁকজমক।

অবরে-সবরে

— সময়ে-অসময়ে।

ফতে

— জয়।

স্ট্র্যাটেজি

— লক্ষ্য ও সাফল্য অর্জনের কৌশল বা নীতি। strategy.



| | |
|---------------------|--|
| আদাওতি | — শক্রতা। বিদেব। |
| ডোনার | — দাতা। donor. |
| মালুম | — অনুভূত। বোধগম্য। আগত। |
| কামিন | — নারী শ্রমিক। |
| তাপহর | — উত্তাপ দূর করে এমন। |
| মাহিয় | — কৈবর্ত জাতি। |
| ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির | — ব্যঙ্গ অর্থে সত্যবাদিতার ভানকারী, অতিশয় মিথ্যাবাদী বা রাটনাকারী। |
| বারোয়ারি রাহা খরচে | — সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে সংগৃহীত পথ খরচে। |
| মজকুর | — পূর্ববর্ণিত। |
| রোয়াব | — সম্মত। |
| কায়েত | — কায়স্ত। |
| জান্তা | — জোর করে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক চক্র। এখানে আক্রমণকারী। |
| মুখজবালি | — মুখের ভাষায়। |
| কোটাল | — অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় সমুদ্র বা নদীতে জলস্ফীতি। ভরা জোয়ার। এখানে সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত। |

পাঠ-পরিচিতি

“সৌদামিনী মালো” গল্পটি শওকত ওসমানের ‘নির্বাচিত গল্প’ (১৯৮৪) থেকে সংকলিত হয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিয়ন্ত মানবাত্মার যে অবমালনা চলছে তাই একটি দিক ফুটে উঠেছে শওকত ওসমানের “সৌদামিনী মালো” গল্প। অর্থ সম্পদ লালসা যে মানুষকে কীভাবে অন্যায় ও দুষ্কর্মের পথে চালিত করে, ইন উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করতে তাড়িত করে, এমনকী সাধারণ মানুষের ধর্মবোধকে প্ররোচিত করে মানবতার বিরুদ্ধে তাই অন্যতম বৃপ্তিত্ব ফুটে উঠেছে এই গল্পের কাহিনিতে। বর্ণিতিক হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি মালো সম্প্রদায়ের নিঃসন্তান বিধবা সৌদামিনী স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূচ্যে ধানি জমি, বসতবাড়ি, পুরু, কলের বাগানসহ কয়েক একর সম্পত্তির মালিক হয়। এই সম্পত্তির ওপর নজর পড়ে সৌদামিনীর জাতি দেবর মনোরঞ্জনের। মনোরঞ্জন ছলে-বলে কৌশলে সম্পত্তি নিজের হস্তগত করার চেষ্টা করলেও দৃঢ়চিত্ত সৌদামিনীর সাহস ও লোকপ্রীতির কারণে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সন্তানহীনা প্রৌঢ়া সৌদামিনী তার মাতৃহৃদয়ের সুষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা পরিত্ন্য করার জন্য দূর কোন দেশ থেকে যখন একটি শিশুকে এনে সন্তানবৎ পালন করতে থাকে তখন মনোরঞ্জন নমশ্কুর ঘরে ত্রাক্ষণ সন্তান পালিত হচ্ছে এই মিথ্যা বক্তব্য প্রচার করে বর্ণিতভাবে হিন্দু সমাজের ধর্মানুভূতির ধুয়া তুলে সৌদামিনীকে স্বাজ্ঞাত করার উদ্যোগ নেয়। সমাজপত্তিদের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত সৌদামিনী তার পালিত পুত্র যে মুসলমানের ওরসজাত এ সত্য প্রকাশ করতে এবং স্বধর্মত্যাগ করে খ্রিস্টান হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সৌদামিনীর জীবনে গভীর ট্র্যাজেডি নেয়ে আসে, যখন তার পালিত পুত্র হরিদাস জানতে পারে যে সৌদামিনী তার মা নয়। আর এ কথা জেনেই সে নিরুদ্ধিষ্ঠ হয়। অটি঱েই সৌদামিনীর মন্তিক বিকৃতি ঘটে। মানুষের লোভ ও ধর্মান্তরার যুপকাঠে সৌদামিনীর মাতৃহৃদয় বলিপ্রাণ হলেও তার মাতৃহৃদয়ের হাহাকারের মধ্যেও ধ্বনিত হতে থাকে মানবতার জয়গান; তার মাতৃত্বের কাছে ধর্ম, অর্থ ও অপর সকলের পরাভুব ঘটে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আদালত কোন জায়গায় অবস্থিত?

ক. পাহাড়ের ওপর

খ. টিলার ওপর

গ. সমতল ভূমিতে

ঘ. নদীর ধারে

২. ‘অগত্যা মোগলের সাথে খালা খেতে হবে’— এখানে কাকে মোগল বলা হয়েছে?

ক. উকিলকে

খ. নাসিরকে

গ. ব্রাদার জনকে

ঘ. কৌতৃহলী শ্রেতাকে

নিচের গল্পাংশ পড়ে ত ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

গফুর মিয়া কাতর স্বরে তর্করত্নকে বলেছিল, অবলা জীব মহেশ আমার না খেয়ে মরে যাচ্ছে। দিন না কাহন দুই খড়। যেভাবে পারি শুধু বাবা। একথা বলে সে তর্করত্নের পায়ের কাছে দপ করে বসে পড়ল। তর্করত্ন তিরবৎ দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বলল— আ মর! ছুঁয়ে ফেলবি নাকি।

৩. গল্পাংশে গফুরের সাথে “সৌদামিনী মালো” গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে—

ক. হারিদাসের

খ. জগদীশের

গ. সৌদামিনীর

ঘ. মনোরঞ্জনের

৪. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ—

i. অসহায়ত্ব

খ. জগদীশের

ii. বাংসল্য

iii. প্রতিকূলতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

বর্ণাচারি মনিরের সামান্য জমিটুকুও কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছে জাগে প্রভাবশালী রশিদের। তাই তা কেনার প্রস্তাৱ দিলে মনির তাৱ পৈতৃক এ সম্পত্তি বিক্ৰি কৰতে অসম্ভৱতি জানান। সেদিন থেকে রশিদ তাকে কাৰণে-অকাৰণে নাজেহাল কৰেন। তাৱ ছেলেকে সুল থেকে বেৰ কৰে দেন। এমনকি মিথ্যা দেনাৰ দায়ে তাকে ভিটেছাড়া কৰেন। চেয়াৰম্যানের হস্তক্ষেপে অবশেষে মনির সবই ফিরে পান।

ক. ব্রাদার জন-এর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোৰ কাৰণ কী?

খ. “ইংৰেজ বাহাদুৱ এমনভাৱে কিছু দেশি বাচ্চা তৈৱি কৰত”— বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

গ. রশিদেৱ আচৰণে “সৌদামিনী মালো” গল্পেৱ যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কৰ।

ঘ. উদ্বীপকে “সৌদামিনী মালো” গল্পেৱ একটা বিশেষ দিকেৱ প্ৰতিফলন ঘটেছে মাত্ৰ, সমন্বয়তা প্ৰকাশ পায়নি
—মন্তব্যেৱ যথার্থ্য যাচাই কৰ।



কলিমদি দফাদার আবু জাফর শামসুন্দীন

লেখক-পরিচিতি

আবু জাফর শামসুন্দীনের জন্য বৃহত্তর ঢাকার গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ। প্রতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ না করলেও তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি সরকারি চাকরিও করেছেন। সমাজ-সচেতন ও রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন সংকোরমুক্ত, প্রগতিকামী ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন।

বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক আবু জাফর শামসুন্দীন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাহিত্যসাধনায় ব্রহ্মী ছিলেন। কেবল গল্পকার ও উপন্যাসিক হিসেবে তিনি পরিচিত নন; তিনি নাটক লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত।

তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গে বিশেষ পরিচিত ও আলোচিত হন ‘ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান’ নামের উপন্যাস লিখে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে : ‘পঞ্চা যেঘনা যমুনা’, ‘সংকর সংকীর্তন’, ‘প্রপঞ্চ’, ‘দেয়াল’। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হচ্ছে : ‘শেষ রাত্রির তারা’, ‘এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য’, ‘রাজেন ঠাকুরের ভৌর্যাজ্ঞা’, ‘আবু জাফর শামসুন্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প’, ইত্যাদি। তাঁর রচিত ‘আত্মপূর্তি’ও অসামান্য গুরুত্ব বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর মৃত্যু ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪এ আগস্ট ঢাকায়।

ঢাকা জেলার একটি বাস্তরিক প্লাবন অঞ্চল। শীতলক্ষ্যা নদীর দু-তীর ধরে মাইল দু-মাইল ভেতর পর্যন্ত ডোবে না। বর্ষায় আরও ভেতরে প্রবেশ করা মুশকিল। দু-মাইল যেতে পাঁচ মাইল যুরতে হয়। কোনো কোনো আম রীতিমতো দীপ হয়ে যায়। চুকতে নাও-কোন্দা লাগে। ছোট পানি পারাপার হওয়ার জন্য কোথাও বাঁশের সাঁকো, কোথাও কাঠের পুল আছে। ওগুলো পারাপার হতে ট্রেনিং আবশ্যিক। অনঙ্গস্তের জন্য প্রায় ক্ষেত্রে ওগুলো পুলসেরাত। সাঁকোতে উর্ধ্বপক্ষে দুটো বাঁশ পাশাপাশি পাতা, নিচে জোড়ায় জোড়ায় আড়াআড়ি পৌতা বাঁশের খুঁটি। ধরে চলার জন্য পাশে হালকা বাঁশ কখনো থাকেও না। মধ্যপথে যাওয়ার পর হয় দেখা গেল পায়ের নিচে মাঝ একটি বাঁশ, অন্যটি উধাও হয়ে গেছে। চড়ামাঝ সাঁকো মাঝিমাঝাইন ডিঙি নৌকার মতো বেসামাল নড়তে থাকে। কাঠের পুলের অবস্থাও প্রায় ওরকম। গুরু-ছাগল পারাপার হওয়ার ফলে এক বছরের মধ্যেই পুলের বারোটা বাজে। পায়ের নিচের চার তক্তা ভেঙে দু-তক্তা এমনকি এক তক্তাও হয়ে যায়। কোথাও তক্তা অদৃশ্য হয়ে যায়, পাশাপাশি দু-খঙ্গ বাঁশ স্থাপন করে সংযোগ স্থাপন করা হয়। দুর্বল খুঁটির ওপর স্থাপিত এসব কাঠের পুলে চড়ামাঝ বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো খটখট নড়ে। মোটকথা, শতকরা আশিজ্জন গ্রামবাসীর আর্থিক স্থিতির মতো সাঁকোর স্থিতিও বড় নড়বড়ে। পুলের নিচে অঁশে পানির স্রোত। পা ফসকে পড়লে বিপদ। সাঁতার না জানলে আরও বেশি বিপদ।

কলিমদি এলাকার দফাদার। বিশ বাইশ বছর বয়সে ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদারিতে ঢুকেছিল। তখন হতে সে কলিমদি দফাদার নামে পরিচিত। এখন বয়স প্রায় ষাট, চুল দাঢ়িতে পাক ধরেছে। বয়সকালে সে লাঠি খেলত। এখন সে লাঠি খেলে না, কিন্তু ঐতিহ্যরে বাবির চুল রাখে। চৌকিদারের সর্দার দফাদার। গ্রামবাসীর একটি মর্যাদাবান পদ। মর্যাদা সে পায়ও। লোকেরা তাকে দফাদার সাব ডাকে। কিন্তু পদমর্যাদার



তার তার বাড় বাড়ায়নি। তার আচার-আচরণ সহজ, সরল। হালকা রসিকতায় রসপাটু। যৌবনে রাত জেগে পুঁথি পড়ত। সন্তানে একদিন তাকে থানায় হাজিরা দিতে হয়। সেখানেও চৌকিদারের ওপরে তার মানবর্যাদা। বড় দারোগা এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মেমোরু তাকে ‘তুমি’ বলেন, শেষোভদ্রের কেউ কেউ আপনি বলেও সম্মান করেন। চৌকিদারদের করেন তুই-তোকারি— এমনকি যাচেছতাই গালিগালাজও।

কলিমদি দফাদারের বাড়ি বলতে একটি ছনের ঘর এবং তালপাতার ছাউনি দেয়া একটি একচালা পাকঘর, সামনে এক ফালি উঠোন। তার সামনে পাঁচ কাঠা পরিমাণ জায়গা। সেটিতে সে ‘আঙ্গুইনা’ চিতার চাষ করে। লতার নিচের মূল কবিরাজি শুধুরে উপাদান। শহরের কারখানায় ভালো দাম পাওয়া যায়। চামের জমি সামান্য। মাস দু-মাসের খোরাকি হয়। বাকি সংবৎসর কিনে খেতে হয়। স্ত্রী ও পুত্রকন্যা নিয়ে পাঁচজনের সংসার, বেতন সামান্য। কয়েকটি আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও পেঁপে গাছ অতিরিক্ত আয়ের উৎস। আর আছে একটি ছোট গাভি এবং স্ত্রীর একটি ছাগল ও ঘোরগ, হাঁস দু-চারটি। বিয়োলে গাভিটি দেড় দু-সের দুধ দেয়। আধ সের রেখে বাকি সে সকালের বাজারে বেচে। এভাবে কায়ক্রমে সংসার চলে। ধান-চালের দাম বাড়লে উপোস-কপোসও করতে হয়। কিন্তু কারো কাছে ধারকর্জের জন্য হাত পেতে দফাদার তার মর্যাদা খোয়ায় না। চরম দুর্দিনেও যে স্ফূর্তিবাজ মানুষ। বাজারের চাদোকানে বসে সে সকলের মতো রসিকতা করে, রসিকতার জাহাজ তার মতিষ্ক।

১৯৭১ সাল। ভাদ্রের শেষ। কানায় কানায় ভরা প্লাবনের পানি। যুদ্ধের প্রথমদিকেই খান সেনারা থানা সদর দখল করে নিয়েছিল। থানার কাছাকাছি ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে। কিছুদিন যেতে নদীর ওপর পুল। অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ওরা ভেতরেও প্রবেশ করেছে। কলিমদি দফাদারের বোর্ড অফিস শীতলক্ষ্যার তীরে, বাজারে। নদীর এপারে-ওপারে বেশ কিছু বড় বড় কল-কারখানা। ওগুলো শাসনের সুবিধার্থে একদল খান সেনা বাজারসংলগ্ন হাইস্কুলটিকে ছাউনি করে নিয়েছে। নদীর ওপারে মিলের রেস্ট হাউসে আর একটি ছাউনি। বাঁধন খুবই শক্ত। তবু কোনো কোনো রাতে গুলিবিনিময় হয়। কোথা হতে কোন পথে কেমন করে মুক্তিফৌজ আসে, আক্রমণ করে এবং প্রতি আক্রমণ করলে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়, খান সেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না। কখনো কখনো খতরনাক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। হাটবাজারের লোকজন, মিল ফ্যান্টারির শ্রমিক, দোকানদার, স্কুলমাস্টার, ছাত্র সকলকে কাতারবন্দি করে বন্দুকের নল উঁচিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, ‘মুক্তি কিধার হ্যায় বোলো।’ এক উন্নত, ওরা জানে না।

অল্পদিন আগেই একটা খতরনাক ঘটনা ঘটেছে। বাজারের পশ্চিম-দক্ষিণে কয়েক ঘর গুরুবণিক বাড়ই জাতীয় হিন্দুর বাস। সে গ্রামের লোকেরা নদীর ঘাটে স্থান করে, কাপড় ধোয় এবং ভরা কলসি কাঁধে বাড়ি ফেরে। বাজারের অল্প দক্ষিণে ওদের ঘাট। ছায়াঘন বাঁশবাড়, সুপারিশাড়, কলাগাছ, পানের বরজ প্রভৃতির ভেতর দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের অপ্রশংস্ত সড়ক এঁকেবেঁকে এসে নদীঘাটে নেমেছে। খান সেনারা বাজারের উত্তরে স্কুল ঘরে। হাট-বাজার এখন আর তেমন জমে না। খান সেনাদের গতিবিধি ও অবস্থানের খোজখবর নিয়ে বউবিরা ঘাটে আসে। খোজখবর নিয়েই সেদিন মধ্যাহ্নে ঘাটে এসেছিল গরিব বিধবা হরিমতি এবং তার মুবতী মেয়ে সুমতি। জায়গা-জমি নেই। ওরা রাতভর টেকিতে চিড়া কোটে, দিনে মুড়ি ভাজে। চিড়া-মুড়ি বেচে ওরা দিন শুজরান করে। অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকিয়ে যায়, এ রকম একটা কথা আছে। দুর্ভাগ্য ওদের; সবে ভরা কলসি কাঁধে আর্দ্র বন্ধে নদীর ভাঙ্গনতি ভেঙে ওপরে উঠে বাড়ির পথ ধরেছে ঠিক সে সময়টাতেই পাঁচজন যমদূতের চোখে পড়ে ওরা— মা মেয়ে। বন্দুক কাঁধে পাঁচজন খান সেনা সড়কপথে দক্ষিণ দিক থেকে এসে উপস্থিত হয় চৌরাস্তার সংযোগস্থলে।



হরিমতি ও সুমতি মাটির কলসি কাঁথ থেকে ফেলে পশ্চিম দিকে দৌড়! দৌড়! ছায়াঘন আঁকাবাঁকা পথে ওরা জীবনগত দৌড়োচ্ছে তো দৌড়োচ্ছেই। আত্মরক্ষা করতেই হবে।

বন্দুক কাঁধে নিয়েই খান সেনারা ওদের পশ্চাদ্ভাবন করে। হরিমতি ও সুমতি একনজর পশ্চাদ্বিকে তাকিয়ে আরও বেগে দৌড়ায়। আশপাশের লোকজন ওই দৃশ্য দেখে বাড়িবর ছেড়ে ঝোপে জঙ্গলে আত্মগোপন করে। পোয়াতি মেয়েরা ক্রমন্বয়ত শিশুর মুখ চেপে ধরে। অর্দ্ধ বন্ধে মাইলখানেক দৌড়োবার পর মা মেয়ে দু-জনের একজনও আর দৌড়তে পারে না। রাস্তার ডান দিকে প্রাইমারি স্কুল। আশ্রয়ের আশায় ওরা স্কুলঘরে প্রবেশ করে।

স্কুলঘর জনপ্রাণীশূন্য। দেয়ালে টাঙ্গানো ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি মাটিতে কষা একটা অর্ধসমাঙ্গ অঙ্ক ছাঢ়া আর কিছু চোখে পড়ে না। একটা ছুঁচো ইঁদুর ওদের দেখে পালিয়ে যায়। চার চারটা দরজা এবং সবগুলো জানালা খোলা। হরিমতি, সুমতি চুকে দম নেয়ার আগেই খান সেনাদের বুটের দাপট শুনতে পায়। ওরাও কিছুক্ষণ দম নেয়। চারিদিকে প্রাচীর। সশন্ত শিকারি এবং শিকার দুটোই ভেতরে। কিছুক্ষণ মা মেয়ের আর্তনাদ ওঠে। পরে নিঃশব্দ হয়ে যায় স্কুলঘর। হরিমতি সুমতিকে ওরা হত্যা করে না। রক্ষাকৃত অভ্যন্তর অবস্থায় ফেলে খান সেনারা রাইফেল কাঁধে স্কুলঘর ত্যাগ করে।

রাস্তায় পড়ে কয়েক পা এগোতেই শুলির শব্দ হয়। কোন দিক থেকে আসছে ঠাহর করার আগেই একজনের মাথার পুলি উঠে যায়। ‘মুক্তি আ গিয়া, ইয়া আলী’ চিৎকার করতে করতে বাকি চারজন উর্ধ্বস্থাসে দৌড়ায়। আরও একজনের উরুর মাংস ছিঁড়ে শুলি বেরিয়ে যায়। নিহত সঙ্গীকে পশ্চাতে ফেলে রেখে বাকি চারজন কোনোক্রমে ছাউনিতে ফিরে আসে।

সেদিন থেকে এলাকায় মুক্তিফৌজ নিধন কাজ শুরু হয়। রোজ দল বেঁধে বেরোয় খান সেনারা। বাজারে মিলিটারি চোকার পর থেকেই কলিমদি দফাদারের ওপর বোর্ড অফিস খোলার ভার পড়েছে। অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান মিলিটারির ভয়ে পারতপক্ষে এদিকে আসেন না। মেঘারগণও আত্মগোপন করেছেন। কিন্তু বোর্ড অফিস নিয়মিত খোলা রাখার হৃকুম জারি আছে। কলিমদি এ কাজ করার জন্য বাজারে আসে। খান সেনারা ওকেই ওদের অভিযানের সঙ্গী করে নেয়। সে সরকারি লোক, নিয়মিত নামাজ পড়ে এবং যা হৃকুম হয় তা পালন করে। সুতরাং সন্দেহের কারণ নেই।

সেদিন থেকে দফাদার দিনের বেলা বাড়ি যেতে পারে না। বাজারেই খেতে হয় তাকে। খাওয়ার জন্য রোজ তিন টাকা পায় সে। খান সেনারা কি তাকে বাজারারে ভর্তি করে নিয়েছে? কলিমদি তার কিছু জানে না। সে তার স্বাভাবিক হাসিমুখে খান সেনাদের সঙ্গী হয়ে যেদিক যেতে বলে যায়। সে আড়-কাঠি, আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া তার ডিউটি। বাজারের লোকজন কখনো কখনো তাকে অনুযোগ দেয়, দফাদার ভাই আপনেও?

কলিমদি শিখ হেসে সহজ উত্তর দেয়, আমি ভাই সরকারি লোক, যখনকার সরকার তখনকার হৃকুম পালন করি। এর বেশি একটি কথাও তার মুখ থেকে বের করা যায় না।

বুধবার। আশপাশে কোথাও হাটবার নেই। সকাল দশটায় কলিমদি দফাদারের ডিউটি পড়ে। আজ ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা সড়কপথে পশ্চিম দিকে মুক্তিবিরোধী অভিযান। আট-দশজন সশন্ত খান সেনা। কলিমদি আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যস্থান গ্রাম। সেখানে নাকি বহু হিন্দুর বাস, আরও হিন্দু বাইরে থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুসলিমানগুলোও ভারতীয় চর- কাফেরদের সঙ্গে এক জোট। আজ ওই গ্রামটা শায়েস্তা করতে হবে। আগুন দেয়ার মালমসলা, অন্তর্ও সঙ্গে আছে।

বেলা এগারোটা। মাঠের ওপর দিয়ে অপশন্ত মেটে সড়ক। মাঠ পেরিয়ে একটি ছেট গ্রাম। তারপরেই লক্ষ্যস্থূল।



চকচকে রোদ। সড়কের উভয়ের রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে গামছা-পরা এক কিশোর তিন চারটে গুরু খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় ছালা বোঝাই ঘাস। কাঁধে লাঙল-জোয়াল। সম্ভবত সে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। ‘মুক্তি! মুক্তি!’ একজন সৈনিক চিৎকার করে ওঠে।

‘কাঁহা? কাঁহা?’— অপরেরা প্রশ্ন করে।

‘ডাহনা তরফ দেখো।’

কলিমদি দফাদার সাবিনয়ে বলতে চায়, ‘মুক্তি নেহি ক্যাপ্টিন সাব, উয়ো রাখাল হ্যায়, মেরা চেনাজানা হ্যায়।’ ‘চুপ রাও সালে কাফের কা বাচ্চা কাফের। মুক্তি, আলবৎ মুক্তি।’ বলেই সকলে একসঙ্গে শুলি ছোড়ে। এলাকা কেঁপে ওঠে। ধৰনি প্রতিষ্ঠানি হয়ে দূরে ছাড়িয়ে পড়ে।

কলিমদি দফাদারের বাল্যকালের পাতানো দোষ্ট সাইজদি খলিফার ষেল বছরের ছেলে একবার মাত্র ‘মা’ বলে। ধরাশায়ী দেহটা থেকে আর কোন ধৰনি কানে আসে না।

‘এক মুক্তি খতম। আভি সামনে চলো দফাদার।’

‘জি, হজুর,’ বলে সে হকুম পালন করে।

ইতোমধ্যে খান সেনাদের পশ্চিমগুরুী অভিযানের সংবাদ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। গোলাগুলির শব্দ শোনার পর আশপাশের লোকজন ঘরবাড়ি ফেলে যে যেখানে পারে পালাতে শুরু করে। মাঠ পাড়ি দেয়ার আগেই সামনের গ্রাম সাফ হয়ে যায়।

পরের গ্রামে সেদিনের মূল যুদ্ধক্ষেত্র। সে গ্রামের পশ্চিমে অথই জলের বিস্তীর্ণ মাঠ। পানির ওপর বাওয়া ধানের সবুজ শীষ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়ার জন্য ধান-ক্ষেতের ওপর দিয়ে নাওদাঢ়া। গ্রামবাসীরা উঠিপড়ি নাও-কোন্দা বেয়ে অথই পানিতে ভাসমান উদ্ভূত ধানের শীষের আড়ালে আত্মগোপন করে। যারা নাও-কোন্দা পায় না তারা বিলে নামে এবং মাথার শুপরে কচুরিপালা চাপিয়ে নাক জাগিয়ে ডুবে থাকে।

মুক্তি নিধন অভিযান এগিয়ে চলে। সামনে একটি লোকও পড়ে না। বাড়িয়র জনশূন্য, কলেরা মহামারীতে বিরল জায়গার মতো মনে হয় পল্লি। হাঁস-মোরগ কুকুর-বিড়ালও গোলাগুলির শব্দ শুনে আত্মগোপন করেছে। দড়িতে বাঁধা ছাগল-গোরু দু-চারটা দেখা যায়।

‘ইয়ে বকরি বহুত খুবসুরত আওর তাজা, ওয়াপস জানে কে ওয়াকত... সমজে ...’ খান সেনাদের একজন সঙ্গীদের বলে।

‘হাঁ, হাঁ, এক ফিস্ট হু জায়েগা,’ অন্যেরা হেসে সমর্থন জানায়। ওরা পথের দু-ধারের বাড়িয়রে উঁকিবুঁকি এবং বোঝে জঙ্গলে শুলি ছুড়ে হৃদ হয়। একজন মুক্তির সন্ধানও পাওয়া যায় না।

বেলা তখন বারোটা, হঠাৎ কমান্ডার নির্দেশ দেয়, ‘হ্লট! এক, দো!'

সামনে কাঠের পুল। দু-দিক থেকে তিরিশ ডিগ্রি অ্যাসেলে খাড়া হয়ে কিছু দূরে ওঠার পর মাঝাভাবে সমতল, নিচে প্লাবিত খাল এবং দু-দিকের বাওয়া ধানের ক্ষেত, উদ্ভূত ধানের শিষ পানির সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলছে। পুলের উভয়-দিকগে যতদূর দৃষ্টি যায় খাল এবং প্লাবিত ধানক্ষেত ঝঁকেবেঁকে স্থানে স্থানে অশ্বরের আকারে ভিতরে প্রবেশ করে এগিয়ে চলেছে। পুলের ওপর দিয়ে মানুষ এবং ছাগল-গুরু পারাপার হয়, নিচ দিয়ে চলে নাও-কোন্দা। ঘন গাছপালা-বেষ্টিত দু-পারের গ্রাম বেশ উচুতে। নবাগতের কাছে পার্বত্য অঞ্চল মনে হতে পারে। আসলে এটাই ভাওয়াল পরগনার ভূমিবিন্যাস বৈশিষ্ট্য। ছানীয় লোকদের কাছে উচু তিলাগুলো টেক নামে পরিচিত।



যুদ্ধস্থলরূপে নির্দিষ্ট সামনের আগমের অবস্থাপন্ন ঘরবাড়ি এপারে দাঁড়িয়েও দেখা যায়। চৌচালা টিনের ঘরের টুয়া সুস্পষ্ট। পুলটা না পেরিয়ে ওহামে প্রবেশ করার কোনো উপায় নেই। বর্ষাকালে আমটা জলবেষ্টিত দ্বীপ। ‘চলিয়ে ছজুর!’ কলিমদ্দি দফাদার বলে।

‘মগর! আওর কুই রাস্তা নেহি দফাদার?’ কমান্ডার জিজাসা করে।

‘নেহি ছজুর! সেরেফ একহি রাস্তা। বাকি চারো তরফ পানি।’ দফাদার জানায়। ‘ইয়ে পুল আছা হ্যায়।’

‘জি, হ্যা, ছজুর, বহুত আছা হ্যায়। মানুষ গরু হামেশা পার হোতা হ্যায়।’

‘মালুম হোতা পুলসেরাত। ঠিক হ্যায়; তুম আগে চলো দফাদার।’

‘বহুত আছা ছজুর।’

কলিমদ্দি দফাদার পুলের ওপর ওঠে। দু-তিন বছর আগে কিছু ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে, কিছু গ্রামবাসীর চাঁদায় তৈরি তিন তক্তার পুল। প্রায় জায়গায় নাট-বস্তু ঢিলা হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় গায়েবও হয়ে গেছে। ধরে ঢলার জন্য দু-দিকে বাঁশের ধরনি নেই। কাঠের খুঁটির গোড়ায় পচল ধরায় স্থানে স্থানে বাঁশের ঠিকা দেয়া হয়েছে। ওর ওপর বিছানো তক্তাও নরম, পচেও গেছে দু-এক জায়গায়, কিন্তু গ্রামের লোকের কাছে বিপজ্জনক নয়, আর যদি কখনও তক্তামুক্ত নিচে পড়েই যায় কেউ সাঁতার কেটে পাড়ে উঠবে। ছেট ছেট ছেলেমেয়েরা পুলের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে খালের জলে ঝাপুড়ি খেলে। আসলে পুলটা তেমন একটা নড়বড়ে নয়, মানুষ গরু ওপরে উঠলে কিছু কাঁপে— কাঁপালে আরও বেশি কাঁপে— কাঁপনি একটা সংক্রামক ব্যাধি কিনা তাই।

কলিমদ্দি এক-পা দু-পা করে অতি সাবধানে এগিয়ে যায় এবং পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আইয়েন ছজুর। ছজুরেরা ওপরে ওঠেন না, পুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কলিমদ্দির পা দু-টোর দিকে মনোযোগ দেয়। কলিমদ্দি দফাদার যত এগিয়ে যায়, তার পদযুগল নিপুণ অভিনেতার পদযুগলের মতো ঠকঠক কাঁপে, পুল কাঁপে ছিঞ্চণ তালে।

উর্ধ্বারোহণ শেষে ওপরের সমতল জায়গাটুকু। সেখানকার তিন তক্তার একপাশেরাটি পচে গেছে। তার একটি নাট-বস্তুও নেই। নিচের বরগাটির কানা জায়গাটাও ফেটে গেছে।

কলিমদ্দি দফাদার কী ভেবে নিচের দিকে একনজর তাকায়— খালের তীব্র স্নোত ছাড়া আর কোনো ঝামেলা নেই সেখানে। পরমুচূর্ণে আর্তনাদের মতো কর্ষস্থরে ‘যুক্তি যুক্তি’ বলতে বলতে পচা তক্তাসমেত নিচে পড়ে যায়। খালের জলে একটা ঝুপ শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে শুলিবর্ষণ শুরু হয়। পঞ্জিশন নিয়ে পাল্টা শুলিবর্ষণের আগেই ধরাশায়ী হয় দু-তিনজন। তারপরেও কিছুক্ষণ গোলাগুলি ঢলে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, পলায়ন পথের দু-দিকে এলোপাতাড়ি। যে কজন যুদ্ধ করতে গিয়েছিল ছাউনিতে সে কজন অস্কত ফেরে না।

কলিমদ্দিকে আবার দেখা যায় ষোলই ডিসেম্বর সন্ধিয়ায় বাজারের চা স্টলে। তার সঙ্গীরা সবাই মুক্তি, সে-ই শুধু তার পুরনো সরকারি পোশাকে সকলের পরিচিত কলিমদ্দি দফাদার।

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|----------|--|
| কোন্দা | — তালগাছ দিয়ে তৈরি নৌকা। |
| পুলসেরাত | — ইসলামি ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী পরকালের বিপজ্জনক সাঁকোবিশেষ। |



- | | |
|----------------------|---|
| দফনাদার | - গ্রামে পাহারায় নিয়োজিত চৌকিদারের সরদার। |
| বাড়ি বাড়া | - ঔন্দ্রজ্য। বাড়াবাড়ি। স্পর্শী। |
| 'আঙ্গুইন' চিতা | - ডেষজ উষ্ণিদবিশেষ। |
| খতরনাক | - বিপজ্জনক। মারাত্মক। |
| গন্ধবণিক | - মশলা-ব্যবসায়ী। |
| বাড়ুই | - ঘরের চাল ছাওয়া মিঞ্চি। |
| খান সেনা | - খান পদবিধারী সেনা অর্ধাং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। |
| ভাঙ্গুনতি | - নদীর পাড়ের ভাঙ্গনশীল অংশ। |
| মুক্তি আ গিয়া | - মুক্তিবাহিনী এসে পড়েছে। |
| রাইফেল রেঞ্জ | - রাইফেলের শুলিবিন্দ করার আওতা। |
| কাঁহা? কাঁহা? | - কোথায়? কোথায়? |
| ডাইনা তরফ দেখো | - ডান দিকে দেখ। |
| উয়ো রাখাল হ্যায় | - ও হচ্ছে রাখাল। |
| মেরা চেনাজানা হ্যায় | - আমার পরিচিত (আছে)। |
| আভি | - এখন। |
| নাওদাঁড়া | - শৌকা চলার ছেট খালের মতো পথ। |

ইয়ে বকরি এন্ত খুবসুরত

আওর তাজা, ওয়াপস

জানে কে ওয়াকত...

সংযোগ

এক ফিস্ট হু জায়েগা

ଟୁମା

মার্গার

ନେହି ଦକ୍ଷାଦାର?

ଲେଖି ହୁଏଇ! ମେ

একহি রাত্তা। বাকি

তরফ পানি

ইয়ে পুল অ

মালুম হো পুলসেরাত

ଧର୍ମନି

ବର୍ଷାଗୀତ

- গ্রামে পাহারায় নিয়োজিত চৌকিদারের সরদার।
 - ষষ্ঠ্য | বাড়াবাড়ি | স্পর্ধা।
 - ভেষজ উত্তিদবিশেষ।
 - বিপজ্জনক | মারাত্মক।
 - মশলা-ব্যবসায়ী।
 - ঘরের চাল ছাওয়া মিঞ্চি।
 - ধান পদবিধারী সেনা অর্ধাং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।
 - নদীর পাড়ের ভাঙমশীল অংশ।
 - মুক্তিবাহিনী এসে পড়েছে।
 - রাইফেলের শুলিবিন্দু করার আওতা।
 - কোথায়? কোথায়?
 - ডান দিকে দেখ।
 - ও হচ্ছে রাখাল।
 - আমার পরিচিত (আছে)।
 - এখন।
 - নৌকা চলার ছেট খালের মতো পথ।
 - এই বকরি ভারি সুন্দর আর তাজা, ফেরার সময়ে... বুরোছে।
 - একটা ভালো ভোজ হয়ে যাবে।
 - ঘরের চালের শীর্ষ।
 - কিন্তু, অন্য কোনো রাস্তা কি নেই, দফাদার?
 - না হজুর! কেবল একটিই রাস্তা। বাকি চারপাশে পানি।
 - এই পুল কি ঠিক আছে?
 - মনে হচ্ছে যেন পুলসেরাত।
 - ধরার অবলম্বন।
 - আড়াআড়ি লাগানো কাঠের ভাঙা মুখ।



পাঠ-পরিচিতি

আবু জাফর শামসুন্নাহের “কলিমদি দফাদার” গল্পটি সংকলিত হয়েছে আবুল হাসনাত সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প-সংকলন ‘মুক্তিযুদ্ধের গল্প’ থেকে। এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিটুর বর্ষণতার ছবি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর বীরত্তপূর্ণ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ছবি এই গল্পে বর্ণিত না হলেও তাদের দুর্বার প্রতিরোধমূলক তৎপরতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম এলাকার আনসার, চৌকিদার-দফাদাররাও যে কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ কোশলে অত্যন্ত গোপনে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেছিল, সেই বাস্তবতাই শিল্প-সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে “কলিমদি দফাদার” গল্পে। গ্রামবাংলার একজন সাধারণ মানুষের দেশপ্রেম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় গল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আঙ্গুইনা চিতা কী?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. ঔষধ | খ. উচ্চিদ |
| গ. প্রাণী | ঘ. ফল |

২. খান সেনারা কলিমদি দফাদারকে তাদের অভিযানের সঙ্গী করে নেওয়ার কারণ তার—

- i. সাহসিকতা
- ii. বিশ্বস্ততা
- iii. ধর্মানুভূতি

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উচ্চীগ্রাটি পড়ে ঢ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নূরুল আমিনের নির্দেশে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালায়। নূরুল আমিন ছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তিনি এ দেশ ও জাতির বিপক্ষে ছিলেন।

৩. নিচের কোন চরিত্রাটিতে নূরুল আমিন চরিত্রের বিপরীত মানসিকতা ঝুঁঁজে পাওয়া যায়?

- | | |
|-------------------|------------------|
| ক. সাইজন্দি খলিফা | খ. কলিমদি দফাদার |
| গ. হরিমতি | ঘ. কমান্ডার |

৪. ৩ নং প্রশ্নে বিপরীত মানসিকতা বলতে বোঝানো হয়েছে—

- | | |
|----------------|------------------|
| ক. অঙ্গবিশ্বাস | খ. আনুগত্য |
| গ. দেশপ্রেম | ঘ. দায়িত্বহীনতা |



সূজনশীল প্রশ্ন

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘাঁটি বাঁধে গৌরনদী উপজেলা সদরে। রাজাকার আহাদ মোড়লের সহায়তায় তারা প্রায়ই গ্রামে হানা দেয়। গণহত্যা, বাড়ি-ঘর জালিয়ে দেওয়া, নারী নির্ধারিতন, লুক্ষন ইত্যাদি হয়ে উঠে নিয়ন্ত্রিতের ঘটনা। বিষয়টি গভীরভাবে নাড়া দেয় কিশোর রাজুকে। সে সুযোগ খুঁজছিল প্রতিশোধ নেওয়ার। তাই সুযোগমতো একদিন সে মিশে যায় ওদের জন্য বাংকার খোঁড়ার দলে, অত্যন্ত গোপনে সেখানে পুঁতে রাখে একটি মাইন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে বাংকারে চুকলে বিকট শব্দে সোটি বিস্ফোরিত হয়। দূর থেকে শোনা যায় ওদের আর্ত চিৎকার।

- ক. কলিমান্দি দফনাদার লাঠি খেলার ঐতিহ্যস্বরূপ কেনাটি ধারণ করে আছেন?
- খ. কলিমান্দি দফনাদারকে নিপুণ অভিনেতা বলা হয়েছে কেন?
- গ. কিশোর রাজুর কার্যক্রমে “কলিমান্দি দফনাদার” গল্পের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিস্কৃত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মুক্তিযুদ্ধে জনতার অংশস্থহণের যে চির শিল্প-সত্য রাপে ফুটে উঠেছে তা উদ্বীপক ও “কলিমান্দি দফনাদার” গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

বায়ান্নুর দিনগুলো

শেখ মুজিবুর রহমান

সেখক-পরিচিতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও জাতির পিতা। তাঁর জন্ম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তাঁর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন। ছাত্রীবন থেকেই তিনি রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিপ্লি লাভ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৮ সালের ১০ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত ধর্মঘটে পিকেটিংয়ের সময় বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণ করা হয়। ভাষা-আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্ববাংলার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে দেশব্যাপী সফরের মাধ্যমে মানুষের মনে বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করেন। বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত ছয় দফা দাবি উপায়ে করে এক সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি সময় জাতিকে ঐক্যবন্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরুত্থুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে অসহযোগের ডাক দেন তিনি। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক প্রতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন: “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাত করার জন্যে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পরে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতাকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে প্রেরণ করে। প্রেরণারের আগে অর্ধাং হুগে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি দেশে ফেরেন এবং মুক্তিবিধাত দেশ গড়ার মহান দায়িত্বে প্রতী হন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনদশায় কিংবদন্তি হয়ে উঠেন। বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাঙালি যিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন। ১৯৭২ সালে তিনি ‘জুলিও কুরি’ পদকে স্বৃষ্টি হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একান্তরের প্রারম্ভিক শক্তিসহ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় কুচক্ষী, ক্ষমতালোভী সদস্য তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।

এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য। আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি, যাই হোক না কেন, আমরা অনশন ভাঙব না। যদি এই পথেই মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে। জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সুপারিলটেনডেন্ট আমীর হোসেন সাহেব ও তখনকার দিনে রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের বুঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন। আমরা তাঁদের বললাম, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু নাই। আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না। সরকার আমাদের বৎসরের পর বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখছে, তাই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করছি। এতদিন জেল খাটলাম, আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই। কারণ আমরা জানি যে, সরকারের হকুমেই আপনাদের চলতে হয়।

১৫ই ক্ষেত্রয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এই কথা বলে যে, আমার সাথে আলোচনা আছে অনশন ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে। আমি যখন জেলগেটে পৌছালাম দেখি, একটু পরে মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা বলে। কয়েক মিনিট পরে আমার মালপত্র, কাপড়চোপড় ও বিছানা নিয়ে জমাদার সাহেব হাজির। বললাম, ব্যাপার কী? কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনাদের অন্য জেলে পাঠানোর হকুম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন জেলে? কেউ কিছু বলেন না। এদিকে আর্মড পুলিশ, আইবি অফিসারও প্রস্তুত হয়ে এসেছে। খবর চাপা থাকে না। একজন আমাকে বলে দিল, ফরিদপুর জেলে। দুইজনকেই এক জেলে



পাঠানো হচ্ছে। তখন নয়টা বেজে গেছে। এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে, সেই জাহাজ আমাদের ধরতে হবে। আমি দেরি করতে শুরু করলাম, কারণ তা না হলে কেউই জানবে না আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছে! প্রথমে আমার বইগুলি এক এক করে মেলাতে শুরু করলাম, তারপর কাপড়গুলি। হিসাব-নিকাশ, কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকা আছে। দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম। রওয়ানা করতে আরও আধা ঘন্টা লাগিয়ে দিলাম। আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিল। সুবেদার পাবিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিল এবং সে একজন বেলুচি ভদ্রলোক। আমাকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। আমাকে দেখেই বলে বসল, ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে। আমি বললাম, কিসমত। আর কিছুই বললাম না। আমাদের জন্য বৰু ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। গাড়ির ভেতরে জানালা উঠিয়ে ও দরজার কপাট বন্ধ করে দিল। দুইজন ভেতরেই আমাদের সাথে বসল। আর একটা গাড়িতে অন্যরা পেছনে পেছনে ভিস্টোরিয়া পার্কের পাশে রোডের দিকে চলল। সেখানে যেয়ে দেখি পূর্বেই একজন আর্মড পুলিশ ট্যাঙ্কি রিজার্ভ করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ট্যাঙ্কি পাওয়া খুবই কঢ়কর ছিল। আমরা আস্তে আস্তে নামলাম ও উঠলাম। কোনো চেনা লোকের সাথে দেখা হলো না। যদিও এদিক ওদিক অনেকবার তাকিয়ে ছিলাম। ট্যাঙ্কি তাড়াতাড়ি চালাতে বলল। আমি ট্যাঙ্কিওয়ালাকে বললাম, “বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাণ্টায় না যায়।”

আমরা পৌছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। এখন উপায়? কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে? রাত একটায় আর একটা জাহাজ ছাড়বে। আমাদের নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। ওপরওলাদের টেলিফোন করল এবং হুক্ম নিল থানায়ই রাখতে। আমাদের পুলিশ ব্যারাকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

রাত এগারোটায় আমরা স্টেশনে আসলাম। জাহাজ ঘাটেই ছিল, আমরা উঠে পড়লাম। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সহকর্মীরা অপেক্ষা করল। রাত একটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বললাম, “জীবনে আর দেখা না হতেও পারে। সকলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ আমার নাই। একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শাস্তি আছে।”

জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। সকালে দুইজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, জাহাজে অনশন করি কী করে? আমাদের জেলে নিতে হবে অনশন শুরু করার পূর্বে। সমস্ত দিন জাহাজ চলল, রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে রাত চারটায় ফরিদপুর পৌছালাম। রাতে আমাদের জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করল না। আমরা দুইজনে জেল সিপাহিদের ব্যারাকের বারান্দায় কাটালাম। সকালবেলা সুবেদার সাহেবকে বললাম, “জেল অফিসাররা না আসলে তো আমাদের জেলে নিবে না, চলেন কিছু নাশতা করে আসি।” নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে যদি কারও সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে ফরিদপুরের সহকর্মীরা জানতে পারবে, আমরা ফরিদপুরে জেলে আছি এবং অনশন ধর্মঘট করছি। আধা ঘন্টা দেরি করলাম, কাউকেও দেখিনা—চায়ের দোকানের মালিক এসেছে, তাকে আমি আমার নাম বললাম এবং খবর দিতে বললাম আমার সহকর্মীদের। আমরা জেলের দিকে রওয়ানা করছি, এমন সময় আওয়ামী লীগের এক কর্মী, তার নামও মহিউদ্দিন—সকলে যাই বলে ডাকে, তার সঙ্গে দেখা। আমি যখন ফরিদপুরে ১৯৪৬ সালের ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলাম, তখন আমার সাথে সাথে কাজ করেছে। মহি সাইকেলে যাচ্ছিল, আমি তাকে দেখে ডাক দিলাম নাম ধরে, সে সাইকেল থেকে আমাকে দেখে এগিয়ে আসল। আইবি নিমেধ করছিল। আমি তনলাম না, তাকে এক ধরক দিলাম এবং মহিকে বললাম, আমাদের ফরিদপুর জেলে এনেছে এবং আজ থেকে অনশন করছি সকলকে এ খবর দিতে।

আমরা জেলগেটে এসে দেখি, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার সাহেব এসে গেছেন। আমাদের তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন। জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন, তবে রাজবন্দিদের সাথে নয়, অন্য জায়গায়। আমরা তাড়াতাড়ি ঔষধ খেলাম পেট পরিক্ষার করবার জন্য। তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। দুই দিন পর অবস্থা খারাপ হলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের দুইজনেরই শরীর খারাপ। মহিউদ্দিন ভুগছে প্লারিসিস রোগে, আর আমি ভুগছি নানা রোগে। চার দিন পরে আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। মহাবিপদ! নাকের ভিতর দিয়ে নল পেটের মধ্যে পর্যন্ত দেয়। তারপর নলের মুখে একটা কাপের মতো লাগিয়ে দেয়। একটা ছিদ্রও থাকে। সে কাপের মধ্যে দুধের মতো পাতলা করে



খাবার তৈরি করে পেটের ভেতর ঢেলে দেয়। এদের কথা হলো, “মরতে দেব না।”

আমার নাকে একটা ব্যারাম ছিল। দুই-তিনবার দেবার পরেই ঘা হয়ে গেছে। রঙ আসে আর যন্ত্রণা পাই। আমরা আপনি করতে লাগলাম। জেল কর্তৃপক্ষ শুনছে না। খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমার দুইটা নাকের ভেতরই ঘা হয়ে গেছে। তারা হ্যান্ডকাফ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে। বাধা দিলে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে জোর করে ধরে খাওয়াবে। আমাদের শরীরও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাঁচ-ছয় দিন পরে বিছানা থেকে উঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ইচ্ছা করে কাগজ লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম। কারণ এর মধ্যে কোনো ফুড ভ্যালু নাই। আমাদের ওজনও কমতে ছিল। নাকের মধ্য দিয়ে নল দিয়ে খাওয়ার সময় নলটা একটু এদিক ওদিক হলেই আর উপায় থাকবে না। সিভিল সার্জন সাহেব, ডাক্তার সাহেবে ও জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়, তার চেষ্টা করছিলেন। বার বার সিভিল সার্জন সাহেব অনশন করতে নিষেধ করছিলেন। আমার ও মহিউদ্দিনের শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর বিছানা থেকে উঠবার শক্তি নাই। আমার হাতের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। প্যালপিটিশন হয় ভীষণভাবে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ভাবলাম আর বেশি দিন নাই। একজন কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালাম। যদিও হাত কাঁপে তথাপি ছেট ছেট করে চারটা চিঠি লিখলাম। আবার কাছে একটা, রেংগুর কাছে একটা, আর দুইটা শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের কাছে। দু-একদিন পরে আর লেখার শক্তি থাকবে না।

একশে ফেরুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকর্ষ নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটি তে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’, ‘বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না’, ‘শেখ মুজিবের মুক্তি চাই’, ‘রাজবন্দিদের মুক্তি চাই’ আরও অনেক স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ, ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দিনের নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু ‘রাজবন্দিদের মুক্তি চাই’ বললেই তো হতো। রাতে যখন ঢাকার খবর পেলাম তখন ভীষণ চিঞ্চাযুক্ত হয়ে পড়লাম। কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর। তবে অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে শুনেছি। দুজনে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি। ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উজ্জেব্বায় উঠে বসলাম।

২২ তারিখে সারা দিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এক জায়গায় হলেই স্লোগান দেয়। ছেট ছেট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেড়ায় আর স্লোগান দেয়। ২২ তারিখে খবরের কাগজ এল, কিছু কিছু খবর পেলাম। মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রঞ্জ দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। জনাব নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাত্ত্ব তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। গুলি হলো মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভেতরে, রাস্তায় নয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও গুলি না করে প্রেফেতার করলেই তো চলত। আমি ভাবলাম, দেখব কি না জানি না, তবে রঞ্জ যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই। মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।

খবরের কাগজে দেখলাম, মাওলানা আবদুর রশিদ তরকাবাগীশ এমএলএ, খৰাত হোসেন এমএলএ, খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএ এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খোলদকার মোশতাক আহমদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে প্রেফেতার করেছে। দু-একদিন পরে দেখলাম কয়েকজন প্রফেসর, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে প্রেফেতার করেছে। নারায়ণগঞ্জে খানসাহেব ওসমান আলীর বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করেছে। বৃক্ষ খান সাহেব ও তাঁর ছেলেমেয়েদের শুপর অক্ষয় অত্যাচার হয়েছে। সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের কোনো কর্মীই বোধহয় আর জেলখানার বাইরে নাই।

আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তি-ছায়ায় চিরদিনের জন্য স্থান পেতে



পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাতে দেখলাম, তার মুখ গভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুবলাম, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। কিছু সময় পরে আবার ফিরে এসে বললেন, “এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।” আমার কথা বলতে কষ্ট হয়, আস্তে আস্তে বললাম, “অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শক্তি।” ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, “কাউকে খবর দিতে হবে কি না? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আবার কাছে কোনো টেলিফোন করবেন?” বললাম, “দরকার নাই। আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।” আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। হাতের দুর্বলতা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়তাম না। একজন কয়েদি ছিল, আমার হাত-পায়ে সরিষার তেল গরম করে মালিশ করতে শুরু করল। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

মহিউদ্দিনের অবস্থাও ভালো না, কারণ ফুরিসিস আবার আক্রমণ করে বসেছে। আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আজ্ঞায়ের কাছে পৌছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম। বার বার আববা, মা, ভাইবেনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেণুর দশা কী হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কী হবে? তবে আমার আববা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিঞ্চলক্ষণ ও হারিয়ে ফেলছিলাম। হাচিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না। বাড়ির কেউ খবর পায় নাই, পেলে নিচয়ই আসত।

মহিউদ্দিন ও আমি পাশাপাশি দুইটা খাট পেতে নিয়েছিলাম। একজন আরেকজনের হাত ধরে শুয়ে থাকতাম। দুজনেই চুপচাপ পড়ে থাকি। আমার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। সিভিল সার্জন সাহেবের কোনো সময়-অসময় ছিল না। আসছেন, দেখছেন, চলে যাচ্ছেন। ২৭ তারিখ দিনের বেলা আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। বোধহয় আর দু-একদিন বাঁচতে পারি।

২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তি নাই। দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে শুজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি। দরজা খুলে বাইরে থেকে ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন, “আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো?” বললাম, “মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।” ডাঙ্কার সাহেব এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী এসে গেছে, চেয়ে দেখলাম। ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, “আমি পড়ে শোনাই, আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি।” তিনি পড়ে শোনালেন, আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না। মহিউদ্দিন শুয়ে শুয়ে অর্ডারটা দেখল এবং বলল যে, “তোমার অর্ডার এসেছে।” আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ডেপুটি সাহেব বললেন, “আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নাই। কারণ, আমার কোনো স্বার্থ নাই; আপনার মুক্তির আদেশ সত্যিই এসেছে।” ডাঙ্কার সাহেব ডাবের পানি আনিয়েছেন। মহিউদ্দিনকে দুইজন ধরে বসিয়ে দিলেন। সে আমাকে বলল, “তোমাকে ডাবের পানি আমি খাইয়ে দিব।” দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙ্গিয়ে দিল।

সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম, আববা এসেছেন। জেলগেটে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসলেন। আমাকে দেখেই আববার চোখে পানি এসে গেছে। আববার সহ্যশক্তি খুব বেশি। কোনোমতে চোখের পানি মুছে ফেললেন। কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে। আমি ঢাকায় পিয়েছিলাম তোমার মা, রেণু, হাচিনা ও কামালকে নিয়ে, দুই দিন বসে রইলাম, কেউ খবর দেয় না, তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে। তুমি ঢাকায় নাই একথা জেলগেট থেকে বলেছে। যদিও পরে খবর পেলাম, তুমি ফরিদপুর জেলে আছ। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। নারায়ণগঞ্জ এসে যে জাহাজ ধরব তারও উপায় নেই। তোমার মা ও রেণুকে ঢাকায় রেখে আমি চলে এসেছি। কারণ, আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমাকে ফরিদপুর নেওয়া হয়েছে কি না! আজই টেলিফোন করব, তারা

যেন বাড়িতে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি আগামীকাল বা পরশু তোমাকে নিয়ে রওয়ানা করব, বাকি খোদা ভরসা। সিভিল সার্জন সাহেব বলেছেন, তোমাকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে যে, “আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।” আবো আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন মহিউদ্দিনও মৃত্যি পাবে, তবে একসাথে ছাড়বে না, একদিন পরে ছাড়বে।

পরের দিন আবো আমাকে নিতে আসলেন। অনেক লোক জেলগেটে হাজির। আমাকে স্ট্রেচারে করে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গেটের বাইরে রেখে দিল, যদি কিছু হয় বাইরে গিয়ে হোক, এই তাদের ধারণা।

পাঁচদিন পর বাড়ি পৌছালাম। মাকে তো বোৰানো কঠকর। হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, “আবো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।” একশে ফেরুয়ারি শুরু ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে। কামাল আমার কাছে আসল না, তবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি খুব দুর্বল, বিছানায় শুয়ে পড়লাম। গতকাল রেণু ও মা ঢাকা থেকে বাড়ি এসে আমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। এক এক করে সকলে যখন আমার কামরা থেকে বিদায় নিল, তখন রেণু কেঁদে ফেলল এবং বলল, তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আবোকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আবোকে বললাম। আবো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাস্তা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া মায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কী উপায় হতো? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কী করে বাঁচতাম? হাচিনা, কামালের অবস্থা কী হতো? তুমি বলবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো হতো না? মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই-বা কীভাবে করতা? আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম, “উপায় ছিল না।” বাচ্চা দুইটা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়লাম। সাতাশ-আটাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গায়, পুরানা কামরায়, পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোটের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। ঢাকার খবর সবই পেয়েছিলাম। মহিউদ্দিনও মৃত্যি পেয়েছে। আমি বাইরে এলাম আর আমার সহকর্মীরা আবার জেলে গিয়েছে।

পরের দিন সকালে আবো ডাঙ্কার আলানেন। সিভিল সার্জন সাহেবের প্রেসক্রিপশনও ছিল। ডাঙ্কার সকলকে বললেন, আমাকে যেন বিছানা থেকে উঠতে না দেওয়া হয়। দিন দশেক পরে আমাকে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটু দিল শুধু বিকেশবেলা। আমাকে দেখতে রোজই অনেক লোক বাড়িতে আসত। গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকেও আমার কিছু সংখ্যক সহকর্মী এসেছিল।

একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর ‘আবো’ ‘আবো’ বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলেছে, “হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আবোকে আমি একটু আবো বলি।” আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, “আমি তো তোমারও আবো।” কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মায়ন্ত্রণ ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জবন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অঙ্গ হয়ে যায়। আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সামান্য হলেও কিছু আন্দোলনও করেছি স্বাধীনতার জন্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, আজ আমাকে ও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটিতে হচ্ছে। আরও কতকাল খাটিতে হয়, কেইবা জানে? একেই কি বলে স্বাধীনতা? ভয় আমি পাই না, আর মনও শক্ত হয়েছে।



১৯৫২ সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পরে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, একশে কেন্দ্ৰীয়াৰি গুলি হওয়াৰ খবৰ বাতাসেৰ সাথে সাথে গ্রামে গ্রামে পৌছে গেছে এবং হোট হোট হাটবাজারে পৰ্যন্ত হৱতাল হয়েছে। মানুষ বুঝতে আৱস্থা কৰেছে যে, বিশেষ একটা গোষ্ঠী (দল) বাঞ্ছিলিদেৱ মুখৰ ভাষা কেড়ে নিতে চায়।

ভৱসা হলো, আৱ দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্ৰীয়ভাষা না কৰে উপায় নাই। এই আন্দোলনে দেশেৱ লোক সাড়া দিয়েছে ও এগিয়ে এসেছে। কোনো কোনো মাওলানা সাহেবৰা ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলা ভাষাৰ বিৱৰণ। তাৰাও ভয় পেয়ে গেছেন। এখন আৱ প্ৰকাশ্যে বাংলা ভাষাৰ বিৱৰণক কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। জনমত সৃষ্টি হয়েছে, জনমতেৰ বিৱৰণ যেতে শোষকৰাও ভয় পায়। শাসকৱা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদেৱ সাহায্য কৰতে আৱস্থা কৰে তখন দেশেৱ ও জনগণেৰ মঙ্গল হওয়াৰ চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

- অনশন ধৰ্মঘট** – কোনো ন্যায্য দাবি পূৰণেৰ লক্ষ্যে একটানা আহাৱ বৰ্জনেৰ সংকল্প।
- সুপারিনেন্টেন্ডেন্ট** – তত্ত্বাবধায়ক (superintendent)।
- মহিউদ্দিন** – মহিউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৯৭)। রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশেৰ অভ্যন্তৰীয়েৰ পূৰ্বে ও পৱে প্ৰায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলনেৰ সদে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মুক্তিযুৱে অংশগ্ৰহণ কৰেন। রাজনৈতিক কাৰণে ব্ৰিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে দীৰ্ঘকাল কাৰাভোগ কৰেন তিনি। ১৯৭৯-১৯৮১ কালপৰ্বে তিনি জাতীয় সংসদে বিৱৰণীদলীয় উপনেতা ছিলেন।
- বেলুচি** – পাকিস্তানেৰ বেলুচিস্তান প্ৰদেশেৰ লোক।
- ‘ইয়ে কেয়া বাত... মে’** – এ কেমন কথা, আপনি জেলখানায়।
- ভিট্টোৱিয়া পাৰ্ক** – ইংল্যান্ডেৰ রানি ভিট্টোৱিয়াৰ নামে ঢাকাৰ সদৱঘাট এলাকায় প্ৰতিষ্ঠিত উদ্যান। বৰ্তমান নাম বাহাদুৱ শাহ্ পাৰ্ক।
- পুৱিসিস** – বক্ষব্যাধি।
- ৱেণু** – বক্ষবন্ধুৰ সহধৰ্মীণী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। তিনি ছিলেন বক্ষবন্ধুৰ রাজনৈতিক জীৱন ও দৃঢ়সময়েৰ অবিচল সাথি।
- নূৰুল আমিন** – ১৯৫২ সালেৰ ভাষা আন্দোলনে ছাত্ৰজনতাৰ ওপৰ গুলিৰ্বৰ্ষণেৰ জন্য দায়ী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী। বাংলাদেশেৰ মুক্তিযুৱ ও স্বাধীনতাৰ বিৱৰণিতাকাৰী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়াৰ পৱে নূৰুল আমিন পাকিস্তানেৰ নাগৱৰিকত্ব প্ৰহণ কৰেন।
- আমলাতত্ত্ব** – রাষ্ট্ৰীয় প্ৰশাসনে সৱকাৱিৰ কৰ্মচাৰীদেৱ কৰ্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা।
- আবদুৱ রশিদ তক্ৰবাগীশ** – গণআজানী লীগ নেতা। ভাষা-আন্দোলনে সক্ৰিয় অবদান ৱেখেছেন। পৱৰতীকালে আওয়ামী লীগেৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰেন।



| | | |
|---------------------|---|--|
| খয়রাত হোসেন | - | রাজশীতিবিদ। ১৯৩৮-১৯৪৭ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নাজিমুদ্দীন সরকারের গণবিবরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮-এ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। |
| খান সাহেব ওসমান আলী | - | নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা। তিনি আইন সভার সদস্য (এমএলএ) ছিলেন। |
| খোদকার মোশতাক আহমেদ | - | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন সংগঠক। ১৯৭৫-এ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে মর্মান্তিক হত্যায় ঘড়্যন্ত, গোপন সমর্থন ও সহায়তার জন্য নিন্দিত। |
| ছেট ভাই | - | বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভাতা শেখ নাসের। |
| হাচিনা, হাচু | - | বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা। |
| কামাল | - | বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল। |
| রেডিওগ্রাম | - | বেতারবার্তা (radiogram)। |
| প্রকোষ্ঠ | - | ঘর বা কুঠি। |

পাঠ-পরিচিতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের “বায়ান্ন দিনগুলো” তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ (২০১২) এতে থেকে সংকলিত হয়েছে। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও সহধর্মিণীর অনুরোধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দি থাকা অবস্থায় এই আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় ঢাকা সেনানিবাসে আটক থাকায় জীবনী লেখা বন্ধ হয়ে যায়। জীবনীটিতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। যৌবনের অধিকাংশ সময় কারা প্রকোষ্ঠের নির্জনে কাটলেও জনগণ-অত্যপ্রাণ এ মানুষটি ছিলেন আপসহীন, নির্ভীক। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলক্ষ্মি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ তিনি এ গ্রন্থে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

“বায়ান্ন দিনগুলো” রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারের বৎসরের পর বৎসর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে লেখক অনশন ধর্মঘট করেন। স্মৃতিচারণে ব্যক্ত হয়েছে অনশনকালে জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও আচরণ, নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের কাছে বার্তা পৌছানোর নানা কৌশল ইত্যাদি। স্মৃতিচারণে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে ঢাকায় একুশে ফেরুজ্যারি তারিখে ছাত্রজনতার মিছিলে শুলির খবর। সেই সঙ্গে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যু অত্যাসন্ন জেনে পিতামাতা-স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভাবনা এবং অবশেষে মুক্তি পেয়ে স্বজনদের কাছে ফিরে আসার স্মৃতির হৃদয়স্পর্শী বিবরণও পরিষ্কৃট হয়েছে সংকলিত অংশে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভাষাসৈনিকদের শহিদ হওয়ার খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে পেয়েছিলেন?

ক. সিপাহিদের মাধ্যমে

খ. প্রহরীদের সহায়তায়

গ. রেডিও শুনে

ঘ. বন্দিদের কাছ থেকে

২. ‘আমলাত্ত্ব তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল’— নূরুল আমিনের কেন বৈশিষ্ট্যের কারণে বঙ্গবন্ধু এরপ মন্তব্য করেছেন?

ক. একক্ষয়ে

খ. নিরুদ্ধিতা

গ. বিচারবুদ্ধিহীনতা

ঘ. অদ্বৰদশিতা



নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মানুষ এক সময় ফুঁসে উঠেন। কালক্রমে তা বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নেয়। এক সময় এ দেশের সিগাহিরাও আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। শাসকগোষ্ঠী এ আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করেন। আন্দোলনকারীদের জনসমক্ষে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

৩. উদ্দীপকে শাসকগোষ্ঠীর যে যে মনোভাব ফুটে উঠেছে সেটিকে “বায়ান্নর দিনগুলো” শীর্ষক স্মৃতিকথার আলোকে বলা যায়—

i. অপশাসন

ii. নির্ভরতা

iii. অত্যাচার

কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. শাসকগোষ্ঠীর উদ্ধৃতি মনোভাবের খেসারত কাকে দিতে হয়েছিল?

ক. আবদুর রশিদ তর্কবাণীশকে

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে

গ. নুরুল আমিনকে

ঘ. খান সাহেব ওসমান আলীকে

সূজনশীল প্রশ্ন

বর্ষবাদ, বৈষম্য আর নিপীড়নের কারণে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক সময় ফুঁসে উঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষগুলো। এদের পুরোধা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। আন্দোলন নস্যাং করতে শুরু হয় নির্যাতন। তাঁকে পুরে দেওয়া হয় জেলে। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাঁকে। পাথর ভাঙার মতো সীমাইন পরিশ্রমের কাজ করতে গিয়ে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু এ সময় এ পাথাগ হস্দয়ের মানুষগুলোর পাশাপাশি কিছু ভালো মনের মানুষও ছিলেন সেখানে যাদের ভালোবাসা, মমত্ববোধ আর সেবায় সিদ্ধ হয়েছেন তিনি। অবশেষে দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগের পর তাঁর মুক্তি মেলে।

ক. “বায়ান্নর দিনগুলো” রচনায় বর্ণিত মহিউদ্দিন সাহেব কোন রোগে ভুগছিলেন?

খ. ‘মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে’— কোন প্রসঙ্গে লেখক এ কথা বলেছিলেন?

গ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে “বায়ান্নর দিনগুলো” রচনায় লেখকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর।

ঘ. প্রেক্ষাপট তিনি হলেও চেতনাগত এক্যাই নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একসূত্রে গেঁথেছে— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

চেতনার অ্যালবাম

আবদুল হক

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান পুরুষ আবদুল হক। বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর থানার উদয়নগর থামে ১৯১৮ সালের ১০ই অক্টোবর মাসে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম সহিযুদ্ধিন বিশ্বাস এবং মাতার নাম সায়েমা খাতুন। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভাঁকে শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে হয়েছে। তিনি কালসাট, টাঙ্গাইল, রাজশাহী ও কলকাতায় পড়াশোনা করেন। সরকারি কর্মসূক্ত হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পর তিনি সরবশেষে বাংলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান-পর্বে আবদুল হক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে ক্ষুরধার লেখা লিখে ‘কলম সৈনিক’ উপাধি লাভ করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ১৯৪৭-পূর্বকালেই তিনি কলম ধরেন এবং এ বিষয়ক প্রথম লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পান। সরকারি কর্মচারী হয়েও বেনামে সরকারবিবোধী লেখায় তিনি যে সাহসিকতা প্রদর্শন করেন তা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মুক্তবুদ্ধি, বিজ্ঞানমনস্কতা, শান্তি যুক্তি, বজ্রবেয়ের সাবলীলা উপস্থাপন প্রভৃতি তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধির মূল্য আনন্দোলনের তিনি এক যোগ্য উভয়সূরি হিসেবে বিবেচিত হন। প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও তিনি লিখেছেন কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক। ইবসনের নাটক অনুবাদেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলোর মধ্যে আছে: ‘কান্তিকাল’, ‘সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ’, ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’, ‘সাহিত্য ও আধীনতা’, ‘ভাষা আনন্দোলনের আদিপর্ব’, ‘নিঃসঙ্গচেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’, ‘চেতনার অ্যালবাম ও বিবিধ প্রসঙ্গ’। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৯৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্যক্তির চেতনা এই জীবনকালেই প্রথম আর শেষ কথা, কিন্তু সমস্ত মানবীয় চেতনা নয়। মানবীয় চেতনা ব্যক্তিমানুষের তুলনায় ছোটখাটো বিষয় নয়, বেশ দীর্ঘকালীন ব্যাপার। ব্যক্তির মধ্যে এই চেতনার প্রকাশ ঘটলেও মানবসমাজে এর ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। নানারূপ মহাজাগতিক কারণে একদিন গোটা মানবজাতিরই বিলুপ্তি ঘটবে; দৈব দুর্ঘটনায় অকালে না ঘটলেও স্বাভাবিকভাবে একদিন ঘটবেই, বৈজ্ঞানিকগণ এ-রকম কথা বলে থাকেন। এই পৃথিবীতে প্রাণীর এমন অনেক প্রজাতি ছিল যা এখন বিলুপ্ত; কোনো কোনো প্রজাতি কোটি বছর এবং তারও অধিককাল যাবৎ পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়িয়েছে তবু তারা আর নেই, কক্ষাল দেখে তাদের অস্তিত্বের কথা জানতে হয়। একদিন তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তেমনি মানবজাতির ভাগ্যেও ঘটবে। কিন্তু এত দীর্ঘদিন পরে ঘটবে যে সেজন্য আজই মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষেরই একদিন মৃত্যু ঘটবে আর সেটা সবাই জানে, কিন্তু সেজন্য কয়েজন মানুষ মন খারাপ করে বসে থাকে? সীমাবদ্ধ কালের প্রাণী সে, যে-অর্থেই ধরা যাক: তথাপি অনন্তকালের কথা সে ভাবে। তাবে, কেননা ওটা তার নিয়তির সঙ্গে বাঁধা।

এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা ভালো। প্রবীণতার পথে ব্যক্তি-মানুষের যেমন একদিন স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে, তেমনি প্রবীণতার পথে নবপ্রজাতিরও একদিন বিলোপ ঘটতে পারে; তবে অধুনা এটাও মনে হচ্ছে সে অক্ষমাং আত্মহত্যাও করে বসতে পারে হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা অথবা আরও বিধ্বংসী কোনো মারণাত্মক প্রয়োগে। অধুনা এই পথে মানবপ্রজাতির বিলোপের আশঙ্কা বিলক্ষণ বিদ্যমান, সেই আশঙ্কার কথা বাদ দিয়েই আমার এই প্রসঙ্গ।

ধরা যাক, যেমন করেই হোক সব দুর্ঘটনা এড়িয়ে মানুষ বেঁচে-বর্তে রইল। কিন্তু তখন যে-সমস্যা দেখা দেবে তা হচ্ছে মানুষের বহুবিচ্ছিন্নত্বী জ্ঞানভাঙারের সমস্য সাধন। মানুষ ক্রমাগত বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান (শিল্প-সাহিত্যসহ) সৃষ্টি করে চলেছে। যে-কোনো বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে সেই জ্ঞানের আবার ইতিহাসও আছে। সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গেও তার সম্পর্ক থাকে, অনেক সময় সে-সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একটি জ্ঞানের হলে আরেকটির অঙ্গত কিছু অংশ জ্ঞানে হয়। এ নিয়ে সমস্যা হ্যাত এখনও দেখা দেয়নি; যদিও সম্ভব তবু ধরা যাক একুশ অথবা বাইশ শতকেও সমস্যা হ্যাত দেখা দিল না, কিন্তু মানুষের জ্ঞানভাঙার শৈলেও শৈলেও যে হারে বাড়ছে তাতে কয়েক হাজার বছর পরে একদিন সমস্যা



দেখা দেবেই : সেটা হচ্ছে স্মৃতির সমস্যা । স্মৃতি দিয়েই জ্ঞানের ধারাবাহিকতা । সাধারণ মানুষ আজ পর্যন্ত মোটামুটি যে-ইতিহাস জানে—সব কথা নয়, মানুষের মোটামুটি যে ইতিহাস জানে—তা হচ্ছে পাঁচ-ছয় হাজার বছরের ইতিহাস । আরও জানে তার আগেকার মানুষের ইতিহাসের কয়েকটি রেখার পরিচয় মাত্র । মানুষ তখন ঘর-সংসার শুধু করেনি, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছে । তারপর গোত্রে-গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে অনেক হাজার বছর ধরে । অলিখিত সে ইতিহাস । নানা সূত্রে সে-ইতিহাসের আভাস মাত্র পাওয়া যায় । কিন্তু কয়েক হাজার বছর থেকে মানুষের সে-ইতিহাস তা কর্মেই বৰ্ধিত পরিমাণে লিখিত ইতিহাস; যুদ্ধবিহারের ইতিহাস শুধু নয়, মানুষের সবরকম জ্ঞান ও সংস্কৃতির ইতিহাস । আর এই লিখিত ইতিহাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রায় জ্যায়িতিক হারে । একজন মানুষের পক্ষে সারাজীবনে এই ইতিহাস জানাই দুর্ভ হয়ে উঠেছে, মানুষ তাই এখন জানছে শুধু বিশেষাকৃত ইতিহাস । এক হিসাবে বলা চলে বিচ্ছিন্ন সতত মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতি পরম্পরারের সংস্পর্শে এসে কর্মেই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং একটা বিশ্বসংস্কৃতি রূপলাভ করছে, তার নতুন-নতুন রূপলাভ ঘটছে অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় । অন্য হিসাবে বলা চলে মানুষের জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ কর্মেই বিভক্ত হয়ে পড়ছে এবং যতদিন যাবে ততই অপরিমিতরূপে বিভক্ত হয়ে যাবে । সব স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের ক্ষেত্রেই এটা ঘটছে, কোনো সমাজই তার সংস্কৃতিসহ একই রকম চিরাদিন থাকছে না । সেই সঙ্গে সমাজের মানসিক সম্পদ—তার সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি একই রকম থাকছে না । জীবন্ত সংস্কৃতির সব ধারা জীবন্ত থাকছে না, অনেক ধারার মৃত্যু ঘটছে, জাতির মৃত্যু ঘটছে, কিন্তু মানবীয় ধারা বেঁচে থাকছে, মানবীয় সংস্কৃতি বেঁচে থাকছে । কিন্তু যে-সব সংস্কৃতি, সমাজ অথবা জাতির মৃত্যু ঘটছে তারা মৃত্যুর পর ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে এবং শুধু ইতিহাস হিসাবেই বেঁচে থাকছে ।

এই ইতিহাসের স্মৃতির ভার একদিন মানুষের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠবে মনে হয় । দীর্ঘ দীর্ঘকাল পরে এই ইতিহাসকে জানতে হলে সব জ্ঞানার্থীকে একদিন ছবির অ্যালবামের মতো দ্রুত পাতা উল্টিয়ে যেতে হবে শুধু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ঘটার পর ঘটা মনোযোগ দিয়ে দেখার অবসর থাকবে না । এক-এক রকম জ্ঞানের জন্য থাকবে এক-এক রকম অ্যালবাম । কিন্তু এই উপমার মধ্যে কিছু ফাঁকি আছে । অ্যালবাম তো শুধু দেখার জন্য, কিন্তু অ্যালবাম বলে বর্ণিত মানুষের এই ইতিহাস দেখার জন্য নয়, পড়ার জন্য; কেননা না পড়লে অতীতের কিছুই জানা যায় না । অতীতের যা-কিছু বেঁচে থাকে তাকে ভালো করে জানতে হলে শুধু দেখলে চলে না, অথবা দেখার বিশেষ কিছু থাকে না, পড়তে হয় । কিন্তু কী পড়বে তখনকার মানুষ? গঞ্জ, উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, না এইসবের ইতিহাস? কোনো ভাষার কীর্তিমালার ইতিহাস? আমরা এখন একটি অথবা দুটি অথবা কয়েকটি ভাষার কয়েকটি কীর্তিমালার কথা ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারি মাত্র । কিন্তু আমাদের নিজেদেরই ভাষার অন্তর্গত সাহিত্যের একটা বড় অংশকে আমরা প্রায় জানি না, কেবল রূটির জন্য অথবা কালের দূরত্বের জন্য । জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে নিয়ে সেই কথা । বিজ্ঞান, প্রকৌশল, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা এমনই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে যে, একদিন কোনো একজন মানুষ হয়ত অনেক বিষয়েই সাধারণ জ্ঞানও রাখতে পারবেন না, একটি বিষয়ে সুপিণ্ঠি হলেও অন্য বিষয়ে তিনি নিতান্ত অজ্ঞ থেকে যাবেন । এমন দিনও আসতে পারে যখন মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না । এখনই তো কোনো উচ্চশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আইনস্টাইন অথবা অ্যাস্ট্রোনমির সর্বশেষজ্ঞাত জ্ঞানের সঙ্গে চিন্তার সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারেন না ।

এদিক দিয়ে অশিক্ষিত অসংস্কৃত মানুষদের সুবিধা । খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, উৎপাদন এবং প্রজননের মধ্যেই তাদের জীবন, তারা স্মৃতির ভারে পীড়িত নয়, কৌতুহলের উভেজনায় চক্ষে নয়, নতুন নতুন আবিক্ষারের কৃতিত্বে উচ্চকিত নয় । স্থান কাল চেতনা সৈক্ষণ্য-এইসব প্রশংসন তাদের কাছে কিছুই নয়, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, জন্ম-মৃত্যু-এইসবই তাদের কাছে জ্ঞানস্ত সমস্যা । এই নিয়ে তাদের জীবনমরণ । কিন্তু শুধু তাদের নিয়ে তো পৃথিবী নয় এবং ইতিহাস নয় । ইতিহাস তাদের কাছে কিংবদন্তি, অথবা কিংবদন্তি তাদের কাছে ইতিহাস? শুধু তাদেরকে নিয়ে মহাজগতে মহামানুষের জীবন নয়, কেননা তাদের চেতনা এবং এইসবের ধারাবাহিকতা সত্য এবং এই সত্যের মধ্যেই সে অমর-অর্থাৎ আজ পর্যন্ত । ভবিষ্যতেও সে অমর থাকবে, কিন্তু কতদিন? প্রশ্ন হচ্ছে, সে নিজেই

অমর হতে চাইবে কি না, এই অপরিসীম স্মৃতির বোঝা নিয়ে। যা স্মৃতির বঙ্গ তা স্মৃতিতে থাকলেই তার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, কিন্তু সৃষ্টির ভার একদিন অসহনীয় হয়ে উঠলে সেই ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইতিহাসের প্রকৃত চেতনা কি সেদিন মানবসমাজে থাকবে? আগামী দু-এক লক্ষ বছরের মধ্যে একদিন এ-সমস্যা দেখা দেবে, মনে হয়। আগামী কোটি বছরে তো মানুষের অবস্থা অকল্পনীয়। গত কোটি বছরের ইতিহাসের সমস্যা অনুরূপ। সে-ইতিহাসকে নানা জটিল পত্তায় আবিক্ষা করে নিতে হয়, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রাপ্তে ঘটনার যেমন ভিড় তাতে আগামী কোটি বছর কি মানুষ বাঁচবে? দু-চার লাখ বছর পরেই সে ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর কথাটা হচ্ছে এই যে, নতুন-নতুন মারণাঞ্চ যে-হারে উঠাবিত হচ্ছে, এই মারণাঞ্চ ব্যবহার করা যে উচিত নয় সে-জ্ঞান এবং নৈতিকতার বিকাশ কি সেই হারে বাঢ়ছে? রণনীতি এখন এই পর্যায়ে উঠেছে যে যুদ্ধে প্রতিপক্ষের যে-সব মানুষ মরে তারা আর মানুষ নয়, সংখ্যা মাত্র। এমন দিন হয়ত আসছে যখন যে-কোনো সংখ্যার পর দু-চারটে শূন্য শূধু শূন্য ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। এখনি তো পূর্ব-পশ্চিমের মহাশক্তিদের ভাঁওরে যে-পরিমাণ মারণাঞ্চ মজুদ আছে তাই দিয়ে মানবপ্রজাতির দশ-বিশ বার আত্মহত্যা করা সম্ভব। সুতরাং এমন ভয়াবহ পরিণাম এড়াতে হলে শুভবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের বিপুল জাগরণ ভিন্ন কোনো বিকল্প নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

- চেতনা** – চেতন্য। বোধ। জ্ঞান।
- অ্যালবাম** – আলোকচিত্র, ডাকটিকেট প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য এক প্রকার খাতা।
- প্রজাতি** – ইংরেজিতে স্পেসিস। কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের শ্রেণিবিশেষ। প্রাণিজগতে মানুষ একটি প্রজাতি।
- বহুবিচ্ছিন্ন জ্ঞানভাণ্ডার** – মানুষের জ্ঞানের বহু শাখা। যেমন : দর্শন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রকৌশলবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি।
- বিশেষাকৃত ইতিহাস** – সাহিত্য-সংস্কৃত-জ্ঞান-বিজ্ঞান-যাকে আত্মিক সম্পদও বলা যায়।
- মানসিক সম্পদ** – বৈমানিক ও আর্থিক সম্পদের বিপরীত। মূলত চিন্তন ক্ষিয়ার মধ্য দিয়ে যা সৃষ্টি।
- মানববীয় ধারা** – মানবজাতির বা মানবের ধারা। নিরবচ্ছিন্ন মানবপ্রবাহ। ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু ঘটলেও মানবপ্রজাতি ধারাবাহিকতাবে প্রবহমান।
- কিংবদন্তি** – লোকপরম্পরায় প্রচলিত কথা। জনশ্রষ্টি।
- এই সত্যের মধ্যেই** – মানবজাতির সামষিক চেতনার প্রবহমান রূপের যে সত্য সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকে। ব্যক্তিমানুষের সৃষ্টির মধ্য দিয়েই মানবসভ্যতা পরিপূর্ণ হচ্ছে আর ওই সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই ব্যক্তি মানুষ বেঁচে থাকছে।
- সে অমর** – যুদ্ধের কোশল।
- রণনীতি** – প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ। বিশেষভাবে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহকে বোঝানো হয়েছে।
- পূর্ব-পশ্চিমের মহাশক্তি** – এর একটি শাখা সম্পর্কেও পুঞ্জানুপুঞ্জ ধারণা লাভ অসম্ভব।

পাঠ-পরিচিতি

১৯৮১ সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি লেখকের ‘চেতনার অ্যালবাম এবং বিবিধ প্রসঙ্গ’ নামক প্রাঞ্চে প্রথম রচনা হিসেবে সংকলিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে।

এ প্রবন্ধে লেখক মানবসভ্যতার একটি সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। এই সংকটের দুটি দিক রয়েছে। একটি দিক হলো, বিভিন্ন শাখায় মানুষের জ্ঞানচর্চা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এখনই একজন মানুষের পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ অসম্ভব। জ্ঞানচর্চার ধারা যেরূপ সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে তাতে ভবিষ্যতে এর একটি শাখা সম্পর্কেও পুঞ্জানুপুঞ্জ ধারণা লাভের মাধ্যমে সুপ্রতিত হয়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে গড়বে।



ফলে মানুষকে ইতিহাস জানতে হলে একদিন ছবির অ্যালবামের মতো জ্ঞানরাজ্যের পাতা দ্রুত উল্টিয়ে যেতে হবে শুধু। পুজ্ঞানপুঞ্জভাবে দেখারও অবসর মানুষ পাবে না। আর একেক রকম জ্ঞানশাখার জন্য থাকবে একেক রকম অ্যালবাম। লেখকের মতে, এটা কেবল জ্ঞানার্থীদেরই সমস্যা। জ্ঞানচর্চায় বিমুখ অশিক্ষিত অসংকৃত মানুষের জন্য এটা কোনো সমস্যা নয়। লেখক সমস্যার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তা হলো, মানুষ তার জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই যে মারণান্ত্র তৈরি করেছে তা ব্যবহৃত হলে যে কোনো সময় পৃথিবী থেকে মানবজাতির বিলাশ ঘটতে পারে। এমন ভয়ানক পরিণাম থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে শুভবুদ্ধির প্রসার ঘটানো খুবই জরুরি।

বজ্জনিৰ্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন চেতনা দীর্ঘকালীন ব্যাপার?

- ক. ব্যক্তিক
- খ. মানবীয়
- গ. জাতীয়
- ঘ. মহাজাগতিক

২. ‘প্রবীণতার পথে নবগ্রামাতির একদিন বিলোপ ঘটতে পারে’—লেখকের একপ আশঙ্কার কারণ কী?

- ক. মানবসৃষ্ট দুর্যোগ
- খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- গ. সভ্যতার বিবর্তন
- ঘ. স্বাভাবিক নিয়ম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

রোগ-ব্যাধি নির্ময়, নিরাময়, বিনোদন, যোগাযোগ সকল ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি আজ বিপ্লব এনে দিয়েছে। প্রযুক্তির সাহায্যে মুহূর্তেই সব সমস্যার সমাধান মেলে। আবার দুষ্টলোকের হাতে পড়লে প্রযুক্তি হয়ে উঠতে পারে মানববিধ্বংসী।

৩. উদ্দীপকটি “চেতনার আ্যালবাম” প্রবক্ষের যে দিকগুলোকে ইঙ্গিত করে তা হলো—

- i. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ
- ii. মানবসৃষ্ট দুর্যোগ
- iii. চেতনার নেতৃত্বাচক দিক

কোনটি ঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii

৪. ইঙ্গিতপূর্ণ দিকটি থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে আলোচ্য প্রবক্ষে কোনটিকে নির্দেশ করা হয়েছে?

- ক. শুভবুদ্ধির প্রসার
- খ. দেশপ্রেম
- গ. গণজাগরণ
- ঘ. প্রকৃত জ্ঞানচর্চা

সূজনশীল প্রশ্ন

আমরা একবিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতের মানুষ। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগকে নিয়ে আমরা অনেক বেশি গবেষণা করি। পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয় বেন একটি গ্রামের মতো। মুহূর্তে তার এক প্রাঙ্গ থেকে অন্য প্রাঙ্গে যুগে আসি মোবাইল কিংবা ইন্টারনেটের সাহায্যে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে Genetically modified food বা GM food। ফলে এ শতাব্দীর মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। কিন্তু কিছু অসৎ লোক খাদ্যদ্রব্যে মাত্রাত্তিরিক ফরমালিন, কার্বাইড, সিসা ইত্যাদি মেশানোর ফলে জনস্বাস্থ্য আজ হ্রাসকির সম্মুখীন।

ক. লেখকের মতে হাজার বছর পর মানুষের জীবনে কোন সমস্যা দেখা দেবে?

- খ. প্রাবণ্যিক আন্দুল হক ‘বিশ্বসংকৃতি’ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের প্রথমার্ধে “চেতনার আ্যালবাম” প্রবক্ষের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয়ার্ধের নেতৃত্বাচকতা দূর করতে “চেতনার আ্যালবাম” প্রবক্ষে লেখক যে আবেদন জানিয়েছেন তা বিশ্লেষণ কর।

একটি তুলসী গাছের কাহিনি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

লেখক-পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট জ্যোমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আহমদউল্লাহ। তাঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল নোয়াখালী। কলকাতা ও ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। সাহিত্যিকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। দেশে-বিদেশে সরকারের বিভিন্ন উচ্চতর পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার, জীবনসংক্রান্তি ও সমাজ-সচেতন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনায় উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মীয় সামাজিক কুসংস্কার, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবমনের অন্তর্দ্রুণ প্রভৃতি। বাংলাদেশের কথাশিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছেন তিনি। ‘লালসালু’, ‘চাঁদের অমাবস্যা’ ও ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে— গল্পগ্রন্থ : ‘নয়নচারা’ এবং ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’; নাটক : ‘বহিপীর’, ‘তরঙ্গতঙ্গ’ ও ‘সুড়ঙ্গ’। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক (মরগোতুর) পেয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১-এর ১০ই অক্টোবর তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

ধনুকের মতো বাঁকা কথগ্রিটের পুলচির পরেই বাড়িটা। দোতলা, উঁচু এবং প্রকাণ্ড বাড়ি। তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দশায়মান। এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার বালাই নাই। তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা। কারণ, পেছনে অনেক জায়গা। প্রথমত প্রশংসন্ত উঠোন। তারপর পায়খানা-গোসলখানার পরে আম-জাম-কঁঠাল গাছে ভরা জঙ্গলের মতো জায়গা। সেখানে কড়া সূর্যালোকে ও সূর্যাস্তের স্মান অঙ্ককার এবং আগাছায় আবৃত মাটিতে ভ্যাপসা গন্ধ।

অত জায়গা যখন তখন সামনে কিছু ছেড়ে একটা বাগান করলে কী দোষ হতো?

সে-কথাই এরা ভাবে। বিশেষ করে মতিন। তার বাগানের বড় শখ, যদিও আজ পর্যন্ত তা কল্পনাতেই পুল্পিত হয়েছে। সে ভাবে, একটু জমি পেলে সে নিজেই বাগানের মতো করে নিতো। যত্ন করে লাগাতো মৌসুমি ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাস্তাহেনা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সঙ্ঘার পর আপিস ফিরে সেখানে বসতো। একটু আরাম করে বসবার জন্যে হাঙ্কা বেতের চেয়ার বা ক্যানভাসের ডেকচেয়ারই কিনে নিতো। তারপর গা ঢেলে বসে গল্প-গুজব করতো। আমজাদের ছক্কের অভ্যাস। বাগানের সম্মান বজায় রেখে সে না হয় একটা মানানসই নলওয়ালা সুদৃশ্য শুভগুড়ি কিনে নিতো। কাদের গল্প-প্রেমিক। ফুরফুরে হাওয়ায় তার কষ্ট কাহিনিময় হয়ে উঠতো। কিংবা পুল্পসৌরভে মদির জ্যোৎস্নারাতে গল্প না করলেই বা কী এসে যেতো? এমনিতে চোখ বুজে বসেই নীরবে সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধতা উপভোগ করতো তারা।

আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে থায় রাস্তা থেকেই চড়তে থাকা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মতিনের মনে জাগে এসব কথা।

বাড়িটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই; তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপুর্দশন করেছিল, তা নয়। দেশভঙ্গের হজুগে এ শহরে এসে তারা যেমন-তেমন একটা ডেরার সঙ্গানে উদয়ান্ত ঘূরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশপলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হলো না। কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে শৰীর উপস্থিত হয়। সে ভয় কাটতে দেরি হয় না। সেদিন সঙ্ঘায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রই-রই আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আম-কুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনা বলে ব্যাপারটা



তাদের কাছে দিন-দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয় না। কোনো অপরাধের চেতনা যদি বা মনে জাগার প্রয়াস পায় তা বিজয়ের উল্লাসে নিমেষে তুলোধূনো হয়ে উড়ে যায়।

পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাধিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার ওপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে-দলে আসে।

বিজয়ের উল্লাসটা দেকে এরা বলে, কী দেখছেন? জায়গা নাই কোথাও। সব ঘরেই বিছানা পড়েছে। এই যে ছোটো ঘরটি, তাতেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো শুধু বিছানা মাত্র। পরে ছ-ফুট বাই আড়াই-ফুট চারটি চৌকি এবং দু-একটা চেয়ার-টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না।

একজন সমবেদনার কষ্টে বলে,

—আপনাদের তক্লিফ আমরা কি বুঝি না? একদিন আমরা কি কম কষ্ট পেয়েছি? তবে আপনাদের কগাল মন্দ। সেই হচ্ছে আসল কথা।

যারা হতাশ হয় তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে সমবেদনা ভরা উক্তিতে।

—ঐ ঘরটা?

নিচের তলার রাস্তার ধারে ঘরটা অবশ্য খালিই মনে হয়।

খালি দেখালেও খালি নয়। ভালো করে চেয়ে দেখুন। দেয়ালের পাশে সতরঞ্জিতে বাঁধা দুটি বেড়ি। শেষ জায়গাটাও দু-ঘণ্টা হলো অ্যাকাউন্টস-এর মোটা বদরশিল্প নিয়ে নিয়েছে। শালার কাছ থেকে বিছানাগুরুর আনতে গেছে। শালাও আবার তার এক দোষ্টের বাড়ির বারান্দায় আস্তানা গেড়েছে। পরিবার না থাকলে শালাটিও এসে হাজির হতো।

নেহাত কপালের কথা। আবার একজনের কষ্ট সমবেদনায় খলখল করে ওঠে। যদি ঘটা দুয়েক আগে আসতেন তবে বদরশিল্পকে কলা দেখাতে পারতেন। ঘরটায় তেমন আলো নেই বটে কিন্তু দেখুন জানালার পাশেই সরকারি আলো। রাতে কোনোদিন ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে সে-আলোতেই দিব্যি চলে যাবে। বা কিঞ্জিনতা যদি করতে চায়—

অবশ্য এ-সব পরাহত বাড়ি-সন্দৰ্ভের কানে বিষবৎ মনে হয়।

যথাসময়ে বেআইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে পুলিশ আসে। সেটা স্বাভাবিক। দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমতো মশের মুশুক পড়েছে তা নয়। পুলিশ দেখে তারা ভাবে, পলাতক গৃহকর্তা কি বাড়ি উদ্ধারের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে? তবে সে-কথা বিশ্বাস হয় না দু-দিনের মধ্যে বাড়িটা খালি করে দিয়ে যে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে বর্তমানে তার অন্যান্য গভীর সমস্যার কথা ভাববার আছে। সন্দেহ থাকে না যে, পুলিশকে খবর দিয়েছে তারাই যারা সময় মতো এখানে না এসে শহরের অন্য কোনো প্রান্তে নিষ্কলভাবে বাড়ি দখলের ফিকিরে ছিল। মন্দভাগ্যের কথা মানা যায় কিন্তু সহ্য করা যায় না। ন্যায্য অধিকারস্থল এক কথা, অন্যায়ের ওপর ভাগ্য লাভ অন্য কথা। হিংসাটা ন্যায়সঙ্গত-তো মনে হয়-ই, কর্তব্য বলেও মনে হয়।

এরা কৃত্বে দাঢ়ায়।

আমরা দরিদ্র কেরানি মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভদ্র ঘরের ছেলে। বাড়ি দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা-দরজা ভাঙ্গি নাই, ইট-পাথর খসিয়ে চোরাবাজারেও চালান করে দিই নাই।

আমরাও আইন-কানুন বুঝি। কে নালিশ করেছে? বাড়িওয়ালা নয়। তবে নালিশটাও যথাযথ নয়।

কাদের কেবল কাতর রব তোলে! যাবো কোথায়? শখ করে কি এখানে এসে উঠেছি? সদলবলে সাব-ইন্সপেক্টর ফিরে গিয়ে না-হক না বে-হক না-ভালো না-মন্দ গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়ত ওপরওয়ালা তা ফাইল চাপা দেয়া শ্রেয় মনে করে। অথবা বুঝাতে পারে, এই হজুগের সময় অন্যায়ভাবে বাড়ি দখলের বিষয়ে সরকারি আইনটা যেন তেমন পরিষ্কার বোৰা যাচ্ছে না।

কাদের চোখ টিপে বলে, সত্য কথা বলতে দোষ কী? সাব-ইন্সপেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া। বলো না কাউকে কিন্তু।

ফর্ম-১৯, সাহিত্যপাঠ একাদশ, দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি



কথাটা অবশ্য কারোরই বিশ্বাস হয় না। তবে অসত্যটির গোড়ায় যে কেবল একটা নির্মল আনন্দের উস্কানি, তা বুঝে কাদেরকে ক্ষমা করতে বিধা হয় না।

উৎফুল্ল কর্তৃ কেউ প্রস্তাৱ কৰে, কী হে, চা-মিষ্টি হয়ে যাক।

রাতারাতি সরগরম হয়ে ওঠে প্রকাঞ্চ বাড়িটা। আস্তানা একটি পেয়েছে এবং সে আস্তানাটি কেউ হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। –শুধু এ বিশ্বাসই তার কারণ নয়। খোলামেলা ঘৰবাবে ভকতকে এ বাড়ি তাদেৱ মধ্যে একটা নতুন জীবন-সংঘার কৰেছে যেন। এদেৱ অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন-এ খালাসি পত্রিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদেৱ পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদেৱ সঙ্গে বা কমৰু খনসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধি নোংৱাৰ মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তুলনায় এ বাড়িৰ বড় বড় কামৱা, নীলকুঠি দালানেৰ ক্ষ্যাশালে মন্ত মন্ত জানালা, খোলামেলা উঠোন, আৱণ পেছনে বনজঙ্গলেৰ মতো আম-জাম-কঁঠালেৰ বাগান—এসব একটি ভিয় দুনিয়া যেন। এৱা লাটেবেলাটেৰ মতো একখনা ঘৰ দখল কৰে নাই সত্য, তবু এত আলো-বাতাস কখনো তাৱা উপভোগ কৰে নাই। তাদেৱ জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে ধৰ্মনীতে সবল সতেজ রঞ্জ আসবে, হাজার-দুহাজারওয়ালাদেৱ মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যেৰ জৌলুস আসবে, দেহও ম্যালেরিয়া-কালাজ্জৰ-ক্ষয় ব্যাখ্যিমুক্ত হবে। গ্ৰোগপট্কা ইউনুস ইতোমধ্যে তাৱ স্বাস্থ্যেৰ পৱিত্ৰতন দেখতে পায়। সে থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্ৰিটে। গলিটা যেন সকাল বেলাৰ আৰ্জনা-ভৱা ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধৰনেৰ একটা কাঠেৰ দোতলা বাড়িতে রান্নাঘৰেৰ পাশে স্যাংসেতে একটি কামৱায় কচছেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদেৱ সঙ্গে চার বছৰ সে বাস কৰেছে। পাড়াটি চামড়াৰ উৎকৃষ্ট গৰু সৰ্বক্ষণ এমন ভৱপুৰ হয়ে থাকতো যে রাস্তার ড্রেনেৰ পাচা দুর্গন্ধি নাকে পৌছতো না, ঘৰেৰ কোণে ইুৰ-বেড়াল মৱে পচে থাকলেও তাৱ থবৰ পাওয়া দুঃক্ৰ ছিল। ইউনুসেৰ জৱজাৰি লেগেই থাকতো, থেকে থেকে শেষ রাতে কাশিৰ ধৰ্মক উঠতো। তবু পাড়াটি ছাড়ে নি এক কাৰণে। কে তাকে বলেছিল, চামড়াৰ গৰু নাকি যস্কাৰ জীবাণু ধৰংস কৰে। দুর্গন্ধিটা তাই সে অন্তৰনবদলে সহ্য তো কৰতোই, সময় সময় আপিস থেকে ফিরে জানালাৰ পাশে দাঁড়িয়ে পাশেৰ বাড়িৰ নিশ্চিদ্ব দেয়ালেৰ দিকে তাকিয়ে বুকভৱে নিঃশ্বাস নিতো। তাতে অবশ্য তাৱ স্বাস্থ্যেৰ কোনো উন্নতি দেখা যায় নাই।

খানাদান না হলে বাড়ি সরগরম হয় না। তাই এক সপ্তাহ ধৰে মোগলাই কায়দায় তাৱা খানাদানা কৰে। রান্নার ব্যাপারে সকলেৰই শুশ্রে কেৱামতি প্ৰকাশ পায় সহসা। নানিৰ হাতে শেখা বিশেষ পিঠা তৈৰিৰ কৌশলটি শেষ পৰ্যন্ত অখাদ্য বস্তুতে পৰিণত হলেও তাৰিক প্ৰশংসায় তা মুখৰোচক হয়ে ওঠে। গানেৰ আসৱণ বসে কোনো কোনো সন্ধ্যায়। হাবিবুল্লা কোথেকে একটা বেসুৱো হারমনিয়াম নিয়ে এসে তাৱ সাহায্যে নিজেৰ গলাৰ বলিষ্ঠতাৰ ওপৰ ভৱ কৰে নিশ্চিধ রাত পৰ্যন্ত একটি অবজ্ব্য সংগীতসমস্যা সৃষ্টি কৰে।

এ সময়ে একদিন উঠানেৰ প্রাণ্টে রান্নাঘৰেৰ পেছনে চৌকোনা আধ হাত উঁচু ইটেৰ তৈৰি একটি মধ্যেৰ ওপৰ তুলসী গাছটি তাদেৱ দৃষ্টিগত হয়।

সেদিন রোবৰার সকাল। নিমেৰ ডাল দিয়ে মেছোয়াক কৰতে কৰতে মোদাৰেৰ উঠোনে পায়চাৰি কৰছিল, হঠাৎ সে তাৰঘৰে আৰ্তনাদ কৰে ওঠে। লোকটি এমনিতেই ছজুগে মানুষ। সামান্য কথাতেই প্ৰাণ-শীতল-কৰা রই-ৱই আওয়াজ তোলাৰ অভ্যাস তাৱ। তবু সে আওয়াজ উপেক্ষা কৰা সহজ নয়। শৈছই কেউ কেউ ছুটে আসে উঠানে।

—কী ব্যাপার?

—চোখ খুলে দেখ!

—কী? কী দেখবো?

সাপখোপ দেখবে আশা কৰেছিল বলে প্ৰথমে তুলসী গাছটা নজৱে পড়ে না তাদেৱ। দেখছো না? এমন বেকায়দা আসন্নাধীন তুলসী গাছটা দেখতে পাচ্ছা না? উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমৱা যখন এ বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোনো হিন্দুয়ানিৰ চিহ্ন আৱ সহজ কৰা হবে না।

একটু হতাশ হয়ে তাৱা তুলসী গাছটিৰ দিকে তাকায়। গাছটি কেমন যেন মৱে আছে। গাঢ় সবুজ রঙেৰ পাতায় খয়েৰি রং ধৰেছে। নিচে আগছাও গজিয়েছে। হয়ত বহুদিন তাতে পানি পড়েনি।

—কী দেখছো? মোদাৰেৰ হংকার দিয়ে ওঠে। বলছি না, উপড়ে ফেল!



এরা কেমন শৰ্ক হয়ে যায়। আকশ্মিক এ আবিষ্কারে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। যে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা ক-টা নাম থাকা সত্ত্বেও যে বাড়িটা এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছিল, সে বাড়ির চেহারা যেন হঠাতে বদলে গেছে। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুক্ষপ্রায় মৃত্যুয়ায় নগণ্য তুলসী গাছটি হঠাতে সে বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।

এদের অহেতুক স্তুতি লক্ষ করে মোদাবের আবার ছংকার ছাড়ে।

—ভাবছো কী অত? উপড়ে ফেলো বলছি।

কেউ নড়ে না। হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নেই। তবুও কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্তী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। আজ যে তুলসী গাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে পরিয়ন্ত তুলসী গাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ এককিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিদুরের নীরব রঞ্জাঙ্গ স্পর্শে একটা শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের বাড় এসেছে, হয়ত কারো জীবন-প্রদীপ নিতে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ-সময়ে, কিন্তু এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বজ্জ্ব থাকে নাই।

যে-গৃহকর্তী বছরের পর বছর এ তুলসী গাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? যতিন এক সময়ে রেলওয়েতে কাজ করতো। অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে-পটির ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে, হয়ত আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে-পটিতে সে মহিলা কোনো আঁচায়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে-থাকা লাল পাড়ের একটি মস্ত কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায়। হয়ত সে শাড়িটি গৃহকর্তীরই। কেমন বিষণ্ণভাবে সে শাড়িটি দোলে ঘঞ্জ হাওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। সে দৃষ্টি খৌজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়ত তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়ত ছলছল করে ওঠে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাব। সে বলে,

—থাক না শুটা। আমরা তো তা পুজো করতে যাচ্ছ না। বরঞ্চ ঘরে তুলসী গাছ থাকা ভালো। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।

মোদাবের অন্যদের দিকে তাকায়। মনে হয়, সবারই যেন তাই মত। গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না। শুদ্ধের মধ্যে এনায়েত একটু মৌলভি ধরনের মানুষ। মুখে দাঢ়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও আছে, সকালে নিয়মিতভাবে কেরান-তেলাওয়াত করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্তীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কি?

অক্ষত দেহে তুলসী গাছটি বিরাজ করতে থাকে।

তবে এদের হাত থেকে রেহাই পেলেও এরা যে তার সম্বন্ধে পর মুহূর্তেই অসচেতনভায় নিয়মিত হয় তা নয়। বরঞ্চ কেমন একটা দুর্বলতার ভাব, কর্তব্যের সম্মুখে পিছ-পা হলে যেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা আসে তেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা তাদের মনে জেগে থাকে। তারই কলে সেদিন সান্ধ্য আজ্ঞায় তরক ওঠে। তারা বাকবিতগুর স্নাতে মনের সে দুর্বলতা অস্বচ্ছন্দতা ভাসিয়ে দিতে চায় যেন। আজ অন্যান্য দিনের মতো রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে সাম্প্রদায়িকতাই তাদের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

—ওরাই তো সবকিছু মূলে, মোদাবের বলে। উলঙ্গ বালব-এর আলোয় তার সফতে মেছোয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে। তাদের নীচতা হীনতা গৌড়মির জন্যেই তো দেশটা ভাগ হলো।

কথাটা নতুন নয়। তবু আজ সে উক্তিতে নতুন একটা বাঁবা। তার সমর্থনে এবার হিন্দুদের অবিচার-অত্যাচারের অশেষ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসে।



দলের মধ্যে বামপন্থী বলে স্বীকৃত মকসুদ প্রতিবাদ করে। বলে, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কী? মোদাবেরের বকবকে দাঁত ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

বাড়াবাড়ি মানে?

বামপন্থী মকসুদ আজ এক। তাই হয়ত তার বিশ্বাসের কঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে দুলে কঁটাটি ডান দিকে হেলে থেমে যায়।

কয়েকদিন পরে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তুলসী গাছটা মোদাবেরের নজরে পড়ে। সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। তার তলে যে আগাছা জন্মেছিল সে আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। যে গাঢ় সবুজ পাতাগুলি পানির অভাবে শুকিয়ে খয়েরি রঁঁ ধরেছিল, সে পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিছে কেউ। খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে। মোদাবেরের হাতে তখন একটি কঁকি। সেটি সাঁ করে কচুকাটির কায়দায় সে তুলসী গাছের ওপর দিয়ে ঢালিয়ে দেয়। কিন্তু ওপর দিয়েই। তুলসী গাছটি অক্ষত দেহেই থাকে।

অবশ্য তুলসী গাছের কথা কেউ উল্লেখ করে না। ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাবটা পরদিন কেটে গিয়েছিল। তুলসী পাতার রসের প্রয়োজন হয় নাই তার।

তারা ভেবেছিল ম্যাকলিওড স্ট্রিট খানসামা লেন ব্লকম্যানের জীবন সত্যিই পেছনে ফেলে এসে প্রচুর আলো-হাওয়ার মধ্যে নতুন জীবন শুরু করেছে। কিন্তু তাদের ভুল্টা ভাঙ্গতে দেরি হয় না। তবে শুধু তত্ত্বান্বিত দেরি হয় যতখানি দরকার, সে বিশ্বাস দৃঢ় প্রমাণিত হবার জন্যে। ফলে আচম্ভিত আঘাতটা প্রথমে নিদারণই মনে হয়।

সেদিন তারা আপিস থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে সকালের পরিকল্পনা মোতাবেক খিচুড়ি রান্নার আয়োজন শুরু করেছে, এমন সময় বাইরে সিঁড়িতে ভারি জুতার মচমচ আওয়াজ শোনা যায়। বাইরে একবার উকি দিয়ে মোদাবের ক্ষিপ্রপদে ভেতরে আসে।

পুলিশ এসেছে আবার। সে ফিসফিস করে বলে।

পুলিশ? আবার কেন পুলিশ? ইউনুস ভাবে, হয়ত রাস্তা থেকে ছাঁচড়া চোর পালিয়ে এসে বাড়িতে চুকেছে এবং তারাই সন্ধানে পুলিশের আগমন হয়েছে। কথাটা মনে হতেই নিজের কাছেই তা খরগোশের গল্লের মতো ঠেকে। শিকারিয়ে সামনে আর পালাবার পথ না পেয়ে হঠাতে চোখ বুজে বসে পড়ে খরগোশ ভাবে, কেউ তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তারাই কি চোর নয়? সব জেনেও তারাই কি সত্য কথাটা ঝীকার না করে এ বাড়িতে একটি অবিশ্বাস্য মনোরম জীবন সৃষ্টি করেছে নিজেদের জন্য?

পুলিশ দলের নেতা সাবেকি আমলের মানুষ। হ্যাট বগলে চেপে তখন সে দাগ-পড়া কপাল থেকে ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। তার পচাতে বন্দুকধারী কলস্টেবল দুটিকেও যত্ন গোফ থাকা সন্ত্রিপ্ত নিরীহ মনে হয়। তাদের দৃষ্টি ওপরের দিকে। তারা যেন কড়িকঠ গোনে। ওপরের বিলিমিলির খোপে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। হয়ত তারা কবুতর দুটিকেই দেখে চেয়ে। হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পঙ্গ-পক্ষীর দিকে।

সবিনয়ে মতিন প্রশ্ন করে, কাকে দরকার?

—আপনাদের সবাইকে। পুলিশদের নেতা একটু খনখনে গলায় ঝট করে উভর দেয়। আপনারা বেআইনিভাবে এ বাড়িটা কঁজা করেছেন।

কথাটা না মেনে উপায় নাই। ওরা প্রতিবাদ না করে সরল চোখে সামান্য কৌতুহল জাগিয়ে পুলিশদের নেতার দিকে চেয়ে থাকে।

—চরিষ ঘটার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। সরকারের হকুম।

এরা নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অবশ্যে মোদাবের গলা সাফ করে প্রশ্ন করে, কেন, বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে নাকি?



অ্যাকন্টস আপিসের মোটা বদরছিল গলা বাড়িয়ে কলস্টেবল দুটির পেছনে একবার তাকিয়ে দেখে বাড়িওয়ালার সন্ধানে। সেখানে কেউ নেই। তবে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা।

—কোথায় বাড়িওয়ালা? না হেসেই গলায় হাসি তোলে পুলিশ দলের নেতা।

এদের একজনও হেসে ওঠে। একটা আশার সংগ্রাম হয় যেন।

—তবে?

—গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে।

এবার হাসি জাগে না। বন্ধুত অনেকক্ষণ যেন কারো মুখে কোনো কথা সরে না। তারপর মকসুদ গলা বাড়ায়। আমরা কি গভর্নমেন্টের লোক নই?

এবার কলস্টেবল দুটির দৃষ্টিও কবুতর কড়িকাঠ ছেড়ে মকসুদের প্রতি নিষ্ক্রিপ্ত হয়।

তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। মানুষের নিরুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়।

তারপর প্রকাণ সে বাড়িতে অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেমে আসে। প্রথমে অবশ্য তাদের মাথায় খুন চড়ে। নানারকম বিদ্রোহী ঘোষণা শোনা যায়। তারা যাবে না কোথাও, ঘরের খুঁটি ধরে পড়ে থাকবে; যাবে তো লাশ হয়ে যাবে। তবে মাথা শীতল হতে দেরি হয় না। তখন গভীর ছায়া নেমে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা?

পরদিন মোদাবের যখন এসে বলে তাদের যেয়াদ চবিশ ঘণ্টা থেকে সাতদিন হয়েছে তখন তারা একটা গভীর স্পষ্টির নিঃশ্বাস ছাড়লেও সে-ঘন ছায়াটা নিবিড় হয়েই থাকে। এবার কাদের পুলিশ সাব ইসপেন্টেরের দ্বিতীয় ঝীর সঙ্গে তার আজীব্যতার কথা বলে না। তবু না বলা কথাটা সবাই মেনে নেয়।

তারপর দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি বাড়ের মতো এসেছিল, তেমনি বাড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়। শূন্য বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাসের চিহ্নস্মরণ এখানে-সেখানে ছিটিয়ে থাকে অবরে কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় বোলাবার একটা পুরোনো দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি।

উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয়নি। সেদিন থেকে গৃহকর্তার ছলছল চোখের কথাও আর কারও মনে পড়েনি।

কেন পড়েনি সে কথা তুলসী গাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।

শব্দার্থ ও টীকা

কংক্রিটের পুল

— চুন-বালি-সিমেন্ট ও চুনাপাথরের মিশ্রণে তৈরি পাকা সেতু।

ক্যানভাস

— মজবুত মোটা কাপড় বিশেষ।

ডেক চেয়ার

— ঘরের বাইরে ব্যবহারের জন্য কাঠ বা ধাতুর কাঠামোর ওপর ক্যানভাস দিয়ে তৈরি সংকোচনযোগ্য আসন।

গুড়গুড়ি

— আলবোলা। ফরাসি। নলযুক্ত ঝুঁকা।

মদির

— মন্ততা জাগায় বা সৃষ্টি করে এমন।

দেশভঙ্গের হজুরগে

— ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের আবেগবশত।

ডেরা

— অস্থায়ী বাসস্থান। আস্তানা।

পরাহত

— ব্যাহত। বাধাগ্রস্ত। পরাজিত।

ফিকির

— ফন্দি। মতলব। উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়।

| | |
|--------------------|---|
| না-হক | - ন্যায়সমত নয় এমন। |
| না-বেহক | - অন্যায় নয় এমন। |
| ঘোর-ঘোরালো | - খুবই জটিল। অত্যন্ত প্যাচালো। |
| লাটেলাট | - গভর্নর বা অনুরূপ সন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ। |
| কচ্ছদেশীয় | - শুজরাটের উভরে অবস্থিত সমুদ্রতীরবর্তী ছান। |
| ইয়ার্ড | - স্টেশনসংলগ্ন চতুর। |
| সাম্প্রদায়িকতা | - সম্প্রদায়গত তেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিকতা ও ত্রিয়াকলাপ। |
| বামপন্থী | - সাম্যবাদী। প্রগতিবাদী। বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। |
| রিকুইজিশন | - কোনো কিছু চেয়ে লিখিত ফরমাশ। তলব করা। Requisition। |
| কড়িকাঠ | - ছাদের তলায় দেওয়া আড়াআড়ি লম্বা কাঠ। |
| অদ্রতার বালাই | - সাধারণ সৌজন্যবোধ। |
| পৃষ্ঠপ্রদর্শন | - পালানো। |
| দিনে দুপুরে ভাকাতি | - প্রকাশ্য প্রতারণা ও মিথ্যাচার। ভাকাতির মতো দুঃসাহসিক কাজ। |
| তুলোধুনো হওয়া | - ধুনা তুলোর মতো ছিল-বিছিল হওয়া। |
| কলা দেখানো | - আলংকারিক অর্থে ফাঁকি দেওয়া। |
| মগের মুছুক | - আলংকারিক অর্থে অরাজক দেশ বা রাজ্য। |

পাঠ-পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর “একটি তুলসী গাছের কাহিনি” গল্পটি ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’ নামক গল্পথন্ত থেকে সংকলিত। গল্পের সীমিত পরিসরে জীবনের গভীর কোনো তাংপর্যকে ইঙ্গিতয় ও ব্যঙ্গনাসমূহ করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মুসিয়ানা রয়েছে। “একটি তুলসী গাছের কাহিনি”তেও এ শুণটি লক্ষ করা যায়।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই ঢাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন উদ্বাস্তু কর্মচারী। কলকাতার বিঞ্জি এলাকায় কোনোরকমে মাথা শুঁজে দুর্বিষ্঵হ জীবনযাপন করলেও নিরাশ্রিত উদ্বাস্তু জীবনের যে উদ্বেগ আর উৎকর্ষ এতদিন তাদের গ্রাস করেছিল কলকাতার তুলনায় অনেক অনেক খোলামেলা বাড়ি পেয়ে তারা কেবল যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তা নয়, বরং বাড়িটিকে তাদের কাছে ঘনে হলো বেহেশ্ত। অচিরেই বাড়ির উঠানে আগাছার মধ্যে তারা আবিক্ষার করল একটি তুলসী গাছ। সবাই প্রথমে গাছটাকে উপাড়ে ফেলার জন্য হইচই করলেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা দ্বিধাও জাগে এবং শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায় তুলসী গাছটা। দেখা গেল সকলের অজ্ঞাতে কেউ একজন গাছটার পরিচর্যা করতে শুরু করেছে। তারপর একদিন সরকারি নির্দেশে বেআইনি দখল থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হলো। শুন্য বাড়িটাতে রইল কেবল ছড়ানো পরিত্যক্ত আবর্জনা আর সেই তুলসী গাছটা। যত্নের অভাবে তুলসী গাছটা অচিরেই আবার শুক্রপ্রায় হয়ে উঠল। যে রাজনৈতিক ঘূর্ণবর্তের শিকার হয়েছে অসংখ্য মানুষের শাস্ত জীবন তুলসী গাছটাও যে তারই শিকার অসহায় গাছটা তা জানবে কী করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “একটি তুলসী গাছের কাহিনি” গল্পে গল্পপ্রেমিক কে?

- ক. মকসুদ
- গ. ইউনুস

- খ. কাদের
- ঘ. মোদাবের



২. ‘অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা’ বলতে গল্পকার যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো-

- i. পরশ্রীকাতরতা
- ii. হজুগে মেতে ওঠা
- iii. হিংসাপরায়ণতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উচ্চিপক্ষটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

শরৎচন্দ্রের “মহেশ” গল্পে দেখা যায়— শ্রীন্দ্রের প্রচণ্ড দাবদাহে চারদিক ফেটে চৌচির হয়ে গেলে মানুষের পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। তখন গ্রামবাসীর একমাত্র অবলম্বন হয় জমিদার শিবচরণের পুকুর। কিন্তু দরিদ্র কৃষক গফুরের মেয়ে আমিনা মুসলমানের মেয়ে বলে সে পুকুরঘাটে নামতে পারে না। এছাড়া গফুরের পুত্রুল্য ষাঢ় মহেশ ঘাস খায় বলে শুশানের ধারের গোচারণ ভূমিটুকুও জমিদার বিক্রি করে দেন।

৩. উচ্চিপক্ষের শিবচরণ “একটি তুলসী গাছের কাহিনি” গল্পে কার প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. মোদাবেরের

খ. ইউনুসের

গ. মকসুদের

ঘ. মতিনের

৪. উচ্চিপক্ষে “একটি তুলসী গাছের কাহিনি” গল্পের যে দিকগুলো প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো—

- i. অসহায়তা
- ii. ধর্মনিরপেক্ষতা
- iii. জাতিভেদ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া

ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।

হুকের জল আর ভাতের হাঁড়ি-ভাবলি এতেই জাতির জান,

তাইতো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিরে একশ খান।

এখন দেখিস ভারত জোড়া পচে আহিস বাসি মড়া,

মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হক্কাহয়া।

ক. ইউনুস কলকাতার কোথায় থাকত?

খ. “মকসুদের বিশ্বাসের কাঁটাটি দুলে দুলে খেমে যায়”— কেন, ব্যাখ্যা কর।

গ. কবিতাঙ্খের ‘জাত শেয়ালের হক্কাহয়া’, “একটি তুলসী গাছের কাহিনি” গল্প যেভাবে প্রতিক্রিয়া করে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সেই প্রতিক্রিয়া বন্ধ করতে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে মানুষ?— মন্তব্যটি বিচার কর।



মানুষ মূলীর চৌধুরী

সেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম ঋপকার মূলীর চৌধুরী ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর পিতার কর্মসূল মানিকগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে বরেণ্য শিক্ষাবিদ, অসাধারণ বক্তা, সৃজনশীল নাট্যকার, তীক্ষ্ণবী সমালোচক ও সফল অনুবাদক। সাহিত্য ও ধরনিতত্ত্বের গবেষণা ও ভূলনামূলক সমালোচনায় তিনি রেখে গেছেন অন্য পাণ্ডিত্য ও উৎকর্ষের ছাপ। মূলীর চৌধুরী বাংলাদেশের আধুনিক নাটক ও নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁর নাটক মনন ও নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সেখা অসাধারণ নাটক ক'বৰ' তিনি রচনা করেছিলেন জেলখানায় বসে। তাঁর অন্যান্য মৌলিক নাটক হচ্ছে : 'রঞ্জান্ত প্রান্তর', 'চিঠি', 'দণ্ডকারণ্য', 'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য'। তাঁর অনুবাদ নাটকের মধ্যে রয়েছে : 'কেউ কিছু বলতে পারে না', 'বৃপ্তার কোটা', 'মুখরা রমণী বশীকরণ'। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সমালোচনামূলক প্রচ্ছের মধ্যে রয়েছে : 'মীর-মানস', 'ভূলনামূলক সমালোচনা', 'বাংলা গদ্যরীতি' ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মাত্র ৪৬ বছর বয়সে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক-দালালদের হাতে তিনি অপহৃত ও পরে নিহত হন।

| | বাবা | শিশু |
|--------|--------|-----------|
| চরিত্র | আম্মা | লোকটা |
| | ফরিদ | এবং একজন। |
| | জুলেখা | |

বড় শোবার ঘর। ডানদিকে একটা খাট একটু কোনাকুনি করে রাখা। মশারি ওঠালো। বামে মাঝারি রাকমের টেবিল, তাতে শেড দেয়া ল্যাম্প, পাশে টেলিফোন। দু-একটা অতিরিক্ত বসবার জায়গা। একদিকে গোসলখানার দরজা, অন্য পাশে গরাদহীন কাচের বড় জানালা।

পর্দা ওঠার সঙ্গে শোনা যায় দূরে, বহু কষ্টের মিলিত ধ্বনি বন্দে মাতরম। এবং একটু কাছে প্রচণ্ড আল্লাহ আকবর রব! এই দুই চিৎকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাঝে মাঝে দেখা দেবে, বক্ষ জানালার কাচের মধ্য দিয়ে দূরে লকলকে আগ্নের শিথা, নীল আকাশকে রক্তিমাত্র করে কাঁপছে।

ঘরের মধ্যে চারজন লোক ও একজন অসুস্থ শিশু। খাটের উপর বর্ষায়সী আম্মাজান আধশোয়া অবস্থায় শিশুকে আন্তে আন্তে বাতাস করছেন। আবছা আলোতে আম্মাজানের ক্লান্ত উদ্বিগ্ন মুখ এক অঙ্গুত বিষাদ-ভরা গান্ধীর্মে তরু। শিশুর অন্য পাশে পানির প্লাস হাতে নিয়ে কিশোরী জুলেখা। মাঝার ওড়নার এক অংশ ঝুলে মাটিতে পড়ে গেছে, ঘামে কপালের উঁড়ো চুল গালে গলায় লেপ্টে আছে। অসহনীয় আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে ভয়ার্ত অর্থহীন চাহনি। টেবিলের সামনে খাটের দিক পেছন ফিরে, কোমরের পেছনে দুহাত মুঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন আবাজান। নিচল নীরব। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন টেবিলের ল্যাম্পের সহস্র আলোকরণ্যির কেন্দ্রস্থলে। যেন ভেতরের কোনো অশান্তি বিস্ফুল হিস্ত অন্তর্দ্রুবকে নিষ্পেষিত করে তবে তিনি সুস্থলুপ ধারণ করবেন। টেবিল ল্যাম্পের সংকীর্ণ আলো-পরিসীমার মধ্যে কাঁপানো সাদা দাঁড়ি আর কপালের গভীর রেখা জলজল করছে। ধিতীয় ছেলে ফরিদ নিশাচর কোনো পশুর মতো সন্তর্পণে সামনে পায়চারি করছে। থমকে দাঁড়াচ্ছে। চোখে মুখে প্রতিহিস্মার ছায়াবাজি।

দূরে ধ্বনি উঠল বন্দে মাতরম, তিনবার। হাজার কষ্টের আকাশ কাঁপানো ছংকার। তারপরই, তীব্র অঙ্ককার আকাশ ছিন্নভিন্ন করে পাঁচটা আহ্বান, আল্লাহ আকবর! কিছুক্ষণ সব স্তুক।



আব্বা। আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর!

জুলেখা। আব্বাজান! আব্বাজান!

আব্বা। কী! তয় পেয়েছিস, না! ভীরু কোথাকার! ইমানের ডাক শব্দে আঁধকে উঠেছিস? চুপ। কাঁদিস না।
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে শোন আব্বার। আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর। বল, তয় লাগে এখনো!

জুলেখা। না।

আব্বা। ভেবেছিলি আমি পাগল হয়ে গেছি, না? কেন? জীবনে অনেক লোককে মরতে দেখেছি, চোখের সামনে। খাস বদ্ধ হয়ে, চোখ উচ্চে দিয়ে, জিব বার করে, গলগল করে রক্ত বামি করে কত সুহৃ মানুষকে মরতে দেখেছি। কই কোনোদিন তো উন্নাদ হয়ে যাইনি।

আম্মা। (ফরিদকে) হাসপাতালে আরেকবার ফোন করে দেখবি?

ফরিদ। লাভ নেই। ওরা মোর্শেদ ভাইয়ের বর্ণনা টুকে রেখেছে। কোনো সংবাদ পেলে আমাদের ফোন করে জানাবে বলেছে।

জুলেখা। মোর্শেদ ভাই আমার জন্য বই কিনতে বেরিয়েছিল। মোর্শেদ ভাইকে আমি কেন যেতে বললাম।

আব্বা। চুপ, চুপ নালায়েক মেয়ে! আদরের দেমাক করিস না অত। তুই, তুই কে? মোর্শেদকে বাইরে পাঠাবার না পাঠাবার তুই কে? যিনি পাঠাবার তিনিই পাঠিয়েছেন। মালাউনের ছুরির খোঁচায় মরণ, ওর তকদিরে লেখা ছিল এমনি ঘণ্ট! আজ হবে জানলেই যেন তুই সব রাখতে পারতি!

ফরিদ। আব্বা!

আব্বা। কী, তোমারও তয় হচ্ছে, আমি উন্নাদ হয়ে গেছি! আমি ভুলে গেছি বাপ হয়ে মেয়ের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়।

ফরিদ। হাসপাতাল থেকে ওরা এখনও কোনো খবর দেয় নি, আপনি যিছেমিছি ওসব কথা কেন ভাবছেন?

আব্বা। হাসপাতাল! ওরা তোমার ভাইকে ছুরি মেরে কোলে ভুলে হাসপাতালে পৌছে দিয়ে গেছে, না? ওগো শুনেছ, তোমার ছেলের কথা? আমি জানি মোর্শেদকে এতক্ষণে ওরা কী করেছে। আমি জানি।

ফরিদ। আব্বাজান, আপনি আর কথা বলবেন না। চুপ করে শুয়ে পড়ুন।

আব্বা। চুপ করে শুয়ে থাকব? কেন? ওরা আমার ছেলেকে কেটে, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, শরীর থেকে গলা কেটে মাথাটা আলাদা করে ফেলেছে। মোর্শেদের কালো কোঁকড়া চুল চাক-বাঁধা রক্তের দলার সঙ্গে লেপ্টে ওর গাঢ় মরা চোখ ঢেকে রেখেছে।

জুলেখা। ভাইয়া, আব্বাকে চুপ করতে বল।

আব্বা। কে, কে আমাকে চুপ করাবে? তোরা মরে গেছিস। তোরা চুপ করে থাক। তোরা ওর ভাই নয়, বোন নয়। তোরা ওর কেউ নস। তাই তোরা চুপ করে আছিস। আমি ওর বাপ-

আম্মা। জুলেখা!

জুলেখা। আম্মা।

আব্বা। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ওরা ওর কাটা মুঝুকে কাঁসার থালায় সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছে, ওরা সবাই তাই দেখে বাহবা দিচ্ছে-ফুর্তির থাতিরে মুঠো মুঠো টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার ছেলের নরম সাদা গলাকাটা লাশের-

আম্মা। খো দা আ!

আব্বা। কে, কে খোদাকে ডাকল?

ফরিদ। আম্মা, আম্মা, কথা বলছ না কেন? খোকার দিকে আঙুল দিয়ে কী দেখাচ্ছ?

জুলেখা। ভাইয়া, খোকা যেন কেমন হয়ে গেছে। নড়ছে না। মুখের শিরাশলো কী রকম নীল হয়ে ফুটে উঠেছে।



- আব্বা। দেখি, দেখি। আমায় দেখতে দাও। জুলি অমন ঝুঁকে পড়ে রইলি কেন। পানি, একটু পানি নিয়ে আয়। (জুলি গ্লাস থেকে চামচে পানি ঢালে)
- ফরিদ, তুমি একবার হাসপাতালে, ডাঙ্কার যে-কোনো ডাঙ্কারকে একবার খবর দাও। যত টাকা লাগে দেবো, সে যেন দেরি না করে সোজা এখানে চলে আসে।
- ফরিদ। তাতে কোনো ফল হবে না আব্বা। আরও দুবার ফোন করেছি, এই দাঙ্কার ভেতর জীবন বিপন্ন করে কোনো ডাঙ্কার আসতে রাজি নয়।
- আব্বা। কেউ আসবে না? কেউ নয়? সবার জীবনের মূল্য আছে, শুধু আমার ছেলেটার নেই?
- জুলেখা। আব্বা, খোকা পানি থাচ্ছে না। ঠোটের দুপাশ দিয়ে সব গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।
- ফরিদ। আব্বা আমি যাই।
- আব্বা। কোথায়?
- ফরিদ। ডাঙ্কার ডেকে নিয়ে আসি।
- আব্বা। না না। তুই যেতে পারবি না। তুই আমার চোখের সামনে থাকবি। কোথাও যাবি না। আমি ‘বুরোছি’ ওরা আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিতে চায়। আমার পাঁজরের হাড় একটা একটা করে খুলে নিয়ে আমাকে যন্ত্রণায় উন্মাদ করে মেরে ফেলতে চায়। আমি দেবো না। আমি তোমাদের কাউকে হারাব না। বুনো চিতার মত ওরা নিষ্পন্নে ওত পেতে ছিল। আমার মোর্শেদ, অসহায়, নির্দোষ, শক্তিহীন—
(চিনের দরজায় ঘা পড়ে)
- কে, কে, দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে? তাহলে মোর্শেদকে ওরা মেরে ফেলতে পারে নি! মোর্শেদ ফিরে এসেছে, আমার মোর্শেদ বেঁচে আছে, সে আমায় ডাকছে। তোমরা কেউ ওকে, মোর্শেদ, মোর্শেদ—
(দরজায় আরও জোরে আঘাত)
- ফরিদ। আপনি অত উভেজিত হবেন না। স্থির হয়ে বসুন। আমি দরজা খুলে দেখছি কে এসেছে। জুলেখা তুই আব্বার কাছে এসে বোস। আমি এক্সুপি দেখে আসছি।
- (প্রস্থান)
- আব্বা। জানিস জুলি, খোদার রহমত আছে আমার ওপর। এখনি দেখবি মোর্শেদ ছুটে ওপরে আসবে। ওর হাসির শব্দে এ ঘর কলকল করে উঠবে। খোকার অসুখ ভালো হয়ে যাবে, সমস্ত পৃষ্ঠিবী শান্ত সুন্দর হয়ে চারদিক আলোকিত করে রাখবে।
- (ফরিদের প্রবেশ)
- ওকি, তুই একলা কেন? মোর্শেদ, মোর্শেদ কোথায়?
- ফরিদ। মোর্শেদ ভাই নয়, পাড়ারই একটি লোক এসেছিল খবর দেয়ার জন্য। আমাদের এলাকায় একটা হিন্দু গুপ্ত নাকি চুকেছে, সাবধানে থাকতে বলল। একটু আগে বশির উকিলের ছাদে কে ওকে দেখেছে। অঙ্ককারে ছাদ টপকে কোথায় পালাল কেউ ঠিক ঠাহর করতে পারল না।
- আব্বা। বশির উকিলের বাড়ির ছাদে?
- ফরিদ। হ্যাঁ। আমি বাইরে যাচ্ছি। দলবল নিয়ে সবাই খুঁজতে বার হবে। আমিও যাচ্ছি।
- আব্বা। তুই যাবি?
- ফরিদ। চুপ করে বসে থাকব? আমি যাচ্ছি। (ড্রয়ারে হাত দেয়) পিণ্ডলটা রইল। হাতের কাছে রাখবেন। আমি এই ছোরাটা সঙ্গে নিয়ে গেলাম।
- জুলেখা। ভাইয়া, তুমি যেও না।
- আব্বা। ছোরা? ছোরা কেন? ছোরা দিয়ে তুই কী করবি?



ফরিদ। আমার ভাইয়ের কাটা মাথা যারা ফেরি করে বেড়াতে পারে তাদের বিরুদ্ধে ছোরা তুলতে আপনি আমায় নিষেধ করেন আবাজান? দুধের কচি শিশুকে যারা হত্যা করতে হাতিয়ার তুলে থরেছে, সে সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে ছোরা হাতে নিয়েছে বলে আপনি শিউরে উঠলেন? আপনার সম্মত বনেদি রুটিকে কদমবুছি। আমি যাই, দোয়া করবেন।

(প্রস্তাব)

(আবাজান নিশ্চল। জুলেখা আবাজানকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

আমা খোকাকে বাতাস করছেন। হঠাত যন্ত্রণাকাতর শিশুর কষ্টরুক্ষ আর্তনাদ।)

জুলেখা। আমা, আমা, খোকা অমন ছটফট করছে কেন? খোকার কী হয়েছে আম্বাজান?

আবরা। আমি অনেক শুনাই করেছি খোদা, আমায় শাস্তি দাও, শাস্তি দাও। যত খুশি যন্ত্রণা আমায় দাও আমি কোনো নালিশ জানাবো না। মোর্শেদ যদি তোমার কাছে কোনো দোষ করে থাকে, তাকে শাস্তি দাও, আমি মাথা পেতে নেবো, একটু প্রতিবাদ জানাবো না। কিন্তু ঐ কচি শিশু নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ঘ, মায়ের কোল থেকে এখনও পৃথিবীতে নাবে নি, ও তো কোনো অপরাধ করে নি, তুমি কোন ইনসাফে ওকে খাস বন্ধ করে মারতে চাও! ওকে মুক্তি দাও, শাস্তি দাও, রেহাই দাও—বাঁচাও, বাঁচাও, ওকে তুমি বাঁচাও খোদা! (দুহাতে মুখ গুঁজে টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। আম্বাজান নিশ্চল। জুলেখা ফুঁপিয়ে কাঁদে। হঠাত পেছনের কাচের জানালার ওপর, বাইরে থেকে কোনো ভারি জিনিসের কয়েকটা আঘাত পড়ে। একটা কাচ বানবান শব্দে ভেঙে পড়ল।)

আবরা। কে? (হাত দিয়ে পিস্তল চেপে ধরেন)

(ভাঙা কাচের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে ক্ষিপ্তহল্তে ছিটকিনি খুলে, জানালা টপকে ঘরে প্রবেশ করে এক যুবক। শেষ দেয়া টেবিল ল্যাঙ্কের স্বল্পালোকে দেখা গেল লোকটার হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ, গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবি, পরনে ধূতি।)

আবরা। (কাঁপা হাতে পিস্তল তুলে) কে, কে তুমি?

লোকটা। আমি—মানুষ?

আবরা। মানুষ?

লোকটা। মানুষ, হিন্দু!

আবরা। বশির উকিলের বাড়ির ছাদে ওরা, তাহলে তোমাকেই দেখেছিল?

লোকটা। হ্যাত। হঠাত দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে ভাবিনি। বস্তুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, প্রয়োজনে। গিয়ে আর বেরতে পারিনি।

আবরা। এখন বেরলে কোন সাহসে?

লোকটা। আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না। বেরিয়েছি বাধ্য হয়ে। বস্তুর সাহসে কুলোগো না, আমায় জায়গা দেয়। বস্তুকে ছেড়ে তাই ছাদ টপকে বেরিয়ে পড়লাম, নিরাপদ জায়গার খৌজে।

আবরা। বস্তুর বাড়ির চেয়ে এটা বেশি নিরাপদ এ আশ্বাস তোমায় কে দিয়েছে!

লোকটা। আমি আশ্রয় দাবি করছি না, প্রার্থনা করছি। অন্য উপায় নেই।

আবরা। বাইরে দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ কান পেতে শুলে, এ ভুল তুমি করতে না।

জুলেখা। আবরা, আবরা, তোমার হাত কাঁপছে। শুলি ছুটে যেতে পারে!

আবরা। (একটু একটু করে এগুতে থাকে) যখন তুমি হ্যাত জানালা ভেঙে প্রাপ বাঁচাতে আমার ঘরে ঢুকেছো, ঠিক তখনই হ্যাত তোমার কোনো পরম আত্মীয় আমার বড় আদরের ছেলে মোর্শেদকে ছুরির মাথায় গেথে নাচাচ্ছে, বিলাসী বেড়াল যেমন অসহায় ইন্দুরকে নখের আঁচড়ে একটু একটু করে কুরে কুরে মারে। আর আমার খোকা-

(খোকা ও মায়ের আর্তনাদ। বেদনাযুক্ত, ভয়াত্ত।)



লোকটা। শুকি? উনি ও-রকম করে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লেন কেন?

জুলেখা। আব্বা, আব্বা, খোকা জানি কেমন করছে?

লোকটা। খোকার কী হয়েছে? অসুখ?

আব্বা। হ্যাঁ, অসুখ। মরণ-অসুখ! গত আধ ঘণ্টা থেকে ছটফট করছিল, এখন হয়ত শাস্তি লাভ করল।

লোকটা। কী করছেন আপনি? দেখি, জায়গা ছাড়ুন, পিণ্ডলটা সরিয়ে একটু পথ দিন। আমি দেখছি।

আব্বা। তুমি, তুমি? তুমি কী দেখবে? ওহ বুঝেছি, তোমাদের এখনও আঁশ মেটেনি। আমার খোকাকে বুঝি নিজ হাতে নিয়ে যেতে ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে।

লোকটা। আপনি অপ্রকৃতিষ্ঠ। সরে দাঁড়ান।

(সকলের স্তুতি দ্বারা সামনে দিয়ে নীরবে এগিয়ে গিয়ে লোকটা খোকার পাশে বসে। হাতের কালো ব্যাগটা খুলে ডাঙ্কারি সরঞ্জাম বার করে পরীক্ষা করতে থাকে।)

ভয়ের কোনো কারণ নেই, মা। খুব সময়মত এসে পড়েছি। কষ্টনালির উত্তু মাংসপিণি হঠাত ফুলে গিয়ে মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ করে দিতে চাইছে। আমি একটা উন্নেজক ওষুধ দিচ্ছি। আর একটা ইনজেকশন দেব। সব এক্ষুনি ভালো হয়ে যাবে। কিছু ভাববেন না।

আব্বা। ইনজেকশন?

(লোকটা চামচ দিয়ে ওষুধ খাওয়াবে। স্পিরিট দিয়ে তুলো ভিজিয়ে সূচ সেঁকে নেয়। সংলাপ চলতে থাকে, কখনও জুলেখা, কখনও আব্বা, কখনও আমা লোকটাকে টুকটাক সাহায্য করে।)

লোকটা। এই যন্ত্রগুলো দেখে অস্তত আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। আমি এখনও পুরোদস্ত্র পেশাদার ডাঙ্কার হইনি। সবেমাত্র পাস করেছি। বন্ধুর বাড়ি এসেছিলাম, রোগী দেখতে। আশা করিনি এক রাতের মধ্যেই দুঁজন রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। (ইনজেকশন ঠিক করে নেয়) এখন আর কোনো ভয় নেই মা। দেখবেন ভাইটি আমার এখনই খলখল করে হেসে উঠবে।

আব্বা। বাঁচবে, না? কোনো ভয় নেই, না? খোদা, অপরিসীম তোমার করণা, তুমি এ শুনাহ্গারের ডাক শুনেছ! অবুবা শিশুর ওপর কি আর তুমি ইনসাফ না করে পার? তোমার শোকর গুজারি করি!

লোকটা। আমায় একটু হাত ধোয়ার সাবান-জল দিতে হবে।

আব্বা। এস, আমার সঙ্গে এস। এই দিকে বাথরুমে চল।

(আব্বা ও লোকটার প্রস্তান। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় দ্রুত করাঘাত ও ফরিদের চিকার : জুলেখা, জুলেখা!)

জুলেখা। আসছি ভাইয়া।

ফরিদ। (নেপথ্যে), শিগ্গির, দরজা খোল শিগ্গির।

জুলেখা। আমা, ভাইয়া যদি-

আমা। কোনো ভয় নেই। তুই দরজা খুলে দে।

(জুলেখা বেরিয়ে যায় ও একটু পরেই উন্নেজিত ফরিদকে নিয়ে প্রবেশ করে)

ফরিদ। আমা, আব্বাজান কোথায় গেলেন?

আমা। গোসলখানায়। কেন, কী হয়েছে?

ফরিদ। সে হিন্দুটাকে নাকি আমাদের বাড়ির ছাদের খুব কাছেই কোথাও একবার দেখা গিয়েছিল। সবাই সন্দেহ করছে, ও নিশ্চয়ই আমাদের বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

আমা। বলে দাও, নেই!

ফরিদ। ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। আমার হাতের ছুরি ওদের দেখিয়েছি—কসম কেটে বলেছি, আমি মোর্শেদ ভাইয়ের ছোট ভাই। তার রাঙ্গক্ষরণের জবাব দিতে আমি কসুর করব না।



- আম্মা। আমার ঘরের জিনিস লঙ্ঘণ করে বাইরের লোককে এখানে খানাতল্লাশি চালাতে আমি কখনও অনুমতি দেবো না। বলে দাও, আমরা পাহারা দিচ্ছি, এ বাড়িতে কেউ ঢেকেনি।
- ফরিদ। ওরা নিজেরা না দেখে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। অন্দরোকের কথা ওরা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। ওদের বাড়ি তল্লাশি করতে না দিলে ওরা গোলমাল বাধাবে। বিপদ ঘটবে। সব বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।
- আম্মা। বেশ। ওদের ডেকে নিয়ে এস। খুঁজে দেখে যাক কাউকে বার করতে পারে কিনা!
- ফরিদ। আপনি তাহলে একবার অন্য ঘরে-
- আম্মা। না, পর্দা করার জন্য আমি অন্য ঘরে যেতে পারব না। এখানেই থাকব। মশারিটা ফেলে দাও। আমি তেতরে থাকব। আমি ছোট খোকার কাছে থাকব।
- ফরিদ। (গোসলখানার পথে পা বাড়িয়ে) আমি তাহলে আবাকাকে ডেকে নিয়ে আসি।
- আম্মা। না, না। তুমি বাইরে যাও। একটু পরে ওদের ভেতরে নিয়ে আসবে। আমরা ততক্ষণে ঘরটা খুঁচিয়ে নিচ্ছি। যত খুশি এসে দেখে যাক, হিন্দু খুঁজে পায় কিনা। জুলেখা তোমার আবাকাকে ডেকে দেবে। তুমি বাইরে যাও। (বলতে বলতে আম্মা নিরুৎসেগ চিন্তে মশারি ফেলছেন। গোসলখানার দরজা দিয়ে, লোকটা হাত ধরে, উভেজিত ভয়ার্ত আবাজানের প্রবেশ।)
- আবাকা। আমরা সব শুনেছি। এ তুমি কী করলে? কেটে কুচি-কুচি করে ফেলবে। একে আমি এখন কোথায় লুকিয়ে রাখি! কিন্তু, কিন্তু-একে আমি রক্ষা করবই। এঁকে আমি মরতে দেবে না। একে বাঁচাব। বাঁচাব হ্যাঁ! এই ধরো আমার পিস্তল মুঠো করে ধরো। যে তোমাকে মারতে চাইবে তাকে মারবার অধিকার তোমারও আছে। না লড়ে মরবে কেন!
- আম্মা। (ভালো করে চারপাশে মশারি ঝুঁজে দেয়।) অত উভেজিত হয়ে না তুমি। আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি। (হাত দিয়ে নেড়ে টেবিল ল্যাম্পটির শেডটা ঠিক করে নেয়।) ডাঙ্গার, তুমি আমার সঙ্গে এস। এই মশারির মধ্যে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। শেড দেয়া টেবিল ল্যাম্প এই আলোর জন্য বার থেকে মশারির ভেতরে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাবে না। শরিফ খান্দানের পর্দানশীল মহিলা আমি, মশারির ভেতর থেকে একবার কথা বললেই যথেষ্ট, কেউ মশারি তুলে উঁকি দিয়ে দেখার প্রস্তাব করতে সাহস করবে না।
- লোকটা। মা!
- আম্মা। দেরি করো না। ওদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঠে এস শিগ্গারি! (প্রথমে আবাজান, পরে লোকটা, মশারির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাবে। আবাকা ও জুলেখা বাক্যহীন। ঘরে প্রবেশ করল ফরিদ। অনুসরণ করে আরও কয়েকজন লোক। ঘরে চুকেই তারা বিনা ভূমিকায় এদিক ওদিক ছাঁড়িয়ে পড়ে। এ দরজা দিয়ে যায়, ও দরজা দিয়ে আসে। হঠাতে টেলিফোন বেজে উঠে। কিন্তু সেই শব্দ এই অচ্ছত পরিস্থিতির মানুষগুলোকে যেন একটু সচকিত করে তুলছে না।)
- আম্মা। (মশারির ভেতর থেকে) তোমরা কেউ ফোনটা ধরছ না কেন? দেখ কে ডাকছে? কী বলছে?
- তোমরা ফোনটা ধর, হয়ত কেউ মোর্শেদের কোনো খবর জানাতে চাইছে।
- আবাকা। ধরছি, আমি ধরছি! হ্যালো, ইয়েস হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, আমি মোর্শেদের বাবা।
(কী যেন শুনলেন। চোখযুক্ত হঠাতে শিটিয়ে পাথরের মূর্তির মত নিখর হয়ে গেল। ফোনটা নামিয়ে রেখে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ততক্ষণে পাঢ়ার লোকেরা গৃহতল্লাশ শেষ করে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময়—)
- একজন। সব ঠিক আছে। কেউ নেই। সালাম সাহেব।

(সকালের প্রস্থান)

জুলেখা। —আবাকা! তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন? আবাকা, কিছু বল। অমন করে চেয়ে থেকো না, আমার ভয় করছে। আবাজান, ফোনে কে ডেকিছিল? কী বলল?



আবরা। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল।

ফরিদ। জুলি, আমার কাছে আয়। তব পাস নে, আবরাজানকে অমনি থাকতে দে! (আবরাজান বেরিয়ে আসেন। মশারি তুলতে থাকেন।)

ফরিদ। আম্মা! এ কে?

লোকটা। আমায় বলছ ভাই? আমি মানুষ (আমাকে) ছেট খোকার আর কোনো ভয় নেই মা। দেখুন খেলতে শুরু করেছে। খোকাকে আমি দেখছি। আপনি (আবরার দিকে ইঙ্গিত করে) ওঁকে দেখুন। (জুলেখা তখন ফরিদের বুকে মাথা রেখে ডুকরে কাঁদছে। আবরাজান তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। আবরাজানের শান্ত কালো চোখ আবরার মুখের ওপর ন্যস্ত। একটু একটু করে তা পানিতে ভরে উঠেছে। লোকটা ছেট খোকার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত রাখে। মঞ্চ আস্তে আস্তে অঙ্ককার হতে থাকে ও ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।)

(য ব নি কা)

শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|-------------|---|
| বন্দে মাতরম | — মাকে (দেশমাতাকে) বন্দনা করি। বক্ষিমচন্দ্র রচিত দেশাভ্রোধক সংগীতধরনি। |
| আল্লাহ আকবর | — আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। |
| বর্ষায়সী | — অতিশয় বৃক্ষ। পুরুষবাচকবৃপ বর্ষায়ন। |
| ইমান | — শান্তিক অর্থ বিশ্বাস। আল্লাহর একত্ব ও মহানবি ইজরাত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ- এই বিশ্বাসই মূলত একজন মুসলমানের ইমান। |
| নালায়েক | — লায়েক নয় এমন। অগ্রাণুবয়স্ক। অনুপযুক্ত। বাচ্চা। |
| দেয়াক | — অহংকার। গর্ব। |
| তকদির | — ভাগ্য। |
| রায়ট | — দাঙ্গা। মারামারি। riot |
| ঠাহর | — অনুমান। আন্দোজ। |
| বনেদি | — প্রাচীন ও সন্তান। |
| ইনসাফ | — সুবিচার। ন্যায়। ন্যায়বিচার। |
| অগ্রকৃতিত্ব | — মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। |
| গুনাহ্গার | — পাপী। |
| লঙ্ঘণ | — তছনছ। এলোমেলো। বিপর্যস্ত। |

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যসাহিত্যের পুরোধা-ব্যক্তি শহিদ মুনীর চৌধুরীর একাক্ষিকা “মানুষ” অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উজ্জ্বল শিল্পকৃপ। মানুষের মৌলিক মানবিক চেতনা দয়া-মায়া-মৰমতা-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি যে জাতি-ধর্ম-বর্ণের অনেক ওপরে স্থিত- এই মৌল সত্যটিকে নাট্যকার একটি দাঙ্গা কবলিত শহরে একটি পরিবারের চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে অভিব্যক্তি দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবলিত শহরে পরিষ্কৃতির চাপে ও প্রতিক্রিয়ায় ধর্মপ্রবণ মানুষের মনেও কীভাবে ধর্মীয় উন্নয়নতার সৃষ্টি হয় এবং সাময়িকভাবে হলেও মন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তার উদাহরণ নাটকের চরিত্র- আবরা, ফরিদ ও এলাকার লোকজন। অন্যদিকে ধর্মীয় উন্নয়নতার মধ্যেও যে কোনো কোনো মানুষের মন মানবতাবোধ ও শুভবুদ্ধি হারায় না তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নাটকে বর্ণিত আম্মা ও তরুণ ডাঙ্গারের চরিত্র। নাটকটির পাঠ শেষ হলে পাঠকের মন পূর্ণ হয় অসাম্প্রদায়িক চেতনায়। ধর্মীয় অক্ষ আত্মেশ ছাপিয়ে মানুষের মহিমাই বড় হয়ে উঠেছে একাক্ষিকাটিতে।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘আপনি অত উত্তেজিত হবেন না’ – উক্তিটি কার?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. আব্বার | খ. আম্বার |
| গ. ফরিদের | ঘ. জুলেখার |

২. ‘তোরা মরে গেছিস, তোরা চুপ করে থাক। তোরা ওর ভাই নয়, বোন নয়’ – আব্বার এই বিলাপে প্রকাশ পেয়েছে—

- i. অসাম্প্রদায়িকতা
- ii. পুত্রনেহের উন্নততা
- iii. সন্তান বাসল্য

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

জানিস নাকি ধর্ম সে যে বর্মসম সহনশীল

তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছেঁয়াছুয়ির ছোট চিল।

৩. কবিতাংশে ‘মানুষ’ একাক্ষিকার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো—

- i. অসাম্প্রদায়িকতা
- ii. ধর্মের উদারতা
- iii. উদার মানবিকতা

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উক্ত ভাবের মধ্য দিয়ে কোন শিক্ষা প্রহণ করা যায়?

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| ক. বর্ণবেষম্য না করা | খ. মনুষ্যত্বের মূল্যায়ন করা |
| গ. আর্তের সেবা করা | ঘ. অসহায়কে সাহায্য করা |

সূজনশীল প্রশ্ন

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,

কাঞ্জারি! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পথ।

‘হিন্দু না ওরা মুসলিম?’ ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

কাঞ্জারি! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

ক. ‘মানুষ’ একাক্ষিকায় কার কোনো ভয় নেই?

খ. আব্বার “চোখ মুখ হঠাৎ শিটিয়ে পাথরের মূর্তির মতো নিখর হয়ে গেল” – কেন?

গ. কবিতাংশের শেষ দুই চরণে ‘মানুষ’ একাক্ষিকার যে ভাবের বিহিপ্রকাশ ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত চেতনাই গড়তে পারে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুখী-সমৃদ্ধ পৃথিবী’ – উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।



মৌসুম শামসুন্দীন আবুল কালাম

লেখক-পরিচিতি

বাংলা কথাসাহিত্যে শামসুন্দীন আবুল কালাম একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর জন্ম ১৯২৫ সালে বরিশাল জেলার নগদিছি থানার কামদেবপুর থামে। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল কালাম শামসুন্দীন। প্রথমে এই নামেই তিনি লিখতেন। কিন্তু এই নামে বাংলা সাহিত্যে আরও একজন খ্যাতিমান লেখক থাকায় তিনি পরবর্তীকালে নিজের লেখক-নাম পরিবর্তন করেন। তিনি বরিশাল ও কলকাতায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। পঞ্জাশের দশকে তিনি ঢাকায় সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। পঞ্জাশের দশকের শেষে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট ডিপ্রি লাভ করেন এবং সেখানে স্নায়ীভাবে বসবাস করেন।

বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবনপ্রবাহকে শামসুন্দীন আবুল কালাম তাঁর সাহিত্যে প্রাপ্তক্ষেত্রে পরিবেশন করেছেন। থামীগ মানুষের ভাষাভঙ্গি, মনোভঙ্গি ও রুচিকে তিনি যথাযথভাবে সাহিত্যরূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। একটি জনপদ, তার জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও জীবনদর্শনের সারসত্ত্বকে তিনি রূপায়ণ করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ছিল তাঁর প্রশংসন সহানুভূতি। তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমকালীন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট চিহ্নিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে: ‘শাহেরবানু’, ‘পথ জানা নেই’, ‘অনেক দিনের আশা’, ‘দুই হৃদয়ের তীর’ প্রভৃতি। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস হলো: ‘কাশবনের কল্যা’, ‘কাঞ্চমালা’, ‘সমুদ্বাসর’, ‘কাঞ্চলভাম’ ইত্যাদি। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৪৭ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি ইতালির রোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

একটানা খরোদ্রে ক্ষেত-মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। চৈত্রমাস শেষ হয়ে গেল, তবু একফোটা জল নেই। এখনো দক্ষিণ হাওয়া কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে মৃদু মর্মর তুলে বিরাবিরিয়ে বয়, উদ্বাম হয়ে মৌসুমি সংবাদ আনে না। সময় সময় এমনও হয় যে নারকেল গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। পত্রবরা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এত তৈরি রৌদ্রে পুড়ে পুড়ে হঠাতে বুঝি তা শুকনো ডালে আগুন ধরে যাবে।

প্রকৃতির এই বৃক্ষতা নবাগত দ্বারিকানাথ দল চৌধুরীর মেয়ে অনসূয়ার শহরে প্রাণ উদাসীন করে তোলে; সে প্রেরণা পায় বটে রবি ঠাকুরের গান গাইবার, কিন্তু চাষিদের মুখ ক্রমান্বয়ে আমসি হয়ে আসে। তাদের ঘরে ঘরে মনে মনে নামে দুর্ভাবনার অঙ্ককার।

শুরু হয় জলের জন্যে কত রকম কান্নাকাটি। ধূমধাম করে এই সেদিন নীলপুঁজো করেছে, এবার মানে পিরের দরগায় সিন্নি, জনে জনে মানত করে, বাঢ়ি বাঢ়ি কীর্তন দেয়, এমনকি মৌলভি ডেকে দল বেঁধে শুকনো ক্ষেতে নেমে মিলাদও পড়ে। কিন্তু কোথায় দেয়ার শুরুর ডাক!

দেখে দেখে অনসূয়ার তো আর হাসি থামে না। ওমনি করে বুঝি জল নামাবে। তাহলে আর মেঘমাল্লার রাগ তৈরি হয়েছিল কেন?

মা একরকম গায়েরি মেয়ে, শহুরে বনতে পারেননি, তাছাড়া ঠাকুর-দেবতা নিয়ে হাসা-হাসি তাঁর ভালো লাগে না, তাড়া দিয়ে বলে শোঁলে : ওই-ই ওদের মেঘমাল্লার তা বেশ তো যা না, তুই-ই যেয়ে নামা না জল।

অনসূয়া ঠোঁট শুলটাতো : আমার বয়ে গেছে। জল নামলেই তো কাদা। হোক গরম, তবু এই-ই বেশ আছি বাবা।

সত্যি বেশ আছে, অসুবিধা তো নেই-ই, ফুর্তিরও কমতি নেই অনসূয়ার। পাঁচ বছর বয়সে প্রাম ছাড়ার পর এই আঠারো বছরে প্রামে এসেছে সে। দিগন্ত বিস্তারিত খটখটে খোলা মাঠ।

সকালে বিকেলে ভাই বোনসহ মাঠে-ঘাটে নেমে ছুটোছুটি করে লুকোচুরি খেলে সে যেন এক নতুন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠতে লাগল।



କିନ୍ତୁ ଗୌଯେର ହାଉୟା ବଡ଼ ଅସ୍ଥି ବୋଧ କରେ । ବୁଡ୍ଢୋରା ଆମଳ ନା ଦେଇବାର ଭାନ କରେ, ଯି ବଉ ମାତାରିରା ଗାଲେ ହାତ ଲାଗିଯେ ଅବାକ ହୁଯେ ଥାକେ, ଆର ଜୋଯାନଦେର କେବଳ ଚୋଖ ଟାଟାଯ । ଓରା ଯଥନ ହାଲକା ଖୁଶିତେ ମାଠେ ମାଠେ ଛୁଟୋଛୁଟି କରେ ହେସେ ହେସେ ଲୁଟୋପୁଟି ଥାଏ, ଓଦେର ଚିଞ୍ଚାଙ୍ଗିଟ ମନେ ତଥନ କେମନ ଦୀର୍ଘାର ଜ୍ବାଲା ଲାଗେ । ମନେ ବଲେ : ସବୁର, ନାୟକ ନା ଦେଇବାଇ! ଦେଖିବୋ ତଥନ ଏତୋ ଫୁର୍ତ୍ତ କୋଥାଯ ଥାକେ!

ବୁଡ୍ଢୋ ସଖାନାଥ ଏକଦିନ ଓଦେର ପାଶ କାଟିଯେ ଯେତେ ଯେତେ ଶୋମେ, ଦନ୍ତ ଚୌଧୁରୀର ମେଯେ ବଲଛେ : ଆହା ଆରା କିଛୁକାଳ ଯଦି ଏମନି ଥାକେ! ଜାମାଇ ବାବୁ ଆର ଦିଦି ଏଲେ ଆରା ମଜା କରେ ବେଡ଼ାନୋ ଯାବେ ।

କଥାଟା ଶୁଣେ ସଖାନାଥେର କେମନ ଥାରାପ ଲାଗେ । ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ବଲା ତାର ସ୍ଵଭାବ, ତାଇ ହଠାତ୍ ଘୁରେ ଦାଁଡିଯେ ବଲେ : ଛିଃ ଛିଃ କବ କୀ ସର୍ବନାଶ୍ୟ କତା!

ଦନ୍ତ ଚୌଧୁରୀର ମେଯେ କ୍ର୍ର କୋଚକାଯ । ମୁଖ ଲାଲ ହୁଯେ ଓଠେ ।

ଏବାର ସଖାନାଥ ଏକଟୁ ହାସେ । ଦୁପା ଏଗିଯେ ଏସେ ଆବାର ବଲେ : ଛିଃ ନା, ଅମନ କତା କହିତେ ନାହିଁ । ଥରା ଥାକଲେ ତୋମାଗୋ ଭାଲୋ ବହି କି! କିନ୍ତୁ ମୋଗୋ ଯେ ସର୍ବନାଶ । ଜଳ ନା ଅଇଲେ ଭାଦ୍ରରଇୟା ଫୁସଳ ଯେ ପାମୁ ନା ।

ଅନସୂଯା ବାଦେ ଅନ୍ୟ ସବାଇ ତାର କଥା ଶୁଣେ ହେସେ ଓଠେ । ଅନସୂଯା ନିଚୁ ଘରେ ଭୃତ୍ୟକେ ଶୁଧାଯ, କେ ରେ ଲୋକଟା! ଭାରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରା । ଗାୟେ ପଡ଼େ କଥା ବଲତେ ଆସେ ।

: ସଖାନାଥ, ଗୌଯେର ଚାରିଦେର ମାତବର ।

: ମାତବର କୀ?

: ମାନେ ମୋଡ଼ଲ ।

: ଅ ତାଇ ଯେଖାନେ ସେଖାନେ-

: କଥାଗୁଲି ସବାଇ ସଖାନାଥେର କାନେ ଯାଏ ।

ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବହିକି-ତାର ଓଇ ବଜୁବୋର ଆଡ଼ାଲେ ଯେ କାନ୍ଦା ତା ଓଦେର କାନେ ପୌଛାଯାନି । ଓରା ଜୟଦାର, ଓଦେର ସୁଖ-ଦୁଃଖ ହାସି-କାନ୍ଦାର ସଙ୍ଗେ ତାଦେର ଆସମାନ-ଜମିନ ଫାରାକ । ଓରା ଏକ ଜୀବ ତାରା ଅନ୍ୟ । ତାଦେର ସର୍ବନାଶେଇ ତୋ ଓଦେର ପୌଷ୍ମାସ । ଏହି ତୋ ରୀତି ।

କିନ୍ତୁ ସଖାନାଥେର ଛେଳେ ରମାନାଥ ବାପେର ମୁଖେ ଘଟନାଟା ଶୁଣେ ଚଟେ ଉଠିଲୋ । ଇଚ୍ଛେ ହଲୋ, ତଥୁଣି ଛୁଟେ ଗିଯେ ଦୁଟୋ କଥା ଶୁଣିଯେ ଦିଯେ ଆସେ ।

କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର କରଲ ସଖାନାଥ : ରାଗେର କିଛୁ ନାହିଁ ରେ, ଅମନ ଓରା ବଲେଇ ।

ଅନସୂଯା ବାଢ଼ି ଫିରେ ବାପକେ ସ୍ଟଟନାଟା ଜାନାଯ : ଦେଖୋ ତୋ କୀ ଆମ୍ପର୍ଦ୍ଧା ।

ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ବଲଲେନ : ଛ ।

ତିନି ଆରା ଅନେକ ଶୁଣେହେନ ସଖାନାଥେର କଥା । ଏଥନ ନାକି ସଖାନାଥେରଇ ମାତବରି : ଓରଇ ନେତ୍ରରେ ସକଳେରଇ ବଡ଼ ବାଡ଼ ବେଡ଼େହେ । ପାଇକ-ପେଯାଦା ଥାଜନା ଚାଇତେ ଗେଲେ ଉଲଟେ ଧମକଦିଯେ ହାତିଯାଇ ଦେଇ; ପାଇ ନା ଥେତେ, ଥାଜନା ଦେବୋ କୋଥେକେ? ଜୟଦାରକେ ନାକି ଓରା ଥାହେର ମଧ୍ୟେଇ ନେଇ ନା ଆଜନାଳ । ଗେଲ ମାଘେ କମ୍ବୁନିସ୍ଟରା ନା କାରା ଯେନ ଏସେଛିଲ, ତାରା ସଖାନାଥେର କାନେ ଯେ ମଞ୍ଜନା ଢେଲେ ଗେଛେ, ଏସବ ତାରଇ ଫଳ । ଏହି ତୋ ପ୍ରାୟ ସଞ୍ଚାହିଥାନେକ ହଲୋ ଦେଶେ ଏସେହେନ ତିନି, ଅର୍ଥଚ ଏକଟା ପ୍ରଜାକେଓ କାଚାରିତେ ଚୌକାଠ ମାଡ଼ାତେ ଦେଖା ଯାଚେ ନା ।

ଦିନକାଳ ଥାରାପ, ତାଇ ସ୍ଟାଟାତେ ସାହସ କରେନ ନା ଦ୍ୱାରିକାନାଥ । ନଇଲେ-

କିନ୍ତୁ ଶେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକେ ରାଗତେଇ ହଲୋ ।

ଏତଦିନ ପ୍ରାମେ ଏସେହେନ ଅର୍ଥଚ ଏକଟା ପ୍ରଜାଓ ସେଲାମ ଠୁକତେ ଏଲୋ ନା, ବ୍ୟାପାରଖାନା କୀ? ଖବର ଦିଲେଓ ଯେ କେଉ ଆସେ ନା । ଯେଯେର ବିଯେ ଠିକ କରେହେ ଏହି ଜୈଯେଷ୍ଟ, ଏଥନ କତ ଲୋକଜଳ ଜୋଗାଡ଼ ଦରକାର-



তাই সখানাথকে খবর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার ছেলে নাকি ঘারযুধে হয়ে পাইককে হাঁকিয়ে দিয়েছে, বলেছে : আকালের দিনে আমরা না খেয়ে মরেছি, আর তোমার কর্তৃমশাই তখন এখানের চাল শহরে নিয়ে ব্যবসা করেছেন। আমাদের অবস্থাটা একবার চক্ষেও দেখতে আসেননি। যে জমিদার প্রজাপালক হতে পারে, তেমন তোমাদের মনিব নয়। আজ দায় পড়েছে তাই ডাকতে এসেছ, কিন্তু তাঁকে বলোগে বাপু, জমিদার যখন আমাদের জানেনি, আমরাও তাঁকে চিনি না।

শুনে আগুন হয়ে উঠলেন দ্বারিকানাথ। যে করে হোক ওদের শায়েত্বা করবার একটা দুর্দম ইচ্ছা হয়েছিল। ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অধুবা বাকি খাজনার দায়ে নিলাম করে তাড়িয়ে দিলে কে কী করতে পারবে তাঁর! কিন্তু নিষেধ করল নায়েব : না কর্তা, মামলা টামলা বা মারামারি করে সুবিধে হবে না। পেছনে স্বদেশিওয়ালারা রয়েছে, দেখছেন না কেমন সুন্দর দল পাকিয়েছে। এক্ষেত্রে চূপ করে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকাই ভালো, নইলে ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে।

সারা বাংলাদেশে প্রজাক্ষেপানো কাঞ্চকারখানাগুলি স্মরণ করে দ্বারিকানাথ শেষ পর্যন্ত অগমানটা হজম করেই নিলেন। মানুষ তো নয়, আদিম বর্বর ওরা, একবার ক্ষেপিয়ে দিলে কে বলতে পারে কী করে বসে। তবে জন্ম সখানাথদের করা চাই-ই। তবে একটু সবুর, মেয়ের বিয়েটা তো ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক।

স্বদেশিওয়ালারা কথা শুনে রোমাসের গঞ্জ পায় বাংলা ফিল্ম দেখা অনসূয়া। জনান্তিকে নায়েবকে শুধায়—স্বদেশিওয়ালাদের কথা যেন কী বলছিলেন কাকাবাবু, এখানেও আছে।

: আছে বই কী!

: লিডার কে তাদের?

: আর লিডারের কথা জিগ্যেস করছো, সে কোনো ভদ্রলোক নয়, এ সখানাথ আর তার ছেলে ব্রহ্মানাথই ওদের লিডার।

: ও! হতাশ হয়ে পড়ে অনসূয়া।

এদিকে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহটাও অনাবৃষ্টিতে কেটে যায়। সর্বত্র খা খা করে শুক্তায়।

অবশ্যে একদিন বিকেলে জোর হাওয়া দিল হঠাত। কয়েকটা দিন অসহ্য শুমোট ছিল। গাছের পাতাটি পর্যন্ত ছিল। আকাশেও ছিল না তীব্র রৌদ্র ঢাকা এক ফোটা মেঘ।

দারুণ শ্রীম্পে যখন চারিদিক অঙ্গুলি, সেই সময় হঠাত একদিন হাওয়া এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ থেকে দেখতে দেখতে পুঁজ পুঁজ মেঘ এলো তার ধূসর পাল উঠিয়ে।

চায়দের বুক আশায় কেঁপে ওঠে। আকাশের দিকে চেয়ে ‘আল্লা’ ‘আল্লা’ করে। স্বগান বুঝি শুনেছেন কাল্লা। ক্রমাগত দুদিন ধরে সেই হাওয়া তীব্রবেগে বইতে থাকে। নতুন আমের মুকুল উড়ে গেল দিক হতে দিগন্তেরে। আর সেই হাওয়ার সাথে পাল্লা দিল মেঘ। শুরু শুরু করে তাদের সে কী ডাকাডাকি আর মাঝে মাঝে বিজলি জ্বেলে ফরকানি!

শেষে নামল জল। ঘরবার করে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। জল উঠল ক্ষেতে মাঠে। মেঘের ডাকে খালবিল ছেড়ে ওঠে, এলো হরেক রকম মাছ। রোজ রাত্রিবেলা ক্ষেতে ক্ষেতে মশাল জ্বেলে মাছ ধরার ধূম পড়ে গেল। গভীর রাত্রে অঞ্চলকার মাঠে মশাল জ্বেলে সেই সমস্ত ছায়ামূর্তিকে যখন জানলা খুলে দেখত অনসূয়া, দ্বারিকানাথ ধরকে উঠতেন : জানলা বঙ্গ করে দাও অনু, ঠাণ্ডা লাগবে। এতো একেবারে সাগরের মোনা হাওয়া, লাগলেই সর্দিতে পড়বে।

অনসূয়া অগত্যা শুয়ে গান ধরত কিংবা খুলে পড়ত উপন্যাস।



যাই বলে থাকুক, দ্বারিকানাথ ভেবেছিলেন সখানাথ শেষ পর্যন্ত আসবেই; কিন্তু তেমন কোনো লক্ষণ না দেখে শেষে নিজেই একদিন বেরোলেন।

অবিশ্যি এছাড়া বেরোবার অন্য এক কারণ ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর তাঁকে এক ব্যক্তিগত চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন: শুনতে পেলাম তোমাদের এলাকায় অন্নভাব শুরু হয়েছে, সত্যি কি না জানাও তো।

এর উভয় ঘরে বসে লিখে দিলেই চলত। কিন্তু তবু গ্রামটা একটু ঘুরে দেখবার ইচ্ছে হলো দ্বারিকানাথের।

অনসূয়া সঙ্গী হলো।

কিন্তু কই? ক্ষেতে ক্ষেতে চাষিরা যে গান গেয়ে হাল চষছে। সকলেরই মুখ হাসিখুশি। যেন নতুন করে জীবন পেয়েছে সব। সব দুষ্টিতা উড়ে গেছে। ব্যাপার কী, চালের দর তো সত্যি সত্যি ত্রিশ টাকায় পৌছেছে, এ অবস্থায় এমন তো হবার কথা নয়।

খোঝ নিলেন, ঘরে খোরাকি রেখেছে কি না। কিন্তু তাও তো নয়।

ঘুরে ঘুরে শেষে এলেন সখানাথের বাড়ি। সখানাথ কোথায় বসাবে, কী করে সমাদর করবে ভেবে আকুল। অনসূয়া গেলো, অন্দরে।

দ্বারিকানাথ জিগ্যেস করলেন: কী খবর সখানাথ, তোমার যে দেখা পাওয়াই ভার!

: আইজ্জা মরিচক্ষেত লইয়া বড় ব্যন্ত ছিলাম, তাছাড়া মাথায় মৌসুমের দুষ্টিতা, ভাবলাম যাই ধীরে সুস্থে-

: হ। তা কেমন কাটাই আজকাল?

: আইজ্জা, আপনার আশীর্বাদে ভালোই!

কথাটা হাত কচলে বললে বটে সখানাথ, কিন্তু দ্বারিকানাথ যেন কেমন ব্যক্তের গন্ধ পান। একে গত খন্দ ভালো হয়নি, তার ওপর এবারে চালের দর ত্রিশ টাকা, সখানাথের তো তেমন অবস্থা নয় যে এ অবস্থাতেই ভালো থাকবে।

তবু না দয়ে আবার শুধান : শুনেছিলাম, সকলেরই নাকি খুব অভাব যাচ্ছে, কিন্তু কই, ফুর্তিতেই তো আছ সবাই। সেবার আকালটা হঠাতে এলো কি না, তাই সামলাতে সত্যি বেগ পেয়েছে, এবার আর তেমন অবস্থা হবে না, কী বল?

পানদানে করে পান নিয়ে এলো, সখানাথ তাই বাড়িয়ে দিয়ে বলে : ক্যামনে কই, মাথার উপরে আপনারা। তেমন অবস্থা না হওয়া, বাঁচা-মরার সবি তো আপনাগো হাতেই নির্ভর।

দ্বারিকানাথ একটা পান তুলে মুখে দিতে দিতে কথাটা উড়িয়ে দিতে চান : আমাদের হাতে আর কী ক্ষমতা! আজকাল জমিদারির কী অবস্থা তো জান না।

সখানাথের ছেলে হঠাতে হেসে বললেন : অনেক ক্ষয়মতা কর্তা। বাঁচাইতে না পারলেও মারতে তো পারেন।

দ্বারিকানাথের হাত থেকে চুনের বেঁটা খসে পড়ে।

অনসূয়াও এই সময় অন্দর থেকে চোখ-মুখ লাল করে ফিরে আসছিল, কথাটা শুনে সেও ক্ষ কোঁচকাল।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দ্বারিকানাথ, তারপর হাসার চেষ্টা করে বললেন : হে, হে, তা বেশ বলেছ। এই বুবি তোমার ছেলে সখানাথ।

: আইজ্জা হ, ওরে বেটা পে়লাম কর।

সখানাথ তাড়া দিলেও রমানাথের দিক থেকে তার কোনো উৎসাহ দেখা যায় না।

শেষ পর্যন্ত দ্বারিকানাথই বলে শুঠেন : থাক থাক, আর পে়লাম করতে হবে না। বেশ ছেলে।

অনসূয়া ডাকল : বাবা!



হঁা, এই উঠছি। তোমার ছেলেকে কাল একবার পাঠিয়ে দিও সখানাথ।

সখানাথ হাত কচলে বললে : সে আপনেই কইয়া যান। আমার কথা আবার শোনে কি না।

কথাটা খেয়াল করে কান লাল হয়ে ওঠে দ্বারিকানাথের। তবু ফিরে দাঁড়িয়ে সখানাথের ছেলের উদ্দেশে মিষ্টি করে হাসার চেষ্টা করেন : বাপের কথা শোন না বুঝি? ছিঃ বাবা, উদ্দত হতে নেই!

চুপ করে নতমুখ হয়ে রইল, তবে তার চেপে মুখে যে ভাব ফুটে উঠল, তাকে বিরক্তি প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। কিন্তু দ্বারিকানাথ তা খেয়াল না করার ভাব করে তাড়াতাড়ি পা বাঢ়ালেন। আচ্ছা, আমি চলি, তুমি কাল এসো একবার। তোমার মতো জোয়ান ছেলেই আমার দরকার—

: আমি যাইতে পারয় না।

কথার মাঝাখানেই রমানাথের জবাবটা যেন শপাং করে দ্বারিকানাথের গায়ে এসে পড়ল। চোখ ঝল্লে উঠল, কিন্তু পর মুহূর্তেই সামলে নিলেন। তবু হাসির চেষ্টা করে মোলায়েম স্বরে শুধালেন : কেন?

: বাড়িতে কাজ আছে।

আবার সেই চাবুকের মতো জবাব। যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি দৃঢ়। পৌঁয়ারের মতো মাটির দিকে ভাকিয়ে আছে।

: আঃ হারামজাদা, আদব করে বল! সখানাথ তাড়া দিয়ে ওঠে। অনসূয়ার চোখ তখন আঙুল, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে হাত ধরে বাঁকুনি দিল দ্বারিকানাথের : বাবা! বলছে কাজ আছে, তবু ওর মতো লোককে তোমার কী এমন দরকার পড়ল?

এইবার রমানাথ বাঁকা চোখে একটু চাইলে তার দিকে। অনসূয়া দেখলে তার মুখ যেমন ভৃষ্টিতে কঠিন তেমনি ব্যঙ্গ তরা।

হাত ধরে এবার যেন সে টেনে নিয়ে যেতে চাইল দ্বারিকানাথকে।

কিন্তু আশ্চর্য দ্বারিকানাথের সামলে নেবার শক্তি। প্রচণ্ড প্রতাপ পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যবহু রক্ত গরম হয়ে উঠলেও —ও, তাহলে থাক, তাহলে থাক—বলতে বলতে আবার তিনি বললেন : তাহলে তুমই যেয়ো সখানাথ।

: যাবো। একটু নরম সুরে সম্মতি করুল করে পিছু পিছু যেতে লাগল সখানাথ। মুখে ছিল অজস্র পঁয়াচাল।

অনসূয়া বা দ্বারিকানাথ কেউ সেদিকে কান দিল না। অথচ এবার খাঁটি কথাই বলছিল সখানাথ। চারদিকের অবস্থা সত্যিই খারাপ। ঘরে কেউই ধান চাল রাখেনি, কেমন করে বুঝবে যে এবারও এমনি বাজার ঢ়াবে। এখন কী করে যে দুমুঠো জুটবে সে-ভাবনায় সবাই অস্থির। বাইরে এ আনন্দ তো নতুন মৌসুম পাওয়ার। আচ্ছা সেবার শুলাম বর্মা শক্রদের হাতে যাওয়ায় চালের দাম বেড়েছিল, কিন্তু এবার—

হঠাতে দ্বারিকানাথকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে কথা থেমে গেল সখানাথের।

আচ্ছা সখানাথ, এত ঔদ্ধৃত্য তোমরা কোথায় পেলে বলো তো? ভাবছ বুঝি আমি এর প্রতিকার জানিনে?

: সে কী কতা কর্তা, ঔদ্ধৃত্য কই! ও, ছেলেটার কতা কইতে আছেন বুঝি? তা ওটা বরাবরই একটু এইরকম। তা ওর কতা ধইরেন না আপনি কর্তা, ওর হইয়া আমি মাপ চাই।

আবার কথা কাটাকাটির উপক্রম দেখে অনসূয়া ডাকে : বাবা! এই অজ্ঞগুলোর সঙ্গে তবু তুমি কথা না বলে পারবে না?

সখানাথ হঠাতে কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

দ্বারিকানাথ একটু নরম হয়ে বলেন : না, না, তোমার মাপ চাইবার কিছু নেই, সখানাথ। মাপ আমি করবই, যদি ও কাল আমার ওখানে আসে। তা তোমার ও ছেলেকে একটু বলে দিও সখানাথ, সে তো জানোই, কথা না মানার দরমন ওর ঠাকুরদাকে কাঁধের চাদর দিয়ে এক মাস আমার বাসায় জুতো মুছে দিতে হয়েছিল। হয়ত ও তা জানে না!



ବାକ୍ତା ବିନ୍ଦୁପେ ସଖାନାଥେର ଚୋଥ ବୁଝି-ବା ଯୁହୁର୍ତ୍ତେର ଜନ୍ୟେ ଜ୍ଞାଲେ ଉଠିଲା : ଖୁବ ଜାନେ କର୍ତ୍ତା । ସେଇ ଅପମାନ ଭୁଲାତେ ନା ପାଇରାଇ ତୋ ଆପନାଗୋ ଉପର ଓର ଅତ ଧେନ୍ନା ।

ଏବାର ଆର ଆତ୍ମସଂବରଣ କରତେ ନା ପେରେ ହଠାତ୍ ହନହନ କରେ ଏଗିଯେ ଗେଲେନ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ।

ସଖାନାଥ ଚୋଥ ତୁଳେ ତାକାଳ ଆକାଶେର ଦିକେ । ଯେଷେ ଯେଷେ ହେଯେ ଗେଛେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ । ବେଗବନ୍ତ ହାଓଯାଯ ଦୂର-ସମୁଦ୍ରଗାନ । ଅନ୍ତିବରଣ କୃଷ୍ଣଚଢ଼ା ଧୂର ଆକାଶର ଗାୟେ ଯେନ ଆରଓ ରଙ୍ଗଲାଲ । ସଖାନାଥ ତୃଷ୍ଣ ହେଁ ଚୋଥ ବୁଜିଲା : ଆ, ଆରଓ ତୀର୍ବ ମୌସୁମ ଏମେ ଦାଓ ଭଗବାନ ଶୋଷଣଶକ୍ତ ପୃଥିବୀତେ, ଆମାଦେର ତୈରି କ୍ଷେତ୍ରେ ଆରଓ ଜାଗ୍ରକ ନବଜୀବନତେଜା ଅନ୍ତର ।

ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ହନ ହନ କରେ ହାଁଟଛିଲେ ।

ପେଛନେ ଅନ୍ସୂରା । ନାକେ ତାର ଫୋସାନି : କେଳ ଅପମାନିତ ହତେ ଗେଲେ ବାବା?

: ତୋକେଓ ବଲେହେ ନାକି କିଛୁ?

: ବଲେନି! କମ୍ବୁନିସ୍ଟଦେର ଶେଖାନୋ କଥା । ବଲେ କିନା, ତୁମି ଚୋରା କାରବାରି । ପଞ୍ଚାଶ ସନେ ମାନୁଷେର ଜାନ ନିଯେ ଛିନିମିନି ଖେଳେଛ?—

: ହଁ! ଆଜିହା ଦାଁଡ଼ା ମଜା ଦେଖାଇଛି!

ଦେହରେ ଯେବେ ଉତ୍ତର ଯେନ ଟଙ୍ଗବଗ କରେ ଫୁଟତେ ଥାକେ । ଏଇ ହାମେର ଦଶମୁଣ୍ଡ-ବିଧାତାଦେଇ ବଂଶଧର ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦର୍ଶ ଚୌଥୁରୀ ଯା ହୃକୁମ ଦିଯେଛେ, ବିନା ବାକ୍ୟରେ ସବ ପ୍ରଜା ତାଇ ପାଲନ କରେ ଧନ୍ୟ ହେଁଛେ, ଏଇ-ଏଇ ଦେଖେ ଏମେହେ ଏତଦିନ । ତାର ସାମନେ ଦାଁଡ଼ିରେ କଥା ଦୂରେର କଥା, ତାକାତେଓ ଭୟ ପେତ । ହଠାତ୍ ସେଇ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗାର ସାହସ କାରା ଜ୍ଞାଗିଯେଛେ ତା ବୁଝାତେ କଟ୍ଟ ହୟ ନା । ତାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥେର ମନେର କ୍ଷେତ୍ରଟା ବେଶିର ଭାଗ ତାଦେଇ ଉ ଓପର ଗିଯେ ବର୍ତ୍ତା ।

: ଦାଁଡ଼ା ଖୁଁଜେ ବାର କରି ପିଛନେ କାରା ଆଛେ । ତାରପର—

: ସଖାନାଥ ବଲାଲେ କୀ ଶୁନଲେ ବାବା? ମୌସୁମ ପେଯେଇ ନା କି ଏତ ଫୁର୍ତ୍ତି, ଆର ତାରି ଜନ୍ୟେ ଓରା ନାକି ସବାଇ ଏକଟୁ ବେସାମାଳ ।

: ମୌସୁମ! ମନେ ମନେ କ୍ରୂର ହେସେ ଓଠେନ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ । ମୌସୁମଇ ବଟେ ।

କିନ୍ତୁ ଜାଦୁ, ଯାରା ତୋମାଦେର ନାଚିଯେ ଦିଯେଛେ, ତାରା ଆବାର ଫାଟକେ ପଚତେ ଗେଲ ବଲେ! (ସେଟୁକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଓ କରତେ ନା ପାରଲେ ଏତକାଳ ଜଜ, ମ୍ୟାଜିସ୍ଟ୍ରେଟ, ଏସପିର ସଙ୍ଗେ ଖାନାପିନା ଆର ଖାତିର କରାର ମୂଲ୍ୟ କୀ!) ତାରପର ଦାଁଡ଼ାଓ ନା, ମୌସୁମ ନା ହୟ ପେଯେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାମାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ଆସବେ ଯେ ତାକାଳ କୋନ ପୁଣି ଦିଯେ ତାକେ ଠେକାବେ! ଆମାର ସ୍ଟକ-କରା ଚାଲେର ଦାମ ତଥନ ଚଢ଼ିଚଢ଼ କରେ ଆରଓ ବେଡ଼େ ଯାବେ । ତଥନ କାର ଦୁଇରେ ମାଥା କୋଟେ ଦେଖବ ନା! ଆମି ମ୍ୟାଜିସ୍ଟ୍ରେଟକେ ଆଜିଇ ଲିଖେ ଦେବ : କୋନୋ ଅଭାବ ନେଇ, କିଛୁ କରତେ ହବେ ନା ତୋମାର ।

ସବୁର! ଏ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆର କଦିନେର, ଆମାରଓ ମୌସୁମ ସମାଗତ ।

ଯେତେ ଯେତେ ଆବାର ଜୀବନେର ଓପର ଦୋର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରତାପେର ସେଇ ଆଗାମୀ ଦିନ କଞ୍ଚିନା କରେ ଖୁଶି ହେଁ ଓଠେନ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ । ତାରପର ଯେନ ଅନେକ ଗଲାର କେମନ ଏକଟା ଆୟାଜ ଶୁନେ ଏକବାର ପିଛନ ଦିକେ ତାକାନ । ହାଓଯାଯ [ସଂକ୍ଷେପିତ]

ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ ଟିକା

ମୌସୁମ ସଂବାଦ

- ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଥେକେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳୀଯ ବାଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଯା ବର୍ଷା ଖତୁର ସୂଚନା ଘଟାଯି ସେଟୋଇ ମୌସୁମି ବାୟୁ ନାମେ ପରିଚିତ । ଏଥାନେ ମୌସୁମ ସଂବାଦ ବଲାତେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ସଂବାଦେର କଥା ବଲା ହେଁଛେ ।

ଦେଇବ

- ମେଘ ।

ମେଘମଳ୍ଲାର ରାଗ

- ସଂଗୀତର ଏକପ୍ରକାର ରାଗ, ଯା ବର୍ଷା ଖତୁର ସଙ୍ଗେ ସଂହିତ ।

ମାତାରି

- ଏକଟି ଆର୍ଥଲିକ ଶବ୍ଦ ଯା ଦିଯେ ନାରୀକେ ବୋବାନୋ ହୟ ।



- ভাদ্ররইয়া ফসল** – ভদ্র মাসে পাকে এমন ফসল বা ধান।
- তাদের সর্বনাশেই তো**
- ওদের পৌষমাস** – একটি প্রবাদ আছে : কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। অর্থাৎ একটি ঘটনা যখন কারো জন্য আনন্দ নিয়ে আসে অথচ অন্যদের তা নিরানন্দের কারণ হয়। এখানে অন্বেষ্টি যখন জমিদার-কন্যার সুখের কারণ তখন তা কৃষকদের জন্য সর্বনাশস্বরূপ।
- আল্পর্ধা**
- স্বদেশিওয়ালা** – দর্প | দুঃসাহস।
- ফরকানি** – ব্রিটিশ শাসনামলে স্বদেশের অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিষ্পোর্ধ্বভাবে জীবনপণ লড়াইয়ে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।
- নোনা হাওয়া** – ঠিকরে বার হওয়া। মেঘের মধ্য থেকে বিদ্যুতের বের হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।
- খন্দ** – লবণাক্ত বায়ু। সমুদ্র থেকে বয়ে আসা বাতাস।
- কম্যুনিস্ট** – ফসল, খস্য। ফসলের মৌসুম।
- কমিউনিজম তথা সাম্যবাদ বা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যারা সংগ্রামশীল।

পাঠ-পরিচিতি

“মৌসুম” গল্পটি লেখকের ‘অনেক দিনের আশা’ (১৯৫২) নামক গল্পগ্রন্থে সংকলিত। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ পরবর্তীকালের কাহিনি নিয়ে এ গল্প রচিত হয়েছে। তখন দেশে জমিদারি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। জমিদারের শোষণের বিরক্তে কৃষকদের মধ্যে যে নতুন চেতনা সৃষ্টি হয়েছে সেটাই গল্পের মূল বিষয়। আর কৃষকদের মধ্যে এই নতুন উপলক্ষ জাগিয়ে তোলার মূলে সক্রিয় ছিল সমাজস্রূপান্তরকামী কমিউনিস্ট ও স্বাধীনতাকামী স্বদেশিওয়ালারা। অন্বেষ্টি শেষে বৃষ্টির আগমনে কৃষকরা, আর্থিক দুর্দশা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ ফসলের কথা ভেবে আনন্দে মাতোয়ারা হয়। ঘরে খাদ্য না খাকলেও নতুন ফসলের স্বপ্নে তারা বিভোর। এই আনন্দ জমিদার সহ্য করতে পারে না। অন্যদিকে শোষক জমিদারের কৃষকবিরোধী কর্মকাণ্ডে তরুণ কৃষকদের মধ্যে যে প্রতিবাদী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তা দমনে নতুন পরিকল্পনা আঁটে জমিদার। চাল মজুদ করে দাম বাড়িয়ে সংকট সৃষ্টি করে জমিদার কৃষকদের ওপর প্রতিশেধ নিতে চায়। শোষক জমিদারের প্রজাবিরোধী স্বার্থপরায়ণতার বিপরীতে কৃষককুলের জাগরণের ইঙ্গিতেই গল্পটি তাৎপর্যবহু। নতুন কালের বাস্তবতা ও ব্যঙ্গনা নিয়ে গল্পটি বিশেষভূমতিতে।

বঙ্গনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘স্বদেশিওয়ালাদের কথা যেন কী বলছিলেন কাকাবাবু?’— উক্তিটি কার?

ক. অনসুয়ার

খ. নায়েবের

গ. দ্বারিকানাথের

ঘ. সখানাথের

২. ‘মাথায় মৌসুমের চিঞ্চা’ বলতে বোঝানো হয়েছে—

i. চামিদের নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনা

খ. i ও iii

ii. অভাবের তাড়নায় বিষণ্ণ বিলাপ

ঘ. i, ii ও iii

iii. বর্ষায় নতুন ফসল বোনার বাসনা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

গ. ii ও iii



কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উভয় দাও।

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।

৩. কবিতাংশের ‘সচেতনতার ধান’ কথাটি “মৌসুম” গল্পের সাথে যেসব দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো-

- i. অধিকার আদায়ে সোচার
- ii. প্রাকৃতিক বৈরিতায় কৃষকের বিপর্যয়
- iii. শোষকের বিরুদ্ধে সোচার

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি বিনির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল নিচের কোনটি?

- | | |
|--|------------------------------------|
| ক. সমাজ পরিবর্তনকারী মানুষের প্রচেষ্টা | খ. গ্রীষ্ম প্রকৃতির প্রচণ্ড দাবদাহ |
| গ. জমিদারের নির্মম শোষণ-বধনা | ঘ. কৃষক শ্রেণির ঐক্য |

সূজনশীল প্রশ্ন

তুরাগ গ্রাম অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক আকবর সাহেবে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী যেমন— ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, ছোলা, চিনি, খেজুর এসব দ্রুত মজুদ করেন। কারণ রমজান মাস আসল্ল। আর রমজানে এসব জিনিসের চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তাই অধিক মুনাফার এখনই সময়। ফলে রমজান আসতে না আসতেই কৃত্রিম সংকটের কারণে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্রিমূল্য দেখা দেয়। দিশেছারা হয়ে পড়েন সোবহান মিয়ার মতো সাধারণ মানুষেরা। আধপেটা খেয়ে কোনোভাবে এরা রমজানে রোজা রাখেন, আর সুনিন আসার জন্য ফরিয়াদ করেন প্রস্তাব কাছে।

- ক. গাঁয়ের চাষিদের মাতবর কে?
- খ. “অনসূয়ার চোখে তখন আশুন”— কেন?
- গ. আকবর সাহেবের সাথে “মৌসুম” গল্পের দ্বারিকানাথের চারিত্রিক সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সখানাথদের জীবনে “মৌসুম” আসে কিন্তু সোবহানদের জীবনে সুনিন আসে না কেন? কারণ বিশ্লেষণ কর।

গহন কোন বনের ধারে দিজেন শর্মা

লেখক পরিচিতি

দিজেন শর্মা ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রকান্ত শর্মা এবং মাতার নাম ময়ময়ী দেবী। তিনি করিমগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা থেকে উচ্চমাধ্যমিক, সিটি কলেজ, কলকাতা থেকে স্নাতক এবং ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোন্ত্র ডিপ্লি লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে থায় ১৬ বছর একাধিক কলেজে অধ্যাপনা শেষে ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সেভিয়েত ইউনিয়নের প্রকাশনা সংস্থা প্রগতি প্রকাশনে অনুবাদকের চাকরি নিয়ে মন্ত্রোচ্চতে গমন করেন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েতের পতনের পর রাশিয়ার সাথে আনুষ্ঠানিক সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দেশে ফিরে আসেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রচৰ রচনার মাধ্যমে এদেশে বিজ্ঞান চর্চায় দিজেন শর্মা নেতৃত্বান্বিত ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপর তাঁর গ্রন্থসমূহ পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্যামলী নিসর্গ, সপুষ্পক উত্তিদের শ্রেণি বিন্যাস, ফুলগুলি যেন কথা, গাছের কথা ফুলের কথা, এমি নামের দুর্গত মেয়েটি, নিসর্গনির্মাণ ও নান্দনিক ভাবনা, সমাজতন্ত্রে বসবাস, জীবনের শেষ নেই, বিজ্ঞান ও শিক্ষা: দায়বদ্ধতার নিরিখ, ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি, বিগল যাত্রার ভ্রমণ কথা, গহন কোন বনের ধারে, হিমালয়ের উত্তিদরাজ্য ডাল্টন ছফ্কার, বাংলার বৃক্ষ, সতীর্থ বলয়ে ডারউইন, মম দৃঢ়ত্বের সাধন, আমার একান্তর ও অন্যান্য ইত্যাদি। তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, ড. কুদুরত-এ খুনা স্বর্ণ পদক, প্রকৃতি সংরক্ষণ পদক, এম মুরলু কাদের শিশু-সাহিত্য পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন।

দিজেন শর্মা ২০১৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

উচু টিলার ওপর একটা চালাধর, ছনের ছাউলি, এক টিলতে বারান্দা, ঝকঝকে নিকোনো উঠোন, চারদিকে অনুচ্ছ পাঁচিল, তারপর নিবিড় বন, টিলার পর টিলা— পুবে উত্তরে দক্ষিণে সীমানাহীন, কে জানে কোথায় ঠেকেছে, হয়তো-বা হিমালয়ে। পশ্চিমটাই শুধু কিছুটা খোলা, সবুজ নদীর মতো একফালি ধানখেত এঁকেবেঁকে চলেছে ছোট ছোট টিলার ফাঁকে ফাঁকে, পাশে একটা ছড়া— কাঁকড়ের ওপর গড়িয়ে চলা কল্পোলিত স্বচ্ছ জলধারা, এমন যে পায়ের পাতাটুকুই কেবল তাতে ডোবে, কিন্তু বৃষ্টি নামলেই প্রমতা, ঘোলাজলের চল পাক খেতে খেতে পাড়-খেতে জমিন ডুবিয়ে দিয়ে গর্জে ছুটে চলে।

আমি, কপ্চে আর রোগা প্রায়ই ওই ছড়ার জল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে হাঁটাম, উজ্জিয়ে যেতাম অনেক দূর, নিরালোক গহনবনে। ছড়ার বাঁকে বাঁকে কিছুটা বেশি জল, হাঁট কিংবা কোমর অবধি, তাতে নানান কুঁচোমাছের তিড়িঁবিড়িঁ ছুটোছুটি, আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। এইসব ছোটোখাটো ডহরের আশপাশে ছড়ানো বড় বড় পাথর সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা, পাড়ে মূলি বাঁশের ঘন বন, আনাচে-কানাচে ফার্নের বোগ, অচেনা যত ঘাসপাতা। এই নিঃশব্দ আলোআঁধারির মাঝখানে ভয় ও রোমাঞ্চ মেশানো এক অঙ্গুত অনুভূতি আমাদের জোর করে আটকে রাখতো, নেশা-ধরানো এক আশৰ্য গন্ধ পেতাম, নড়তে পারতাম না; আরও দূরে, বনের গভীরে যেতে কে যেন আমাদের হাতছানি দিতো, এক সময় কিছু পড়ার কোনো শব্দে, পাখির ডানাখাপটায় আমাদের হঁশ হতো। আমরা আবার চলতাম, কখনও আরও উজানে, কখনও ভাট্টিতে ঘরের পানে।



তখন সবে পাঠশালার পাঠ শেষ হয়েছে। বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরের হাইস্কুলে যাওয়া-আসা করার মতো শক্ত হয়ে উঠি নি বলে এক বছরের ছুটি যিলেছিলো। ছুটির এই সময়টার বেশির ভাগই কাটে পাহাড়ের ওই টিলাবাড়িতে। মাঝেমধ্যে মা আসতেন, নইলে একমাত্র অভিভাবক শোভা বুড়ো— বাগানের পাহাড়াদার। ছফ্ট লম্বা, দশাসই চেহারা, কচকুচে কালো গায়ের রঙ, মাথায় মন্ত টাক, কানছুঁয়ে ঘাড়ের দিকে চুলের একটা হালকা ঘের, দাঢ়িগোঁফ নেই, পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে ফতুয়া— এই আমাদের শোভা বুড়ো। জাতটাতের দিক থেকে কোল-ভিল-সাঁওতাল—এই রকম কিছু একটা হবে হয়তো, বাগানের দলছুট কুলি। রোগা আর কপ্চে, গরু চরাতো, ফাইফরমাশ খাটতো।

শোভা বুড়োর অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে মন কাঢ়তো এমন কিছু কিছু জিনিসের কোনোটাই সে আমাদের ছুঁতে দিতো না: তার কাঁধসমান উচু একটা ধনুক, একগাদা তীর, উচ্চট আকারের ধপধপে শাদা ধারালো তিনটা দা, ছুলোর ওপর দেয়ালে শুঁজে রাখা নানা রঙের পাখির পালক। অবসর সময় সে মাছ ধরার চাঁই, পাখির ফাঁদ বানাতো। তীরের জন্য বাঁশের কঢ়ি, ফাঁদের সুতোর জন্য উদাল গাছের ছাল শুকাতে দিতো উঠেনের কোণে। তার সব কিছুই ছিলো ছিমছাম, আমরা হাত লাগালে বুড়ো ভারি বিরক্ত হতো। অবশ্য মনমেজাজ ভালো থাকলে সে আমাদের ফাঁদ তৈরি শেখাতো, তীর-ধনুক ধরতে আর লক্ষ্যভেদের তালিম দিতো।

অচিরেই আমরা শিকারী হয়ে উঠলাম। তির, ধনুক আর একগাদা ফাঁদ নিয়ে বনে বনে ঘুরতাম। অন্ত আমাদের দৃঃসাহস দিয়েছিলো। আছাদের সঙ্গে থাকতে ভয় ছিলো না। শিকারে তেমন কিছুই জুটতো না, সারা বছরে গোটা দুয়েক কাঠবেড়ালী, তিন-চারটা পুচকে পাখি, সবই শোভা বুড়োর ভোজে লেগেছিলো। যা ছিলো একান্ত কাঞ্চিত তাই অলভ্য থেকে গিয়েছিলো: বনমোরগ, তিতির আর হরিয়াল। একটা গাছে ফল পাকলে বাঁক বাঁক হরিয়াল ছটাপুটি থেত। এক অদৃশ্য নেশা আমাদের বাঁশবনের গভীরে, নলখাগড়ার বোপ, লতাপাতা-জড়ানো খানাখন্দ টানতো, আটকে রাখতো, কিছুতেই বাড়ি ফিরতে দিতো না।

শোভা বুড়ো ব্যাপারটা লক্ষ্য করে থাকবে। একদিন আমাদের সঙ্গে নিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে ওদিকে পা বাড়াতে নিষেধ করালো। আমরা অবাক। বারবার জিগ্যেস করেও হেতুটি জানা গেলোনা। শোভা বুড়ো কপালে জোড়হাত তুলে। কেবলই বলে, ‘ওখানে দেওতার বাস, নাম নিতে মানা।’ আকারে-ইঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত বোঝালো তার অর্থ— ওখানে একজোড়া সাপ থাকে, ভয়কর, ওরা লেজ দিয়ে ঘৌঁটিয়ে ঘৌঁটিয়ে শুকনো পাতা, ডালপালা আর মাটির চেলা দিয়ে বাসা বানায়, তাতে ডিম পাড়ে। ডিম ছেঁড়ে দূরে যায় না, আর তখন কাছেপিঠে কেউ গেলে নির্ধার মরণ। এমনকি হাতির মতন জানোয়ারেরও রেহাই নেই।

শরতের দুপুর। ঘোমলে দিন। বোগঝাড় উচ্চিত পাতায় নিবিড়। দেখলাম, পিচাশ ঝাড়ের ওপর শরীর এলিয়ে তিনি রোদ পোহাচেন কিংবা কোনো শিকারের দিকে নজর রাখছেন। হাত দশেক লম্বা, ডলু বাঁশের মতো মোটা, ধূসর-কালো রঙ, সারা গায়ে অনেকগুলো শঙ্খথল বেড়। আমাদের উপগ্রহিতি তার বিরক্তি ঘটিয়ে থাকবে। তাই প্রথমে ফস্ক করে মাথাটা তুললেন, পরমহৃতে শরীরের অর্ধেকটাই খাড়া করলেন, ফণাটি মেললেন যেনো ছোটোখাটো একটা কুলো এবং এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন আমাদের ভস্ম করে ফেলবেন। জ্বলজ্বলে হিস্তি ওই চোখ দুটো এখনো মনে পড়লে শরীরে কাঁপুনি ধরে। তিনি মহানাগ শঙ্খচূড়।

শোভা বুড়ো মাঝে মাঝে কোথায় যেন উধাও হতো। শুরুতে কিছুই বলতো না, তবে আমরা প্রস্তুতি টের পেতাম। সে তার ধনুকে তেল ঘষতো, তিরগুলো তুলে রাখতো, সারাদিন বসে দা ধারাতো। সকালে উঠে দেখতাম সে নেই। বদলি হয়ে এসেছে তার বন্ধু বুধু, মাঝবয়সী, বাগানের দলছুট কুলি, একটু বোকা ধরনের। আমাদের দারণ ফুর্তি। বুড়োর বকাবকার ঝাঁকি নেই। যথেচ্ছারের অবাধ সুযোগ। বুধু নির্বিধায় আমাদের সবগুলো আবদার মেটাতো, ভালো ভালো খাবার রাঁধতো, রাতে শুয়ে শুয়ে যতো রাজ্যের পাহাড়ি গঞ্জ ফর্মা-২২, সাহিত্যপাঠ একাদশ, দাদশ ও আলিম শ্রেণি



শোনাতো। শোভা বুড়ো এবার তার অজ্ঞাতবাস থেকে এলো। মাথা মুড়িয়ে বললো; মন্ত্রলিয়েছি রে শুরুর কাছে, মাছ মাংস মানা, শিকার তি মানা। সত্যি সত্যি বুড়ো সাধু বনে গেলো। কয়েকটা চিয়াড়ি রেখে বাকি তির, সবগুলো ফাঁদ সে আমাদের বিলিয়ে দিলো। সকাল-সন্ধ্যা অনেকক্ষণ বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করলো।

বনে বনে ‘অকারণ পুলকে’ আমরা ঘুরে বেড়াতাম। সবকিছুই ভালো লাগতো—বড় বড় গাছ, বাঁশবাড়, অজন্তু জাতের লতা, পাখর, পাথরের গায়ে রেশমি সবুজ শ্যামলার আঙ্গর, ঢাউস পাতার বুনো রামকলার ঝোপ, হলুদ হয়ে ওঠা ঘাস। আমাদের পাহাড়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুলগাছ দেখেছি : অশোক, দেবকাঞ্চন, কনকচাঁপা, পারম্পর, জংলী জঁই, নাগবংলী, লুটকি, নীললতা, ল্যাডিস আশ্বেলা। নাম না-জানা ফুলও কিছু কম ছিলো না। একটা বাহারি লতা, আঁকশি দিয়ে বেয়ে উঠতো ঝোপের ওপর, লম্বাটে পাতা, গাঢ় খয়েরি, অস্তুত সুন্দর, যেনো বনদেৰীর কর্তৃত। ছিলো কয়েক জাতের অর্কিডও— তাদের বেগুনি, শাদা, কমলা রঙের লম্বা লম্বা মঞ্জরি দোলাতো আশ্রয়দাতা উঁচু গাছের কাণ্ড কিংবা ডাল থেকে।

কিন্তু ফুল নয় পাখির জগৎই তখন আমাকে পাগল করে ভুলেছিলো। ফুল ও পাখির উদয় পৃথিবীতে বলা চলে এক সঙ্গে, প্রায় ১০-১২ কোটি বছর আগে। সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যে উভয়ই সমতুল— তবু পাখি ছোটদের এতেটা মন ভোলায় কেন? পাঠশালায় পড়ার সময় স্কুলের দেয়ালে টানানো ময়নার একটা ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়তাম, কখনও মনে হতো পাখিটা বেঁচে উঠছে নড়ছে, এখনি ঘর জুড়ে উড়ে বেড়াবে, আমার চোখের সামনে ঘর ভরা ছাত্রের দল কোথায় মিলিয়ে যেতো, শুনতে পেতাম এক আশ্র্য সুরেলা কাকলি ভেসে আসছে কোন গভীর গহন থেকে। পাহাড়ে এসেও এই তদ্গত ভাবটা কাটে নি, বরং বেড়েই গিয়েছিলো।

বনের যে মোহন মায়া আমাকে কাছে টানতো, সেটা পাখি ছাড়া আর কিছু নয়। ডালে ডালে লাফাচ্ছে ময়নার বাঁক, কালো শরীর, সোনালি কান ও ঠোঁট, কিম্বরকষ্ট। নিমুম দুপুরে হঠাতে উলুর আওয়াজে ওপরে তাকিয়ে দেখি গাছের আড়ালে একটা বসন্তবৌরি, ঘনসবুজ পিঠি, মাথায় লাল টুকটুকে টোপর। আর বেনেবৌ, আমাদের হলদে পাখি, সে তো রূপকথার হীরামন। ছেলেবেলায় শোনা ‘কাঁঠালগাছে দেখছি দুটি হলদে পাখির ছান’— সে তো আজও উন্মান করে, চোখ বুজলেই দেখি উড়ছে। উঁচু উঁচু গাছের পাতার গহনে আমার শিশুহৃদয় নিংড়ে, জানি কখনই ছুঁতে পারবো না বাস্তবে, ধরা দেবে শুধু স্বপ্নে। বাগানের টিলায় ছিলো বুনো জামের গাছ, তাতে ফুল ফুটলে বাঁক বাঁক পাখি পড়তো, গাছটাকে দেখাতো রথের মেলায় হকারের হাতে সোলার লাঠিতে গাঁথা রঙচঙ্গে কাঁগজে পাখির ঝলমলে ঝাড়ের মতোন। সে যে কতো রঙের— হলুদ, নীল, খয়েরি, কালো, সবুজ, লাল-রামধনুর কোনোটাই বাদ পড়তো না। টুকটুকে সিঁদুরে লাল আলতাপরী একবারই দেখেছিলাম পাহাড়ে, তারপর কতোদিন তাকে খুঁজেছি, বলতে পারি সেই ঘোর আজও কাটে নি, পেলে দু’চোখ ভরে দেখি।

পাহাড়ে আমাদের খেত-জমির কিনারে একটা প্রকাণ মরা গাছ ছিলো। ডালপালা খসে গেছে অনেকদিন, ছালবাকলও, বাকি শুধু ধড়, সেও অনেক উঁচু লোকেদের নাগালের বাইরে। তারই এক খোঁড়লে বাসা বাঁধতো ময়না। ময়নার ছা পেড়ে দেওয়ার জন্য শোভা বুড়োর কাছে বায়না ধরতাম। বুড়ো মানুষ, অতোটা উঁচুতে ওঠার মই বানানো তার সাধ্য ছিলো না। তবু আশ্বাস দিতো। কিন্তু ফি বছরই কারা আগেভাগে বাচ্চাগুলো পেড়ে নিতো। একবার বড়দা গাছটা কেটে ফেলতে চাইলে শোভা বুড়ো অমত জানায়। গাছটায় নানা জাতের পাখপাখালির ঘরসংসার, তারা ফসলের পোকামাকড়, ইঁদুর, এমন কি সাপও খায়— তাতে মানুষের উপকার হয়। বুড়োর এই যুক্তি তিনি অঘাত্য করেন নি।

পৌষের এক সকালে শোভা বুড়ো বললো : ‘বাঘ ধরা পড়েছে। চ’ এক নজর দেখে আসি। আমরা তো অবাক,



জ্যান্ত বাঘ দেখা। চললাম তার সঙ্গে। অনেকটা দূর। যতো এগোই, ততোই লোক বাড়ে, শেষে জনস্মোত এসে মিললো এক মেলায়। হাজার হাজার মানুষ। এগিয়ে গিয়ে দেখি বেশ বড় একটা জায়গা মাথাসমান শক্ত দড়ির জাল দিয়ে ষেরা। গায়ে গা লাগিয়ে শিকারীরা দাঁড়িয়ে, হাতের বর্ণ জালের ফাঁকে মাটিতে গাঁথা। মাঠের মাঝখানে একটা ছোট ঘর, ঘাটা তোলা। ওই ফাঁদে ছাগল বেঁধে রেখে বাঘবাবাজীকে লোভ দেখিয়ে ধরা হয়েছে। এখন তিনি মাঠে একটা ঝোপের আড়ালে বসে আছেন। বিরক্ত ত্রুদ মুখ। তেমন বিশাল কিছু নয়। গরু মোষ মেরে কেলে— বিশ্বাস হয় না। হঠাত সে শয়ঙ্কের এক ডাক ছেড়ে গা ফুলিয়ে জালের ওপর লাফিয়ে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বর্ণীর ধারালো ফলা তার পিঠে বিধলো। কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর বাঘ পিছু হটে ঝোপের আড়ালে পালালো। বড় ঝুঁত, মুখ দিয়ে ফেনা ব্যরছে। দৃশ্যটা আমার ভালো লাগলো না। বাঘের জন্য মায়া হলো। শোভা বুড়োর শার্ট টেনে ধরে বাঢ়ি ফেরার বাহানা ধরলাম। রোগা আর কপ্চে নড়তে চায় না। শেষে বুড়ো তাদের শাসিয়ে পথে নামালো।

অনেক দূর আসার পর জিগ্যেস করলাম, ‘ওরা বাঘটাকে যেরে ফেলবে?’ বুড়ো একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলো, ‘না, মারবে না, দিন কয়েক খেলিয়ে ছেড়ে দেবে, ব্যাটা আর কুনোদিন ওদিক আসবে না।’ পরে জেনেছি, সে সত্য কথা বলে নি। স্কুলে পড়ার সময় বাঘ শিকার দেখার জন্য আমরা ফি বছর ছুটি পেতাম। শিক্ষকসহ ছাত্ররা সবাই সেখানে যেতো। দিন কয়েক পর বাঘটাকে শুলি করে মেরে মাচায় তুলে গা-গঙ্গ ঘুরিয়ে যারা দেখে নি তাদের দেখিয়ে শেষে ছাল ছাড়ানো হতো। ছালের স্তুতি নিয়ে অনেক সময় স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামাও বাধতো।

‘বাঘ পোষ মানে?’ বুড়োকে জিগ্যেস করি। কপ্চে আগু বেড়ে জবাব দেয়, ‘না, বহুৎ হারামি। মালিককেও খপ করে শিলে কেলে।’

চৈত্রের এক বিকেলে আমি আর শোভা বুড়ো উঠোনে বসে গল্প করছিলাম। কপ্চে আর রোগা নেই, গেছে চা-বাগানে বেড়াতে। চারদিক শুকনো ঠন্ঠনে। টিলার ঘাস মরে খড় হয়ে আছে। বহু গাছ পাতা ঝরিয়ে শরীর হালকা করেছে। বন ফাঁকা ফাঁকা। আকাশ মেঘহীন, তামাটে। উঠোনে শুকনো পাতা জমছে। মাঝে মাঝে উড়ে আসছে তুলো কিংবা আঁশের ঝুটি-বাঁধা নানা বীজ, প্যারাসুটের মতো শুঠে নামে, কখনও গায়ে এসে পড়ে। বুড়ো চিনতে পারে কোন্টা শিমুলের, আকন্দের, ছাতিমের কিংবা কোন্টা পারুলের।

একটা দমকা হাওয়ায় গোটা বন যেনো হঠাত তালি বাজিয়ে নেচে উঠলো, একটা। শন্শন আওয়াজ চেউয়ের মতো ছাড়িয়ে পড়লো পাহাড়ের কল্পের কল্পে। আমরা চুপ করে শুনি। কিছুতেই এই বনমর্মর থামে না, নানা লয়ে নানা তালে নতুন নতুন বোল তোলে। কখনো মিহি, কখনো উদাত, এক আকর্ষ ঐকতান সঙ্গীত। বুড়ো বলে, ‘বন ভগবানের কাছে ভিখ মাংছে, বারিশ চাইছে।’ ততোক্ষণে উঠোন ঝরাপাতায় ভরে গেছে। বুড়ো উঠে ঝাঁট দেয়, এক কোণে পাতার পাহাড় জমে।

শোভা বুড়ো বনের ভেতর আমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখাতো। তার সঙ্গে তখন চলতে হতো খালি পায়ে, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, নিঃশব্দে। কোনো বড় গাছ দেখলে সে দাঁড়াতো, তারপর আমাদের সেগুলো জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে থাকতে বলতো, কোনো পোকা হাত বা গাল বেয়ে উঠলে সেটা তাড়াতে দিতো না, তার কথামতো আমরা নিজেদের গাছের অংশ ভাবতে ধাকতাম, বাকলে গাল ঘষতাম, অঙ্গুত একটা গুঁক মগজে চুকে আমাদের আবিষ্ট করতো, গাছের দোলন টের পেতাম, এমনকি ওর শরীরের ভেতরের শৌঁ-শৌঁ আওয়াজও।

বনে কোথায় ঝরাপাতার স্তুপ দেখলে বুড়ো আমাদের মাটিতে শুইয়ে পাতা দিয়ে গা ঢেকে দিতো। আমরা ওপরের দিকে চেয়ে ধাকতাম, গাছের মাথার ফাঁকে ফাঁকে আকাশের নীল, ভাস্তু শাদা মেঘ উকি দিতো। উঁচুতে, অনেক উঁচুতে উড়স্ত চিল বা শকুন দেখলে আমাদের পাথি হওয়ার সাধ হতো— অনেক উঁচুতে গাছের



ডালে ডালে পাতার সবুজে সবুজে উড়ে বেড়ানো, তারপর এক সময় বনের বাঁধন ছেড়ে বিস্তীর্ণ মীলাকাশে অবাধ বিচরণ। কিছুক্ষণ পর বুড়ো আমাদের মুখটাও পাতা দিয়ে ঢেকে দিতো। আমরা চোখ বৃজতাম। সে আমাদের মাটিতে মিশে যেতে বলতো। আমরা তাই ভাবতাম এবং কোনো কোনো দিন ঘুমিয়েও পড়তাম।

একদিন আমি, কপ্চে ও রোগা বনে ঘুরতে বেরিয়েছি, হঠাতে কানে এলো অপূর্ব সুরেলা কাকলি, কোনো নিঃসঙ্গ পাখি আপন মনে উজাড় করে চলেছে কষ্টলহয়ী। রোগা বলে, ‘শ্যামা’ কপ্চে আপত্তি জানায়, ভিমরাজ। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এগিয়ে পাখিটি দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু যা-দেখি, সেটা কল্পনাতীত। পাখি নয়, আমাদের শোভা বুড়ো, দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতো একঠায় নিখর, মাথায় শুকনো ডালপালা, শিস দিচ্ছে অবিরাম। ঈশ্বর জানে কেন। আমরা যে তাকে দেখছি, তাতে বুড়ো সম্পূর্ণ বেখেয়াল। হয়তো হঁশই নেই।

এভাবে কিছুক্ষণ কাটে। তারপর দেখি একটা খয়েরি-হলুদ পাখি ওর আশপাশে উড়ছে। বুড়ো আরও জোরে শিস দিতে থাকে। শেষে পাখিটা প্রথমে ওর মাথায়, শেষে হাতে বসে। আমরা তো অবাক! শোভা বুড়ো কি শেষে সাধুসন্ত বনে গেলো। বুড়ো শিস দেওয়া থামায়। পাখিটা অবাক হয়ে তাকে দেখে, তারপর উড়ে গিয়ে একটু দূরে বসে, ইতিউতি তাকায়। বুড়ো আবার শিস দেয়, পাখিটা আবার তার মাথায় বসে। এই খেলা চলে অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত বুড়ো থামে। পাখিটাও উড়ে যায়। সে উঠে পড়ে। আমাদের দেখে অবাক হয় এবং হাসে। তোমরা ভি পারবে, বুড়ো আমাদের আশ্বস্ত করে। লেকিন বহুৎ মেহনত আর মহবত লাগে। আমরা একসঙ্গে ঘরে ফিরি।

একবার আমাদের একটা দুধেল গাই বনে চরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেলে বড়দা রেগে শঙ্খচূড়ের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেন। শোভা বুড়োকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিলেন, যান নি। কাজটা তার অপছন্দ। তখন চৈত্র মাস, ঠাঠা শুকনো বন, তাতে অচেল বরাপাতা আর ঘাস। মুহূর্তে দাউদাউ আগুন ঝঁজলে ওঠে। ঠাস ঠাস শব্দে বাঁশ ফাটে। দুতিন ষষ্ঠির মধ্যেই গোটা এলাকাটা সাফ। খাড়া কিছু বড় বড় গাছ আর ছাইভন্দ্য ছাড়া ওখানে কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। তয়ঙ্কর সাপের আস্তানা পুড়ে যাওয়ায় প্রথমে আমরা খুশি। ওতে কোনো দোষ দেখি নি। কিন্তু শোভা বুড়োর দৃঢ়ী ভাব দেখে দমে যাই। তবে কি কাজটা ভালো হয় নি? হতে পারে সাপেরা ডিম পেড়েছিলো, কিংবা কচি কচি বাচ্চা আগলাচ্ছিলো। ওখানে পাখির বাসা, অন্য জীবজন্মের ছানাপানো ধাকার কথা। সবাই তবে পুড়ে মরেছে? আমাদেরও তখন মন খারাপ।

শোভা বুড়ো হঙ্গাখানেক কোনো কথা বলে নি। শেষে যা বলেছিলো তখন ততোটা না বুঝলেও এখন বুঝি। তার কথা: বনজঙ্গল জন্মজানায়ারের রাজ্য। ওতে মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই, এখানে জঙ্গলের নিয়ম মেনে চলাই উচিত। সাপ তো ঘরে এসে গরুটাকে কামড়ায় নি, জঙ্গলে কেটেছে। ওটা তার দখলি এলাকা। দোষ আমাদের, সাপের নয়। মানুষ জঙ্গলের দেবতোক মান্য করে না, তার রাজ্য তারা দখল করে নিচ্ছে। ফল ভালো হবে না।

বছর শেষ হয়ে এলো। পাহাড় ছেড়ে বাড়ি এলাম, তারপর নিত্যদিন স্কুল। কপ্চে ও রোগা চলে গেলো চা-বাগানে নতুন চাকরিতে শোভা বুড়ো রইলো বাগানে। আজো মনে পড়ে সেইদিনের কথা। স্কুল বন্ধ কিংবা স্কুলে যাই নি। শোভা বুড়ো এসে বসলো বারান্দায়। বাহানা ধরলো সে দেশে যাবে। দেশে, কোথায় দেশ? সবাইতো অবাক। কী একটা নাম বলে, কেউ কোনোদিন শোনে নি। মা তাকে বোঝান, বড়দা বোঝান। সে শোনে না, শুনতে চায় না। দেশে এতেদিনে কেউ বেঁচে নেই, আজীয় কেউ থাকলেও তারা তাকে চিনবে না—এসব কোনো যুক্তি তার কানে যায় না। একটাই কথা— টিকিট কিমে দাও। বড়দা গেলেন স্টেশনে। স্টেশনমাস্টার বন্ধুলোক। ঢাউস এক পৃথি খুঁজে বের করলেন ওই নামের এক রেলস্টেশন-মধ্যপ্রদেশের কোনো প্রত্যন্ত এলাকায়। শুনে বুড়ো দারুণ খুশি। দিন কয়েক পর এক বিকেলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে



সে ট্রেনে চাপলো। মা চোখ মুছলেন। কিন্তু শোভা বুড়োর মুখে উজ্জ্বল আনন্দ। সে জানলা গলিয়ে মাথা বাড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমরাও দাঁড়িয়ে। ট্রেন বাঁক ঘোরার আগে শোভা বুড়ো পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে নাড়তে লাগলো।

বড়দা আমাদের নাম-ঠিকানা লেখা কার্ডটা তাকে দিয়েছেন, যাতে পৌছনোর সংবাদ পাঠায়। ট্রেন চলে গেলেও আমরা অনেকক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলাম, কারও মুখে কথা নেই। কোথা থেকে সে এসেছিলো, আমরা কেউ জানি না। কোথায় সে চলেছে, তাও কোনোদিন জানা যাবে না। মানুষের জীবন, তার ভাগ্য-চির রহস্যদেরা, দুর্জ্জেয়। আশায় আশায় বলদিন কাটলো। না, শোভা বুড়োর পৌছনোর সংবাদ এলো না। তারপর প্রায় বছর পঞ্চাশ কেটে গেছে। পাহাড়ের ওই এলাকাটা এখন আবাদ। চারদিকে লোকবসতি। সাগরখোপ, জলজানোয়ার, পাখপাখালি সবই লাপাস্তা। আমি গ্রামের স্কুল ছেড়ে শহরে পড়তে গেছি, তারপর চাকরি নিয়ে রাজধানী, সেখান থেকে আজ বিশ বছর বিদেশে। বয়স হয়েছে। তবু চরম মনখারাপের মুহূর্তে হঠাত দমকা হাওয়ায় শুকনো একটা পাতা ঘরে এসে পড়লে কিংবা কর্মসূল থেকে ক্লান্ত পা টেনে টেনে বাড়ি ফেরার পথে কোনো কুকুরছানা ছুটে এসে লাফিয়ে কোলে উঠতে চাইলে অল্পক্ষণের জন্য হলেও খুশির জোয়ারে ভেসে যাই। তখনই ছেলেবেলায় গহন বনের ধারে টিলাবাড়িতে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সামনে এসে দাঁড়ায় প্রকৃতির সন্তান শোভা বুড়ো, মাথায় মস্ত টাক, গায়ে ফতুয়া, পরনে হাফপ্যান্ট, যার কাছ থেকে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম, প্রকৃতিকে জানতে শিখেছিলাম, কেননা ভালো না বাসলে তো কাউকেই জানা যায় না।

শব্দার্থ ও টিকা

চালাঘর

— ছন, খড় দিয়ে ছাওয়া ঘর।

ছনের ছাউনি

— ছন ধারা আচ্ছাদিত ছাদ।

ছড়া

— ঝরনা, পাহাড়ী নদী।

ফার্ন

— লতা জাতীয় উষ্ণিদ। সাধারণত পুরনো পাথর, দেয়াল ইত্যাদির স্যাতস্যাতে জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

অঙ্গুবর সম্পত্তি

— স্থানস্থিতি করা যায় এমন সম্পত্তি।

ফাঁদ

— পশ্চ-পাথি ধরার যন্ত্রবিশেষ।

তালিম

— উপদেশ, শিক্ষা।

বনমোরগ

— গৃহপালিত নয়— বনে বিচরণ করা মোরগ।

তিতির

— এক জাতীয় পাখি।

হরিয়াল

— এক প্রকার হলুদ বা সবুজ রঙের যুগু জাতীয় পাখি।

মহানাগশজ্ঞাচূড়

— এক জাতীয় বিষধর সাপ।

তৃণ

— যাতে বান বা তীর রাখা হয়।

মন্ত্র

— কোন কাজ সফল হওয়ার জন্য পঠিত পরিত্র বাক্য।

আঁকশি

— ফল-ফুল পাড়ার জন্য এক প্রকার দণ্ড বা লাঠিবিশেষ।

বনদেবীর কষ্টহার

— বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর গলার মালা।

অর্কিড

— পরগাছ। অন্য গাছের উপর জন্মানো লতাবিশেষ।

মঞ্জরি

— মুকুল।

কিলুরকষ্ট

— সুকষ্টের অধিকারী। এখানে সুকষ্ট পাখি বুঝানো হয়েছে।

রূপকথার হীরামন

— শুকপাখি। রূপকথার হীরামন পাখি বিপদ থেকে উদ্ধারে ভূমিকা রাখে। এখানে আপনজন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উন্ননা

— ব্যাকুল।

কন্দরে কন্দরে

— গর্ত। গহ্নর।

বনমর্মর

— গুহায় গুহায়। এখানে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বুরানো হয়েছে।
— বায়ু প্রবাহের ফলে বনের মধ্যাছিত গাছ-লতা-পাতার প্রাকৃতিক শব্দতরঙ্গ।

ভিখ

— ভিঙ্গা। দান।

বারিশ

— বৃষ্টি।

তোমরা ভি পারবে। লেকিন বহুৎ

— তোমরাও পারবে। তবে অনেক পরিষ্কার ও ভালোবাসা লাগবে।

মেহনত আর মহবত লাগে

— যা জানা যায়নি। অজানা।

দুর্জ্জেয়

— বন-জঙ্গলাদি সাফ করে চাষ বা লোকবসতির উপযুক্ত।

আবাদ

— নিখোঁজ। হারিয়ে যাওয়া।

সাপাতা

পাঠ-পরিচিতি

এই রচনাটি দিজেন শৰ্মার ‘গহন কোন বনের ধারে’ থাহু হতে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত। শৈশবে বৃহন্ত-সিলেট অঞ্চলের বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সাথে লেখকের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তারই বর্ণনা এই রচনাটি। এক বছর বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ থাকায় লেখকের বাস হয় পাহাড়ের উপরের টিলাবাঢ়িতে। সেখানে দুই সঙ্গী— কপচে আর রোগা। সারাদিন তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো। নানা জাতের ফুল-পাখি-লতা-পাতার সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে দেয় এক রহস্য-মানব শোভা বুড়ো। শোভা বুড়ো যেন প্রকৃতিরই সন্তান। গাছের সাথে, পাখির সাথে তাঁর আত্মায়তার সম্পর্ক। পাখিরা এসে নিঃসংকোচে তাঁর হাতে-মাথায় বসে। এমনকি বিষধর নাগশঙ্খচূড়ও তাঁর কাছে দেবতাবিশেষ। বনের স্বাভাবিকত্ব যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে শোভা বুড়োর তীক্ষ্ণদৃষ্টি। তাই, আগুন লাগিয়ে বনের বড় একটা অংশ পুড়িয়ে দিলে সে দুঃখ পায়। তাঁর মতে ‘বনজঙ্গল জঙ্গলজানোয়ারের রাজ্য’। জঙ্গল পুড়ে নষ্ট হলে প্রকৃতির এই সন্তানও ত্রেনে চেপে চলে যায় দীর্ঘকাল আগে ফেলে আসা পরিবারের কাছে। মানুষে মানুষে সৃষ্টি সম্পর্কই কেবল নয় বরং প্রকৃতি-জগতের সকলের সাথে পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ক নির্মাণই প্রকৃত মানবিকতা— এই অমৌর দর্শন ব্যক্ত হয়েছে উক্ত রচনায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গঙ্গে উল্লিখিত রূপকথার পাখিটির নাম কি?

ক. হীরামন

খ. বসন্তবৌরি

গ. বেলেবৌ

ঘ. ময়না

২। ‘শোভা বুড়ো কি শেষে সাধুসন্ত বনে গেলো’— একথা বলার কারণ কী?

ক. পাখির সঙ্গে মিতালী

খ. প্রকৃতিতে হারিয়ে যাওয়া

গ. লেখককে ছেড়ে যাওয়া

ঘ. সন্ধ্যাসী হয়ে যাওয়া



উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

অমিতের সাজেক দেখার শখ অনেকদিনের। তাই গত শীতে গিয়েছিলেন রাঙামাটিতে অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্র সাজেকে। স্থানটি সমতল ভূমি থেকে ১৮০০ ফিট উচ্চতায়। সেখানে যাওয়ার পথে আঁকা-বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা আর দুই ধারে ঘন বন-জঙ্গল দেখে তিনি অভিভূত। পাহাড় বেয়ে নেমে আসা পানি, কংলাক পাহাড়, হেলিপ্যাড, উপজাতিদের গ্রাম, পাহাড়ি খুপড়িতে রাত্রিযাপন, পাহাড়ি নানা খাবার তাকে ভীষণভাবে রোমাঞ্চিত করে। তোরবেলার কুয়াশা-যেরা আকাশে মেঘমালা, পাথির ডাক যেন হাত পাতলেই ধরা দেয়।

৩। ‘গহন কোন বনের ধারে’ রচনার কোন বৈশিষ্ট্যটি অমিতের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ক. সৌন্দর্যপ্রিয়তা | খ. প্রকৃতিপ্রিয়তা |
| গ. ভ্রমণ বিলাসিতা | ঘ. বিচ্ছিন্নতা |

৪। প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যটি যে বাক্যে পাওয়া যায়-

- i. বনে বনে ‘অকারণ পুলকে’ আমরা ঘুরে বেড়াতাম
- ii. বনের মোহন মাঝা আমাকে কাছে টানতো
- iii. ছেলেবেলায় গহন বনের ধারে, টিলাবাড়িতে কাটানো দিনগুলোর কথা যনে পড়ে

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

অমিত, সুমিত মা-বাবার সাথে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়ে দেখলো পৃথিবীর বৃহস্পতি এ ম্যানগ্রোভ বনে গাঢ় সবুজের সমারোহ, হরেক রকম জীবজন্ম, পাথি, আর কীট-পতঙ্গ। বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসা জলভেজা লবণ্যাক্ত বাতাস। তারা প্রাণভরে দেখলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অ্যাডভেঞ্চর, তয় ও শিহরগুলির স্থান সুন্দরবন। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। প্রকৃতির অকৃপণ হাতের সৃষ্টি। সুন্দর বনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, সাপ, বানর। অপরূপ লতাগুল্য, সুন্দরী, কেওড়া, গরান, বাইন, গেওয়া, পঙ্কের, গোলপাতা, হেতাল, কাঁকড়া ইত্যাদি। গাছের কচি ডাল ছিঁড়ে দিলে অসংখ্য হরিপের উপস্থিতি। তারা হীরণ পয়েন্ট, কটকা, করমজল ইত্যাদি দেখে মুক্ত। তারা প্রতিবছর বাবা-মাকে সুন্দরবন যাওয়ার জন্য ব্যস্ত করে তোলে।

- ক. লেখক কতো বছর বিদেশে অবস্থান করেছেন?
- খ. ‘মানুষের জীবন, তার ভাগ্য চির রহস্য যেরা, দুর্জ্জের্য’- একথা বলার কারণ কী?
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘গহন কোন বনের ধারে’ রচনার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘উদ্দীপকটি ‘গহন কোন বনের ধারে’ রচনার খণ্ডাংশ মাত্র’- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

কপিলদাস মুরুর শেষ কাজ

শওকত আলী

সেৰক-পৱিত্ৰিতা

কথাসাহিত্যিক শওকত আলী পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্ৰুয়াৰি জন্মহণ কৰেন। তাঁৰ বাবাৰ নাম খোৱশেদ আলী সুন্দৱাৰ এবং মায়েৰ নাম মোসামত সালেমা খাতুন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চলে আসেন তৎকালীন পূৰ্ব পাকিস্তানের দিনাজপুৰে। ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন। অভাৱ অনটনেৰ মধ্যেই চলিয়ে যান নিজেৰ লেখাপড়া। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে এমএ পাস কৰেন। সাংবাদিকতা, শিক্ষকতাসহ বিভিন্ন ধৰনেৰ পেশায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তৎকালীন জগতুৱাথ কলেজে দীৰ্ঘকাল শিক্ষকতাৰ পৰি সৰ্বশেষ তিনি সৱকাৰি সংগীত মহাবিদ্যালয়েৰ অধ্যক্ষ হিসেবে কৰ্মৱত ছিলেন।

জীৱনকে নিবিড়ভাৱে অবলোকন কৰা এবং বিচিৰ জীৱনপ্ৰবাহকে শিল্পাবয়ৰ প্ৰদান শওকত আলীৰ সাহিত্যভাবনাৰ মূল প্ৰবণতা। নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে তাঁৰ বিশেষ আগ্রহ রয়েছে, যাৰ প্ৰতিফলন ঘটেছে তাঁৰ চৰচাৰ। তিনি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুৱফাৰে এবং ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন। শওকত আলীৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থেৰ মধ্যে রয়েছে : ‘পিঙ্গল আকাশ’, ‘প্ৰদোষে প্ৰাকৃতজন’, ‘উত্তৰেৰ ক্ষেপ’, ‘লেশিহান সাধ’ প্ৰভৃতি। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দেৰ ২৫এ জানুয়াৰি তিনি ঢাকায় মৃত্যুবৰণ কৰেন।

বাতাস উঠলৈ এখন টাঙ্গনেৰ পানিতে কাঁপন লাগে না। পানি এখন অনেক নিচে। বালি কেটে কেটে ভাৱি ধীৱ
শ্ৰোতে এখন শীতেৰ টাঙ্গন বয়ে যায়। পানিৰ তলায় বালি চিকমিক কৰে, কোথাও কোথাও সুবুজ গুলা শ্ৰোতেৰ
ভেতৱে ভাটিৰ দিকে মাথা রেখে এপাশ ওপাশ কৰে। চৰুৱ দু-একটা মাছ তিৰ তিৰ কৰে উজানে ছুটে গেলেও
আৰাৰ ভাটিতে ফিরে আসে। কিন্তু কাঁপে না পানিৰ শ্ৰোত। এমনকি সাঁকোৱ ওপৱ দিয়ে চিনি কলেৱ ভাৱী
আখ-বওয়া ট্ৰাকগুলো যাৰাৰ সময়ও না। সাঁকোৱ থামগুলো শুম শুম শব্দ কৰে ওঠে, কিন্তু পানিৰ শ্ৰোত তেমনি
ধীৱ, তেমনি শাস্ত। আসমান, কান্দৱ আৱ দিগন্তজুড়ে যে শীতেৰ একটা শাস্ত ভাৱ থাকবাৰ কথা সেই ভাৱটা
টাঙ্গনেৰ শ্ৰোতে আজকাল সব সময় ধৰা থাকে।

আৱ ঐ শাস্ত নদীৰ ধাৱে বসে থাকবাৰ জন্মেই কিনা কে জানে কপিলদাস ভাৱি আৱামে রোদেৱ দিকে পিঠ মেলে
দিয়ে ঝিয়োতে পাৱে। তাৱ চাৱদিকে নানা শব্দ কিন্তু সে সব তাৱ কানে ঢোকে কি না বোৰা মুশকিল। ধৰো, কী
ৱৰকম গাঁ গাঁ চিৎকাৱ কৰতে কৰতে চিনি কলেৱ ট্ৰাকগুলো ছুটেছে, ফাৰ্মেৱ ভেতৱে বিনোদ মিস্তিৱ খান-দুই ট্ৰাইটৰ
ট্ৰায়ালেৱ জন্য চালু কৰে রেখেছে—তাৱ ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ শব্দ একটানা সকাল দুপুৱ রাত ধৰে ক্ৰমাগত হয়ে
চলেছে, নদীৰ ওপৱে আৰাৰ কোথায় এক রাখাল সাৱাদিন ধৰে একটা বুলো সুৱ বাঁশিতে বাজিয়ে যাচ্ছে—এ
সবই তাৱ কানে চুকবাৰ কথা। কিন্তু কপিলদাস চুপচাপ। মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে অল্প-অল্প দুলছে, আৱ সে বসে
ৱয়েছে তো বসেই ৱয়েছে।

ওদিকে ছাগল চুকে যদি সব্জি ক্ষেত তছনছ কৰে, কি বিন্দা মাখিৰ বউ সোনামুখী নগেন হোৱোৱ বোন সিলভীৰ
সঙ্গে বগড়া বাধায় কিংবা নদীৰ ওপৱে খোলা কান্দৱে খৰগোশ তাড়িয়ে নিয়ে আসে কোনো ভিন গাঁয়েৱ কুকুৱ
এবং সেজন্মে যদি এপাৱেৱ বাচ্চাৱা লে লে হই হই কৰেও ওঠে—কপিলদাস নড়বে না, হেলবে না, কান পাতবে
না—কাউকে একটা কথা জিজ্ঞেসও কৰবে না।

আসলে কপিলদাস বুড়োৱ কাছে সবই একটাৰ সঙ্গে আৱেকটা মেলানো বলে মনে হয়। মনে হয়, এৱকমই হয়ে
আসছে দুনিয়ায়। বগড়া বলো, বাঁটি বলো, জন্ম বলো, মৰণ বলো—সবই একটাৰ সঙ্গে আৱেকটা মেলানো।
কত দেখল সে জীৱনে। সব কিছুই শেষ পৰ্যন্ত একটা জায়গায় গিয়ে মিলে যায়। রাগ বল, ক্ষোভ বল, আৰাৰ



হাসিখুশি মনের ভাব বল, কিংবা সামনে প্রকাও কান্দর, কি কান্দরের উপরকার আসমান, আবার তার নিচে টাঙ্গনের স্রোত—সব কিছু, যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যা শোনা যাচ্ছে—সবই একটার সঙ্গে আরেকটা শেষ পর্যন্ত মেলানো। আসলে, তার মনে হয়, সংসারের অনেক ভেতরে শান্ত ধীর এবং নিরবচ্ছিন্ন একটা স্রোত আছে। সব কিছুর উপর দিয়ে ঐ স্রোত বয়ে যায়। সেখানে কাঁপন নেই, উজ্জেজনা নেই, চিন্কার নেই। সব কিছু সেখানে ক্রমাগত একটার সঙ্গে আরেকটা মিলে যাচ্ছে।

ঠিক এই ধরনের একটা গা-ছাড়া পরিতৃপ্তি ভাব আজকাল তাকে প্রায়ই পেয়ে বসে। আর সেজন্যেই শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ভারি আরামে সে বিমোতে পারে। বয়স বেড়ে গেলে সভবত মানুষের এরকম একটা অবস্থা এসে যায়।

তবে সব সময় ঐ ভাবটা থাকে না।

আর তখনই পুরনো ঘটনা ছবির পর ছবি সাজিয়ে নিয়ে আসে চোখের সামনে। পুশনা পরবে কি তুমুল নাচ জুড়েছে দেখো কপিলদাস। তার গলায় বাঁধা মান্দল কী রকম শূন্যে ঘূরপাক খাচ্ছে, মেয়েদের গলায় কেমন শান্তানো স্বর। কপিলদাস দেখতে দেখতে নিজের ঘোবনকালে চলে যায়। একের পর এক ঘটনা মনে পড়তে থাকে তার। আর ঐ রকমভাবে স্মৃতি তার সামনে পুরনো পসরা খুলে বসলে সে ভারি সুখে ঐসব পুরনো ঘটনার মধ্যে বিচরণ করে ফেরে।

একবার সেই যে কি হলো, মহাজনের ধান খামার বাড়ি থেকেই কিষানদের হাতে বিলিয়ে দিলি—মনে আছে সে কথা?

আর মানুয়েল পাদ্রিকে টাঙ্গনের পানিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলি? মনে নাই?

চকিতে সে দেখতে পায় বর্ষায় ভরা টাঙ্গনের পানিতে পাদ্রি তলিয়ে গেল। ঘোলাটে পানির মধ্যে কালো জুতোসুন্দ তার পা দুখানি ওপরে উৎক্ষিপ্ত হতে দেখা গেল স্পষ্ট করে। একটু পরই মানুয়েল পাদ্রি আবার ভেসে উঠেছিল। আর সে কি গাল! সাঁতরাতে সাঁতরাতে শাসাচ্ছিল, দেখিস তোর বাপকে বলব, দেখব বিচার হয় কি না।

সেই ছেলেবেলার কথা। হাপন ছিল যখন সে। তোর তির কী রকম নির্খুত নিশানায় গিয়ে বিধত, কপিলদাস মনে নাই সে কথা?

হ্যাঁ মনে আছে। কপিলদাস যাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নিজেকে শোনায়—সব মনে আছে।

কেন মনে থাকবে না। সান্তালের বাচ্চা না সে? দেখ তো খরগোশের পেছনে কে ছুটছে অমন? শুকদেবের ব্যাটা চতুর মাঝি নাকি দিবোদাসের ব্যাটা কপিলদাস? আর ঐ দেখ, কপিলদাসের শিকারি কুকুর কী রকম ছুটে যাচ্ছে তির-খাওয়া শিকারের পেছনে। কপিলদাস মনের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পায় তার কালো রঙের কুকুরটাকে—যেটা তার কিশোরকালের সঙ্গী ছিল সর্বক্ষণ। কুকুরটাকে শেষ পর্যন্ত বাঘে খেল।

কপিলদাস একেক দিন আবার নিজের কাছে গল্প কাঁদে। দূর থেকে দেখা যায় বুড়ো থেকে থেকে যাথা নাড়াচ্ছে আর বুঁকে বুঁকে দুলছে। কোন গল্পটা আরম্ভ করবে সে? বাহু গল্পের কি আর শেষ আছে—নিজেকেই শোনায় বুড়ো। ধরো, মেলার সেই ঘটনাটা—

মেলার গল্পটাই হঠাতে মাঝাথান থেকে শুরু হয়ে যায়। কেন যে বেছে বেছে মেলার গল্পটাই শুরু হয়—সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। গল্প আরম্ভ করলেই সে মেলার ঘটনায় চলে আসে।



কিংবা এই ধান কাটার ব্যাপারটাই ধরো না কেন। আধিয়ার জোতদারের মাঝখানে পড়ে গেল সাঁওতাল বন্ডিটা। শুণীনাথ ছঁহাঁ করে না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। ওদিকে কে একজন আগুনের কুঙ্গলীর শুপরে আরেক বোঝা নাড়া চাপিয়ে দিয়ে গেল। দাউ দাউ করে ঝুলে উঠল আগুন। আর এই আগুনের আলোয় শুণীনাথের কপাল চকচক করতে লাগল। কিন্তু সে শাদা চুল ভর্তি মাথাটা ঝুঁকিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে।

সাঁওতালদের তখন কি মুশকিল ভাবো দেখি। মহাজন বসত করবার জ্যাগা দেয়, আবাদের জমি দেয়, গিরন্তির কাজ দেয়—সেই মহাজনের বিপক্ষে কেমন করে যায়। মহাজন যে সব দেয়। হ্যাঁ, সব দেয়—কিন্তুক পেটের ভাতটা কি সারা বছর দেয়, আঁ? কহ মড়ল, কহ দে, দেয় পেটের ভাতটা? এই রকমের সব বাদামুবাদ। কিন্তুক যদি ভিটেয়াটি থেকে তুলে দেয় তাহলে? এই রকমের সব তর্কাতর্কি। ওদিকে শুণীনাথ কিছুই বলে না। মড়ল হলে বোধ হয় এই অবস্থায় কিছু বলা যায় না।

কিন্তুক তখন ভারি জাড় হে মড়ল। দেহ দলদল করে কাঁপছে। দূরে দূরে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল—হামরা মাহাজনের সঙ্গে নাই, আধিয়ার কিষানের সঙ্গে হামরা।

কে বলেছিল কথাটা? মনে নেই এখন। সে নিজে হতে পারে, মোহন কিন্তু হতে পারে—কিংবা চতুর মাঝি ও হতে পারে। লোকটা যে কে ঠিক মনে নেই। কিন্তু কথাটা ঠিক মনে আছে।

তারপর?

কপিলদাস আর খেই ধরতে পারে না। বিচার সভার শেষ দৃশ্যটা স্মরণে আসে না। বরং হঠাৎ ধান কাটার দৃশ্যটা মনের শেষের দেখতে পায় সে। কপিলদাস মাঠে নেমেছে, পাশের ক্ষেতে ঘোহন কিন্তুর বউ টরি-সারা কান্দরে আর একটা মানুষ দেখা যায় না। ধান গাছের নোয়ানো পাতায়, শিশের গায়ে, তখনও রাতের হিম ফেঁটায় ফেঁটায় জমে আছে। রোদের তাপ গায়ে লাগে কি লাগে না এমনি কুয়াশা।

এই রকম গল্প বলতে বলতে বেলা ফুরিয়ে যায় এক সময়। রোদের তাপ কমে আসে। ঘাপসা চোখ দুটি মেলে সে তখন আসমানের ধূসর রঙ দেখে। একবার নদীর ভাটি থেকে উঠে আসা শব্দচিলের ডাকটাও শুনতে পায়। বাতাসে তখন শীতের কামড়। তার দুহাতের আঙুল ছেঁড়া কোটের বোতাম দুটি খুঁজতে থাকে।

আর এই সময়ই তার চোখে পড়ে যায়। দেখতে কজন লোক টাঙ্গনের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে বন্ডির দিকে হাত তুলে কী যেন দেখাচ্ছে। লোকগুলোকে সে চিনতে চেষ্টা করে। ওখানে এই সময়ে কারা? অমন পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা—কে লোকটা? অনেকক্ষণ ধরে লোকটার নড়া-চড়ার ভঙ্গিটা লক্ষ করে। লক্ষ করতে করতেই মনে পড়ে—কদিন আগেও বোধহয় ওদের এইভাবেই দেখেছে সে। ঠিক এইভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্ডির দিকে হাত তুলে কী যেন বলাবলি করছিল। সে এক সময় চিনতে পারে। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা লোকটা ম্যানেজার মহাজন ছাড়া আর অন্য কেউ হতে পারে না। কিন্তু এমন সময় ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের কি কাজ? একবার মনে হয় জরিপ হচ্ছে বোধ হয়। একেক সময় এই রকম জমিজমার মাপামাপি চলে। ওরা কি জমিজমা মাপতে এসেছে? কই এ রকম কোনো খবর তো তার কানে আসেনি।

একটু পর আর দেখা যায় না কাউকে। দেখতে না পাওয়ায় কৌতুহলটাও আর থাকে না। কপিলদাস তখন গরুর পালের ঘরে ফেরা যুক্তির আওয়াজ কান পেতে শোনে। ফার্মের গরুগুলোর গলায় নতুন যুক্তি বাঁধা হয়েছে নিশ্চয়ই। আজকাল বোধহয় জয়হরির ছোট ছেলেটা ফার্মের গরু চরায়। জয়হরির কী যেন হয়েছিল? জয়হরির কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করে সে। আর ঠিক এই সময় কাছে এসে দাঁড়ায় সলিমউদ্দিন। এসেই ভাকে, বুঢ়া দাদা বাড়িত যাবো নাই?



হ্যাঁ যামু, সে জয়হরির কথা স্মরণ করতে না পেরে সলিমউদ্দিনের দিকে মনোযোগ দেয়। ছেঁড়া কোথেকে আসছে সেই কথা জিজেস করতে করতে উঠে দাঁড়ায়।

সলিমউদ্দিন তখন কুশিয়ার ক্ষেত্রে আজ কী কাণ্টা ঘটেছে সেই ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ করে এবং ঐ আরঙ্গের মুখেই সে জনিয়ে দেয়—বুঢ়া দাদা তুমার বস্তিটা আর এইটে থাকবে নাই, ইবছর এইটে ধানের আবাদ হবে। কথাটা কেন যে বলে ছেঁড়া বুড়ো ঠিক ধরতে পারে না। কিংবা এমনও হতে পারে যে তার বর্ণনাতেই বোধহয় প্রসঙ্গটা থাকে না।

কপিলদাসের হঠাতে খেয়াল হয় লোকগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। এখুনি না দেখল! মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উবে গেল অতোগুলো মানুষ।

নাকি সে দেখে নি! তার কেবলি মতিঅন্ম হতে থাকে। ইদিকে সলিমউদ্দিনের সেই খামারবাড়ির ঘটনাটার বর্ণনা তখনো ফুরোয়ানি।

আবার কথাটা নতুন করে বলতে হলো সলিমউদ্দিনকে। বলল, তুমার বস্তিটা ইবার উঠায় দিবে, এইটে ইবছর ট্রাকটর চলিবে।

কপিলদাস এবারও বুঝতে পারে না। তার নিজের হিসাব মেলে না। ট্রাকটর জমিতে চলবে, তাই চলে এসেছে এতকাল। মানুষের বসতের উপর দিয়ে ট্রাকটর চলতে যাবে কেন? ই কেমন কথা? সে অঙ্ককারেই ডাইনে বায়ে তাকায়। বলে, ঠিক শুনিছিস তুই, কহ ঠিক শুনিছিস?

সলিমউদ্দিন এবার সত্যিই বিরক্ত হয়। বলে, যোর কথা বিশ্বাস না হয় আর কাহাকে পুছে দেখ। মুই ইবার যাউ, তুই বুঢ়া মানুষ, তোর কিছু ফর্ম থাকে না।

কথাটা বলেই হঠাতে ছেঁড়া চলে গেল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপিলদাস মাথা নাড়ায়। আর নিজেকে শোনায়—না, ক্যানে পালাব। তার পা আপনা থেকে বাড়ির পথ ধরে। কোথায় পালাবে সে। এক সময় আবার হাসি পায় বুড়োর, পালাবার কথাটা এল কোথেকে? তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল—নিজেকে শুনিয়ে তখন সে বলে, তোর কিছু ফর্ম থাকে না। আর ঐ সময় ট্রাকটরের আওয়াজটা তার কানে এসে ধাক্কা মারে। কী কারণে যে হঠাতে ধকধক শব্দ করে জেগে উঠল ঘূর্মন্ত ট্রাকটরটা আল্দাজ করা মুশকিল। বিলোদ মিঞ্জি একেকদিন এই রকম হঠাতে ট্রাকটরের এঞ্জিন চালিয়ে দেয়। ট্রাকটরটা সে চোখের সামনে দেখতে পায় যেন। বিশাল বিশাল দুটো চাকা ঘূরতে ঘূরতে মাঠের বুকের ওপর দিয়ে চলেছে, পেছনের ধারালো চাকতিশুলো মাটি ফালা ফালা করে দিচ্ছে, গাঢ় বেরুচ্ছে কাটা মাটির ভেতর থেকে। ঐভাবে ট্রাকটরটা চলে আসে একেবারে দীনেশ কিঙ্কুর বাড়ির সীমানা পর্যন্ত। তারপরই বেশ দিব্যি ঘূরে যায়। বসতই হলো ট্রাকটর চলাফেরা করার শেষ সীমানা। হ্যাঁ, কলের জিনিস ঐ পর্যন্ত আসে। সংসারের সীমানা পর্যন্তই তার আসবার ক্ষমতা, তারপর আর পারে না, এতকাল অস্ত পারেনি। আর এখন সেই কলের জিনিস হড়মুড় করে চুকে পড়বে দীনেশ কিঙ্কুর উঠোনে। ঘরের দেয়ালে ভোঁতা নাক চুকিয়ে উল্টো দিকের দেয়াল ফুঁড়ে বেরুবে। দৃশ্যটাকে সে মনের ভেতর দেখতে পায়। আর তাই দেখে সে ভয়ানক অস্ত্রিতা বোধ করে। ই কী কথা আঁ? ট্রাকটর চলে আসবে সংসারের বুকের ওপর?

কপিলদাস বুড়োর এখন ঘনে পড়তে থাকে। এই বন্তি উঠে যাবার ব্যাপারটা আকস্মিক নয় একেবারে-তাহলেও, এই কি শেষ পর্যন্ত পরিপন্থি? বস্তিটাটি উঠে যাবে আর ট্রাকটর চলতে থাকবে ঘরবাড়ি-ভিটেমাটির উপর দিয়ে। কোথায় একটা মেয়েমানুষের মাথা গরম করে মাতালের দিকে দা উঁচিয়ে তেড়ে যাবার ঘটনা আর কোথায় বাড়িয়র সংসারসুক লোপাট করে দেওয়া। কিসের সঙ্গে কিসের জড়ানো। কিন্তু ভাবো তো বসতটা কত পুরনো? ঘনে আছে তোর, হ্যাঁ বাহে ঘড়লের ব্যাটা, তোর কি ফর্ম আছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ ফম আছে। বিচার বসেছিল ফার্মের অফিস ঘরে। কে একজন সাহেব মানুষ শুধোছিল। আর সে উভর দিছিল। কবে কোন প্রাচীনকালে এসেছিল একদল মানুষ। সেই দলের মড়ল ছিল শিবোনাথ। শিবোনাথ আবার গুণিন ছিল। কিন্তুক গুণিন হলেই কি সব হয়, আঁ? হয় কখনও? হয় না।

ঐ পর্যন্ত বলার পর আর বলতে পারেনি—মহিন্দ্র ধরকে উঠেছিল। পরে জানিয়েছিল, তুই আর হামার সঙ্গে আসিস না বাপ—তোর কথার কুনো ঠিক নাই। কুন কথাত তুই কুন কথা কহিস বুবিস না।

হ্যাঁ মড়ল তুই বুঢ়া মানুষ—তুই কিছু করিবা পারিস না। ঐ দিনই কে যেন বলেছিল কথাটা। কপিলদাস কথাটা নিজেকে শোনালো আরেকবার—তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল, তোর কিছু করার নাই। একবার নয়, ঘূরে ঘূরে কথাটা সে বলেই চলল। আর থেকে থেকে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল কয়টা। আর ঐ দীর্ঘশ্বাস তাকে বার্ধক্যের অক্ষমতা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার দেরি হয়ে যায়। ততক্ষণে ঠাণ্ডায় পা দুখানি অসাড় হয়ে উঠেছে। উঠোনের আগন্তনের কাছে বসে বসে সে হাত-পা সেঁকে কিছুক্ষণ। মহিন্দ্রের বউ বিনী খালায় করে ভাত দিয়ে যায়। আগন্তনের তাতে ততক্ষণে আরাম লাগছে কপিলদাসের। ভাতের পাশে এক টুকরো পোড়া মাংস দেখতে পেয়ে সে খুশি হয়। নাতিদের শুধোয়া কী শিকার পেয়েছিল তারা। মহিন্দ্রের ছেলে শিকারের গল্লটা আরম্ভ করে বোধহয়—কিন্তু তার গল্লের দিকে বুড়ো আর মনোযোগ দিতে পারে না।

দাদা, বড় জঙ্গলত মাকি বাঘ থাকে?

নাতির প্রশ্ন শুনে একটু সজাগ হতে হয় বুড়োকে। ঠিক মনে করতে পারে না। প্রাণনগরের জঙ্গলে কি বাঘ আছে? কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে। তারপর মাথা নাড়ায়, নাই রে—শুকদাস, এঁটে বাঘটাগ নাই। কিন্তুক ছিল এক সময়।

নাতিরা ঘন হয়ে বসে। কপিলদাস ভাত খাওয়ার কথা ভুলে যায় তখন। সে গল্ল আরম্ভ করে।

গল্ল মানে তো নিজের কথা। সাঁওতাল কিশোর ছেলের যে ব্যাপারে সবচাইতে আকর্ষণ সেটাই সে ধীর স্বরে বর্ণনা করতে থাকে। তার কালো রঙের কুকুরটার কথা আসে। তার ঘরে খুঁজলে তিরের চোঙা দুটো এখনো পাওয়া যাবে—সেই চোঙায় বাহা বাহা তির জমানো থাকত। একবার তির দিয়ে একটা বাঘ গেঁথে ফেলেছিল। ভাগিয়স সে তখনো বাঘ কী জিনিস জানত না। বনবিড়াল ভেবে নিশানা করে তির ছেড়ে দিয়েছে আর অমনি কী ডাক! ভয় পেয়ে পড়িমরি করে কী রকম দৌড়েছিল সেই ঘটনাটা সে বলে এবং বলবার সময় দৌড়ের বর্ণনাটাই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। বুড়ো মানুষের গুণগুণ শুনগুণ ধীর ঘরের একখেয়েমিতে বিরক্তি লাগে বাচ্চাদের। শুকদাস অস্থির হয়ে ডাকে, দাদা বাঘটার কী হইল?

ও, হ্যাঁ, বাঘটা। কপিলদাসকে একটু ভেবে নিতে হয়। তির খেয়ে বিকট চিত্কার করে উঠবার পর বাঘটার যে কী হয়েছিল কোনোভাবেই মনে পড়তে চায় না। তখন গল্লটা সে বানাতে আরম্ভ করে। তার বর্ণনায় তখন কৌতুক আসে। বাঘের ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসবার ব্যাপারটা সে রঙ চড়িয়ে বলতে চায়। কিন্তু বাঘটা টেনে নিয়ে আসবার সময় কি রকম কষ্ট হচ্ছিল সে কথাটাই ঘুরেফিরে বলতে থাকে সে।

শীতের রাত, ততক্ষণে সবারই ঘরে গিয়ে শোবার কথা। কিন্তু কেউ শুন্তে যাচ্ছে না সেটা সে লক্ষ্য করে। দেখে, ইতিমধ্যে মহিন্দ্র, দীনদাস এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝা যাচ্ছে কোনো শলাপরামর্শ হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা যে কী, কিছুই অনুমান করা যায় না।

ও হ্যাঁ, বাঘটার যেন কী হয়েছিল? কপিলদাস কিশোর দুটির মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ল্যাজ ধরে টানবার প্রসঙ্গে ফিরে আসে। ঐ রকম যখন টেনে আনছিল তখনো কিন্তু বাঘটা বেঁচে ছিল—হ্যাঁ। ঘা খাওয়া বাঘ কিন্তু ভয়ংকর জিনিস।

এই পর্যন্ত বলে থামতে হয়। ঘা খাওয়া বাঘের ভয়ংকরতা কীভাবে বোঝাবে সেজন্যে তাকে ভাবতে হয়। আর ঐ সময় মহিন্দ্রদের কাছে একটি লোককে আসতে দেখে সে গল্লের কথা ভুলে যায়। উঠে গিয়ে দাঁড়ায় মহিন্দ্র আর দীনদাসের কাছে।



নিজের ছেলে মহিন্দুর বিরক্ত হয়—বলে, তুই এখন যা তো বাবা, বুঢ়া মানুষ তুই ইসবের কী বুঝিস!

কপিলদাস বুঢ়ো এবার সত্যিই দমে যায়। নিজের জন্ম দেয়া ছেলে যদি এই রকম করে বলে, তো সে কী করবে। তাকে পিছিয়ে আসতে হয়। হ! মড়ল তুই তো বুঢ়া মানুষ, তুই কিছু করিবা পারিস না। কথাটা ঘুরেফিরে কেউ যেন তার কানের কাছে বারবার করে বলতে থাকে। সে কিছুই করতে পারে না, তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মানুষের জটলাটা দেখে। ততক্ষণে জায়গাটা বেশ একটুখানি সমাবেশ মতো হয়ে উঠেছে। দেখে, দীনদাস হাত নেড়ে নেড়ে কী বলে চলেছে। তারপর আবার মহিন্দুর আরঞ্জ করল। তার কথা শেষ হতে না হতেই ওদিক থেকে আবার ভায়া মাঝি আরঞ্জ করল।

ভারি ধীর নোয়ানো স্বর। শান্তভাবে পরামর্শ হচ্ছে যেন। রাগ নেই। জ্বালা নেই। কারো দুচোখ ধকধক করে জ্বলে উঠছে না, কেউ চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছে না। কপিলদাসের ভারি অবাক লাগে গোটা ব্যাপারটা দেখে। অবাক লাগে, কিন্তু কিছু বলে না সে। বরং নিজেকে সরিয়ে আনে। কয়েক পা পিছিয়ে আসে সে। কিন্তু এই কয়েক পা সরে আসতে অনেকটা সময় লেগে যায় তার। কানের কাছে তখনও সে শুনছে—তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল, তোর কিছুই করার নাই। যেখান থেকে উঠে এসেছিল সেইখানে সে ফিরে যায়। শুধুই যথাস্থানে ফিরে যাওয়া, শুধুই মনে নেওয়া—তার কেবলই মনে হতে থাকে।

বাচ্চারা লোকসমাগম দেখেই সম্ভবত উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে। মেয়ে-বউরা এখানে সেখানে ইত্তেও দাঁড়িয়ে। বাচ্চারা একত্র হলে যা হয়—ততক্ষণে খুনসুটি, দাপাদাপি এবং হাসাহাসি এইসব আরঞ্জ হয়ে পিয়েছে। পাথরের ওপর ঘষে ঘষে তীরে শান দেওয়া তথনে হচ্ছে। মহিন্দুর ছেলে ডাকল, দাদা তারপর বাঘটার কী হইল?

ও, সেই গল্প। কপিলদাসের মনে পড়ে একটু আগে শিকারের গল্প বলতে বলতে সে উঠে গিয়েছিল। তখন আগুনের আলো কিশোর মুখের ওপর চমকাচ্ছে, কে একজন কষ্ট দিয়ে আগুনটা আরেকটুখানি উস্কে দিল। আর এই ঘটনার কারণেই কি না কে জানে, কপিলদাস গল্পটা আবার আরঞ্জ করে দিল। হ্যাঁ, বাঘটার ল্যাজ ধরে টানতে টানতে আসছিল সে। ভারী ওজন হয় বাঘের। আর বাঘটা ওদিকে তখনও বিস্তৃ মরেনি। নাহুঁ, বাঘটা বোধহয় মরেই গিয়েছিল। হঠাতে তার মনে পড়ে।

কপিলদাস সৎ হয়ে উঠতে চায় বাচ্চাদের কাছে। গল্প বানানো বাদ দেয়। তার স্পষ্ট মনে পড়ে তখন। বাঘটার গায়ে বিকট গন্ধ ছিল, তিরটা ঠিক বুকের মাঝখানে গিয়ে গেঁথেছিল, একেবারে এদিক থেকে ওদিক বেরিয়ে গিয়েছিল। রক্ত তখনও বেরঘিল গলগল করে। আর এই সময়, বিকেল বেলায়, প্রাণনগরের জঙ্গলের ধারে একটা লোক ছিল না চারদিকে কোথাও। সে চিৎকার করে বাবাকে ডাকছিল, বঙ্গদের ডাকছিল। আর ঠিক তখন হঠাতে তার পাশের বৌঁপ থেকে কি একটা জানোয়ার লাফ দিয়ে বেরিয়েই বাঁয়ে ছুটতে শুরু করে দিল। এই জানোয়ারটা দেখেই সে—

এ পর্যন্ত বলেই সে থামে। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যাবে বলে ইত্তেও করে। আহা কেমন করে বলবে যে শেয়াল দেখে সে ভয়ানক ভয় পেয়ে পালিয়েছিল।

তারপর, তারপর কী হইল? বাচ্চারা সমস্যের জিজ্ঞেস করলে সে হঠাতে হেসে ওঠে।

কপিলদাস তখন নিজের আলাদা অস্তিত্ব আর অনুভব করতে পারে না। তীরে শান দেবার সময় কী রকম করে পাথরের ওপর ঘষতে হয়—তাই দেখায়। একজনের হাত থেকে বাঁশিটা টেনে নিয়ে ফুঁ দিয়ে একটা বহু পুরনো সূর বাজায়। কী বাজালো আঁ, কী বাজালো দাদা? প্রশ্ন হলে সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় গানটা গায়—

ফকির বুলে চুলুক বাজে

ভালুক নাচে ঝাম,

হাইয়ারে হালমাল কই গেলু রে-এ-এ।

গানটি শুনে বাচ্চারাও গাইতে শুরু করে দেয়।



বুড়োর ভীমরতি হয়েছে ভেবে মেয়েরা কেউ কেউ মনোযোগ দেয় বাচ্চাদের জটলার দিকে। বড়ো যেখানে সভা বসিয়েছে সেখান থেকেও কে একজন চিংকার করে গোলমাল বন্ধ করতে বলে। কিন্তু বাচ্চাদের ধামাবে কে? মহিন্দরের ছেলে ধনুকের জন্যে বাঁশের ছিলা তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। কপিলদাস তার হাত থেকে কেড়ে নিলো ধনুকটা। বলল, দেখ, কেমন করে ছিলা পরাতে হয় ধনুকে।

বাচ্চারা তখন ঘিরে দাঁড়ায় বুড়োর চারদিকে। কপিলদাস হাঁটু ভেঙে ধনুকের এক মাথা ধরে ঝুলে পড়ে ধনুকটা নোয়ায়। তারপর বাঁ হাতে ছিলার ফাঁসটা ধনুকের মাথায় ঢেকাতে চায়। কিন্তু প্রথমবারেই পারে না।

তান হাতটা তার ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে। বাচ্চারা বুড়োর কাণ দেখে সমস্তেরে বলে, পারব নাই দাদা—তুই পারব নাই। কিন্তু পারে সে। এই কাঁপা কাঁপা হাতেই সে ছিলা পরিয়ে দেয় ধনুকের। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছিলা টেনে ধনুকের একটা টক্কার ভোলে। ভারি সুন্দর টানটান আওয়াজ হয় তাতে। এরপরও বুড়ো থামে না। একটা শানানো তির নেয় হাতে এবং তিরটা ধনুকের ছিলায় বসিয়ে তাক করে। সামনের দিকে একবার, একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। বুড়ো তয় দেখিয়ে ঘস্করা করে যেন। বাচ্চারা তাতে হই হই করে ওঠে। আর এই রুকম হই হই শুনেই সম্ভবত কপিলদাস তিরটা দু আঙুলের ফাঁকে চেপে ছিলা ধরে টানে। টেনে ধনুকের নিশানা করে অঙ্ককারের দিকে। মহিন্দরের ছেলে বলে ওঠে, দাদা তিরটা ছুটে যাবে, দাদা মোর তিরটা ছুটে যাবে। কিন্তু কপিলদাস নাতির মিনতি শুনতে পায় কি না বোঝা যায় না। সে সত্যি সত্যি তিরটা ছেড়ে দেয়। আর বাতাস কাটা শব্দ করে তিরটা অঙ্ককারের দিকে ছুটে যায়।

চারদিকে মানুষের বসত। মেয়েরা বুড়োরা কাণ লক্ষ করে হাঁ হাঁ করে ওঠে। সভার মানুষদের মধ্য থেকেও কয়েকজন এগিয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বুড়ো কপিলদাস আর একটা তির হাতে তুলে নিয়েছে। সবাই যখন নিষেধ করছে তখন সে তৃতীয় তিরটাও সামনের অঙ্ককারের দিকে নিশানা করে ছুড়ে দিয়েছে। এবং এই কাণ ঘটে যাওয়ায় ব্যাপারটা আর ছেলেমানুষি তামাসার পর্যায়ে থাকে না। দূর থেকে মহিন্দর চিংকার করে ওঠে, বিন্নি গালাগাল করতে আরম্ভ করে। কিন্তু বুড়ো তখন হাসছে কেমন দেখো, যেন সে কিশোরকালে ফিরে গিয়েছে। জীবনে প্রথম নিশানা ভেদ করার যে খুশি—সেই খুশি পেয়ে বসেছে তাকে। সে শান দেয়া আরও একখানা তির হাতে তুলে নিয়েছে তখন। ওদিকে পেছন থেকে দীনদাস চিংকার করে বলছে—ধর বুঢ়টাকে, ধরে কাঢ়ে লে ধেনুকখান—সেই চিংকার বুড়োর কানে পৌছায় না। কেউ পেছনে তাকে ধরতে আসছে কিনা সেদিকে ঝক্ষেপ না করে কপিলদাস বুড়ো দুহাতে তির-ধনুক নিয়ে সামনের অঙ্ককারের দিকে চলতে থাকে। বিমুচ মানুষজনের চোখের সামনে দিয়েই সে অনায়াসে অঙ্ককার, গাছপালা, কৈশোর এবং আদিম উল্লাসের মধ্যে চলে যায়। আর সেখান থেকে সে তার তৃতীয় তিরটা সঠিক নিশানায় ছুড়বার জন্যে তৈরি হতে থাকে।

[সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

শব্দার্থ ও টীকা

মুর্ম

- সাঁওতাল গোত্রবিশেষ। মুর্ম শব্দের অর্থ নীল গাভি; যা এই গোত্রের গোত্র-চিহ্ন তথ্য টোটেম। কথিত আছে একবার এক অরণ্যভূমিতে কিছু লোক কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিল। একসময় তাদের সর্দার ঘুমিয়ে পড়ল। সেই বনে ছিল একটি হিংস্র নীল গাভি। গাভিটি এসে পায়ের চাপা দিয়ে সর্দারকে মেরে ফেলল। ঘুম থেকে উঠে লোকেরা তখন গাভিটিকে হত্যা করল। সেই থেকে মৃত ব্যক্তির গোত্রের নাম বা পদবি হলো মুর্ম। এই গোত্রের একাধিক উপগোত্রও রয়েছে।



- টাঙ্গন** — পাহাড়ি জলাধারবিশেষ। এ গঞ্জে ঠাকুরগাঁও শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া টাঙ্গন নদী বোঝানো হয়েছে।
- কান্দর** — খাত বা নিচু স্থান। সাধারণত খালের অংশবিশেষ।
- পুশনা পরব** — বিশেষ পুজোর আয়োজন। পৌষ-সংক্রান্তিতে এই পুজো উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হয়।
- হাপন** — বালক।
- মান্দল** — মাদল; এক ধরনের তালবাদ্য।
- পসরা** — পণ্যসম্ভার; বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত দ্রব্য।
- ভাঁট** — এক ধরনের বুনো ফুলবিশেষ।
- নাগরদোলা** — উপর থেকে নিচের দিকে ঘূরতে পারে এমন পাল্কির মতো। এতে ছোট ছোট খোপ থাকে। তাতে মানুষ বসে আর এই খোপগুলোকে যন্ত্রের সাহায্যে কিংবা হাত দিয়ে টেনে উপর থেকে নিচে ঘূরিয়ে আনে।
- জাড়** — শীত, ঠাণ্ডা।
- আধিয়ার** — বর্গাদার। যারা একটি নির্দিষ্ট শর্তে অন্যের মালিকানাধীন জমিতে হাল চাষ করে এবং উৎপাদিত ফসলের অংশ শর্ত মোতাবেক মালিককে প্রদান করে।
- জোতদার** — ব্রিটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রধার সূত্র ধরে কৃষকদের জমির মালিকানা চলে যায় জমিদারদের হাতে। এ সময় জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে এক মধ্যস্থত্বভোগী জোতদার শ্রেণির উচ্চব ঘটে। এরা জমিদারদের কাছ থেকে জমি প্রতিনি বা ইজারা নিত। এরাই জমির চাষ তদারকি এবং খাজনা আদায়ের কাজ করত। ফলে উৎপাদনের সম্পূর্ণ খরচ কৃষক বহন করলেও ফসলের অর্ধেক চলে যেত জোতদারের হাতে।
- গিরান্তি** — গৃহস্থ কাজ।
- মড়ল** — মোড়ল। গোষ্ঠী প্রধান। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।
- ঘুঁটি** — ঘুঁটিবিশেষ। গবাদিপশুর গলায় পরানো হয় এমন ছোট ঘুঁটা।
- কুশিয়ার ক্ষেত** — আখ ক্ষেত।
- পুছে দেখ** — জিজ্ঞেস করে দেখ।
- ফর থাকা** — স্মরণ থাকা। মনে থাকা।

পাঠ-পরিচিতি

আলোচ্য গল্পটি শওকত আলীর ‘লেলিহান সাধ’ (১৯৭৭) প্রস্তুত থেকে সংকলন করা হয়েছে। কপিলদাস মুর্মুর এক বৃন্দ সাঁওতাল। ভূমির অধিকার নিয়ে সাঁওতালদের রয়েছে রক্তে রঞ্জিত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। ভূমি তাদের অঙ্গিত্বেরই অপর নাম। তাই নিজেদের বসতবাটি থেকে উন্মুক্ত হবার আশঙ্কা যখন তীব্রতর রূপ ধারণ করে

তখন বয়সের ভারে খিমিয়ে পড়া, অন্য সবার কাছে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মানুষ কপিলদাস অমিত সাহসে উচ্চীপিত হয়ে উঠে। জীবনের শেষ কাজ হিসেবে শেষ লড়াইটা লড়বার জন্য নিজেকে সে সময়ের হাতে তুলে দেয়। তরুণদের তয় দ্বিধাকে অমূলক প্রমাণিত করে একাই সে আত্মত্যাগী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাটির কাছাকাছি থাকা এক প্রবীণের এই অনিঃশেষ সংগ্রামশীলতার নান্দনিক রূপায়ণ ঘটেছে এই গল্পে।

সময় গল্পজুড়েই লেখক হ্রবির দশায় আক্রমণ কপিলদাসের অতীতের স্মৃতিকথা, বীরতত্ত্বাধা— যার কতকটা সত্য কতকটা কপুরা— এসব প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। আর সেইসঙ্গে কপিলদাসের প্রতি অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গও তুলে ধরেন; যার মূল সুর হলো : ‘হা মড়ল তুই বুঢ়া মানুষ— তুই কিছু করিবা পারিস না।’ এরপ চিন্তার বিপ্রতীপে অবস্থিত কেবল শিশুরা। তাদের কাছে কপিলদাস এবং তার গল্প— দুয়েরই বিশেষ আকর্ষণ ও গুরুত্ব রয়েছে। এই উৎসাহ কপিলদাসকে নতুন চেতনায় উত্তুল্ক করে। সে তার বয়সকে অতিক্রম করে যায়; অনেকটা খেলার ছলেই জড়বৎ কপিলদাস আকস্মিকভাবে গতিপ্রাপ্ত হয়। তার হাতে উঠে আসে তির-ধনুক। একের পর এক তির তার হাত থেকে ছুটে যেতে থাকে শত্রুকে লক্ষ করে। কপিলদাস নিজে কেবল একটি চারিত্ব থাকে না; হয়ে উঠে জাতিসন্তান অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের এক আপসহীন যোদ্ধা। কপিলদাসের আশ্রয়ে লেখক আমাদের জানিয়ে যান লড়াইয়ের কোনো বয়স নেই। উন্মুক্তপ্রায় মানুষগুলো কোনো কিছুর পরোয়া না করেই তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এই আশাবাদের দ্যোতনা জাগিয়ে গল্পকার রচনাটি সমাপ্ত করেন। সাঁওতালি কথনভঙ্গি, শব্দ যোজনা এবং যথোপযুক্ত প্রেক্ষাপট সূজন এই রচনার শিল্পসাফল্যকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “ধর বুঢ়াটাকে, ধরে কাঢ়ে লে ধেনুকখান”—কার উকি?

- | | |
|-----------------|------------------|
| ক. দীনদাসের | খ. মহিন্দরের |
| গ. সলিমউদ্দিনের | ঘ. বিনোদ মিশ্রের |

২. “ওদিকে গোপীনাথ কিছুই বলে না”—এর কারণ হলো গোপীনাথের-

i. স্বার্থপরতা

ii. কাপুরুষতা

iii. স্বাজাত্যবোধহীনতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

উচ্চীপক্টি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাহমুদা নামের এক অসহায় বিধবা বছ বছর ধরে সরকারি খাস জমিতে বসবাস করে আসছেন। ভূমিহীনতা সূত্রে মাহমুদা ও অন্যান্যরা সরকারের কাছ থেকে খাস জমি বন্দোবস্ত নিতে চান। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী মৎস্য ঘের মালিকেরা ওই জমি তাদের নামে বন্দোবস্ত নিয়ে নতুন মৎস্য ঘের বানাতে চান। ‘হয় জমি নয় জীবন’— এই প্রত্যয় বুকে নিয়ে মাহমুদারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।



৩. উদ্দীপকের মাহমুদা কপিলদাস মুর্মুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণ, তার—

- i. সাহসিকতা
- ii. সংগ্রামশীলতা
- iii. অধিকার সচেতনতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটির চূড়ান্ত রূপ “কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ” গল্পে কোন বাক্যের এধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সবই একটার সঙ্গে আরেকটা শেষ পর্যন্ত মেলানো

খ. ম্যানুয়েল পাদ্রিকে টাঙ্গনের জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল

গ. মহাজনের ধান খামার বাড়ি থেকেই কিষানদের বিলিয়ে দিলি

ঘ. বুড়ো দু-হাতে তির-ধনুক নিয়ে সামনের অঙ্কারের দিকে চলতে থাকে

সূজনশীল প্রশ্ন

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশবাসীর ওপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি নানা দিক থেকে শোষণ-বঝণ্ডা চালিয়ে আসছিল।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরস্কৃশ জয় লাভ করলেও বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তাদের বিভিন্ন টালবাহানা এদেশবাসীকে সংক্ষেপ করে তোলে। তখন ‘জয় বাংলা’, ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর’, ‘তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যয়ুনা’ স্লোগানে শহুর-বন্দর-গ্রাম আন্দোলিত হয়।

ক. মুর্মুর কী?

খ. কপিলদাস বুড়োর কাছে সবই একটার সাথে আরেকটা মেলানো বলে মনে হয়—কেন?

গ. উদ্দীপকের দেশবাসীর সাথে কপিলদাস মুর্মুর চেতনাগত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কপিলদাস মুর্মুর অভীত ও বর্তমান তাঁকে উদ্দীপকের দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। —
মন্তব্যটির যথার্থ্য যাচাই কর।



জাদুঘরে কেন যাব আনিসুজ্জামান

লেখক-পরিচিতি

আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও মনস্থী অধ্যাপক।। তাঁর জন্ম ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায়। পিতা ডা. এ.টি.এম. মোয়াজ্জম ও মাতা সৈয়দা খাতুন। তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকার প্রিয়নাথ স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৯৫৩ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলায় স্নাতক সম্মান, স্নাতকোন্তর ও পিএইচডি ডিপ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছেন শিকাগো ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন।

আনিসুজ্জামান উচ্চমানের গবেষণা ও সাবলীল গদ্য রচনার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : ‘মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য’, ‘মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র’, ‘স্বরূপের সঙ্গানে’, ‘আঠারো শতকের চিঠি’, ‘পুরোনো বাংলা গদ্য’, ‘বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে’, ‘বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য’, ‘ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য’, ‘সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক’, ‘চেনা মানুষের মুখ’, ‘আমার একান্তর’, ‘কাল নিরবধি’, ‘বিপুলা পৃথিবী’ ইত্যাদি। সাহিত্য ও গবেষণায় কৃতিত্বের জন্যে তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিলিট এবং ভারত সরকারের পদ্মভূষণসহ বহু পুরস্কার ও সমাননায় ভূষিত হন। তিনি ২০২০ সালের ১৪ই মে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঞ্চাত্যদেশে জাদুঘরতত্ত্ব—মিউজিয়ুলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ—একটা স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসেবে বিকশিত। আলেকজান্দ্রিয়ায় নাকি পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বা তার কাছাকাছি সময়ে—ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না—কিন্তু একটু বিধাইনভাবে বলা যায় যে, সে সময়ে জাদুঘরতত্ত্ববিদ্যের কেউ তার ধারে-কাছে ছিলেন না। কী প্রেরণা থেকে বিশেষজ্ঞ না হয়েও একজন মানুষ এমন একটা কাজ করেছিলেন এবং দর্শনার্থীরাই বা সেখানে কোন প্রত্যাশা নিয়ে যেতেন, তা আজ ভাববার বিষয়। পৃথিবীর এই প্রথম জাদুঘরে ছিল নির্দশন-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার, ছিল উদ্ভিদজ্যান ও উন্মুক্ত চিত্তিয়াখানা, তবে এটা নাকি ছিল মুখ্যত দর্শন-চার্চার কেন্দ্র। এ থেকে আমাদের মনে দুটি ধারণা জন্মে : জাদুঘর গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠাতার কুচিমাফিক, আর তার দর্শকেরা সেখানে যেতেন নিজের নিজের অঙ্গীয় অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অংশে, হয়ত কেউ কেউ ঘুরে ফিরে সরবর্কেরেই উপস্থিত হতেন।

কালক্রমে প্রাচীন জিনিসপত্র সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছিল এবং সম্পত্তি ব্যক্তি বা পরিবারের উদ্যোগে তা সংগৃহীত হয়ে জাদুঘর গড়ার ভিত্তি রচনা করাইল। প্রাচ্যদেশেও এমন সংগ্রহের কথা অবিদিত ছিল না, তবে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পরে পাঞ্চাত্যদেশে এ ধরনের প্রয়াস অনেক বৃদ্ধি পায়। এ রকম ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জাদুঘরে কখনো কখনো জনসাধারণ সামান্য প্রবেশমূল্য দিয়ে চুক্তে পারত বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সকলের জন্যে খোলা থাকত না। রাজ-রাজড়ারা বা সামন্ত প্রভুরা যেসব সংগ্রহশালা গড়ে তুলতেন, তাতে থাকতো ওইসব মহাশয়ের শক্তি, সম্পদ ও গৌরবের ঘোষণা। ঘোল শতকের আগে যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থার উদ্যোগে জাদুঘর নির্মাণের চেষ্টা হয়লি। নবনির্মিত এসব জাদুঘরই জনসাধারণের জন্যে অবারিত হয় গগতন্ত্রের বিকাশের ফলে কিংবা বিপ্লবের সাফল্যে। ফরাসি বিপ্লবের পরে প্রজাতন্ত্রে সৃষ্টি করে লুক্ষ, উন্মোচিত হয় ভের্সাই প্রাসাদের দ্বারা। কৃশ বিপ্লবের পরে সেনিনফাদের রাজপ্রাসাদে গড়ে উঠে হার্মিতিয়ে। টাওয়ার অফ লন্ডনের মতো ঐতিহাসিক প্রাসাদ এবং তার সংগ্রহ যে সর্বজনের চক্ষুআহ্বয় হলো, তা বিপ্লবের না হলোও ক্রমবর্ধমান গগতন্ত্রায়নের ফলে।



ব্যক্তিগত সংগ্রহের অধিকারীরাও একসময়ে তা জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করার প্রেরণা বোধ করেন এবং কখনো কখনো এসব ব্যক্তিগত সংগ্রহের দায়িত্বভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে তা সকলের গোচরীভূত করার ব্যবস্থা করে। সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়ম গড়ে উঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে—এখানকার অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামের সৃষ্টি হয় পিতাপুত্র দুই ট্র্যাডেসন্ট এবং অ্যাশমোল—এই তিনজনের সংগ্ৰহ দিয়ে। আঠারো শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম, তবে তার ভিত্তিতে ছিল অপর তিনজনের সংগ্ৰহ—স্যার হ্যানস স্লেন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্চ অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লি। এসব কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার পরিবর্তন যে জাদুঘরের রূপকে বড় রকম প্রভাবান্বিত করে, সে-বিষয়টা তুলে ধরা। জাদুঘরে প্রবেশাধিকার না পেলে কিংবা নাগরিকদের জন্যে জাদুঘর গড়ে না উঠলে সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই উঠত না,—কেন যাব সে চিন্তা তো অনেক দূরের বিষয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা যেতে পারে; পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উনিশ শতকে জাদুঘরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, সামাজিকবাদী শক্তিগুলোও তাদের উপনিবেশে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। তেমনি একদিকে শিল্পোন্নতি এবং অন্যদিকে উপনিবেশবাদের অবসানের ফলে বিশ শতকে জাদুঘর-স্থাপনার কাজটি দ্রুত এগিয়ে যায়, সদ্য স্বাধীন দেশগুলোও আত্মপরিচয়দানের প্রেরণায় নতুন নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে, তার আগে আর দুটি কথা বলি। একালে আলেকজান্দ্রিয়ার মতো মেলানো-মেশানো জাদুঘরের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বোধ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম। সেখানে বৃহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার সঙ্গে রয়েছে বিশাল প্রাচীনাবলী; স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে উচ্চদর্শিতান ও জীববিদ্যার জাদুঘর; রয়েছে নানা বিষয়ে অস্থায়ী প্রদর্শনী ও বৃত্তান্ত ব্যবস্থা। আর এসবের জন্যে প্রয়োজন হয়েছে প্রাসাদোপম অট্টলিকার। অভ্যাগতদের মধ্যে যিনি যেখানে যেতে চান, যা দেখতে চান ও জানতে জান, তিনি তা করতে পারেন। তবে এখনকার প্রবণতা হচ্ছে প্রাক্তিক জগতের নির্দর্শনের থেকে মানবসৃষ্ট নির্দর্শন আলাদা করে রাখা, আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে ছোট-বড় জাদুঘর গড়ে তোলা। গত ত্রিশ বছরে ব্রিটেনে জাদুঘরের সংখ্যা বিশুণ হয়েছে, যদিও ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সমতুল্য দ্বিতীয় কোনো জাদুঘর সে দেশে তৈরি হয়নি। জাদুঘরের বৈচিত্র্য আজ খুবই চোখে পড়ে—সে বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সংগ্রহের বিষয়গত, তেমনি গঠনগত এবং অন্যদিকে প্রশাসনগত। আজ ভিল্লিম বিশয়ের জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টাই প্রবল : প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সামাজিক ইতিহাস, পরিবহন ব্যবস্থা, বিমানবাহ্য, মহাকাশ ভ্রমণ, পরিবেশ, কৃষি, উচ্চদর্শিতান, জীবতত্ত্ব, শিল্পকলা—তারও আবার নানান বিভাগ-উপবিভাগ। কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবন ও সাধনা সম্পর্কিত জাদুঘর বহু দেশে বহু কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। মৎস্যাধার ও নক্ষত্রশালাও এখন জাদুঘর বলে বিবেচিত। জাদুঘর বলতে আজ আর ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ল্যুভ বা হার্মিতের মতো বিশাল প্রাসাদ বোঝায় না। উন্মুক্ত জাদুঘর জিনিসটা এখন খুবই প্রচলিত। এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনাবলী ভবনের একাংশে অবস্থিত হলেও জাদুঘরের গুরুত্ব হ্রাস পায় না। প্রশাসনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র প্রেগির জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর, স্থানীয় বা আঞ্চলিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও একান্ত বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়া জাদুঘর। আমাদের দেশ থেকে উদাহরণ নিলে বলব, এখানে যেমন আছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, তেমনি আছে চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকার নগর জাদুঘর, মুক্তিযুক্ত জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর ও সামাজিক জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, ঢাকার বলধা গার্ডেন এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এলাকায় সাইট মিউজিয়াম। একজন কী দেখতে চান, তা হির করে কোথায় যাবেন, তা ঠিক করতে পারেন।

তবে জাদুঘরের একটা সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে, যা চমকপ্রদ, যা অনন্য, যা লুণপ্রায়, যা বিশ্ব উদ্বেককারী—এমন সব বস্তু সংগ্ৰহ করা। গড়পড়তা মানুষ তা দেখতে যায়, দেখে আপুত হয়। এই প্রসঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতার



কথা বলি। ঢাকায় আমাদের জাতীয় জানুয়ারের প্রথম ভবনের ডিস্ট্রিক্টর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান। অনেক আমন্ত্রিতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিতান্ত কনিষ্ঠ শিক্ষক আমিও ছিলাম। লক্ষ করলাম, শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণ পড়তে গিয়ে যুদ্ধিত ‘জানুয়ার’ শব্দের জায়গায় সর্বত্র ‘মিউজিয়ম’ পড়ছেন। চা খাওয়ার সময়ে আমাদের শিক্ষকপ্রতিম অর্থমন্ত্রী ড. এম. এন. হুদা আমাকে ডাকলেন। কাছে যেতে বললেন, ‘গভর্নর’ সাহেবের একটা প্রশ্ন আছে, উত্তর দাও। গভর্নর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মিউজিয়মকে আপনারা জানুয়ার বলেন কেন?’ একটু হচকচিয়ে গিয়ে বললাম, ‘স্যার, জানুয়ারই মিউজিয়মের বাংলা প্রতিশব্দ।’ গভর্নর এবার রাগত্বের বললেন, ‘মিউজিয়মে যে আল্লাহর কালাম রাখা আছে, তা কি জানু?’ আল্লাহর কালাম বলতে তাঁর মনে বোধ হয় ছিল, চমৎকার তুঘরা হরফে লেখা নুসরত শাহের আশরাফপুর শিলালিপি—যোল শতকে এক মসজিদ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত সংবলিত প্রতরখণ—সেটা রাখা হয়েছিল সকলের চেথে পড়ার মতো জায়গায়। যাহোক, গভর্নরের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, ‘স্যার, ওই অর্থে জানু নয়, বিস্ময় জাগায় বলে জানু—যা যেমন সন্তানকে বলে, ওরে আমার জানু রে।’ ব্যাখ্যার পরের অংশটা যথার্থ কিনা, সে বিষয়ে এখন সন্দেহ হয়, তবে আমার বাক্য শেষ করার আগেই গভর্নর হংকার দিলেন, ‘না, জানুয়ার বলা চলবে না, মিউজিয়ম বলতে হবে, বাংলায়ও আপনারা মিউজিয়মই বলবেন।’ তর্ক করা বৃথা—হুকুম শিরোধার্য করে আমি চ্যাঙ্গেলরের সামনে থেকে পালিয়ে এলাম। যঃ পলায়েতে স জীবতি।

আরও একটা প্রবাদ আছে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমারও তাই হলো। গভর্নরের সামনে থেকে চলে আসার পর মনে হলো, তাঁকে বললাম না কেন, জানু শব্দটা ফারসি,—তাতে হয়ত তিনি কিছুটা ব্যক্তি পেতেন। আপনারা অনেকেই জানেন, জানুয়ারের পুরোটাই ফারসি, তবে জানুয়ারের ঘরটা বাংলা। উর্দ্ধতে জানুয়ারকে বলে আজবখানা, হিন্দিতে অজায়েব—ঘর। খানা ফারসি; আজব, আজিব, আজায়েব আরবি। জানু ও আজব শব্দে দ্যোতনা আছে দুরকম : একদিকে কুহক, ইন্দ্ৰজাল, ভেলকি; অন্যদিকে চমৎকার, ঘনোহর, কৌতুহলোদ্দীপক। ‘আমার ছেলেকে সোজা পেয়ে মেঝেটা জানু করেছে’ আর ‘কী জানু বাংলা গানে!’—দু রকম দ্যোতনা প্রকাশ করে।

বয়সের দোষে এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। মোনায়েম খান যে সেদিন রাগ করেছিলেন এবং জানুয়ারের অন্য অনেকে কিছু থাকা সত্ত্বেও যে তিনি আল্লাহর কালামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, এখন মনে হয়, তাঁর একটা তাৎপর্য ছিল। তিনি দিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই জানুয়ারে সংরক্ষিত মুসলিম ঐতিহ্যমূলক নির্দর্শন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল এবং বাংলায় হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে জানুয়ারকে যেহেতু ‘জানুয়ার’ বলে, তাই তিনি সেটা বর্জন করে ‘মিউজিয়ম’ শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হিসেবে। জানুয়ারকে যদি তিনি আল্লাপরিচয়লাভের ক্ষেত্র হিসেবে দেখে থাকেন, তাহলে মোটেই ভুল করেননি। অল্প বয়সে আমি যখন প্রথম ঢাকা জানুয়ারে যাই, তখন আমিও একধরনের আল্লাপরিচয়ের সূত্র সেখানে ঝুঁজে পাই—অতটা সচেতনভাবে না হলেও। বাংলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রাচীন নির্দর্শনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। স্থাপত্যের নির্দর্শন বলতে প্রধানত ছিল কাঠের ও পাথরের স্তুপ, আর ভাস্কর্য ছিল অজন্ম ও নানা উপকরণে তৈরি। বঙ্গদেশে অত যে বৌদ্ধ মূর্তি আছে, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না; পৌরাণিক-লৌকিক অত যে দেবদেবী আছে, তাও জানতাম না। মুদ্রা এবং অঙ্গশঙ্ক দেখে বাংলায় মুসলিম-শাসন সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়েছিল—ইসা খীর কামানের গায়ে বাংলা লেখা দেখে মুক্ষ হয়েছিলাম। পোড়ামাটির কাজও ছিল কত বিচ্ছিন্ন ও সুন্দর! জানুয়ারের বাইরে তখন রক্ষিত ছিল নীল জাল দেওয়ার মন্ত বড় কড়াই। নীল-আন্দোলনের ইতিহাস কিছুটা জানতাম। কড়াইয়ের বিশালত্ব চিত্রে সন্ধর্ম জাগাবার মতো, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে অনেক দীর্ঘশ্বাস ও অঞ্চলবিন্দু জড়িত, সেটা মনে পড়তে ভুল হয়নি। ঢাকা জানুয়ারে যা দেখেছিলাম, তাঁর কথা বলতে গেলে পরে দেখা নির্দর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে—কিন্তু বক্সের হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস ও



সমৃদ্ধ সংস্কৃতির যে নমুনা সেখানে ছিল তা থেকে আমি বাণিজির আজপরিচয় লাভ করেছি। পরে তা শক্তিশালী হয়েছে কলকাতা জাদুঘর ও ভিট্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে।

পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহু জাদুঘরে আজপরিচয়জ্ঞাপনের এই চেষ্টা, নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখার যত্নকৃত প্রয়াস দেখেছি। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রেকো-রোমান মিউজিয়মে ও কায়রো মিউজিয়মে যেমন মিশরের পুরোনো ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে, সিয়াটলে ও নর্থ ক্যারোলাইনার পূর্ব প্রান্তে দেখেছি আমেরিকার আদিবাসীদের নানাবিধি অর্জনের নির্দর্শন এবং ইউরোপীয় বসতিস্থাপনকারীদের প্রথম আগমনকালীন স্মৃতিচিহ্ন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম এবং টাওয়ার অফ লণ্ডনে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অনেকখানি ধরা আছে। বুয়েতের জাদুঘরে আমার ছেলেবেলায় দেখা ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রার সংস্কৃত ছান দেখে চমৎকৃত হয়েছিঃ বুবেছি, তাদের আজ্ঞানুসন্ধান শুরু হয়েছে, কিন্তু দূর ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ হাতে আসেনি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাদুঘরের একটা প্রধান কাজ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং জাতিকে আজপরিচয়দানের সূত্র জানানো। জাদুঘরে আমাদের যাওয়ার এটা একটা কারণ। সে আজপরিচয়লাভ অনেক সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরও সূচনা করে।

টাওয়ার অফ লণ্ডনে সকলে ভিড় করে কোহিনুর দেখতে। আমিও তা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আমার আরেকটা কথা মনে হয়েছিল। জাদুঘর হত সাংস্কৃতিক উন্নয়নাধিকারের জয়গা বটে, তবে তা সবসময়ে নিজের জিনিস হবে, এমন কথা নেই। অন্যের ঐতিহ্যিক উন্নয়নাধিকার হরণ করে এনেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের জাদুঘর সাজাতে কৃষ্ণিত বোধ করে না।

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে নানা দেশের নানা নির্দর্শন সংগৃহীত হয়েছে। কী উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে, সেকথা আপাতত মূলতবি রাখলাম। কিন্তু এসব দেখে অভিন্ন মানবসভার সঙ্গান পাওয়া যায়। মনে হয়, এত দেশে এত কালে মানুষ যা কিছু করেছে, তার সবকিছুর মধ্যে আমি আছি।

জাতীয় জাদুঘর একটা জাতিসভার পরিচয় বহন করে। যে সেখানে যায়, সে তার নিজের ও জাতির স্বরূপ উপলক্ষ করতে পারে, সংস্কৃতির সঙ্গান পায়, আজ্ঞাবিকাশের প্রেরণা লাভ করে। এই যে শত সহস্র বছর আগের সব জিনিস—যা হয়ত একদিন ব্যক্তির বা পরিবারের কুক্রিগত ছিল—তাকে যে নিজের বলে ভাবতে পারি, তা কি কম কথা? আবার অন্য জাতির অন্তর্বৃক্ষ কীর্তির সঙ্গে যখন আমি একাত্তা অনুভব করি, তখন আমার উন্নৰণ হয় বৃহস্পুর মানবসমাজে।

জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি জোগায়, আমাদের চেতনা জাগ্রাত করে, আমাদের মনোজগতকে সমৃদ্ধ করে। জাদুঘর একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন। সমাজের এক স্তরে সংস্কৃত জ্ঞান তা ছড়িয়ে দেয় জনসমাজের সাধারণ স্তরে। গণতন্ত্রায়ণের পথেও প্রশংস্ত হয় এভাবে। জাদুঘর শুধু জ্ঞানই ছড়িয়ে দেয় না, অলক্ষ্যে ছড়িয়ে দেয় ভাবাদর্শ। কাজেই এ কথা বলা যেতে পারে যে, জাদুঘর যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবনার সৃষ্টি, তেমনি তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরও কারণ ঘটাতে পারে।

আরও একটা সোজা ব্যাপার আছে। জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। মানুষের অনন্ত উচ্চাবন-নৈপুণ্যে, তার নিরলস সৃষ্টিক্ষমতা, তার তান্ত্রিক সৌন্দর্যসাধনা, তার নিজেকে বারংবার অতিক্রম করার প্রয়াস—এসবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমরা অশেষ উন্নতি হই।

এতকিছুর পরেও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, ‘জাদুঘরে কেন যাবে?’ সূক্ষ্ম কৌতুক সঞ্চার করে প্রাবন্ধিক পরিশেষে লিখেছেন যে, তাহলে তার একমাত্র উন্নত বোধ হয় এই : ‘কে বলছে আপনাকে যেতে?’

শব্দার্থ ও টাকা

মিউজিয়াম স্টাডিজ
আলেকজান্দ্রিয়া

অবিদিত

- জাদুঘর বা প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যা।
- উন্নত মিশরের প্রধান সমুদ্রবন্দর ও সুপ্রাচীন নগর। প্রিটপূর্ব ৩০২ অন্দে আলেকজান্দ্রার দি প্রেট এই নগর পতন করেন। এটি ছিল আলেকজান্দ্রার যুগের ত্রিক সভ্যতার কেন্দ্র। এখানে বিশ্বের প্রাচীন গ্রন্থাগার (পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত) ছিল।
- জানা নেই এমন। অজানা। অজ্ঞাত।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস

- প্রিস্টোয় চৌদ্দো থেকে শোলো শতক থেকে ইউরোপে শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে নবজাগরণের মাধ্যমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উভরণই ইউরোপীয় রেনেসাঁস।

ফরাসি বিপ্লব

- ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসি জনগণ সেখানকার কৃত্যাত বাস্তিল দুর্গ ও কারাগার দখল করে নেয় এবং সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেয়। এর মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় ধনিক শ্রেণি আর অত্যাচারিত কৃষকরা ছিল তাদের সহযোগী। বিপ্লবের মূল বাণী ছিল ‘মুক্তি, সাম্য, আতৃত্ব ও সম্পত্তির পরিত্র অধিকার।’ এই বিপ্লবের ফলে সামন্তবাদের উৎপাটন হয়।

কশ বিপ্লব

- ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বিপ্লবী নেতা লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সর্বহারার দল বলশেভিক পার্টি সেখানকার জারতগ্রকে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয় জনগণ তথা রাষ্ট্র।

টাওয়ার অফ লন্ডন

- লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর তৌরবর্তী রাজকীয় দুর্গ। এর মূল অংশে রয়েছে সাদা পাথরের গমুজ। এটি নির্মিত হয় ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে। এক সময় দুর্গটি রাজকীয় ভবন ও রাষ্ট্রীয় কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে অক্ষশালা ও জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত।

গোচরীভূত

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

- অবগত। পরিজ্ঞাত।
- যুক্তরাজ্যের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় বারো শতকের প্রথম দিকে। শিল্পকলা ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত জাদুঘর অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান।

অ্যাশমল

- ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক। জন্ম ১৬১৭; মৃত্যু ১৬৯২। তিনি রসায়ন ও পুরাকীর্তি বিষয়ে করেকটি বই লিখেছেন। তাঁর সংগ্রহগুলি দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম।

অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম

- ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক অ্যাশমলের সংগ্রহ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘর। এই সংগ্রহশালার প্রাচীন ভবন গড়ে উঠে ১৬৭৯-১৬৮৩ কালগৰ্বে। বর্তমান অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম

- প্রযুক্তি ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত এই জাদুঘর ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৩। সে সময়ে ব্রিটিশ সরকার স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন, আর্চ অব অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লি—এই তিনজন সংগ্রহকের বই, পাঞ্জলিপি, মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদির বিশাল ব্যক্তিগত সংগ্রহ করে এই জাদুঘর গড়ে তোলে।

প্রযুক্তি

- এই বিদ্যায় প্রাচীন মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করা হয়। পুরাতত্ত্ব। archaeology।

**নৃতত্ত্ব
মৎস্যাধার**

- মানব জীবনের উৎপত্তি ও ত্রুমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। নৃবিদ্যা। anthropology।
- মাছ পালনের কাচের আধার। মাছের চৌবাচ্চা। জলজ প্রাণী বা উষ্ণিদ সংরক্ষণের কৃত্রিম জলাধার। aquarium।

ল্যুক্ট

- Louvre Museum। ফ্রান্সের জাতীয় জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি। প্যারিসে অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে। এই জাদুঘরের চিত্রশিল্পের সংগ্রহ বিশের অন্যতম সমৃদ্ধ সংগ্রহ হিসেবে বিবেচিত।

হার্মিটেজ

- সন্ম্যাসীর নিঝের আশ্রম। মঠ। hermitage।



বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাদুঘর। এ দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা ও প্রাক্তিক ইতিহাসের নির্দর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজে এটি নিয়োজিত। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জাদুঘর হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরের শাহবাগে এর অবস্থান।

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর

- এই জাদুঘরে বাংলাদেশের অন্য জাদুঘর। চট্টগ্রাম নগরের আঞ্চলিক অবস্থিত এই জাদুঘরে বাংলাদেশের পঁচিশটি ক্ষুদ্র মুগোষ্ঠীসহ বিদেশি পাঁচটি দেশের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নির্দর্শন প্রদর্শনের জন্য রয়েছে।

ঢাকা নগর জাদুঘর

- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত এই জাদুঘর নগর ভবনে অবস্থিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। এর লক্ষ্য ঢাকা নগরের ঐতিহাসিক নির্দর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এই জাদুঘর ঢাকা সংক্রান্ত বেশকিছু বই প্রকাশ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রথম জাদুঘর। মুক্তিযুদ্ধের নির্দর্শন ও স্মারক সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্যে এই জাদুঘর বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস সবার সামনে তুলে ধরার কাজেই জাদুঘর অন্য অবদান রেখে আসছে।

বঙ্গবন্ধু জাদুঘর

- এই জাদুঘর ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনকে ১৯৯৭ সালে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়। এই জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক দুর্লভ ছবি, তাঁর জীবনের শেষ সময়ের কিছু স্মৃতিচিহ্ন এবং তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনের জন্যে রাখা হয়েছে।

বিজ্ঞান জাদুঘর

- ঢাকায় অবস্থিত এই জাদুঘরের প্রাতিষ্ঠানিক নাম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। ১৯৬৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভৌতিকিয়তা, শিল্পপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, মজার বিজ্ঞান, ইত্যাদি গ্যালারি ছাড়াও সায়েন্স পার্ক, আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ইত্যাদি রয়েছে। এই জাদুঘর তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনামূলক কাজে প্রণোদন দিয়ে থাকে।

সামরিক জাদুঘর

- ১৯৮৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে শহরের কেন্দ্রস্থল বিজয় সরণিতে এটি স্থানান্তরিত হয়। প্রাচীন যুগের সম্বান্ধ, ট্যাঙ্ক, ত্রুজারসহ নানা ধরনের আধুনিক যুদ্ধান্ত, আঠারো শতক থেকে এ পর্যন্ত ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কামান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন স্মারক ইত্যাদি দেখার সুযোগ এ জাদুঘরে রয়েছে।

বরেন্দ্র জাদুঘর

- প্রাতিষ্ঠানিক নাম বরেন্দ্র প্রবেশণা জাদুঘর। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ও রাজশাহীতে অবস্থিত। এ জাদুঘর বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর। এখানে ভাস্কর্য, খোদিত লিপি, পাঞ্জলিপি ও প্রাচীন মুদ্রার মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস, শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণায় এগুলি আকর-উপাদান হিসেবে গণ্য।

বলধা গার্ডেন

- ঢাকা মহানগরের ওয়ারীতে এর অবস্থান। এটি একাধারে উক্তি উদ্যান ও জাদুঘর। ভাওয়ালের জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ১৯০৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই জাদুঘরের অনেক নির্দর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বলধা গার্ডেনে দেশি-বিদেশি অনেক প্রজাতির গাছপালার আকর্ষণীয় সংগ্রহ রয়েছে।

- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর** – চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক হস্তান্তরিত ছোট সংগ্রহ নিয়ে ১৯৭৩ সালে এই জাদুঘরের যাত্রা শুরু। এই জাদুঘরে রয়েছে টার্সিয়ারি যুগের মাছের জীবাশা, বাহলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের উৎখননকৃত শিল্পবস্তু, প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুদ্রা, শিলালিপি, ভাস্কর্য, অস্ত্রশস্ত্র, লোকশিল্প ইত্যাদি নির্দর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের কিছু দলিলপত্র। এ ছাড়া একাডেমিক প্রদর্শনী, সেমিনার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ জাদুঘর সক্রিয় ভূমিকা রেখে আছে।
- বিজ্ঞাতি তত্ত্ব**
- ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ভারতকে ধর্মীয় প্রাথান্ত্রের ভিত্তিতে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করার রাজনৈতিক মতবাদ। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এ ধারণার উদ্বাতা তদানীন্তন মুসলিম জীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।
- স্থাপত্য**
- ভবন প্রাচার ইত্যাদি স্থাপনের কাজ বা এ সংক্রান্ত কলাকৌশল বা বিজ্ঞান। architecture।
- ভাস্কর্য**
- ধাতু বা পাথর ইত্যাদি খোদাইয়ের শিল্প। মুর্তিনির্মাণ কলা। sculpture।
- কলকাতা জাদুঘর**
- এটি ইঞ্জিয়ান মিউজিয়ম বা ভারতীয় জাদুঘর নামেও সমধিক পরিচিত। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৪ সালে। এটিই ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জাদুঘর।
- ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল**
- প্রাতিষ্ঠানিক নাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। রানি ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত স্মৃতিসৌধ। কলকাতা যয়দানের দক্ষিণ কোণে অবস্থিত সুরম্য শ্রেষ্ঠপাথরে নির্মিত এই স্মৃতিসৌধ অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর নির্দর্শন।
- গ্রেকো রোমান মিউজিয়ম**
- মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে। এতে প্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পুরানিদর্শনসহ প্রাচীন গ্রিক-রোমান সভ্যতার অনেক নির্দর্শন সংরক্ষিত আছে।
- কায়রো মিউজিয়ম**
- মিশরের কায়রোতে অবস্থিত এই জাদুঘর মিশরীয় জাদুঘর নামেও পরিচিত। এটি ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার প্রদর্শন সামগ্রী রয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

এই রচনাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শামসুল হোসাইনের সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা ‘ঐতিহ্যায়ন’ (২০০৩) থেকে সংকলিত হয়েছে।

জাদুঘর হচ্ছে এমন এক সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান যেখানে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নির্দর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয় সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার জন্যে। অর্থাৎ জাদুঘর কেবল বর্তমান প্রজন্মের কাছে নির্দর্শনগুলি প্রদর্শন করে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও সেগুলি সংরক্ষণ করে রাখে। সংগৃহীত নির্দর্শনগুলিকে জাদুঘরে যথাযথভাবে পরিচিতিমূলক বিবরণসহ এমন আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করা হয় যেন তা থেকে দর্শকরা অনেক কিছু জানতে পারেন, পাশাপাশি আনন্দও পান। এ ছাড়াও জাদুঘরে আয়োজন করা হয় বক্তৃতা, সেমিনার, চলচিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি। পরিদর্শকদের মধ্যে জানার কৌতুহল বাঢ়িয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। এভাবে জাদুঘর ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্যের সঙ্গে জনগণকে আকৃষ্ণ ও সম্পৃক্ত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গুরুত্বের কথা এবং মানব জাতির আত্মপরিচয় তুলে ধরায় নানা ধরনের জাদুঘরের ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে আকর্ষণীয় চাণ্ডি ও মনোগ্রাহী ভাষায়।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভিস্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোথায় অবস্থিত?

২. ব্রিটিশ মিউজিয়ম, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা এবং গ্রাহাগারের জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকার প্রয়োজন হয়েছিল-

- i. বিচির্ণ সংগ্রহের কারণে

- ## ii. সংরক্ষণের সুবিধার্থে

- ### iii. সংগ্রহের বিপুলতার কারণে

নিচের কোনটি ঠিক?

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

ফিলিপ শিক্ষা-সফরে বলধা গার্ডেনে গিয়ে নানা ধরনের উষ্ণিদের সঙ্গে পরিচিত হয়। অজানা অসংখ্য উষ্ণিদের এবং আহরিত নতুন জ্ঞান তাকে কৌতুহলী করে তোলে।

৩. ফিলিপের কৌতুহলী হওয়া এবং ‘জাদুঘরে কেন যাব’ রচনায় মানবের আবেগপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ, জাদুঘর—

- গ. অভিনব ও রোমাঞ্চকর
ঘ. আনন্দদায়ক ও রহস্যপূর্ণ

৪. উক্ত দিক নিচের কোন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে?

- ক. সদ্য স্বাধীন দেশগুলোও আত্মপরিচয়দানের প্রেরণায় নতুন নতুন জানুধর প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়

- ধ. গড়পড়তা মানুষ তা দেখতে যায়, দেখে আপ্সত হয়

- গ. জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি যোগায়

- ঘ. জানুয়ার একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন

সুজনশীল পদ্ম

କ୍ରାନ୍ତିର ଲୋକଦେର ଦେଶାଭାଜନ ଅମନି କରେଇ ହୁଯ ବଳେ ତାଦେର ଦେଶାଭାବୋଧ ଆପନା ଆପନିଟି ଜନ୍ମାଯ । ଶୈଶବ ଥିକେଇ ତାରା ପଥ ଚଲାତେ ଚନେ ତାଦେର ଜାତୀୟ ପୂର୍ବ-ପୁରୁଷଦେର, ଯାଦେର ନିଯେ ତାଦେର ଇତିହାସ ଲେଖା ହୁଯେଛେ । ଆର ଦେଶର ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନାର ପ୍ରତି ପର୍ବତେର ନାମ—ଯାଦେର କୋଣେ ତାଦେର ଅଖଣ୍ଡ ଜାତି ଶାଶ୍ଵତ ହୁଯେଛେ । ସୁଦେଶକେ ଚନେ ବଲେଇ ତାରା ବିଶ୍ଵକ୍ରେତା ଚିନ୍ତନେ ପାରେ ।

ক. পথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল কোথায়?

খ. জাদুঘর কীভাবে গড়ে ওঠে?

গ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনাটির যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাদৃশ্যগত দিকটি ‘জাদুঘরে কেন যাব’ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কতটুকু সম্পর্কিত? যাচাই কর।



রেইনকোট

আখতারজ্জামান ইলিয়াস

লেখক-পরিচিতি

আখতারজ্জামান ইলিয়াস বাংলা কথাসাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার নাম। ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তিনি গাইবান্ধা থামে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস বগুড়া শহরের উপকল্পে অবস্থিত নারলি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম বি.এম. ইলিয়াস এবং মাতার নাম মরিয়ম ইলিয়াস। তাঁর পিতৃদণ্ড নাম আখতারজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস। প্রথমে বগুড়ায় ও পরে ঢাকায় তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিপ্লি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আখতারজ্জামান ইলিয়াস একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি লেখার সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর কখনো জোর দেননি। বরং শুরুত্ব দিয়েছেন লেখার শুণগত মানের ওপর। জীবন ও জগৎকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, দারিদ্র্য, শোষণ, বখন্না প্রভৃতি বিষয়কে করেছেন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের জীবনকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছেন এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই। মানুষের পরম সূচী মনস্তাত্ত্বিক প্রাঙ্গসমূহ উল্লোচনেও তাঁর রয়েছে গভীর দক্ষতা। তাঁর পাঁচটি ছেটগল্প গ্রন্থে সংকলিত আছে মাত্র ২৮টি গল্প। এছাড়া রয়েছে ২টি উপন্যাস ও ১টি প্রবন্ধসংকলন। তাঁর গল্পগুলোর নাম : ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’, ‘খোঁয়ারি’, ‘দুধভাতে উৎপাত’, ‘দোজখের ওম’, ‘জাল স্পন্দনের জাল’। উপন্যাস দুটি হলো : ‘চিলেকোঠার সেপাই’ ও ‘খোঁয়াবনামা’।

১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ক্যাপ্টারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

ভোরাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঘৰঘৰ বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ব্র্যাসিফিকেশনও আছে। যেমন, মঙ্গলে ভোরাতে হইল শুরু, তিন দিন মেঘের শুরুশুরু। তারপর, বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল। বৃহস্পতি শুরু কিছু বাদ নাই। কিন্তু এখন ভুলে গেছে। যেটুকু মনে আছে, পুরু বেড়-কভারের নিচে শুটিসুটি মেরে শুয়ে আর-একগুশলা সুমিয়ে নেওয়ার জন্যে তাই যথেষ্ট। অস্তত তিন দিন ফুটফাট বঙ্গ। বাদলায় বন্দুক-বারুদ কি একটু জিরিয়ে নেবে না? এই কটা দিন নিশ্চিন্তে আরাম করো।

তা আর হলো কই? ম্যান প্রোপোজেস –। এমন চমৎকার বাদলার সকালে দরজায় প্রবল কড়া নাড়া শেষ হেমন্তের শীত শীত পর্দা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল। সব ভেস্টে দিল। মিলিটারি! মিলিটারি আজ তার ঘরে। আল্লা গো। আল্লাহম্মা আস্তা সুবহানকা ইন্নি কুণ্ঠ বিনাজ জোয়ালেমিন।— পড়তে পড়তে সে দরজার দিকে এগোয়। এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে। রাস্তায় বেরলে পাঁচ কালো সব সময় রেডি রাখে টেঁটের ওপর। কোনদিক থেকে কখন মিলিটারি ধরে। —তবু একটা না একটা ভুল হয়েই যায়। দোয়া মনে হলো ঠিকই কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে গেল।

দুটো ছিটকিনি, একটা খিল এবং কাঠের ডাশা খুলে দরজার কপাট ফাঁক করতেই বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপ্টার সঙ্গে ঘরে ঢোকে প্রিন্সিপ্যালের পিওন। আলহামদুল্লাহ! মিলিটারি নয়। পিওনকে জড়িয়ে ধরে চুমু থেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটার চিনচিনে গলা গঁষ্টীর স্বরে হাঁকে, “স্যার নে সালাম দিয়া।” বলেই ভাঙ্গচোরা গালের খোঁচাখোঁচা দাঢ়িতে লোকটা নিজের বাক্যের কোমল শ্বাসটুকু শুবে নেয় এবং হকুম ছাড়ে, “তঙ্গ কিয়া। আভি যানে হোগা।”



কী ব্যাপার?

বেশি কথা বলার সময় নাই-কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে কারা বোমা ফাটিয়ে গেছে গত রাতে।

মানে?

“‘মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকট্রি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অঙ্গ অয়াপস যানেকা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিয়ে গেরেনেল ক্ষেক। গেট তোড় গিয়া।’”

ভয়াবহ কাণ্ড। ইলেকট্রিক ট্রাক্সফর্মার তো কলেজের সামনের দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের পর বাগান, টেনিস লন। তারপর কলেজ দালান। মস্ত দালান পার হয়ে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠ। মাঠ পেরিয়ে একটু বাঁ দিকে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টার। এর সঙ্গে মিলিটারি ক্যাম্প। কলেজের জিমন্যাশিয়ামে এখন মিলিটারি ক্যাম্প। প্রিনসিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা ফেলা মানে মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা। সামনের দেওয়ালে বোমা মেরে এতটা পথ ত্রুট করে গেল কী করে? সে জানতে চায়, “ক্যায়সে?”

প্রিনসিপ্যালের পিওন জানবে কী করে? “উও আপ হি কহ সকতা।”

মানে? সে-ই বা বলবে কী করে? পিওন কি তাকে মিসক্রিয়ান্টদের লোক ভাবে নাকি?—তার মাথাটা আপনাআপনি নিচু হলে মুখ দিয়ে পানির মতো গড়িয়ে পড়ে, “ইসহাক মিয়া, বৈঠিয়ে। চা টা খাইয়ে। আমার এই পাঁচ সাত মিনিট লাগেগো।”

‘নেহি।’ নাশতার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে ইসহাক বলে, “আব্দুস সাত্তার মিরখাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়া। সব পরফসরকো এজেন্সি দিয়া। ফওরন আইয়ে।”

কর্নেলের নেতৃত্বে মিলিটারির হাতে কলেজটা এবং তাকেও ন্যস্ত করে ইসহাক বেরিয়ে যায়, রাস্তায় ঘড়ঘড় করতে থাকা বেবি ট্যাক্সির গর্জন তুলে সে রওয়ানা হলো জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে। ইসহাক নিজেই এখন মিলিটারির কর্নেল বললেও চলে। তবে ভোরবেলা কলেজের ভেতরে কর্নেল খোদ চলে আসায় সে হয়ত ডেমোটেড হয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেলে। আরও নিচেও নামাতে পারে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের এদিকে তাকে ঢেলা মুশকিল। মিলিটারি প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাকে দেখে কলেজের সবাই তটছ। এগুলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে। কোনকালে দাদা না পরদাদার ভায়রার মাঝু না কে যেন দিল্লিওয়ালা কোন সাহেবের খাস খানসামা ছিল, সেই সুবাদে দিনরাত এখন উর্দু বলে।

“যেতেই হবে? অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হাঁপানির টানটা আবার—” বৌয়ের এসব সোয়াগের কথা শুনলে কি তার চলবে? বৌ কি প্রিনসিপ্যালের ধর্মকের ভাগ নেবে? এর ওপর কলেজে কর্নেল এসেছে। কপালে আজ কী আছে আঞ্চাই জানে! ফায়ারিং ক্ষোয়াতে যদি দাঁড় করিয়েই দেয় তো কর্নেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ঠিক কপালে শুলি করার হুকুম জারি করানো যায় না? প্রিনসিপ্যাল কি তার জন্যে কর্নেলের কাছে এই তদবিরুদ্ধ করবে না? পাকিস্তানের জন্যে প্রিনসিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরবন্দ পড়ছে। সময় নাই অসময় নাই আঞ্চাল দরবারে কাল্পাকাটি করে এবং সময় করে কলিগদের গালাগালিও করে। এগুলি মাসের মাঝামাঝি প্রিনসিপ্যাল মিলিটারির বড়ো কর্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুলকলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও। এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে এসব কাঁটা ওপড়াতে হবে। তা মিলিটারি ডষ্টের আফাজ আহমদের পরামর্শ শুনেছে, ধার্ম-গঞ্জে যেখানেই গেছে, প্রথমেই কামান তাক করছে শহিদ মিনারের দিকে। দেশে একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত নাই। তা প্রিনসিপ্যাল তাদের এত বড়ো একটা পরামর্শ দিল, আর সামান্য এক লেকচারারকে শুলি করার সময় শরীরের আলতুফালতু জায়গা বাদ দিয়ে কপালটা টার্গেট করার অনুরোধটা তার মানবে না? আবার প্রিনসিপ্যালকে সে এত সার্ভিস দিচ্ছে, তার কলিগের, তওবা, সাব-অর্ডিনেটের জন্যে এতটুকু করবে না?



প্যান্টের ভেতর পা গলিয়ে দিতে দিতে সে শোনে রান্নাঘর থেকে বৌ বলছে, “তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে শুলির আওয়াজ আসছিল। কখন কী হয়।”

এসব কথা এখন বলার দরকারটা কী?—রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলছে, সিচুয়েশন নর্ম্যাল। পরিষ্কৃতি স্বাভাবিক। দুশ্মনকে সম্পূর্ণ কর্তৃতা করা গেছে। মিসক্রিয়েন্টরা সব খতম। প্রেসিডেন্ট দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বন্ধপরিকর। কিছুদিন বাদে বাদে তার ভাষণ শোনা যায়, আওয়ার আলটিমেট এইই রিমেইনস দ্য সেম, দ্যাট ইজ টু হ্যান্ডওভার পাওয়ার টু দি ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ্স অব দ্য পিপল। সবই তো নর্ম্যাল হয়ে আসছে। বাঙালি, আই মিন, ইস্ট পাকিস্তানি গভর্নর, মঙ্গীরা ইস্ট পাকিস্তানি। সবই তো স্বাভাবিক। এখন বৌ তার এসব বাজে কথা বলে কেন? ইস! আসমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

“এই বৃষ্টিতে শুধু ছাতায় কুলাবে না গো।” বৌয়ের আরেক দফা সোয়াগ শোনা গেল, “তুমি বরং মিন্টুর রেইনকোটটা নিয়ে যাও।”

ইস! আবার মিন্টু। বৌয়ের এই ভাইটার জন্যেই তাকে এক্সট্রা তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। বাড়ি থেকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকেই তো মিন্টু চলে গেল জুন মাসে, জুনের ২৩ তারিখে। জুলাইয়ের পয়লা তারিখে সে বাড়ি শিফট করল। বলা যায় না, ওখানে যদি কেউ কিছু আঁচ করে থাকে। ও চলে যাবার তিনিদিন পরেই পাশের ফ্ল্যাটের গোলগাল মুখের মহিলা তার বোকে জিগ্যেস করেছিল, “ভাবি, আপনার ভাইকে দেখছি না।” যাস, এই শুনেই সে বাড়ি বদলাবার জন্যে লেগে গেল হন্তে হয়ে। মিলিটারি লাগার পর থেকে এই নিয়ে চারবার বাড়ি পাল্টানো হলো। এখানে আসার পর নিচের তলার অন্দরোক একদিন বলছিল, “আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না। যে গোলমাল, বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।” শুনে বুকটা তার চিপচিপ করছিল, এবার যদি তার শালার প্রসঙ্গ তোলে? নিরাপত্তার জন্যেই সে এখানে এসেছে। কলেজ থেকে দূরে, আজীয়স্বজন থেকে দূরে। শহর থেকেও দূরেই বলা যায়। ভেবেছিল নতুন এলাকা, পুবদিকে জানলা ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বিল আর ধানক্ষেত। তা কী বিপদ! এদিকে নাকি নৌকা করে চলে আসে স্টেনগানওয়ালা ছোকরার দল। এদিককার মানুষ চোখে খালি নৌকা দেখে, নৌকা ভরা অস্ত্র। এর ওপর বৌ যদি মিন্টুর কথা তোলে তো অন্ত চুকে পড়ে তার ঘরের মধ্যখানে। মিন্টু যে কোথায় গেছে তা সে-ও জানে তার বৌ-ও জানে। কিসিনজার সাহেব বলেছে, এসব হলো পাকিস্তানের ইন্টার্নাল অ্যাফেয়ার। —মানুষ মেরে সাফ করে দেয়, বাড়িবর, গ্রাম, বাজারহাট জুলিয়ে দিচ্ছে,—কারো কোনো মাথাব্যথা নাই। এসব হলো ইন্টার্নাল অ্যাফেয়ার। —না, না, এ ধরনের ভাবনা ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়াও ঠিক নয়। নিচের ফ্ল্যাটে থাকে ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিক, তার শুঙ্গর নিশ্চয়ই সর্দার গোছের রাজাকার। সঙ্গে দুইদিন-তিনিদিন মেয়ের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, টেপ রেকর্ডার, দামি দামি সোফাসেট, ফ্যান, থাট-পালং সব চালান পাঠায়।

“দেখি তো, ফিট করে কিনা।” আসমা এগিয়ে এসে তার গায়ে রেইনকোট চড়িয়ে দিতে দিতে বলে, “মিন্টু তো আমার অনেক লম্বা। তোমার গায়ে হবে তো?” —দেখো, ফের মিন্টুর দৈর্ঘ্যের তুলনা করে তার সঙ্গে। এই ভাইকে নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করাটা কি আসমার ঠিক হচ্ছে?

“ভালোই হলো। তোমার গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। পায়েও বৃষ্টি লাগবে না।” এখানেই আসমার শেষ নয়। রেইনকোটের সঙ্গেকার টুপি এনে চড়িয়ে দেয় তার মাথায়।

“আবু ছোটোমামা হয়েছে। আবু ছোটোমামা হয়েছে।” আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-স্থূম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি চুকে পড়লো অন্তর্শন্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে চুকছে মিলিটারি। তার মানে—। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ।

তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গঞ্জির চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, “আবুকে ছোটোমামাৰ মতো দেখাচ্ছে। আবু তা হলে মুক্তিবাহিনী। তাই না?”



এ তো ভাবনার কথা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুনকপে সে ভ্যাবাচ্যাকা থায়। না—। খামাখা তয় পাচ্ছে। বৃষ্টির দিনে রেইনকোট গায়ে দেওয়াটা অপরাধ হবে কেন? মিলিটারির কি আর বিবেচনাবোধ নাই? প্রিনসিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ ঠিকই বলে, “শোনেন, মিলিটারি যাদের ধরে, মিছেমিছি ধরে না। সাবজার্ভিস অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইন্ডলভ্ড।” তা সে তো বাপু এসব থেকে শতহাত দূরে। শালা তার বর্ডার ত্রস করল, ফিরে এসে দেশের ভেতরে দমাদম মিলিটারি মারে। তাতে আর দুলাভাইয়ের দোষটা কোথায়? এই যে মিলিটারি প্রত্যেকদিন এই ঢাকা শহরের বাজার পোড়ায়, বস্তিতে আগুন লাগিয়ে টপাটপ মানুষ মারে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়,—সে কখনো এসব নিয়ে টু শব্দটি করেছে? কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে প্রিনসিপ্যালের কোর্যার্টের পাশে মিলিটারি ক্যাম্প, ফ্লাস্ট্রাস সব বঙ্গ। ছেলেরা কেউ আসে না। মাস্টারদের হাজিরা দিতে হয়, তাও বহু টিচার গা ঢাকা দিয়েছে কবে থেকে। সে তো রোজ টাইম্স যায়। স্টাফ রুমে কলিগ্রাফিস করে, কোথায় কোন ব্রিজ উড়ে গেল, কোথায় সাত মিলিটারির লাশ পড়েছে ছেলেদের শুলিতে, এই কলেজের কোন কোন ছেলে ফ্রন্টে গেছে,—কই, সে তো এসব আলাপের মধ্যে কখনো থাকে না। এসব কথা শুরু হলেই আলগোছে উঠে সে চলে যায় প্রিনসিপ্যালের কামরায়। ড. আফাজ আহমদের খ্যাসখ্যাস গলায় হিন্দুস্তান ও মিসক্রিয়েন্টের আও ও অবশ্য়ন্ত্বাবী পতন সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যত্বাবণী শোনে। ওই ঘরে আজকাল সহজে কেউ ঘেঁষে না। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে প্রিনসিপ্যাল আজকাল তোয়াজ করে।

মিন্টুর ক্ষেত্রে-যাওয়া নাকি রেখে-যাওয়া রেইনকোটে ঢোকার পর থেকে তার পা শিরাশির করছে, আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। প্রিনসিপ্যাল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই কখন!

রাস্তায় একটা রিকশা নাই। তা রিকশার পরোয়াও সে এখন করছে না। রেইনকোটের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড যেতে তার কোনো অসুবিধে হবে না। রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কী মজা, তার গায়ে লাগে না একটি ফেঁটা। টুপির বারান্দা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লে কয়েক ফেঁটা সে চেটে দেখে। ঠিক পানসে আদ নয়, টুপির তেজ কি পানিতেও লাগল নাকি? তাকে কি মিলিটারির যতো দেখাচ্ছে? পাঞ্চাব আর্টিলারি, না বালুচ রেজিমেন্ট, না কম্যান্ডো ফোর্স, নাকি প্যারা মিলিটারি, না মিলিটারি পুলিশ,—ওদের তো একেক শুষ্ঠির একেক নাম, একেক সুরত। তার রেইনকোটে তাকে কি নতুন কোনো বাহিনীর লোক বলে মনে হচ্ছে? হোক। সে বেশ হনহন করে হাঁটে। শেষ-হেমন্তের বৃষ্টিতে বেশ শীত-শীত ভাব। কিন্তু রেইনকোটের ভেতরে কী সুন্দর ওম। মিন্টু এই রেইনকোট রেখে শিয়ে কী ভালোই যে করেছে।

বাসস্ট্যান্ডে পৌছে বাসের জন্য তাকে তাকাতে হয় উভরেই। মিলিটারি সরির ল্যাজটাও দেখা যাচ্ছে না। আবার তার বাসেরও তো নামগঙ্ক নেই। বাসস্ট্যান্ডে জনপ্রাণী বলতে সে একেবারে একলা। রাস্তার পাশে পান-বিড়ি-সিঙ্গেটের ছোট দোকানটার বাঁাপ একটুখানি তুলে দোকানদারও তাকিয়ে রয়েছে উভরেই, ওদিকে কি কোনো গোলমাল হলো নাকি? দোকানদার ছেলেটা একটু বাচাল টাইপের। বাসস্ট্যান্ডে তাকে দেখলেই ছোড়াটা বিড়বিড় করে, কাল শোনেন নাই? মিরপুরের বিল দিয়া দুই নৌকা বোরাই কইরা আইছিল। একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম। বিবিসি কইছে, রংপুর-দিনাজপুরের হাফের বেশি জায়গা স্বাধীন। এর মধ্যেই ছিপছিপে বৃষ্টিতে লালচে আভা তুলে এসে পড়ল লাল রঙের স্টেট বাস।

বাসে যাবী কম। না, না, কভাট্টির সবসময় যেমন-খালি-গাড়ি বলে চাঁচায়, সেরকম নয়। সত্যি সত্যি অর্ধেকের বেশি সিট খালি। সে বাসে উঠলে তার রেইনকোটের পানি পড়তে লাগল বাসের ভিজে মাটিতে। এ জন্যে তার একটু খারাপ কথা, অস্তত টিটকারি শোনার কথা। কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলে না।

ঠোটে তার একটু হাসি বিছানো থাকে। এই নীরব কিন্তু স্পষ্ট হাসির কারণ কি এই যে, তার রেইনকোটের পানিতে বাসে সয়লাব হয়ে গেলেও কেউ টু শব্দটি করছে না? তার পোশাক কি সবাইকে ঘাবড়ে দিল নাকি?

খালি রাত্তা পেয়ে বাস চলে খুব জোরে। কিন্তু তার আসনটি সে নির্বাচন করতে পারছে না। টলতে টলতে একবার এই সিট দেখে, পছন্দ হয় না বলে ফের ওই সিটের দিকে যায়। এমন সময় পেছনের দিক থেকে দুজন যাত্রী উঠে পড়ে তাড়াহুড়া করে, “রাখো রাখো”, বলতে বলতে ঝুঁকি নিয়ে তারা নেমে পড়ে চলত্ব বাস থেকে। সে তাদের দিকে তাকায় এবং বুঝতে পারে, এরা পালাল ঠিক তাকে দেখেই। লোক দুটো নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল। একটা চোর, আরেকটা পকেটমার। কিংবা দুটোই চোর অথবা দুটোই পকেটমার। নামবাব মুহূর্তে দুটোর মধ্যে সর্দার টাইপেরটা তার দিকে পেছন ফিরে তাকাল। সেই চোখ ভরা ভয়, কেবল ভয়।

জুন্সই সিট বেছে নিয়ে সে ধপাস করে বসতেই ফোয়ে ফস করে আওয়াজ হয় এবং তাইতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সামনের সিটে বসা তিনজন যাত্রী। ছঁ! এদেরও সে ঠিক চোর অথবা পকেটমার বলে ঠিক শনাক্ত করে ফেলে। ডাকাতও হতে পারে। কিংবা মিলিটারি কোনো বক্তিতে আগুন লাগিয়ে চলে এলে এরা হোটে সেখানে লুটপাট করতে। অথবা মিলিটারি কোথাও লুটপাট করলে এরা গিয়ে উচ্ছিষ্ট কুড়ায়। তিনটেই পরের স্টপেজে নামার জন্যে অনেক আগেই ধরফর করে উঠে দাঁড়ায় এবং বাস থামার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে পড়ে বাটপট পায়। তিনটে ক্রিমিনালের একটাও তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। তার মানে তাকে বেশ ভয় পেয়েছে বলেই তার সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে এদের এত কসরত।

যাক, মিন্টুর রেইনকোটে তার কাজ হচ্ছে। চোর ছাঁচোর পকেটমার সব কেটে পড়ছে। ভালো মানুষেরা ধাক। সে বেশ সৎসঙ্গে চলে যাবে একেবারে কলেজ পর্যন্ত।

আসাদ গেট বাসস্টপেজে বিরবিরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন মানুষ। ছাতা হাতে কেউ কেউ নিজ-নিজ ছাতার নিচে এবং ছাতা ছাতা অনেকেই অন্যের ছাতার নিচে মাথার অন্তত খানিকটা পেতে দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করতে শরীরগুলোকে আঁকাবাঁকা করছিল। বাস থামালে সে দেখল, একে একে নয়জন প্যাসেঞ্জার বাসে উঠল। সে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাইকে দেখে। তো তার দিকে তাকিয়ে নয়জনের তিনজন ‘আরে রাখো রাখো’ এবং একজন ‘রোখো-রোখো’ বলতে বলতে নেমে পড়ল ধড়ফড় করে। শেষের জন বোধ হয় এমনি অভিন্নারি চোর, ছিঁকে চোর হওয়ার সভাবনাই বেশি। আর প্রথম তিনটে কোথাও সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখলে মিলিটারিকে খবর দেয় কিংবা মিলিটারির কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিয়ে মহল্লায়-মহল্লায় ঘোরে আর সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে পৌছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। এগুলো হলো রাজাকার। ফের মতুন করে অপরাধীমুক্ত বাসে যেতে এখন ভালো লাগছে। জানালার বাইরে বৃষ্টির আঁশ উড়ছে; ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছপালা, লোকজন, দোকানপাট ও বাড়িয়রের ওপর ট্রাঙ্গারেন্ট আবরণ দেখে তার একটা ভালো লাগে। সমস্ত ভালো-লাগাটা চিঢ় খায়, বাস হঠাতে করে ত্রুক করলো। তখন তাকে তাকাতে হয় বাঁয়ে, চোখ পড়ে নির্মায়মাণ মসজিদের ছাদের দিকে। দরজা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগে তার মুখে এবং নাকের ভেতর দিয়ে সেই হাওয়া চুকে পড়ে বুকে, সেখানে ধাক্কা লাগে; ক্লাক-ডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির শুলিতে এই মসজিদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল মুয়াজ্জিন সাহেব। ঠাণ্ডা হওয়ার ধাক্কা রেইনকোটের তাপে এতটাই গরম হয়ে উঠে যে, মনে হয় ভিতরে বুবি আগুন ধরে গেল। মসজিদের উল্টোদিকের বাড়িতে তিনতলায় ধাকত তখন তারা। রাতভর ট্যাকের হক্কার আর মেশিনগান আর স্টেল্সগানের ঘেউঘেউ আর মানুষের কাতরানিতে তাদের কারও ঘুম হয়লি সে রাতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ছেলেমেয়ের মায়ের সঙ্গে সে শুয়েছিল খাটের নিচে। ভোরবেলা মিলিটারি মানুষ মারায় একটু বিরতি দিলে ছেলেমেয়ের ঘুমিয়ে পড়ে এবং বক্ষ জানালার পর্দা একটু তুলে সে রাত্তা দেখতে থাকে। রাত্তার ওপরে মসজিদের ছাদে মুয়াজ্জিন সাহেব দাঁড়িয়েছিল আজান দিতে। সাধারণত জুমার নামাজটা সে নিয়মিত পড়ে। তবে সেই ভোরে তার আজান শুনতে ইচ্ছা করছিল খুব। মুয়াজ্জিনের আজান দেওয়াটা সম্পূর্ণ দেখবে বলে সে জানালার



ধার থেকে সরে না। সারা এলাকায় ইলেক্ট্রিসিটি মষ্টি, মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো। মুঝিজ্ঞ সাহেব গমগমে গলায় যতটা পারে জোর দিয়ে বলে উঠল ‘আল্লাহ আকবার’। দিতীয়বার আল্লাহর মহসুস ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি, এর আগেই সম্পূর্ণ অন্যরকম ধ্বনি করে লোকটা পড়ে যায় রাস্তার ওপর। সেদিন সকালে বৃষ্টি ছিল না। আজ বৃষ্টির সকালে মিলিটারি কি ওই দৃশ্যের পুনর্বিন্দনের পাঁয়তারা করছে? এখন তো কোনো নামাজের ওয়াক্ফ নেই, তবে আজান দেওয়াবে কি করে? এরা বোধ হয় যে কোনো সময়কেই নামাজের ওয়াক্ফ ঘোষণা করে নতুন হৃকুম জারি করেছে।

মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করিয়ে রেখেছে এই মানুষের সারির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জায়গাগুলো তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ঠিলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে। তাদের বাসটিতে এসে উঠল লম্বা ও খুব ফর্সা এক মিলিটারি।

এখন বাসের ভিতর কোনো আওয়াজ নাই। যাত্রীদের বুকের টিপটিপ শব্দ এই নীরবতার সুযোগে বাড়ে এবং এটাই তার মাথায় বাজে দ্রাম-দ্রাম করে। বারান্দাওয়ালা টুপির নিচে শব্দের ঘষায় ঘষায় আগুন জ্বলে এবং তার হল্কা বেরোয় তার চোখ দিয়ে। তবে একটু নড়ে বসলে মাথার ও বুকের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এসবকে পরোয়া না করে সে সরাসরি তাকাল মিলিটারির মুখের দিকে। মিলিটারির চোখ ছুঁচালো হয়ে আসে এবং ছুঁচালো চোখের মণি কাঁটার মতো বিধে যায় তার মুখে। সেও তার চোখের ভেঁতা কিন্তু গরম চাউনিটাকে ছির করে আলগোছে বিছিয়ে দেয় মিলিটারির খাড়া নাকে, ছুঁচালো চোখে, গৌকের নিচে ও নাক, গৌক ও চোখের আশপাশের ও নিচের লালচে চামড়ায়। এতে কাজ হলো। মিলিটারির চোখা চোখ সরে যায় তার মুখ থেকে, নেমে পড়ে তার রেইনকোটের ওপর। মনে হয় রেইনকোটের পানির ফোটাগুলো লোকটা গুণে গুণে দেখছে। ভেতরের তাপে এইসব পানির ফোটা দেখে মিলিটারির এত থ মেরে যাবার কী হলো? লোকটা কি এগুলোতে রক্তের চিহ্ন দেখে? রেইনকোটের বৃষ্টির ফোটা গোপনভিত্তি সেরে মিলিটারি হঠাতে বলে, ‘আগে বাড়ো।’ বাস হঠাতে স্টার্ট দিয়ে কয়েক পা লাফিয়ে আগে বাড়ে এবং যাত্রীদের ঘষ্টির নিঃশ্বাসের ধাক্কায় অতিরিক্ত বেগে ছুটে পার হয়ে যায় ঢাকা কলেজের গেট। নিউ মার্কেটের সামনে এসে পড়লে সে উঠে দাঁড়ায় এবং হৃকুম করে, ‘রাখেন নামবো’। বাস একটু স্লো হলে তার রেইনকোটের জমালো পানি গড়িয়ে পড়তে দিয়ে অপরাধীমুক্ত বাস থেকে নামতে নামতে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সে টোট বাঁকায়, এতে তার সামনের সারির দাঁতও বেরিয়ে পড়ে। যারা দেখেছে তারা তার সেই ভঙ্গিটিকে ঠিক হাসি বলে শনাক্ত করতে পেরেছিল বলে তার ধারণা হয়।

প্রিনসিপালের কামরায় প্রিনসিপালের সিংহাসন মার্কা ঢেয়ারে বসে রয়েছে জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পাস্ত। তার ভারিক্ষি মুখ থেকে অনুমান করা যায়, পাস্তাটি কর্নেল কিংবা মেজর জেনারেল, অথবা মেজর বা ব্রিগেডিয়ার। তাকে দেখে প্রিনসিপালের কালো মুখ বেগুনি হয়, ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি, ই পি এস ই এস হওয়ার চেষ্টা করতে করতে স্যার বলে, ‘হি ইজ প্রফেসর স্ন্যাদা।’

কিন্তু ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি নিজের ভুল সংশোধন না করে পারে না, ‘সরি হি ইজ নট এ প্রফেসর। এ লেকচারার ইন কেমিস্ট্রি।

“শাট আপ।”

এবার প্রিনসিপাল থামে।

তাকে এবং আবদুস সাতার মৃধাকে নিয়ে মিলিটারি জিপে তোলার আগে জাঁদরেল কর্নেল না ব্রিগেডিয়ার প্রিনসিপালকে কড়া গলায় বলে, সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড়ে অপরাধ। এবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তবে কড়া ওয়াচে রাখা হবে। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদের দোহাই পেড়ে প্রিনসিপালের সুবিধা হয় না। নুরুল উদ্ধিঙ্গ হয়, সাজিদ সাহেবে যদি পালিয়ে না থাকে তো তার কপালে যে কী আছে তা জানে এক আল্লা আর জানে এই মিলিটারি।

তাদের দুজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, জিপ চলছিল এঁকেবেঁকে। মন্ত্র উঁচু একটা ঘরে তাদের এনে ফেলা হলো। চোখ খুলে দিলে সে আবদুস সান্তার মৃথাকে দেখতে পায় না। জায়গাটাও একেবারে অচেনা। একটা ডেক-চেয়ারে সে যে কতক্ষণ বসে থাকল তার কোনো হিসাব নেই। তার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল এক মিলিটারি। তাকে ইংরেজিতে নানান প্রশ্ন করে, সে জবাব দেয়। লোকটা চলে গেলে তাকে অন্য ঘরে নিয়ে ফের অন্য একটা লোক এসে তাকে প্রশ্ন করে এবং সে জবাব দেয়। প্রশ্নগুলো প্রায় একইরকম এবং তার উত্তরেরও হেরফের হয় না। যেমন, কিছুদিন আগে তাদের কলেজে কয়েকটা লোহার আলমারি কেনা হয়েছে। ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছিল কারা?

সে জবাব দেয়, ঠিক। অফিসের জন্যে তিনটে, বোটানি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্যে দুটো করে এবং ইংরেজির জন্যে একটা, সর্বমোট দশটি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে।

এত কথা বলার দরকার নাই তার। ওই আলমারিগুলো নিয়ে আসা হয় কয়েকটা ঠেলাগাঢ়ি করে। ঠেলাগাঢ়িওয়ালাদের তো সে ভালো করেই চেনে।

নুরুল হৃদা জবাব দেয়, তাদের সে চিনবে কোথেকে? তারা হলো কুলি, সে একজন লেকচারার।

তাহলে সে তাদের সঙ্গে এত কথা বলছিল কেন?

প্রিনসিপালের আদেশে সে আলমারিগুলোর স্টিলের পাতের ঘনত্ব, দেরাজের সংখ্যা ও আকার, তালাচাবির মান, রঙের মান প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখছিল, তার দায়িত্ব ছিল-

মিলিটারি শান্ত গলায় তথ্য সরবরাহ করার ভঙ্গিতে বলে, মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে চুকেছিল কুলির বেশে। এটা তার চেয়ে আর ভালো জানে কে? তারা আজ ধরা পড়ে নুরুল হৃদার নাম বলেছে। তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়মিত, সে গ্যাঙের একজন সক্রিয় সদস্য।

“আমার নাম? সত্যি বলেছে? আমার নাম বলেছে?” নুরুল হৃদার হঠাতে চিংকারে মিলিটারি বিরক্ত হয় না, বরং উৎসাহ পায়। উৎসাহিত মিলিটারি ফের বলে, কুলিরা ছিল ছফ্ফবেশী মিসক্রিয়েন্ট। তারা কলেজের টিচারদের মধ্যে নুরুল হৃদার নামই বলেছে।

নুরুল হৃদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা কি তাকে চেনে? কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি সাজিয়ে রাখার সময় এক কুলি দাঁড়িয়েছিল তার গা ঘেঁষে! তখন তো ঘোরতর বর্ষাকাল, ঢাকায় এবার বৃষ্টি ও হয়েছে খুব। রাতদিন এই বৃষ্টি নিয়ে সে কি যেন বলেছিল, তাতে কুলিটা বিড়বিড় করে ওঠে, ‘বর্ষাকালেই তো জুঁ’। কথাটা দুবার বলেছিল। এর মানে কী? স্টাফকর্মে কে একজন একদিন না দুদিন ফিসক্রিস করছিল, বাংলার বর্ষা তো শালারা জানে না। রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার, আমাদের জেনারেল মনসুন। –ওই ছফ্ফবেশী ছেলেটা কি এই কথাই বুবিয়েছিল? তার ওপর তাদের এত আস্তা? –উৎসাহে নুরুল হৃদা এদিক-ওদিক তাকায়। তার মৌনতা মিলিটারিকে আরেকটু নিশ্চিত করে।

কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ পর সে বুঝতে পারে না, মিলিটারি তাকে ফের একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে প্রবল বেশে দুটো ঘূর্ষি লাগায় তার মুখে। প্রথম ঘূর্ষিতে সে কাত হয়, দ্বিতীয় ঘূর্ষিতে পড়ে যায় মেঝেতে। মেঝে থেকে তুলে তাকে মিলিটারি ফের জিজ্ঞেস করে, ওদের আস্তানা কোথায় সে খবর তার তো ভালোভাবেই জানা আছে। সে জবাব দেয়, ‘হ্যাঁ’!

ওই ঠিকানাটা বলে দিলেই তো তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে পাউরচি ও দুধ খাওয়ানো হয়। তাকে ভাবতে সময় দিয়ে মিলিটারি চলে যায়। কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ সে জানে না, মিলিটারি ফিরে এসে ফের বলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তো তার জানা আছে। সে ফের জবাব দেয়, হ্যাঁ। কিন্তু পরের



প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মিলিটারি তাকে নিয়ে যায় অন্য একটি ঘরে। তার বেঁটেখাটো শরীরটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ছাদে-লাগানো একটা আঁটার সঙ্গে। তার পাছায় চাবুকের বাড়ি পড়ে সপাং সপাং করে। তবে বাড়িগুলো বিরতিহীন পড়তে থাকার কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলো নুরুল হৃদার কাছে মনে হয় স্রেফ উৎপাত বলে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোটটা এরা খুলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে। কিন্তু তার ওম তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে। বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছলবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়। তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উভেজনায় নুরুল হৃদার ঝুলস্ত শরীর এতটাই কাপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।

শব্দার্থ ও টীকা

জেনারেল স্টেটমেন্ট

— সাধারণ বিবৃতি।

স্পেসিফিক ক্লাসিফিকেশন

— সুনির্দিষ্ট প্রেরণকরণ।

‘তলব কিয়া। আতি যানা হোগা’

— ‘তলব করেছেন। এখনই যেতে হবে।’

‘মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকট্রি

টেরানসফার্মার তোড় দিয়া।

অওর ওয়াপস যানে কা টাইম

পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে

গেরেনড ফেকা। গেট তোড়

গিয়া।’

— ‘মিসক্রিয়েন্টরা ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়েছে। আবার ফিরে যাওয়ার সময় প্রিনসিপাল সাহেবের বাড়িতে প্রেনেড ছুড়েছে। গেট ভেঙে গেছে।’

‘ক্যায়সে?’

— ‘কীভাবে?’

‘উও আপ হি কহ সকতা’

— ‘সোচি আপনিই বলতে পারেন।’

মিসক্রিয়ান্ট

— দুষ্কৃতকারী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ও তার সেনাবাহিনী এই শব্দটি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করেছে।

‘আব্দুস সান্তার মিরখাকা ঘর

যানে হোগা। আপ আতি আইয়ে।

এক কর্ণেল সাহাব পঁওছ গিয়া।

সব পরফসরকো এনেলা দিয়া।

ফওরন আইয়ে।’

— ‘আব্দুস সান্তার মৃধার বাসায় যেতে হবে। আপনি এখনই আসুন। এক কর্ণেল সাহেব এর মধ্যেই চলে এসেছেন। সব প্রফেসরকে ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি আসুন।’



ওয়েলডিং ওয়ার্কশপ

সাবভার্সিভ অ্যাকচিভিটিজ

ক্রাক-ডাউনের রাত

রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার

আমাদের জেনারেল মনসুন

- বালাই কারখানা।
- রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাকে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ১৯৭১ সালে এভাবে অভিহিত করত।
- ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা পরিচালনা করে সেই রাতের কথা বলা হয়েছে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়ে হিটলারের বাহিনী রুশ বাহিনীর হাতে পর্যন্ত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রবল বর্ষায় তেমনি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। এখানে সেই বিষয়টিরই তুলনা করা হয়েছে।

পার্ট-পরিচিতি

‘রেইনকোট’ গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পছত্র ‘জাল স্পঃ স্পন্দের জাল’ (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে আখতারজামান ইলিয়াস রচনাসমষ্টি ১ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে গল্পটি রচিত। মুক্তিযুদ্ধের তখন শেষ পর্যায়। ঢাকায় তখন মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়েছে। তারই একটি ঘটনা এ গল্পের বিষয়; যেখানে ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলা আক্রমণের ফলে বৈদ্যুতিক ট্রাঙ্কফর্মার ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কলেজের শিক্ষকদের তলব করে এবং তাদের মধ্য থেকে নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে ফ্রেঙ্গির করে নির্যাতন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গান পাওয়ার চেষ্টা করে। নুরুল হুদার জবানিতে গল্পের অধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। বিবৃত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কহস্ত জীবনের চিত্র। গেরিলা আক্রমণের ঘটনা ঘটে যে রাতে, তার পরদিন সকালে ছিল বৃষ্টি। তলব পেয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে নুরুল হুদাকে কলেজে যেতে যে রেইনকোটটি পরতে হয় সেটি ছিল তার শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা মিটুর। গল্প এই রেইনকোটের প্রতীকী তাঁপর্য অসাধারণ। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে সাধারণ ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে সংঘারিত হয় যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম— তারই ব্যক্তিময় প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে।

বহুনির্বাচনি এন্ড

১. কার জবানিতে “রেইনকোট” গল্পের অধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হয়েছে?

ক. আবদুস সাত্তার মৃধা

খ. ড. আফাজ আহমদ

গ. আখতারজামান ইলিয়াস

ঘ. নুরুল হুদা

২. নুরুল হুদাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তলব করার কারণ—

ক. কমান্ডারের নির্দেশে

খ. প্রিসিপালের অভিযোগে

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী ভূবে

ঘ. তাকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে



ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼େ ୩ ଓ ୪ ସଂଖ୍ୟକ ପତ୍ରର ଉତ୍ସର ଦାତା ।

ମୁକ୍ତିକୌଜ ! କଥଟା ଏତ ଭାରୀ ଯେ ଏହି ରକମ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସୈନ୍ୟ ଦିଯେ ସେଇ ଅବରକ୍ଷଣ ଢାକା ଶହରେ ବସେ ମୁକ୍ତିକୌଜ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେଓ କେମନ ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ମନେ ହୁଁ । ଆବାର ଓହ ଅବିଶ୍ୱାସେର ଭେତର ଥେବେ ଏକଟା ଆଶା, ଏକଟା ଭରସାର ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯନେର କୋଣେ ଜେଗେ ଉଠିବେ ଥାକେ ।

୩. ଅନୁଚ୍ଛେଦେ “ରେଇନକୋଟ” ଗଙ୍ଗର କୋନ ଭାବେର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟେଛେ?

କ. ପାକ ହାନାଦାର ବାହିନୀର ନୃତ୍ୟଶତା

ଖ. ମୁକ୍ତିଯୋଜାଦେର ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି-ସାହସ

ଗ. ମୁକ୍ତିଯୋଜାଦେର ଅଭିଭାବିକ୍ଷାତା

ଘ. ମୁକ୍ତିଯୋଜାଦେର ଅନ୍ୟ ମାନୁଷେର ଉତ୍ସକର୍ତ୍ତା

୪. ଉତ୍ସ ଭାବଟି ଯେ ବାକେ ପ୍ରକାଶ ପେରେଛେ ତା ହଲୋ—

କ. ମିସକ୍ରିଯାନ ଲୋଗ ଇଲେକ୍ଟରି ଟେରାନସକାରୀର ତୋଡ଼ ଦିଯା

ଖ. ଏକଟା ଜିପ ଡ୍ରାଇଙ୍ସା ଦିଛେ, କମପକ୍ଷେ ପୌଚ୍ଟା ଖାନସେନା ଖତମ

ଗ. ନୁରମ୍ବଳ ହଦାର ଝୁଲୁଟ ଶରୀର ଏତଟାଇ କାଂପେ ଯେ ଚାବୁକେର ବାଡ଼ିର ଦିକେ ଆର ମନୋଯୋଗ ଦେଉଯା ହେଁ ଓଠେ ନା

ଘ. ବାରେର ଏହି ଭାଇଟାର ଜନ୍ୟାଇ ତାକେ ଏକ୍ଷ୍ଟା ତଟ୍ଟୁ ଧାକତେ ହୁଁ

ସ୍ଵଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା



କ. “ରେଇନକୋଟ” ଗଙ୍ଗର ମିଲିଟାରି କ୍ୟାମ୍ପ କୋଥାଯା ହାପନ କରା ହୁଁ ?

ଖ. ଦେଶେ ଏକଟା କଲେଜ ଓ ଶହିଦ ମିନାର ଅକ୍ଷତ ନେଇ କେନ ?

ଗ. ଚିତ୍ରେ “ରେଇନକୋଟ” ଗଙ୍ଗର ଯେ ଦିକଟି ଫୁଟେ ଉଠେଛେ ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

ଘ. ଚିତ୍ରିତ ଦିକଟି “ରେଇନକୋଟ” ଗଙ୍ଗର ଖାତାଶମାତ୍ର — ବିଶ୍ଵେଷଣ କର ।

মহাজাগতিক কিউরেটর

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর পিতার কর্মসূল সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ, জনৈ আয়েশা আখতার খাতুন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নেত্রকোণা জেলায়। তাঁর মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় বগুড়ায়। ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যাক্রমা পাসের পর তিনি তাঙ্কির পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোভর ডিপ্লি লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে পিএইচডি ডিপ্লি লাভ করেন। দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল বাংলা ভাষায় রচিত সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির একচ্ছত্র সম্পূর্ণ। ‘কপোট্রনিক সুখ দুঃখ’ রচনার মাধ্যমে এ-ধারার সাহিত্যে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। তিনি একই সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও স্পন্দচারী রোমান্টিক। তাঁর সাহিত্যেও বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠা ও মানবীয় কল্পনার সম্মিলন ঘটেছে। মাতৃভূমি, মানুষ ও ধরিবার প্রতি নেতৃত্ব দায়বদ্ধতা তাঁর সাহিত্যিক মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের বিজ্ঞানমূর্তী তরুণ-প্রজন্মের তিনি আদর্শ। কিশোর উপন্যাস এবং ছেটগল্প রচনাতেও তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিশোর উপন্যাস ‘দীপু নামার টু’, ‘আমার বক্স রাশেন্দ’ এবং ‘আমি তপ্প’ তাঁর অন্যতম প্রের্ণ রচনা। ‘ঘৃহাকাশে মহাত্রাস’, ‘টুকুনজিল’, ‘নিঃসঙ্গ গ্রহচারী’, ‘একজন অতিমানবী’, ‘ফোবিয়ানের যাত্রী’সহ অনেক পার্শ্বক্ষেপ্ত সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির তিনি শ্রষ্টা। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞান লেখক হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো। প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।’

‘হ্যাঁ।’

‘বেশ পরিষ্ঠিত প্রাণ। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রজাতি। একেবারে স্কুল এককোষী থেকে শুরু করে লক্ষ-কোটি কোষের প্রাণী।’

বিতীয় প্রাণীটি আরও একটু খুঁটিয়ে দেখে বলল, ‘না। আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়। খুব সহজ এবং সাধারণ।’ ‘কেন? সাধারণ কেন বলছ? তাকিয়ে দেখ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণ। শুরু হয়েছে ভাইরাস থেকে, প্রকৃতপক্ষে ভাইরাসকে আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা যায়। অন্য কোনো প্রাণীর সংস্পর্শে এলেই তার মাঝে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। তারপর রয়েছে এককোষী প্রাণ, পরজীবী ব্যাকটেরিয়া। তারপর আছে গাছপালা, এক জায়গায় ছির। সালোকসংশ্লেষণ দিয়ে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে। পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার। গাছপালা ছাড়াও আছে কীটপতঙ্গ। তাকিয়ে দেখ কত রকম কীটপতঙ্গ। পানিতেও নানা ধরনের প্রাণী আছে, তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন। ডাঙ্গাতেও নানা ধরনের প্রাণী, কিছু কিছু শীতল রক্তের কিছু কিছু উষ্ণ রক্তের। উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটির ভিতরে আবার অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।’

‘কিন্তু সব আসলে বাহ্যিক। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাঝে আসলে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।’

প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘আমি বুবাতে পারছি না তুমি কেন এই পার্থক্যকে বাহ্যিক বলছ? ’

‘তুমি আবেকটু খুঁটিয়ে দেখ। এই ভিন্ন প্রজাতি কী দিয়ে তৈরি হয়েছে দেখ।’



প্রথম প্রাণীটি একটু খুঁটিয়ে দেখে বিশ্বয়সূচক শব্দ করে বলল, ‘তুমি ঠিকই বলেছ। এই প্রাণীগুলো সব একইভাবে তৈরি হয়েছে। সব প্রাণীর জন্য মূল গঠনটি হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে, সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম, সবগুলো একই বেস পেয়ার দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জটিল প্রাণীটির একই রকম গঠন। প্রাণীটির বিকাশের নীলনকশা এই ডিএনএ দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে। কোনো প্রাণীর নীলনকশা সহজ, কোনো প্রাণীর নীলনকশা জটিল—এটুকুই হচ্ছে পার্থক্য।’

‘হ্যাঁ।’ দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, ‘আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব প্রহ-নক্ষত্র ঘুরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীগুলোকে সৎপ্রাপ্ত করে নিয়ে যাচ্ছি—কাজটি সহজ নয়। এই গ্রহ থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীটি খুঁজে বের করতে হবে—যেহেতু সবগুলো প্রাণীর গঠন একই রকম, কাজটি আরও কঠিন হয়ে গেল।’

‘সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।’

‘হ্যাঁ।

‘এই ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া বেশি ছেট, এর গঠন এত সহজ এর মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই।’

‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আবার এই হাতি বা নীল তিমি নিয়েও কাজ নেই, এদের আকার বেশি বড়। সংরক্ষণ করা কঠিন হবে।’

‘গাছগালা নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। এরা এক জায়গায় স্থির থাকে। যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে দ্বিতীয় প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।’

‘এই প্রাণীটি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? এটাকে বলে সাপ।’

‘সাপটি বেশ কৌতুহলোদীপক, কিন্তু এটা সরীসৃপ। সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়, ঠাণ্ডার মাঝে এরা কেমন যেন স্থবর হয়ে পড়ে। প্রাণিজগতে সরীসৃপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী।’

‘ঠিকই বলেছ। তা হলে সরীসৃপ নিয়ে কাজ নেই।’

প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘আমার এই প্রাণীটি খুব পছন্দ হয়েছে। এটাকে বলে পাখি। কী চমৎকার! আকাশে উড়তে পারে।’

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, ‘হ্যাঁ, আমারও এটি পছন্দ হয়েছে। আমরা এই প্রাণীটিকে নিতে পারি। তবে—’

‘তবে কী?’

‘এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই। আমাদের কি এমন কোনো প্রাণী নেওয়া উচিত নয় যারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, যারা কোনো ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছে?’

‘ঠিকই বলেছ। তা হলে আমাদের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একবার দেখা উচিত।’

‘এই দেখ একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী। কী সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরাকাটা! এর নাম বাঘ।’

‘হ্যাঁ প্রাণীটি চমৎকার। কিন্তু এটি একা একা থাকতে পছন্দ করে। একটা সামাজিক প্রাণী নিতে পারি না?’

‘কুকুরকে নিলে কেমন হয়? এরা একসাথে থাকে। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।’

প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘এই প্রাণীটিকে মানুষ পোষ মানিয়ে রেখেছে, প্রাণীটা নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে।’

‘ঠিকই বলেছ, গৃহপালিত প্রাণীগুলোর মাঝে স্বকীয়তা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। একটা খাঁটি প্রাণী নেওয়া প্রয়োজন। হরিণ নিলে কেমন হয়?’

‘তৃণভোজী প্রাণী। তার অর্থ জান?’

‘কী?’

‘এদের দীর্ঘ সময় খেতে হয়। বেশির ভাগ সময় এটা ঘাস লতাপাতা খেয়ে কাটায়।’

‘ঠিকই বলেছ। আমরা দেখছি কোনো প্রাণীই পছন্দ করতে পারছি না।’

‘আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে।’

‘কী?’

‘এই প্রহ্লিতে যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রাণীটি নিলে কেমন হয়?’

‘কোন প্রাণীর কথা বলছ?’

‘মানুষ।’

‘মানুষ?’

‘হ্যাঁ। দেখ এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে। সমাজবন্ধ হয়ে থাকে। এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।’

‘ঠিকই বলেছ।’

‘এই দেখ এরা শহর-বন্দর-নগর তৈরি করেছে। কত বিশাল বিশাল নগর তৈরি করেছে।’

‘শুধু তাই না, দেখ এরা চাষাবাদ করছে। পশ্চালন করছে।’

‘যখন কোনো সমস্যা হয় তখন এরা দলবন্ধভাবে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করে।’

‘নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এদের কত আত্ম্যাগ রয়েছে দেখেছ?’

‘কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে—’

‘কী?’

‘তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর মানুষ এই প্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী?’

‘তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?’

‘এই পৃথিবীর দিকে তাকাও। দেখেছ বাতাসে কত দূষিত পদার্থ? কত তেজক্রিয় পদার্থ? বাতাসের ওজ্জোন স্তর কেমন করে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? গাছ কেটে কত বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করেছে দেখেছ?’

‘এর সবই কি মানুষ করেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বৃক্ষিমান প্রাণী।’

‘এরা একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে। যুদ্ধ করে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে ফেলেছে। প্রকৃতিকে এরা দূষিত করে ফেলেছে।’

‘ঠিকই বলেছ।’

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে মানুষকে লক্ষ করল, তারপর প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘না মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না। এরা মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এর মাঝেই শুধু যে নিজেদের বিপন্ন করেছে তাই নয়, পুরো প্রাণিতাত্ত্বিক ধ্বংস করে ফেলেছে।’

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদের কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের খুব চিন্তা-ভাবনা করে প্রাণীগুলো বেছে নিতে হবে। এই সুন্দর প্রাণ থেকে এ রকম স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী আমরা নিতে পারি না। কিছুতেই নিতে পারি না।’



প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং হঠাতে করে প্রথম প্রাণীটি আনন্দের ধ্বনি দিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় প্রাণীটি অবাক হয়ে বলল, ‘কী হয়েছে?’

‘আমি একটি প্রাণী খুঁজে পেয়েছি। এরাও সামাজিক প্রাণী। এরাও দল বেঁধে থাকে। এদের মাঝে শ্রমিক আছে সৈনিক আছে। বৎশ বিস্তারের জন্য চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে। দেখ নিজেদের থাকার জন্য কী চমৎকার বিশাল বাসস্থান তৈরি করেছে।’

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, ‘ঠিকই বলেছ। দেখ এরাও মানুষের মতো চাষাবাদ করতে পারে। মানুষ যেরকম নিজেদের সুবিধার জন্য পশ্চালন করতে পারে এদেরও ঠিক সেরকম ব্যবস্থা রয়েছে।’

‘কী সুশ্রূতল প্রাণী দেখেছ?’

‘শুধু সুশ্রূতল নয়, এরা অসম্ভব পরিশ্রমী, গায়ে প্রচণ্ড জ্বর, নিজের শরীর থেকে দশগুণ বেশি জিনিস অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।’

‘হ্যাঁ। কোনো ঝগড়াবিবাদ নেই। কে কোন কাজ করবে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। কোনো রকম অভিযোগ নেই, যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।’

‘অত্যন্ত সুবিবেচক। আগে থেকে খাবার জমিয়ে রাখছে। আর বিপদে কখনো দিশেহারা হয় না। অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে।’

‘মানুষের বয়স মাত্র দুই মিলিয়ন বছর, সেই তুলনায় এরা সেই ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে।’

‘প্রকৃতির এতটুকু ক্ষতি করেনি। আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধৰ্ম করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে। পৃথিবী এক সময় এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে।’

‘ঠিকই বলেছ। তা হলে আমরা এই প্রাণীটাই নিয়ে যাই?’

‘হ্যাঁ। পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা মেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে।’

দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রাহটি থেকে কয়েকটি পিংপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে রওনা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘূরে ঘূরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|------------------|---|
| মহাজাগতিক | — মহাজগৎ সম্বন্ধীয়। |
| কিউরেটর | — জাদুঘর রক্ষক। জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক তথা পরিচালক। |
| তেজক্রিয় পদার্থ | — যা থেকে এমন রশ্মির বিকিরণ ঘটে যা অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। |
| ওজোন স্তর | — বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোন গ্যাসে পূর্ণ স্তর বিশেষ, যা আমাদের সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। |
| নিউক্লিয়ার বোমা | — পারমাণবিক বোমা। |
| ডাইনোসর | — বর্তমানে লুণ্ঠ প্রাগৈতিহাসিক কালের বৃহদাকার প্রাণী। |
| গ্যালাক্সি | — ছায়াপথ। |

পাঠ-পরিচিতি

‘জলজ’ এছের অঙ্গর্ত ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পটি মুহম্মদ জাফর ইকবালের ‘সায়েন্স ফিকশন সমগ্র’ তত্ত্বীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে। ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি হলো এতে দেশকালের প্রভাবপূর্ণ মানবকল্যাণকর্মী লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। অন্ত মহাজগৎ থেকে আগত মহাজাগতিক কাউলিলের দুজন কিউরেটরের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর নমুনা সংগ্রহে সৌরজগতের তত্ত্বীয় গ্রহ পৃথিবীতে আগমনের তথ্য দিয়ে গল্পটির সূচনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে শিয়ে দুজন কিউরেটরের সংলাপ বিনিয়য়ের মধ্য দিয়ে গল্পটি নাট্যগুণ সাত করেছে। প্রজাতির যাচাই-বাছাই কালে পৃথিবীর নানা প্রাণীর শুণাশুণ কিউরেটরদের সংলাপে উঠে আসে। ‘মানুষ’ নামক প্রজাতি বিবেচনার ক্ষেত্রে কিউরেটর দুইজনের বস্ত্রনিষ্ঠ আলোচনা মূলত কল্পকাহিনির লেখকেরও মনের কথা। দুইজন কিউরেটর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বুবাতে পারে মনুষের কারশেই-হ্রাস ঘটে যাচে ওজোন স্তরের। মানুষই নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করে চলেছে প্রকৃতির ভারসাম্য। পরম্পরার যুদ্ধে লিঙ্গ হয়ে মানুষই নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে একে অন্যের ওপর। এই পরিস্থিতিতেও তারা পৃথিবীর বুদ্ধিমান বলে কথিত। ‘মানুষ’ প্রজাতির নির্বৃক্ষিতায় তারা শক্তি হয়। অবশেষে তারা পরিশ্রমী সুশৃঙ্খল সামাজিক প্রাণী পিংপড়াকেই শনাক্ত করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হিসেবে। ডাইনোসরের যুগ থেকে এখনো বেঁচে থাকা সুবিবেচক ও পরোপকারী পিংপড়াকে তারা পৃথিবীর শুরুত্তপূর্ণ প্রাণী বিবেচনায় সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। কল্পকাহিনির রসের সঙ্গে সমাজ, পরিবেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন লেখকের তীব্র প্রেম ও পরিহাসের মিশ্রণ গল্পটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “মহাজাগতিক কিউরেটর” গল্পে মানুষের বয়স কত বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে?

ক. এক মিলিয়ন

খ. দুই মিলিয়ন

গ. তিন মিলিয়ন

ঘ. চার মিলিয়ন

২. সৌরজগতের তত্ত্বীয় গ্রহের প্রাণ সহজ এবং সাধারণ কেন?

ক. বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই

খ. সকল প্রজাতি দেখতে একই রকম

গ. সকল প্রজাতির গঠন একই

ঘ. প্রজাতিগুলোর শুণাশুণ ভিন্ন ভিন্ন

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও

কালোবেশাথীর প্রচণ্ড বাপটায় লঙ্ঘ-ভঙ্গ মালধূম ধ্রাম। ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, ভেঙে পড়ে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী প্রাণবাসী ভেঙে না পড়ে সবাই মিলে পরম্পরারের ঘর-বাড়ি মেরামত করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিপর্যয় কাটিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে এলোন।

৩. অনুচ্ছেদে “মহাজাগতিক কিউরেটর” গল্পের যে দিকগুলোর প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো-

i. একতা

ii. শৃঙ্খলা

iii. সহমর্মিতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii



৪. উক্ত দিকের বিপরীত প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে নিচের কোন বাক্যে?

- ক. এরা একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে
- খ. এদের মাঝে শ্রমিক আছে, সৈনিক আছে
- গ. যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে
- ঘ. অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে

সৃজনশীল প্রশ্ন

একদিন সকালে কাজলের বাড়ির পাশে একটি বানর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই জায়গা অন্য বানরেরা ঘিরে ধরে যেন বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে ফেলবে ওরা। ওই দিনই কলেজে যাবার পথে কাজল দেখল, কয়েকটি ছেলে একটি মেয়েকে উত্ত্যক্ত করছে। আশে-পাশে অনেক মানুষ থাকলেও কেউ প্রতিবাদ করছেন না। কাজল সঙ্গের বন্ধুদের নিয়ে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেল।

- ক. “মহাজাগতিক কিউরেটর”কোন জাতীয় রচনা?
- খ. মহাজাগতিক কিউরেটরদ্বয়ের পিপড়া সংগ্রহের কারণ কী?
- গ. কিউরেটরদের বিচারের আলোকে উদ্বীপকের কোন প্রাণীটি শ্রেষ্ঠ— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ইতিবাচক কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক— উদ্বীপক ও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গঞ্জের আলোকে মন্তব্যটি বিচার কর।



ନେକଲେସ

ମୂଳ : ଗୀ ଦ୍ୟ ମୋପାସ୍ତୀ

ଅନୁବାଦ : ପୁର୍ଣ୍ଣଦୂ ଦଙ୍ତିଦାର

ଲେଖକ-ପରିଚିତି

ଗୀ ଦ୍ୟ ମୋପାସ୍ତୀ ୧୮୫୦ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୫େ ଆଗସ୍ଟ ଫ୍ରାଙ୍କେ ନର୍ମାଣି ଶହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତା'ର ପୁରୋ ନାମ Henri-Renri-Albert-Guy de Maupassant । ତା'ର ପିତାର ନାମ ଶୁଭାତ ଦ୍ୟ ମୋପାସ୍ତୀ ଓ ମାଯେର ନାମ ଲରା ଲି ପ୍ରାଟିଭିନ (Laure Le Poittevin) । ୧୮୬୭ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ମୋପାସ୍ତୀ ଏକଟି ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଲୁଲେ ଭର୍ତ୍ତ ହନ । ମେଥାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଔପନ୍ୟାସିକ ଶୁଭାତ ଫ୍ଲବେୟାର-ଏର ସଙ୍ଗେ ତା'ର ପରିଚଯ ଘଟେ । ପାରିବାରିକ ବନ୍ଦୁ ଶୁଭାତ ଫ୍ଲବେୟାର ମୋପାସ୍ତୀର ସାହିତ୍ୟ-ଜୀବନେ ଅଭିଭାବକେର ଭୂମିକାଯ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହନ । ଏହି ମହାନ ଲେଖକେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମା ଓ ସହ୍ୟୋଗିତାର ତିନି ସାଂବାଦିକତା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଜଗତେ ପ୍ରବେଶ କରେନ । ଫ୍ଲବେୟାରେର ବାସାଯ ମୋପାସ୍ତୀର ପରିଚଯ ଘଟେ ଏମିଲ ଜୋଲା ଓ ଇତାନ ତୁର୍ଗନେତ୍ସହ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାତ ଲେଖକେର ସଙ୍ଗେ । କାବ୍ୟଚର୍ଚୀ ଦିଯେ ତା'ର ସାହିତ୍ୟ-ଜୀବନ ଶୁଭ ହଲେଓ ମୂଳତ ଗଲ୍ପକାର ହିସେବେ ତିନି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଧ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରେନ । ଧର୍ମୀୟ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଆଦର୍ଶଗତ କୋନୋ ବିଶ୍ୱାସେ ବିଦ୍ୟୁମାତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ନା ହେଯ ତିନି ତା'ର ସାହିତ୍ୟ-ଚର୍ଚାର ଜଗତ୍ ତୈରି କରେନ । ତା'ର ବନ୍ଦୁନିଷ୍ଠା ଓ ନିରାପେକ୍ଷତାର ତୁଳନା ବିଶ୍ୱାସିତ୍ୟର ଇତିହାସେ ଖୁବ ବେଶ ଲଙ୍ଘ କରା ଯାଇ ନା । ଅସାଧାରଣ ସଂଯମ ଓ ବିଶ୍ୱାସକର ଜୀବନବୋଧ ତା'ର ରଚନାକେ ତାଙ୍କର୍ପର୍ବତୀ କରେ ତୁଲେଛେ ।

ଗୀ ଦ୍ୟ ମୋପାସ୍ତୀ ୧୮୯୩ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୬େ ଜୁଲାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେନ ।

ଅନୁବାଦକ-ପରିଚିତି

ପୁର୍ଣ୍ଣଦୂ ଦଙ୍ତିଦାର ଚଟ୍ଟାମ୍ରେ ପଟିଯା ଉପଜେଲାର ଧଲଘାଟ ପ୍ରାମେ ୧୯୦୯ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୨୦ୟ ଜୁଲାଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତିନି ଛିଲେନ ଏକାଧାରେ ଲେଖକ ଓ ରାଜନୀତିବିଦ । ତା'ର ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଦଙ୍ତିଦାର ଓ ମାତା କୁମୁଦିନୀ ଦଙ୍ତିଦାର । ତିନି ଯାନ୍ତୋରା ସୂର୍ଯ୍ୟନେର ନେତୃତ୍ଵ ପରିଚାଳିତ ଚଟ୍ଟାମ୍ର ଯୁବ ବିଦ୍ରୋହେ ଅଂଶ ନେଓଯାଯ କାରାବରଣ କରେନ । ପେଶାଗତ ଜୀବନେ ତିନି ଛିଲେନ ଆଇନଜୀବୀ; ସମାଜଭାବୁକ ଲେଖକ ହିସେବେ ଧ୍ୟାତି ଛିଲ ତା'ର । ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟେ ରମେହେ : ‘କବିଯାଳ ରମେଶ ଶୀଳ’, ‘ସ୍ଵାରୀନତା ସଞ୍ଚାରେ ଚଟ୍ଟାମ୍ର’, ‘ବୀରକଳ୍ୟା ଶ୍ରୀତିଲତା’ । ଏହାଡ଼ାଓ ତା'ର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟେ ରମେହେ ‘ଶେଖବେର ଗଲ୍ଲ’ ଓ ‘ମୋପାସ୍ତୀର ଗଲ୍ଲ’ । ତିନି ୧୯୭୧ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୯େ ମେ ମୃକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅଂଶ ନିତେ ଭାରତେ ଯାଓଯାର ପଥେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେନ ।

ମେ ଛିଲ ଚମତ୍କାର ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ତରଙ୍ଗୀ । ନିୟତିର ତୁଲେଇ ଯେଣ ଏକ କେରାନିର ପରିବାରେ ତା'ର ଜନ୍ୟ ହେଯେଛେ । ତା'ର କେରାନିର ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରାଯାଇଥାଏ ଥାକତ । କିନ୍ତୁ ତା'ର ଶ୍ରେଣିର ଅନ୍ୟତମ ହିସେବେ ମେ ଛିଲ ଅସୁଖୀ । ତା'ର କୋନୋ ଜାତିବର୍ଗ ନେଇ । କାରଣ ଜନ୍ମରେ ପରେ ପରିବାର ଥେକେଇ ତାରା ଶ୍ରୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କେ ସଜାଗ ହେଯେ ଓଠେ । ସହଜାତ ଚାତ୍ର୍ୟ, ପ୍ରକୃତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଆର ବୁଦ୍ଧିର ନମନୀତାଇ ହେଲେ ତା'ର ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଯାର ଫଳେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ପରିବାରେ ଘେରେକେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳାର ସମକଳ କରେ ତୋଳେ ।

ଶର୍ଦ୍ଦା ତା'ର ମନେ ଦୁଃଖ । ତା'ର ଧାରଣା, ଯତ ସବ ସୁରକ୍ଷିତପୂର୍ବ ଓ ବିଲାସିତାର ବନ୍ଦ ଆଛେ, ସେଗୁଣିର ଜନ୍ୟକୁ ତା'ର ଜନ୍ୟ ହେଯେଛେ । ତା'ର ବାସକଷେତ୍ର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ହତ୍ଯାକାରୀ ଦେଓଯାଳ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଚୟାର ଏବଂ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଜିନିସପତ୍ରେର ଜନ୍ୟ ମେ ବ୍ୟୁଧିତ ହେତେ । ତା'ର ମତୋ ଅବଶ୍ୟାର ଅନ୍ୟ କୋନୋ ମେଯେ ଏସବ ଜିନିସ ଯଦିଓ ଲଙ୍ଘ କରନ୍ତି ନା, ମେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଓ ତୁଳ୍କ ହେତେ । ଯେ ଖର୍ବକାର ବ୍ରେଟନ ଏହି ସାଧାରଣ ସରଟି ତୈରି କରେଛି ତାକେ ଦେଖିଲେଇ ତା'ର ମନେ ବେଦନାଭରା ଦୁଃଖ ଆର



ବେପରୋଯା ସବ ସ୍ଵପ୍ନ ଜେଗେ ଉଠିଲ । ସେ ଭାବତ ତାର ଥାକବେ ପ୍ରାଚ୍ୟ-ଚିତ୍ର-ଶୋଭିତ, ଉଚ୍ଚ ବ୍ରୋଞ୍ଜ-ଏର ଆଲୋକମଣ୍ଡିତ ପାର୍ଶ୍ଵକଙ୍କ । ଆର ଥାକବେ ଦୁଇନ ବେଶ ମୋଟାସୋଟା ଗୃହ-ଭତ୍ୟ । ତାରା ଖାଟୋ ପାଇଜାମା ପରେ ଯେଇ ବଡ଼ ଆରାମକେନାରା ଦୂଟି ଗରମ କରାର ସତ୍ର ଥେକେ ବିକ୍ଷିଷ୍ଟ ତାରି ହାଓଯାଇ ନିଦ୍ରାଲୁ ହେଁ ଉଠିଲେ, ତାତେ ଶୁଯେ ସୁମିଯେ ଥାକବେ । ସେ କାମନା କରେ ଏକଟି ବୈଠକଖାନା, ପୁରାନୋ ରେଶମି ପର୍ଦୀ ସେଖାନେ ଝୁଲବେ । ଥାକବେ ତାତେ ବିଭିନ୍ନ ଚମତ୍କାର ଆସବାବ, ଯାର ଓପର ଶୋଭା ପାବେ ଅମୂଳ୍ୟ ସବ ପ୍ରାଚୀନ କୌତୁଳ-ଉଦ୍‌ଦୀପକ ସାମାଜୀ । ଯେବେ ପରିଚିତ ଓ ଆକଞ୍ଜିତ ପୁରସ୍ତ ସବ ମେଯେଦେର କାମ୍ୟ, ସେବର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଦେର ସଙ୍ଗେ ବିକାଳ ପ୍ରାଚୀନ ଗଙ୍ଗାଗୁଜବ କରବାର ଜନ୍ୟ ଛୋଟ ସୁରଭିତ ଏକଟି କଷ୍ଟ ସେଖାନେ ଥାକବେ ।

ତିନଦିନ ଧରେ ସ୍ୟବନ୍ତ ଏକଥାନା ଟେବିଲକୁଥ ଢାକା ଗୋଲ ଏକଟି ଟେବିଲେ ତାର ସ୍ବାମୀର ବିପରୀତ ଦିକେ ସେ ସଥଳ ସାନ୍ଧ୍ୟଭୋଜେ ବସେ ଏବଂ ଖୁଶିର ଆମେଜେ ତାର ସ୍ବାମୀ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷାର ପାତ୍ରଟିର ଢାକନା ତୁଳତେ ତୁଳତେ ବଲେ : ‘ଓ! କି ଭାଲୋ ମାନ୍ୟ! ଏଇ ଚେଯେ ଭାଲୋ କିଛୁ ଆମି ଚାଇ ନା—’ ତଥନ ତାର ମନେ ପଡ଼ିବେ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ଧ୍ୟଭୋଜେର କଥା, ଉଚ୍ଚଲ ରୌପ୍ୟପାତ୍ରାଦି, ମାଯାମୟ ବନ୍ଦ୍ରମିର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିରଳ ପାଖିର ଚିତ୍ରଶୋଭିତ କାର୍କାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦୀ ଦିଯେ ଢାକା ଦେଉଯାଇ-ଏର କାମନା । ସେ ଭାବେ, ଅପରାଧ ପାତ୍ରେ ପରିବେଶିତ ହବେ ଅପୂର୍ବ ଖାଦ୍ୟ ଆର ଗୋଲାପି ରଂ-ଏର ରୋହିତ ମାହେର ଟୁକରା ଅଥବା ମୁରଗିର ପାଥନା ଥେତେ ଥେତେ ମୁଖେ ସିଂହ-ମାନ୍ୟର ହାସି ନିଯେ କାନ ପେତେ ଶୁଣବେ ଚୁପି-ଚୁପି-ବଜା ପ୍ରଗଯଲୀଲାର କାହିନି ।

ତାର କାହେ ଫ୍ରକ ବା ଜଡ଼ୋଯା ଗହନା ନେଇ-ନେଇ ବଲତେ କିଛୁ ନେଇ । ଅଧିଚ ଏଇ ସବ ବନ୍ଧୁଇ ତାର ପ୍ରିୟ । ତାର ଧାରଣା ଐସେବେର ଜନ୍ୟଟି ତାର ସୃଷ୍ଟି । ସୁଶୀ କରାର, କାମ୍ୟ ହୁଏଇର, ଚାଲାକ ଓ ପ୍ରଗଯାଚିକା ହବାର କତଇ ନା ତାର ଇଚ୍ଛା ।

ତାର ‘କନଡେନ୍’-ଏର ସହପାଠିନୀ ଏକ ଧନୀ ବାଙ୍ଗବୀ ଛିଲ । ତାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ ତାର ଭାଲୋ ଲାଗିଲା ନା । କାରଣ ଦେଖା କରେ ଫିରେ ଏସେ ତାର ଖୁବ କଟ୍ଟ ଲାଗିଲ । ବିରକ୍ତି, ଦୁଃଖ, ହତାଶା ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନ ଧରେ ସେ କାଁଦିଲ ।

ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ହାତେ ଏକଟି ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ନିଯେ ବେଶ ଉତ୍ସବିତ ହେଁ ତାର ସ୍ବାମୀ ଘରେ ଫିରିଲ ।

ସେ ବଲନ, ‘ଏହି ଯେ, ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଏକ ଜିନିସ ଏନେଛି ।’

ମେଯେଟି ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଖାମଟି ଛିଡ଼େ ତାର ଭିତର ଥେକେ ଏକଥାନା ଛାପାନୋ କାର୍ଡ ବେର କରିଲ । ତାତେ ନିଚେର କଥାଙ୍ଗଲି ମୁଦ୍ରିତ ଛିଲ :

‘ଜନଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଦାମ ଜର୍ଜ ରେମପନ୍ନୁ ଆଗାମୀ ୧୮ଇ ଜାନୁଆରି ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ତାଁହାଦେର ନିଜ ବାସଗୃହେ ମର୍ମିଯେ ଓ ମାଦାମ ଲୋଇସେଲେର ଉପର ନିକ୍ଷେପ କରେ, ବିଡ଼ ବିଡ଼ କରେ ବଲେ :

‘ଓଥାନା ନିଯେ ତୁମି ଆମାର କୀ କରତେ ବଲ?’

‘କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି, ଆମି ଭେବେଛିଲାମ, ଏତେ ତୁମି ଖୁଶି ହୁବେ । ତୁମି ବାଇରେ କଥନେ ଯାଏ ନା, ତାଇ ଏଇ ଏକ ସୁଯୋଗ, ଚମତ୍କାର ଏକ ସୁଯୋଗ!

ଏଟା ଜୋଗାଡ଼ କରତେ ଆମାକେ ଅନେକ କଟ୍ଟ କରତେ ହେଁଲେ । ସବାଇ ଏକଥାନା ଚାଯ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ ବେଛେ ବେଛେ ଦେଓଯା ହେଁଲେ । କର୍ମଚାରୀଦେର ବେଶ ଦେଓଯା ହୟନି । ସେଥାନେ ତୁମି ଗୋଟା ସରକାରି ମହଲକେ ଦେଖିଲେ ପାବେ ।’

ବିରକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାର ଦିକେ ତାକିଯେ ମେଯେଟି ଅଧୀରଭାବେ ବଲେ ଉଠିଲ :

‘ଏ ଘଟନାର ମତୋ ଏକଟି ବ୍ୟାପାର କୀ ପରେ ଆମି ଯାବ ବଲେ ତୁମି ମନେ କରି?’

ସେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁ ଭାବେନି । ତାଇ ସେ ବିବ୍ରତଭାବେ ବଲେ :

‘କେଳ ଆମରା ଥିଯେଟାରେ ଯାବାର ସମୟ ତୁମି ଯେଇ ପୋଶାକଟା ପର ମୋଟା ପରବେ । ଓଟା ଆମାର କାହେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ—’

ତାର ତ୍ରୀକେ ଫୁଲିଯେ ଫୁଲିଯେ କାଁଦିଲେ ଦେଖେ ମେଯେଟିର ନିର୍ବାକ ଓ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଁଲେ । ତାର ଚୋଥେର ପାଶ ଥେକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଫୁରୋଟା ଅକ୍ଷ ତାର ଗାଲେର ଉପର ଗଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲ । ସେ ଥିତମନଭାବେ ବଲନ :

‘କୀ ହଲୋ? କୀ ହଲୋ ତୋମାର?’



প্রবল চেষ্টায় মেয়েটি নিজের বিরক্তি দমন করে, তার সিক্ত গঙ্গ মুছে ফেলে শান্ত কর্তে জবাব দেয় :

‘কিছুই না। শুধু আমার কোনো পোশাক নেই বলে আমি ঐ ব্যাপারে যেতে পারব না। তোমার যে কোনো সহকর্মীর স্ত্রীর পোশাক আমার চেয়ে যদি ভালো থাকে, কার্ডখানা নিয়ে তাকে দাও।’

সে মনে মনে দৃঢ়ে পায়। তারপর সে জবাব দেয় :

‘মাতিলদা, বেশ তো চল আলাপ করি আমরা। এমন কোনো পোশাক, অন্য কোনো উপলক্ষেও যা দিয়ে কাজ চলবে অথচ বেশ সাদাসিধা, তার দাম কত আর হবে?’

কয়েক সেকেন্ড মেয়েটি চিন্তা করে দেখে এমন একটি সংখ্যার বিষয় হির করল যা চেয়ে বসলে হিসাবি কেরানির কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে এক আতঙ্কিত প্রত্যাখ্যান যেন না আসে।

শেষপর্যন্ত ইতস্তত করে মেয়েটি বলল :

‘আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমার মনে হয় চারশ ক্রাঁ হলে তা কেনা যাবে।’

শুনে তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। কারণ, তার যেসব বন্ধু গত রবিবারে নানতিয়ারের সমভূমিতে ভরতপাখি শিকারে গিয়েছিল, আগামী গ্রীষ্মে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছায় একটি বন্দুক কিনবার জন্য ঠিক ততটা অর্থই সে সংঘর্ষ করেছিল। তা সত্ত্বেও জবাব দিল :

‘বেশ ত। আমি তোমায় চারশত ক্রাঁ দেব। কিন্তু বেশ সুন্দর একটি পোশাক কিনে নিও।’

‘বল’-নাচের দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে ততই মাদাম লোইসেলকে বিচলিত ও উদ্ধিষ্ঠ মনে হয়। অবশ্য তার পোশাক প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। একদিন সন্ধিয়া তার স্বামী তাকে বলল :

‘তোমার হয়েছে কী? গত দুই-তিন দিন ধরে তোমার কাজকর্ম কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে।’

শুনে মেয়েটি জবাব দেয়, ‘আমার কোনো মণিমুক্তা, একটি দায়ি পাথর কিছুই নেই যা দিয়ে আমি নিজেকে সাজাতে পারি। আমায় দেখলে কেমন গরিব গরিব মনে হবে। তাই এই অনুর্ধানে আমার না যাওয়াই ভালো হবে।’

স্বামী বলল, ‘কিছু সত্যকার ফুল দিয়ে তুমি সাজাতে পার। এই ঝুতুতে তাতে বেশ সুরচিপূর্ণ দেখায়। দশ ক্রাঁ দিলে তুমি দুটি কি তিনিটি অত্যন্ত চমৎকার গোলাপফুল পাবে।’

মেয়েটি ঐ কথায় আশ্চর্ষ হলো না। সে জবাবে বলল, ‘না, ধনী মেয়েদের মাঝখানে পোশাকে-পরিচ্ছদে ঐ রকম খেলো দেখানোর মতো আর বেশি কিছু অপমানজনক নেই।’

তখন তার স্বামী চেঁচিয়ে উঠল : ‘আচ্ছা, কী বোকা দেখত আমরা! যাও, তোমার বাঙ্গবী মাদাম ফোরস্টিয়ারের সঙ্গে দেখা করে তাকে বল তার জড়োয়া গহনা যেন তোমায় ধার দেয়। এটুকু আদায় করার তো তার সঙ্গে তোমার পরিচয় যথেষ্ট।’

সে আনন্দধ্বনি করে উঠল। তারপর সে বলল :

‘সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি।’

পরদিন সে তার বাঙ্গবীর বাড়িতে গিয়ে তার দুঃখের কাহিনি তাকে বলল। মাদাম ফোরস্টিয়ার তার কাচের দরজা লাগানো গোপনকঙ্কে গিয়ে বড় একটি জড়োয়া গহনাঞ্জি পরে পরে দেখে আর ইতস্তত করে, কিন্তু ওগুলি নেওয়ার সিদ্ধান্তও করতে হেঢ়ে যেতেও পারে না। তারপর সে জিজ্ঞাসা করে :

‘তাই, যা ইচ্ছা এখান থেকে নাও।’

সে প্রথমে দেখল কয়েকটি কঙ্কন, তারপর একটি মুক্তার মালা ও মণিমুক্তা-থচিত চমৎকার কারুকার্য-ভরা একটি সোনার ভিনিশার ‘ক্রুশ’। আয়নার সামনে গিয়ে সে জড়োয়া গহনাঞ্জি পরে পরে দেখে আর ইতস্তত করে, কিন্তু ওগুলি নেওয়ার সিদ্ধান্তও করতে হেঢ়ে যেতেও পারে না। তারপর সে জিজ্ঞাসা করে :

‘আর কিছু তোমার নেই?’

‘কেন? আছে, তোমার যা পছন্দ তুমি তা বেছে নাও।’



ହଠାତ୍ ସେ କାଳୋ ସ୍ୟାଟିନେର ଏକଟି ବାରେ ଦେଖିଲ ଅପରାପ ଏକଥାନା ହୀରାର ହାର । ଅଦୟ କାମନାଯ ତାର ବୁକ ଦୂର ଦୂର କରେ । ସେଟା ତୁଳେ ନିତେ ଗିଯେ ତାର ହାତ କାଁପେ । ସେ ତାର ପୋଶାକେର ଉପର ଦିଯେ ସେଟା ଗଲାଯ ତୁଳେ ନେଯ ଏବଂ ସେଙ୍ଗେ ଦେଖେ ଆନନ୍ଦେ ବିହଳ ହେଁ ଯାଯ । ତାରପର ଉଷ୍ଣତାବେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ :

‘ତୁମି ଏକଥାନା ଆମାଯ ଧାର ଦେବେ? ଶୁଧୁ ଏଟା?’

‘କେନ ଦେବ ନା? ନିଚ୍ଚଯଇ ଦେବ ।’

ସେ ସବେଗେ ତାର ବାନ୍ଧବୀର ଗଲା ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ, ପରମ ଆବେଗେ ତାକେ ବୁକେ ଚେପେ ଧରେ । ତାରପର ତାର ସମ୍ପଦ ନିଯେ ସେ ଚଲେ ଆସେ ।

‘ବଳ’ ନାଚେର ଦିନ ଏସେ ଗେଲ । ମାଦାଯ ଲୋଇସେଲେର ଜୟଜୟକାର । ସେ ଛିଲ ସବଚୟେ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁରୁଚିମୟୀ, ସୁଦର୍ଶନା, ହାସ୍ୟମୟୀ ଓ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ସବ ପୂର୍ବ ତାକେ ଲକ୍ଷ କରିଛି, ତାର ନାମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ତାର ସଙ୍ଗେ ଆଲାପେର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମନ୍ତ୍ରସଭାର ସବ ସଦଦ୍ୟେର ତାର ସଙ୍ଗେ ‘ଓସାଲଟଜ’ ନୃତ୍ୟ କରତେ ଇଚ୍ଛା ହାଚିଲ । ସ୍ଵର୍ଗ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଇଛିଲେ ।

ଆନନ୍ଦେ ମନ୍ତ୍ର ହେଁ ଆବେଗ ଓ ଉତ୍ସାହ ନିଯେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରିଛି । ତାର ରଙ୍ଗରେ ବିଜୟଗର୍ବେ, ସାଫଲ୍ୟେର ପୌରବେ ସେ ଆର କିଛୁଇ ଭାବେ ନା । ଏକ ଆନନ୍ଦେର ମେଘେ ଓପର ଦିଯେ ଯେଳ ଭେଦେ ଆସିଲ ଏହି ସବ ଆହୁତି ଓ ମୁହଁତା ଆର ଜାହୁତ ସବ କାମନା । ଯେ କୋନୋ ମେଘେ ଅନ୍ତରେ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ କତ ମଧୁର!

ଭୋର ଚାରଟାର ଦିକେ ସେ ବାଡ଼ି ଫିରେ ଗେଲ । ଅନ୍ୟ ସେଇ ତିନିଜଙ୍କ ଭଦ୍ରଲୋକେର ଦ୍ଵୀ ଖୁବ ବୈଶି ଫୁର୍ତ୍ତିତେ ମନ୍ତ୍ର ଛିଲ, ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ତାର ସ୍ବାମୀ ଛୋଟ ଏକଟି ବିଶ୍ରାମକଙ୍କେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମି ସମ୍ପଦ ବିଜୟ କରିଛି ।

ବାଡ଼ି ଫିରିବାର ପଥେ ଗାୟେ ଜଡ଼ାବାର ଜନ୍ୟ ତାରା ଯେ ଆଟପୌରେ ସାଧାରଣ ଚାଦର ନିଯେ ଏସେଛିଲ ସେ ତାର କାଁଧେର ଓପର ସେଟି ଛାଡ଼ିଯେ ଦେଯ । ‘ବଳ’ ନାଚେର ପୋଶାକେ ଅପରାପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ଐଟିର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୁପରିସ୍କୁଟ ହେଁ ଉଠିଛି । ମେଘେଟି ତା ଅନୁଭବ କରତେ ପାରେ ତାଇ ଅନ୍ୟ ଯେବେ ଧନୀ ମେଘେ ଦାମି ପଶମି ଚାଦର ଦିଯେ ଗା ଢେକେଛିଲ ତାଦେର ଚେଥେ ନା ପଡ଼ିବାର ଜନ୍ୟ ସେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଏଗିଯେ ଯେତେ ଶାଗଲ ।

ଲୋଇସେଲ ତାକେ ଟେଲେ ଧରେ ବଲଲ : ‘ଧାମୋ, ତୋମାର ଠାଙ୍ଗ ଲେଗେ ଯାବେ ଓଖାନେ । ଆମି ଏକଥାନା ଗାଡ଼ି ଡେକେ ଆନି ।’ କିନ୍ତୁ ମେଘେଟି କୋନୋ କଥାଯ କାନ ନା ଦିଯେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ସିଁଡ଼ି ବେଯେ ନାମତେ ଥାକେ । ରାତ୍ରାଯ ସଥନ ତାରା ପୌଛେ ଗେଲ, ସେଥାନେ କୋନୋ ଗାଡ଼ି ପାଓଯା ଗେଲ ନା । ତାରା ଗାଡ଼ିର ଖୋଜ କରତେ କରତେ ଦୂରେ କୋନୋ ଏକଥାନାକେ ଦେଖେ ତାର ଗାଡ଼୍‌ଯାନକେ ଡାକତେ ଥାକେ ।

ହତାଶ ହେଁ କାଂପତେ କାଂପତେ ତାରା ସିନ ନଦୀର ଦିକେ ହାଁଟିତେ ଥାକେ । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପୁରାତନ ଏକଥାନା ତାରା ପାଯ, ତାହଲୋ ସେଇ ନିଶାଚର ଦୁଇ-ଯାତ୍ରୀର ଗାଡ଼ି ଯା ପ୍ଯାରିତେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପର ଲୋକେର ଚୋଖେ ପଡ଼େ, ତାର ଏକଥାନା, ଯେଇଦିଲେ ଏଇଶ୍ଵଳି ନିଜେର ଦୁର୍ଦାନ୍ତା ଦେଖାତେ ଲଜ୍ଜା ପାଯ ।

ଏଥାନି ତାଦେର ମାର୍ଟାର ସ୍ଟର୍ଟିଟେ ଘରେ ଦରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯେ ଗେଲ । ତାରା କ୍ଲାନ୍ତଭାବେ ତାଦେର କଙ୍କେ ଗେଲ । ମେଘେଟିର ସବ କାଜ ଶେଷ । କିନ୍ତୁ ସ୍ବାମୀର ବ୍ୟାପାରେ, ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲ ଯେ ଦଶଟାଯ ତାକେ ଆପିସେ ଗିଯେ ପୌଛାତେ ହବେ ।

ନିଜେକେ ପୌରବମଣିତ ରଙ୍ଗେ ଶେଷ ଏକବାର ଦେଖାର ଜନ୍ୟ ସେ ଆୟନାର ସାମନେ ଗିଯେ ତାର ଗଲାର ଚାଦରଖାନା ଖୋଲେ । ହଠାତ୍ ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ ଉଠିଲ । ତାର ହାରଖାନା ଗଲାଯ ଜଡ଼ାନୋ ନେଇ ।

ତାର ସ୍ବାମୀର ପୋଶାକ ତଥନ ଅର୍ଧେକ ମାତ୍ର ଖୋଲା ହେଁଲେ । ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ :

‘ଆମାର-ଆମାର କାହେ—ମାଦାମ ଫୋରସ୍ଟିଆରେ ହାରଖାନା ନେଇ ।’

ଆତକିତଭାବେ ସେ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଲା : ‘କୀ ବଲଲେ! ତା କୀ କରେ ହବେ? ଏଟା ସମ୍ଭବ ନନ୍ଦ ।’

ପୋଶାକେର ଓ ବହିର୍ବାସେର ଭାଙ୍ଗେ, ପକେଟେ, ସବ ଜାଗଗାଯ ତାରା ଖୋଜ କରେ । କିନ୍ତୁ ତା ପାଓଯା ଗେଲ ନା ।

ସ୍ବାମୀ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ : ‘ଏ ବାଡ଼ି ଥେକେ ଚଲେ ଆସବାର ସମୟ ତା ଯେ ତୋମାର ଗଲାଯ ଛିଲ, ତୋମାର ଠିକ ମନେ ଆହେ?’



‘হ্যাঁ, আমরা যখন বিশ্রামকক্ষ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, তখনও তা ছিল আমার খেয়াল আছে।’

‘কিন্তু তুমি যদি ওটা রাস্তায় হারাতে, ওটা পড়বার শব্দ আমাদের শোনা উচিত ছিল। গাড়ির মধ্যেই নিষ্কয়ই পড়েছে মনে হয়।’

‘হ্যাঁ, সম্ভবত তাই। তুমি গাড়ির নম্বরটি টুকে নিয়েছিলে?’

‘না। আর তুমি কি তা লক্ষ করেছিলে?’

‘না।’

হতাশভাবে তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত লোইসেল আবার পোশাক পরে নিল।

সে বলল, ‘আমি যাচ্ছি। দেখি যতটা রাস্তা আমরা হেঁটেছিলাম, সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।’

তারপর সে গেল। মেয়েটি তার সান্ধ্য গাউন পরেই রয়ে গেল। বিছানায় শুতে যাবার শক্তি তার নেই। কোনো উচ্চাশা বা ভাবনা ছাড়াই সে একখানা চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে রইল।

সকাল সাতটার দিকে তার স্বামী ফিরে এল। কিছুই সে খুঁজে পায়নি।

সে পুলিশের কাছে ও গাড়ির আপিসে গিয়েছিল এবং পুরস্কার ঘোষণা করে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়ে এসেছে। সে যথাসাধ্য করে এসেছে বলে তাদের মনে কিছুটা আশা হলো।

ঐ ভয়ানক বিপর্যয়ে মেয়েটি সারাদিন এক বিজ্ঞান অবস্থায় কাটাল। সন্ধ্যাবেলা যখন লোইসেল ফিরে এল তখন তার মুখে ব্যঙ্গণার মলিন ছাপ, কিছুই সে খুঁজে পায়নি।

সে বলল, ‘তোমার বাঙ্কবীকে লিখে দিতে হবে যে হারখানার আংটা তুমি ভেঙে ফেলেছ, তাই তা তুমি মেরামত করতে দিয়েছ। তাতে আমরা ভেবে দেখবার সময় পাব।’

তার নির্দেশমত মেয়েটি লিখে দিল।

এক সপ্তাহ শেষ হওয়ায় তারা সব আশা ত্যাগ করল। বয়সে পাঁচ বছরের বড় লোইসেল ঘোষণা করল :

‘ঐ জড়োয়া গহনা ফেরত দেবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।’

পরদিন যেই বাঙ্গে ওটা ছিল, তার ভিতরে যেই স্বর্ণকারের নাম ছিল, তার কাছে তারা সেটা নিয়ে গেল। সে তার খাতাপত্র খেঁটে বলল :

‘মাদাম, ঐ হারখানা আমি বিক্রি করিনি, আমি শুধু বাল্ট্রাটা দিয়েছিলাম।’

তারপর তারা সেই হারটির ঘত হার খোঁজ করার জন্য, তাদের স্মৃতির উপর নির্ভর করে এক স্বর্ণকার থেকে অন্য স্বর্ণকারের কাছে যেতে থাকে। দু'জনেরই শরীর বিরক্তি ও উংগলে খারাপ হয়ে গেছে।

প্যালেস রয়েলে তারা এমন এক হীরার কর্তৃহার দেখল সেটা ঠিক তাদের হারানো হারের মতো। তার দাম চাল্লিশ হাজার ট্র্যান্স। ছত্রিশ হাজার ট্র্যান্স তারা তা পেতে পারে।

তিনি দিন যেন ওটা বিক্রি না করে সে জন্য তারা স্বর্ণকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল। তারা আরও ব্যবস্থা করল যে, যদি ফেরুয়ারি মাস শেষ হওয়ার আগে ঐ হারটি খুঁজে পাওয়া যায়, তারা এটা ফেরত দিলে চৌরিশ হাজার ট্র্যান্স ফেরত নিতে পারবে।

লোইসেলের কাছে তার বাবার মৃত্যুর পরে প্রাণ্ত আঠারো হাজার ট্র্যান্স ছিল। বাকিটা সে ধার করল।

মাদাম লোইসেল যখন জড়োয়া গহনা মাদাম ফোরস্টিয়ারকে ফেরত দিতে গেল তখন শেষেকালে মেয়েটি নির্জিবকষ্টে বলল :

‘ওটা আরও আগে তোমায় ফেরত দেওয়া উচিত ছিল; কারণ, তা আমারও দরকার হতে পারত।’

তার বাঙ্কবী সেই ভয় করেছিল, তেমনভাবে সে গহনার বাল্ট্রাটি খুলল না। যদি বদলে দেওয়া হয়েছে সে টের পেত, সে কী মনে করত? সে কী বলত? সে কি তাকে অপহারক ভাবত?



ଏବାର ମାଦାମ ଲୋଇସେଲ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଜୀବନେର ଭୟାବହତା ବୁଝିତେ ପାରେ । ସେ ତାର ନିଜେର କାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସର ସଙ୍ଗେଇ କରେ ଯାଯା । ଏ ଦୁଃଖଜନକ ଦେନା ଶୋଧ କରା ପ୍ରୋଜନ । ସେ ତା ଦେବେ । ଦାସୀକେ ତାରା ବିଦାୟ କରେ ଦିଲ । ତାରା ତାଦେର ବାସା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରଲ । କିଛି ଛାଦେର କରେକଟି କାମରା ତାରା ଭାଡ଼ା କରଲ ।

ଘରକଳ୍ପାର କଠିନ ସବ କାଜ ଓ ରାନ୍ନାଘରେର ବିରକ୍ତିକର କାଜକର୍ମ ସେ ଶିଖେ ନିଲ । ତାର ଗୋଲାପି ନଥ ଦିଯେ ସେ ବାସନ ଧୋଯ, ତୈଳାକ୍ଷ ପାତ୍ର ଓ ବୋଲ ରୀଧାର କଢ଼ାଇ ମାଜେ । ମୟଳା କାପଡ଼-ଚୋପଡ଼, ଶୈମିଜ, ବାସନ ମୋହାର ଗାମଛା ସେ ପରିଷକାର କରେ ଦିନିତେ ଶୁକାତେ ଦେଇ । ରୋଜ ସକାଳେ ସେ ଆବର୍ଜନା ନିଯେ ରାତ୍ରାଯ ଫେଲେ । ସିନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାପେ ଶ୍ଵାସ ନେବାର ଜନ୍ୟ ଥେମେ ଥେମେ ସେ ଜଳ ତୋଳେ । ସାଧାରଣ ପରିବାରେର ମେୟେର ମତୋ ପୋଶାକ ପରେ ସେ ହାତେ ବୁଡ଼ି ନିଯେ ମୁଦି, କସାଇ ଓ ଫଳେର ଦୋକାନେ ଯାଯା ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖେର ପଯସାର ଏକଟିର ଜନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର କଥାକଷି କରେ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେଇ ସମୟ ଚେଯେ କିଛି ଦଲିଲ ବଦଳ କରିତେ ହୁଏ, କାଉକେ କିଛି ଶୋଧ ଦିତେ ହୁଏ ।

ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ସନ୍ଧାବେଳୋ କାଜ କରେ । ସେ କରେକଜନ ବ୍ୟବସାୟୀର ହିସାବେର ଖାତା ଠିକ କରେ । ରାତ୍ରେ ଏକ ପାତା ପାଁଚ ‘ସାଓ’ ହିସବେ ସେ ପ୍ରାୟଇ ଲେଖା ନକଳ କରେ ।

ଏରକମ ଜୀବନ ଦଶ ବହୁ ଧରେ ଚଲିଲ ।

ଦଶ ବହୁରେ ଶେଷେ ତାରା ସବ କିଛି ମହାଜନେର ସୁଦସହ ପ୍ରାପ୍ୟ ନିଯେ ସବ କ୍ଷତିପୂରଣ କରେ ଫେଲିତେ ପାରେ । ତାହାଡ଼ା କିଛି ତାଦେର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହଲୋ ।

ମାଦାମ ଲୋଇସେଲକେ ଦେଖିଲେ ଏଥିନ ବୟକ୍ତା ବଲେ ମନେ ହୁଏ । ସେ ଏଥିନ ଗରିବ ଗୃହସ୍ଥରେର ଶକ୍ତ, କର୍ମତ ଓ ଅମାର୍ଜିତ ମେୟେର ମତୋ ହେଁ ହେଁ । ତାର ଚଳ ଅବିନ୍ୟାସ, ଘାଘରା ଏକପାଶେ ମୋଚଡ଼ାନୋ, ହାତଗୁଲୋ ଲାଲ । ସେ ଚଡ଼ାଗଲାୟ କଥା ବଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲସିତେ ଜଳ ଏନେ ମେରେ ଧୋଯ । କିନ୍ତୁ କଥନଓ, ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ସଥିନ ଆପିସେ ଥାକେ, ଜାନାଲାର ଧାରେ ବସେ ବିଗତ ଦିନେର ସେଇ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସେଇ ‘ବଳ’ ନାଚେ ତାକେ ଏତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇଲି ଓ ଏମନ ଅଭିରିତ ପ୍ରଶଂସା ଗେଯେଇଲି, ତାର କଥା ସେ ଭାବେ ।

ଯଦି ସେ ଗଲାର ସେଇ ହାରଖାଲା ନା ହାରାତ ତାହିଁଲେ କେମନ ହତୋ? କେ ଜାନେ କେ ବଲିତେ ପାରେ? କୀ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ଏଇ ଜୀବନ ଆର ତାର ମଧ୍ୟେ କତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ! ସାମାନ୍ୟ ଏକଟି ବସ୍ତୁ କି କରେ ଏକଜନ ଧର୍ମ ହେଁ ହେଁ ଯେତେ ଆବାର ବୀଚିତ୍ର୍ୟ ପାରେ! ଏକ ରବିବାରେ ସାରା ସଞ୍ଚାରେ ନାନା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନ ଥେକେ ଦୂର କରାର ଜନ୍ୟ ସେ ସଥିନ ଚାମପସ-ଏଲିସିସ-ଏ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଇଲି, ହଠାତ୍ ଏକଟି ଶିଶୁ ନିଯେ ଭ୍ରମଗରତା ଏକଜନ ମେୟେ ତାର ଚୋଖେ ପଡ଼ିଲ । ସେ ହଲୋ ମାଦାମ ଫୋରସିଟିଯାର । ସେ ଏଥନଓ ଯୁବତୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟା । ଦେଖେ ମାଦାମ ଲୋଇସେଲେର ମନ ଖାରାପ ହେଁ ଗେଲ । ସେ କି ଏ ମେୟେଟିର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲିବେ? ହୁଁ, ଅବଶ୍ୟକ ବଲିବେ । ତାକେ ସଥିନ ସବ ଶୋଧ କରା ହେଁଛେ ତଥନ ସବ କିଛି ଖୁଲେ ସେ ବଲିବେ । କେଳ ବଲିବେ ନା?

ସେ ମେୟେଟିର କାହେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ବଲଲ : ‘ସୁପ୍ରଭାତ, ଜେନି !’

ତାର ବନ୍ଧୁ ତାକେ ଚିନିତେ ପାରିଲ ନା । ଏକ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ତାକେ ଏମନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯ ସେ ଅବାକ ହଲୋ । ସେ ବିବ୍ରତଭାବେ ବଲଲ :

‘କିନ୍ତୁ ମାଦାମ-ଆପନାକେ ତୋ ଚିନିଲାମ ନା-ବୋଧହୟ ଆପନାର ଭୁଲ ହେଁଛେ—’

‘ନା, ଆମି ମାତିଲଦା ଲୋଇସେଲ ।’

ତାର ସାନ୍ଧ୍ୟର ବିନ୍ଦୁଯେ ଚେଷ୍ଟିଯେ ଉଠେ ବଲଲ : ‘ହୟ, ଆମାର ବେଚାରୀ ମାତିଲଦା! ଏମନଭାବେ କୀ କରେ ତୁମି ବଦଳେ ଗେଲେ—’

‘ହ୍ୟା, ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହ୍ୟାର ପର ଥେକେ ଆମାର ଦୁର୍ଦିନ ଯାଚେ—ବେଶ କିଛି ଦୁଃଖେର ଦିନ ଗେହେ—ଆର ସେଟା ହେଁଛେ ଶୁଦ୍ଧ ତୋମାର ଜନ୍ୟ—’

‘ଆମାର ଜନ୍ୟ? ତା କୀ କରେ ହଲୋ?’

‘ସେଇ ଯେ କରିଶନାରେର ‘ବଳ’ ନାଚେର ଦିନ ତୁମି ଆମାକେ ତୋମାର ହୀରାର ହାର ପରିତେ ଦିଯେଇଲେ, ମନେ ପଡ଼େ?’

‘ହ୍ୟା, ବେଶ ମନେ ଆଛେ ।’



‘কথা হচ্ছে, সেখানা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।’

‘কী বলছ তুমি? কী করে তা আমায় তুমি ফেরত দিয়েছিলে?’

‘ঠিক সেখানার মতো একটি তোমাকে আমি ফেরত দিয়েছিলাম। তার দাম দিতে দশ বছর লেগেছে। তুমি বুঝতেই পার, আমদের মতো লোক যাদের কিছুই ছিল না, তাদের পক্ষে তা সহজ ছিল না। কিন্তু তা শেষ হয়েছে এবং সোজন্য আমি এখন ভালোভাবেই নিশ্চিন্ত হয়েছি।’

মাদাম ফোরস্টিয়ার তাকে কথার মাঝপথে থামিয়ে বলল :

‘তুমি বলছ যে, আমারটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তুমি একখানা ইৱারার হার কিনেছিলে?’

‘হ্যাঁ। তা তুমি খেয়াল করনি? এই দুটি এক রকম ছিল।’

বলে সে গর্বের ভাবে ও সরল আনন্দে একটু হাসল। দেখে মাদাম ফোরস্টিয়ার-এর মনে খুব লাগল। সে তার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল :

‘হায়, আমার বেচারী মাতিলদা! আমারটি ছিল নকল। তার দাম পাঁচশত ট্রাঁর বেশি হবে না।’

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|---------------|--|
| কলঙ্কন্ত | — প্রিষ্ঠান নারী মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল। মিশনারিদের আবাস। |
| মাসিয়ে | — সৌজন্য প্রদর্শন ও সম্মান জ্ঞানান্তরের জন্য ক্রান্তে পুরুষদের মাসিয়ে সম্মোধন করা হয়। |
| মাদাম | — সৌজন্য প্রদর্শন ও সম্মান জ্ঞানান্তরের জন্য ক্রান্তে মহিলাদের মাদাম সম্মোধন করা হয়। |
| ফ্রাঁ | — ফরাসি মুদ্রার নাম। ২০০২ সাল পর্যন্ত এই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায় ফ্রাঙ্গ ইউরো ব্যবহার করে। |
| ‘বল’ নাচ | — বিনোদনমূলক সামাজিক নৃত্যানুষ্ঠান। ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু দেশে এই নৃত্য প্রচলিত। |
| জুশ | — প্রিষ্ঠান ধর্মীয় প্রতীক। |
| স্যাটিন | — মস্ত ও চকচকে রেশমি বস্ত্র। Satin |
| প্যারী | — প্যারিসের ফরাসি নাম। |
| প্যালেস রয়েল | — রাজকীয় প্রাসাদ। |

পার্ট-পরিচিতি

বিশ্ববিখ্যাত গল্লকার গী দ্য মোপাসাঁ'র শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর মধ্যে ‘নেকলেস’ অন্যতম। ফরাসি ভাষায় গল্পটির নাম ‘La Parure’। ১৮৮৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ফরাসি পত্রিকা ‘La Gaulois’-এ গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং সে বছরই ইংরেজিতে অনুদিত হয়। একই সালে প্রকাশিত ‘নেকলেস’ শীর্ষক গল্পগুলোর মধ্যে গল্পটি স্থান পায়। অপ্রত্যাশিত কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাপ্তির জন্য গল্পটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এক সঞ্চয়ায় মাদাম লোইসেলের স্বামী মাসিয়ে কী হাতে ঘরে ফিরলেন?
- ক. সুন্দর গয়নার বাস্ত্র
 - খ. একটি বড় খাম
 - গ. উজ্জ্বল রৌপ্য পাত্র
 - ঘ. কার্মকার্যপূর্ণ পর্দা

২. মাদাম লোইসেলের সর্বদা দৃঢ়খ, কারণ, সে—

- ক. নেকলেস হারিয়ে ফেলেছে
- খ. কাঞ্চিত জীবন পায়নি
- গ. রান্নাঘরে কাজ করে
- ঘ. দায়ি পোশাক পরতে পারেনা

অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উভয় দাও।

তথ্যীর সাজগোজের শখ। কিন্তু প্রসাধনী ক্রয়ের সামর্থ্য তার বাবা-মায়ের নেই। ধনীর ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। স্বামী প্রায়ই গরিবের মেয়ে বলে ধিকার দিয়ে তথ্যীকে শারীরিক নির্ধারণ করত। তথ্যী এক পর্যায়ে বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসে। সে উপলক্ষ্মি করে, বিস্তৈ-বিশেষ মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়।

৩. উক্তিপক্ষে “নেকলেস” গল্লের যেসব ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো—

- i. মানসিক দৃঢ়তা
- ii. পরশ্চীকাতরতা
- iii. আত্ম-সচেতনতা

নিচের কোনটি ঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত ভাবের বৈপরীত্যের প্রতিফলন যে বাক্যে—

- ক. যত সব সুরক্ষিপূর্ণ ও বিলাসিতার বস্তু আছে, সেগুলির জন্যই তার জন্ম হয়েছে
- খ. মুরগির পাখনা খেতে খেতে মুখে সিংহ-মানবীর হাসি নিয়ে কান পেতে শুনবে চুপি চুপি বলা প্রণয়লীলার কাহিনি রোজ সকালে সে আবর্জনা নিয়ে রাস্তায় ফেলে
- গ. মাদাম লোইসেলকে দেখলে এখন বয়ক্ষা বলে মনে হয়
- ঘ. সামান্য একটি বস্তুতে কী করে একজন ধ্বংস হয়ে যেতে আবার বাঁচতেও পারে



সূজনশীল প্রশ্ন

মেধাবী রুবিনার বাবা খুব সামান্য বেতনে চাকরি করেন। তার সহপাঠীরা সকলেই অবস্থাপন্ন পরিবারের। সহপাঠীদের পোশাক, জীবনাচরণের সঙ্গে রুবিনার কিছুতেই খাপ খায় না। তবু তা নিয়ে সে মোটেই হীনস্মরণযোগ্য ভোগে না। তার ধনী সহপাঠীরাও রুবিনার বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে তার মেধাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। নিজের কঠোর পরিশ্রমে রুবিনা পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করে। আজ তিনি একজন বড় কর্মকর্তা।

- ক. বন্দুক কিনতে মসিয়ে কত ট্র্যাণ্স সঞ্চয় করেছিল?
- খ. মাদাম লোইসেল আমজ্ঞণ-পত্র টেবিলের উপর নিক্ষেপ করেন কেন?
- গ. রুবিনার সঙ্গে মাদাম লোইসেলের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক্ষিণি বর্ণনা কর।
- ঘ. পারম্পরিক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও পরিষত্তির দিক থেকে রুবিনা আর মাদাম লোইসেলের দুজনের জীবন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। –উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

কবিতা



۲۰۲۲-۲۰۲۳



মুকুন্দরার বারোমাস্যা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবি-পরিচিতি

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (আনুমানিক ১৫৪০-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর পিতা হৃদয় মিশ্র এবং মাতা দৈবকী। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দামুন্ডা গ্রামে। সম্ভবত ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুকুন্দরাম পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার আড়ুরা গ্রামে আশ্রয় নেন এবং সেখানকার জমিদারপুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে জমিদার রঘুনাথ রায়ের সভাকবিকৃপে তাঁরই প্রেরণায় ‘চট্টীমঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য এ কবিকর্মের জন্য জমিদার তাঁকে ‘কবিকঙ্গ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। মুকুন্দরামের পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল অসাধারণ। মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত সীমার মধ্যে থেকেও তিনি এতে বাস্তব জীবনচিত্র উপস্থাপনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে সাধারণ বাঙালি জীবন, সমকালীন সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা, মানব চরিত্র চিত্রণ, প্রকৃতি ও পরিবেশের বস্ত্রনিষ্ঠ বর্ণনা অসামান্য ক্লপ লাভ করেছে। গণজ্ঞীবনের করণ চিত্র বিশ্বস্ততার সাথে অক্ষেনের জন্য তাঁকে দুঃখবাদী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও তাঁর কাব্য মানবজীবনরসে পূর্ণ। স্বত্বাগত কবিত্বশক্তির প্রসাদে তিনি তাঁর কাব্যে নাট্যশূণ্য ও উপন্যাসের বর্ণনা-নেপুণ্যের সমন্বয় ঘটান। তাঁকে বাংলা সাহিত্যের উপল্যাসিকদের অঞ্চলুক বলা হয়ে থাকে।

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী ।

ভাঙ্গা কুড়া ঘরখানি পত্রে ছাউনি ॥

ভেরাঞ্জাৰ খাম তাৰ আছে মধ্য ঘৰে ।

প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝাড়ে ॥

পাপিষ্ঠ জৈয়ষ্ঠ মাসে প্রাচণ তপন ।

খৰতৰ পোড়ে অঙ্গ রবিৰ কিৱিধ ॥

পাপিষ্ঠ জৈয়ষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জৈয়ষ্ঠ মাস ।

বেঙ্গচেৰ ফল খায়্যা করি উপবাস ॥

আষাঢ়ে পুৱিল মহী নবমেঘে জল ।

বড় বড় গৃহস্ত্রে টুটয়ে সম্বল ॥

মাহসেৰ পসৱা লয়্যা বুলি ঘৰে ঘৰে ।

কিছু খুদ-কুড়া মিলে উদৱ না পুৱে ॥

শ্রাবণে বৱিষে মেঘ দিবস রজনী ।

সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥

অভাগ্য মনে শুণি অভাগ্য মনে শুণি ।

কত শত খায় জোক নাহি খায় ফলী ॥

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরত্ব বাদল ।
নদনদী এককার আটদিকে জল ॥

আশ্চিনে অশিকা পূজা করে জনে জনে ।
ছাগল ঘহিম মেষ দিয়া বলি দানে ॥

উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা ।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিঞ্চা ॥

কার্তিক মাসেতে হয় হিমের প্রকাশ ।
যগজনে করে শীত-নিবারণ বাস ॥

নিযুক্ত করিলা বিধি সভার কাপড় ।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥

মাস মধ্যে মাস্যর আপনে ভগবান ।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভাকার ধান ॥

উদয় পুরিয়া অন্ন দৈবে দিলা যদি ।
যম-শম শীত তথি নিরমিলা বিধি ॥

পটুয়ে প্রবল শীত সুখী যগজন ।
তুলি পাড়ি পাছড়ি শীতের নিবারণ ॥

হরিণী বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা ।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা ॥

মাঘে কুঞ্জটিকা প্রত্ন মৃগয়াতে যায় ।
আঙ্কারে লুকায় মৃগ দেখিতে না পায় ॥

সহজে শীতল ঝাতু ফালুন যে মাসে ।
পোড়ায় রমণীগণ বসন্ত বাতাসে ॥

অনল সমান পোড়ে চইতের খরা ।
চালু সেরে বাঙ্কা দিনু মাটিয়া পাথরা ॥

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান ।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান ॥

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|---------|--------------|
| রামা | — রমণী । |
| কুড়া | — কুঁড়েঘৰ । |
| ভেরাঞ্জ | — রেড়িগাছ । |
| খাম | — খুঁটি । |



- পাপিষ্ঠ — জ্যেষ্ঠ মাসের তীব্র উষ্ণতায় ক্ষুক ফুল্লরা জ্যেষ্ঠকে পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত করেছে। কেননা এই মাসে খাবার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য তার জোটে না।
- খরতর — প্রচণ্ড।
- কিরণ — আলো।
- বেঙ্গচের ফল — বেউচ; টক-মিষ্টি জাতীয় বুনো ফল।
- উপবাস — উপোস। না খেয়ে থাকা।
- পুরিল — পূর্ণ হলো।
- মহী — পৃথিবী।
- টুট্টয়ে — টুটে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়।
- পসরা — পগ্য।
- বুলি — বুল থেকে বুলি। বুল অর্থ ঘুরে বেড়ানো। ফুল্লরা মাসের পসরা নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়।
- ঝুদ-কুড়া — চালের শুন্দ্রতম অংশ; সামান্য খাবার বিশেষ।
- বরিষে — বর্ষিত হয়।
- সিতাসিত — শুক্র ও কৃষ্ণপক্ষ। সিত ও অসিত; সিত - শুক্র বা সাদা; অসিত - কৃষ্ণ বা কালো।
- ফণী — সাপ।
- ভদ্রপদ — ভদ্র মাস।
- একাকার — একাকার।
- অধিকা পূজা — দুর্গাপূজা।
- বসন — পোশাক।
- করয়ে — করে।
- বনিতা — নারী বা মেয়ে।
- হিম — শীত বা ঠাণ্ডা।
- ঘগজন — জগৎ-জন বা জগজ্জন; জগৎ-বাসী বা জগদ্বাসী।
- সভার — সবার।
- হরিশের ছড় — হরিশের ছাল বা চামড়া।
- মাস্যর — অঞ্চলীয় মাসের প্রাচীন নাম।
- গোঠ — গোচারণ ভূমি।
- সভাকার — সবার।
- দৈব — দেবতা; ঈশ্বর; ভগবান।

| | |
|---------------------------------|--|
| য়ম-শম | — মৃত্যু । |
| তথি | — তথায়, সেখানে । |
| নিরমিলা | — নির্মাণ করলে । |
| বিধি | — বিধাতা । |
| পাড়ি | — যা পাঢ়ার জন্য । |
| পাছড়ি | — দামি বন্ত । |
| পুরাণ | — পুরনো । |
| খোসলা | — এক প্রকার গায়ের কাপড় । |
| দোপাটা | — দুই ফালি কাপড় জোড়া দেওয়া পরিধেয় বন্ত । |
| কুঞ্জটিকা | — কুয়াশা । |
| মৃগয়া | — শিকার । |
| মৃগ | — হরিণ । |
| চইত | — চৈত্র মাস । |
| চান্দু সেরে বাঙ্কা দিনু মাটিয়া | |
| পাথরা | — চালের জন্য বন্ধক দিলাম মাটির পাত্র । |
| আমানি | — পান্তাভাতের পানি । |
| অবধান | — শোনা । |

পাঠ-পরিচিতি

চন্দ্রমঙ্গল কাব্যের খুবই শুদ্ধ একটি অংশ ‘ফুল্লরার বারোমাস্যা’। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যকে বেশ কয়েকটি পালায় বিভক্ত করে গীত ও বাদ্য সহযোগে পরিবেশন করা হতো। এক মঙ্গলবারে কাহিনি আরম্ভ করে সমাপ্ত করা হতো আরেক মঙ্গলবারে। এ কারণে কাব্যগুলো হতো দীর্ঘ পরিসরের। চন্দ্রমঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ফুল্লরা ও কালকেতু চরিত্রকে ঘিরে। পশু শিকার ও মাংস বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করে তারা; অর্ধনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই বললেই চলে। ‘ফুল্লরার বারোমাস্যা’য় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বারো মাসের পটভূমিতে প্রকৃতির পরিবর্তন এবং ফুল্লরার দুঃখের প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করেছেন। ফুল্লরার কষ্টস্বরে শোনা যাচ্ছে তার অভাব, দারিদ্র্যয় গার্হস্ত্য জীবনের বর্ণনা। উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ‘বারোমাসী’ একটি বিশেষ কাব্যরীতি, যেখানে সংযোজিত হতো জীবনযাপন অথবা নারীর বিবরণ বারোমাসভিক্তিক বিবরণ। বারোমাসী রচনায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাস্তবানুগ সূজ্জ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোন মাসে অধিকা পূজা হয়?

ক. জ্যৈষ্ঠ

খ. কার্তিক

গ. আশ্বিন

ঘ. শ্রাবণ



২। ফুল্লরা হরিণের ছড় পরে কেন?

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ক. বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য | খ. শীত নিবারণের জন্য |
| গ. হরিণের ছড় অনেক আরামপ্রদ বলে | ঘ. রোদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য |

৩। “অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিঞ্চা” এ চরণে প্রকাশ পেয়েছে—

- i. হতাশা
- ii. ক্ষোভ
- iii. আক্ষেপ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুলেখার স্বামী সামান্য কেরানি। অল্প আয়ে খুব কষ্টে সংসার চালায় সুলেখা। সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দর্জির কাজ করে সে। তার জীবনের কোনো বিশেষ শখ কখনো পূর্ণতা পায় নি। কিন্তু এ নিয়ে স্বামীর প্রতি কোনো অভিযোগ নেই তার।

৪. উদ্দীপকের সুলেখা ও ‘ফুল্লরার বারোমাস্য’ কবিতার ফুল্লরার মধ্যে কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ক. মাতৃস্নেহ | খ. স্বামীর প্রতি অগাধ ভক্তি |
| গ. বাঙালির চিরস্মৃত রমণীমূর্তি | ঘ. সংসারের প্রতি মমত্বোধ |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিমা বেগম স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার চালাতে অন্যের বাড়িতে কাজ করে। ধাকার ঘর ছাড়া তার অন্য কোনো সম্পদ নেই। সংসারে অভাব অন্টন লেগেই থাকে। ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো তিনবেলা খেতে দিতে না পারলেও তাদেরকে সে ক্ষুলে পাঠায় এবং স্পন্দ দেখে একদিন তার দুঃখ কষ্টের অবসান হবে।

ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন যুগের কবি?

খ. ফুল্লরা জ্যৈষ্ঠ মাসকে পাপিষ্ঠ বলেছে কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের রহিমা মধ্যে ‘ফুল্লরার বারোমাস্য’ কবিতার ফুল্লরার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে দিকটি ফুটে উঠে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘অবস্থাগত সাদৃশ্য থাকলেও দুঃখকে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে রহিমা ও ফুল্লরার মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান’— বিশ্লেষণ কর।



ଝାତୁ ବର୍ଣନ

ଆଲାଓଳ

କବି-ପରିଚିତି

ଆଲାଓଳ ସତେରୋ ଶତକେର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି । ଆନୁମାନିକ ୧୬୦୭ ଖ୍ରୀଟାବ୍ଦେ ଫତେହାବାଦ ପରଗନାର (ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରିଦପୁର ଜ୍ଞାନ) ଜାଲାଲପୁରେ ତିନି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତରକଣ ବସିଥେ ଜ୍ଞାନପଥେ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ସାହୀର ସମଯେ ତା'ର ପିତା ଓ ତିନି ପର୍ତ୍ତନିଜ ଜଳଦସ୍ୱଦେର କବଳେ ପଡ଼େନ । ଏହି ଆକ୍ରମଣେ ତା'ର ପିତା ନିହତ ହନ । ତିନି ଭାଗ୍ୟକୁ ବେଂଚେ ଆରାକାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହନ । ସେଥାନେ ପ୍ରଥମେ ଆରାକାନ ରାଜେର ସେନାଦଲେ କାଜ ପାଲ ତିନି; ତୁମେ ରାଜଦରବାରେର ପ୍ରଧାନ ଅମାତ୍ୟ ମାଗନ ଠାକୁରେର କୃପାଦୃଷ୍ଟ ଲାଭ କରେନ ଏବଂ ରାଜସଭାଦତ୍ତୁଙ୍କ ହନ । ତା'ରେଇ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାଯ ଏବଂ କାବ୍ୟପ୍ରତିଭା ଓ ବିଦ୍ୟାବୁନ୍ଦିର ଗୁଣେ ଆଲାଓଳ ‘ପଞ୍ଚାବତୀ’ କାବ୍ୟ ରଚନା କରେନ । ରାଜସଭାର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଦହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ସାହଚର୍ତ୍ତରେ ଥେକେ ତିନି କାବ୍ୟଚର୍ଚା କରେଛେ । ତା'ର ରଚନାଯ ନାଗରିକ ଚେତନା ଓ ରୁଚିର ଛାପ ସୁନ୍ପଟ । ସଂକ୍ଷତ, ଆରବି, ଫାରସିସହ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଯ ବ୍ୟୁତପନ୍ନ ଆଲାଓଳ ଅସାଧାନ୍ୟ ପାଞ୍ଜିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଛିଲେନ । ଶିଳ୍ପକୁଶଳୀ ଏହି କବିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାର ମଧ୍ୟେ ରାଯେଛେ— କାବ୍ୟ : ‘ସମ୍ବୁଦ୍ଧମୂଳକ ବଦିଉଜ୍ଜ୍ଵାମାଳ’, ‘ହଞ୍ଚ ପରକର’, ‘ସିକାନ୍ଦରମାମା’; ମୌତିକବିତା : ‘ତୋହଫା’; ସଙ୍ଗୀତବିଷୟକ କାବ୍ୟ : ‘ରାଗଭାଲନାମା’ ।

ଆଲାଓଳ ୧୬୮୦ ଖ୍ରୀଟାବ୍ଦେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେନ ।

ପ୍ରଥମେ ବସନ୍ତ ଝାତୁ ନବୀନ ପତ୍ରବ ।
ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଆଗେ ପାହେ ମଧ୍ୟେ ସୁମାଧବ ॥
ମଲ୍ଲଯା ସମୀର ହୈଲା କାମେର ପଦାତି ।
ମୁକୁଲିତ କୈଳ ତବେ ବୃକ୍ଷ ବନସ୍ପତି ॥
କୁସୁମିତ କିଂଶୁକ ସଘନ ବନ ଲାଲ ।
ପୁଣ୍ପିତ ସୁରଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଲବଙ୍ଗ ଶୁଲାଲ ॥
ଭରରେର ବକ୍ଷାର କୋକିଲ କଲରବ ।
ଶୁନିତେ ଯୁବକ ମନେ ଜାଗେ ଅନୁଭବ ॥
ନାନା ପୁଣ୍ପ ଯାଳା ଗଲେ ବଡ଼ ହରାଷିତ ।
ବିଚିତ୍ର ବସନ ଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ ॥

ନିଦାନ ସମ୍ରା ଅତି ପ୍ରଚ୍ଛ ତପନ ।
ରୌଦ୍ର ଆସେ ରହେ ଛାଯା ଚରଣେ ସରଗ ॥
ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପକ ମାଲ୍ୟ ମଲ୍ଲଯା ପବନ ।
ସତତ ଦମ୍ପତ୍ତି ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପିତ ମଦନ ॥

ପାବନ ସମୟ ଘନ ଘନ ଗରାଜିତ ।
ନିର୍ଭୟେ ବରିଯେ ଜଳ ଚୌଦିକେ ପୂରିତ ॥
ଘୋର ଶଦେ କୈଳାସେ ମହାର ରାଗ ଗାଏ ।



ଦାଦୁରୀ ଶିଥୀନି ରବ ଅତି ମନ ଭାଏ ॥
 କୌଟକୁଳ ରବ ପୁଣି ବକ୍ଷାରେ ବକ୍ଷାରେ ।
 ଶୁନିତେ ଯୁବକ ଚିତ୍ତ ହରାଯିତ ଡରେ ॥
 ଆଇଲ ଶାରଦ ଖାତୁ ନିର୍ମଳ ଆକାଶେ ।
 ଦୋଳାଏ ଚାମର କେଶ କୁସୁମ ବିକାଶେ ॥
 ନବୀନ ଖଞ୍ଜନ ଦେଖି ବଡ଼ହି କୌତୁକ ।
 ଉପଜିତ ଯାମିନୀ ଦମ୍ପତ୍ତି ମନେ ସୁଖ ॥
 ପ୍ରବେଶେ ହେମତ ଖାତୁ ଶୀତ ଅତି ଯାଯ ।
 ପୁଞ୍ଜ ତୁଳ୍ୟ ତାମ୍ବୁଳ ଅଧିକ ସୁଖ ହୟ ॥
 ଶୀତେର ତରାସେ ରବି ତୁରିତେ ଲୁକାଏ ।
 ଅତି ଦୀର୍ଘ ସୁଖ ନିଶି ପଲକେ ପୋହାଏ ॥
 ପୁଞ୍ଜ ଶଯ୍ୟା ଭେଦ ଭୂଲି ବିଚିତ୍ର ବସନ ।
 ଉରେ ଉରେ ଏକ ହୈଲେ ଶୀତ ନିବାରଣ ॥
 କାଫୁର କଞ୍ଚରୀ ଚୁଯା ଯାବକ ସୌରତ ।
 ଦମ୍ପତ୍ତିର ଚିନ୍ତେତ ଚେତନ ଅନୁଭବ ॥

ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ ଟୀକା

- ସୁମାଧୁର
- ଉତ୍ତମ ବସନ୍ତକାଳ; ସୁବନ ବସନ୍ତକାଳ ।
- ମଲଯା ସମୀର
- ଦଖିନା ମ୍ଲିଙ୍କ ବାତାସ ।
- କାମେର
- କାମଦେବ-ଏର । ପ୍ରେମେର ଦେବତାର ।
- ପଦାତି
- ପଦଚାରୀ ସୈନିକ । ସଂବାଦ ବାହକ ।
- କୈଲ
- କରିଲ ।
- ବନ୍ଦପତ୍ତି
- ଯେ ବୃକ୍ଷେ ଫୁଲ ଧରେ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଫଳ ହୟ । ଅନ୍ତର୍ଥ, ବଟ ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷ ।
- କିଞ୍ଚକ
- ପଲାଶ ଫୁଲ ବା ବୃକ୍ଷ ।
- ସୁରଙ୍ଗ
- ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ । ଶୋଭନ ବର୍ଣ୍ଣ ।
- ମଞ୍ଜୁ
- ବେଳିଫୁଲ । ବେଳଫୁଲ ।
- ଲବଙ୍ଗ
- ଏକଥକାର ଫୁଲ । ମସଳୀ ।
- ଶୁଲାଳ
- ଆବିର । ଫାଗ ।
- ବକ୍ଷାର
- ବୀଣାଯନ୍ତ୍ରେର ଶର୍ଦ । ଶୁଞ୍ଜନ ।
- ନିଦାଘ
- ଶ୍ରୀଅକାଳ । ଉତ୍ତାପ ।
- ସରଣ
- ଶରଣ ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହରିତ । ଆଶ୍ରୟ ।
- ବରିଷେ
- ବର୍ଷିତ ହଚେ । ଅଜନ୍ତ୍ର ଧାରାଯ ବୃତ୍ତିପାତ ।
- ପୂରିତ
- ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭରା । ଭରପୁର ।



| | |
|------------|---|
| কৈলাস | - শিবের বাসস্থান। হিমালয় পর্বতের একটি অংশ। |
| মন্ত্রার | - মালহার; সংগীতের একটি রাগ; রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া হয়। |
| দাদুরী | - মাদি ব্যাঙ। ডেকী। |
| শিখিনী | - ময়ূরী। |
| অতি মন ভাএ | - মনে অনেক ভাব জাগে। |
| পুনি | - পুনরায়। |
| চামর | - পাখা বিশেষ। চমরী— গরুর পুচ্ছ দিয়ে তৈরি পাখা। |
| খঞ্জন | - এক জাতীয় চপ্পল পাথি। |
| উপজিত | - উপস্থিত হয়। উৎপন্ন। |
| তাম্বুল | - পান। একপ্রকার পাতা যা সুপারি চুন ইত্যাদি সহযোগে খাওয়া হয়। |
| তরাসে | - ভয়ে। আসে। |
| তুরিতে | - দ্রুত। শৈঘ্ৰ। তাড়াতাড়ি। |
| কাফুর | - কর্পুর। গুড় গন্ধনব্য বিশেষ। |
| কষ্টরী | - মৃগনাড়ি। |
| চুয়া | - গন্ধনব্য। একপ্রকার সুগন্ধি ঘন নির্যাস। |
| যাবক | - আলতা। |

পাঠ-পরিচিতি

আলাওলের “ঝাতু বর্ণন” কবিতাটি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘পঞ্চাবতী’র ঝাতু বর্ণন খণ্ড থেকে সংক্ষেপিত আকারে সংকলিত। প্রকৃতির বিচির রূপ অভিব্যক্ত হয় আবহাওয়া ও বড়খাতুর প্রভাবে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগে মুগে মানুষ হয়েছে মুঝ। মুঝ হয়েছেন সংবেদনশীল কবিগণও। ঝাতু বর্ণনা মধ্যযুগের কাব্যের এক স্বাভাবিক গ্রীতি।

কবি আলাওল এই ঝাতু বর্ণনায় প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের সাথে মানব মনের সম্পর্ক ও প্রভাব তুলে ধরেছেন। বসন্তের নবীন পত্রপুষ্প, মলয় সমীর, ভূমর-গুঞ্জন ও কোকিলের কৃত্তান; শ্রীমের প্রচণ্ড তপনের রৌদ্র আস ও ছায়ার শুরুত; বর্ধার মেঘ গর্জন, অবিরল বৃষ্টিজলে স্নাত প্রকৃতি, একটানা দাদুরী শিখিনী রব; শরতের নির্মল আকাশ, ফুলের চামর দোলা, খঞ্জনার নাচ; শরৎ বিদায়ে হেমন্তে পুষ্পতুল্য তাম্বুলের সুখ এবং শীতের আসে তুরিত সূর্য দ্বুবে যাওয়া, রজনীতে সুখী দম্পত্তির চিন্তসুখ ইত্যাদি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে কবিতাটিতে। বড়খাতুর বর্ণনার ভেতর দিয়ে কবি বাংলার প্রকৃতির রূপ-মাধুরী তুলে ধরেছেন। যড়খাতুর বৈচির্য বাংলার নিসর্গ-রূপকে যে সমৃদ্ধ করেছে তা এ কাব্যাংশ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “খাতু বর্ণন” কবিতায় প্রথমে কোন খাতুর বর্ণনা আছে?

ক. গ্রীষ্ম

খ. বর্ষা

গ. শরৎ

ঘ. বসন্ত

২. ‘নিদাঘ সমএ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. প্রচণ্ড গরমকাল

খ. আবহাওয়া ঠাণ্ডা

গ. পীড়নের সময়

ঘ. বর্ষার আগমন

নিচের উক্তীপক্টি পড়ে ও ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

আসে বসন্ত ফুলবনে

জাগে বনভূমি সুন্দরী।

৩. কবিতাখে “খাতু বর্ণন” কবিতার বসন্ত খাতুর কোন দিকটি উল্লেচিত হয়েছে?

ক. সুন্দর শোভা

খ. পুষ্পমাল্য

গ. মল্লার রাগ

ঘ. মলয় সমীর

৪. উক্ত দিকটি নিচের কোন পঞ্জিকিতে প্রকাশ পেয়েছে—

ক. চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন

খ. কুসুমিত কিংসুক সঘন বন লাল

গ. পাবন সময় ঘন ঘন গরজিত

ঘ. নবীন খণ্ডন দেখি বড়হি কৌতুক

সূজনশীল প্রশ্ন

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে

বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

ক. মল্লার কী?

খ. “রৌদ্র আসে রহে ছায়া চরণে সরণ” বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে “খাতু বর্ণন” কবিতার বসন্ত খাতুর সাদৃশ্য আছে— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্দীপকটি “খাতু বর্ণন” কবিতার সমষ্টি ভাব ধারণ করেনি’— মূল্যায়ন কর।

স্বদেশ সৈক্ষরচন্দ্র গুপ্ত

কবি-পরিচিতি

সৈক্ষরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই মার্চ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চবিশ পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিনামায়ণ দাশগুপ্ত। সৈক্ষরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ – উভয়েরই লক্ষণ দেখা যায়। তাই তিনি বাংলা সাহিত্যে যুগসমৰ্পণের কবি হিসেবে পরিচিত। বিচ্ছে অলংকারের ব্যবহার এবং ব্যঙ্গ-কৌতুক তাঁর কবিতার অন্যতর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনই তাঁকে বিদ্রোপ্ত্বণ করে তুলেছিল। তিনি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর পর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পাদনায় তাঁর কাব্যসংগ্ৰহ প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: রামচন্দ্র গুপ্ত সংগৃহীত ‘কবিতার সংকলন’, বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘কাব্যসংগ্ৰহ’ এবং কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ‘সংগ্ৰহ’।

তিনি ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

জান না কি জীব তুমি,
সে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে॥
ভূমিতে করিয়ে বাস,
জাগিলে না দিবা বিভাবৰী।
কতকাল হরিয়াছ,
জননী জঠর পরিহৱি॥
যার বলে বলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী,
ভঙ্গিভাবে কর তারে স্নেহ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আৱ।
সুখাকরে কত সুধা,
স্বদেশের শ্রিয় প্ৰেম,
ভাত্তভাব ভাবি মনে,
তার চেয়ে রত্ন নাই আৱ।
কত রূপ স্নেহ কৱি,
প্ৰেমপূৰ্ণ নয়ন মেলিয়া।
দেখ দেশবাসীগণে,
দেশের কুকুর ধৱি,
বিদেশের ঠাকুৰ ফেলিয়া॥



স্বদেশের প্রেম যত,
 সেই মাত্র অবগত,
 বিদেশেতে অধিবাস যাব।
 ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে,
 চিত্রপটে চিত্র করে,
 স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥
 স্বদেশের শান্তমতে,
 চল সত্য ধর্মপথে,
 সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
 বৃক্ষি কর মাতৃভাষা,
 পুরাও তাহার আশা,
 দেশে কর বিদ্যা বিতরণ ॥

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

| | | |
|---------|---|---|
| জীব | - | প্রাণী। এ কবিতায় ভারতবাসীকে বোঝানো হয়েছে। |
| পুরাও | - | পূর্ণ কর। |
| বিভাবৰী | - | রাত্রি। |
| হরিয়াছ | - | হরণ করিয়াছ। ‘এখানে যাপন করেছ’ অর্থে ব্যবহৃত। |
| জঠর | - | পেট। উদর। |
| পরিহরি | - | পরিহার করে। |
| বলিতেছ | - | বল লাভ করছ। |
| চালিতেছ | - | চালাচ্ছ। |
| বলী | - | বলবান। |
| হেম | - | স্বর্ণ |
| সুধাকর | - | ঢাঁদ। |
| সুধা | - | জ্যোৎস্না। অমৃত। |
| অধিবাস | - | বাসস্থান। |

পাঠ-পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “স্বদেশ” কবিতাটি সংক্ষেপিত আকারে সংকলিত হয়েছে ‘কবিতা সংগ্রহ’ প্রস্ত থেকে। এটি একটি স্বদেশপ্রেমের কবিতা। কবি স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে সন্তানতুল্য দেশবাসীকে তার প্রতি যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মাতৃভূমির শক্তিতে বলীয়ান স্বদেশবাসীকে তিনি ভক্তিভাব নিয়ে স্বদেশের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কবির স্বাজ্ঞায়বোধ এ কবিতায় এমনই প্রধর যে, তিনি বিদেশের মূল্যবান-কিছু ত্যাগ করেও স্বদেশের তুচ্ছ-কিছুকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। কবির কাছে, স্বদেশের শুভ বা কল্যাণ মণি মুক্তার চেয়ে দামি। নিজ দেশের প্রতি মমত্ব ও প্রেম সে-ই যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে বিদেশে থাকে। দেশবাসীর পক্ষে সত্য ধর্মপথে চলে মাতৃভাষা চর্চা, জ্ঞান অঙ্গেষণ ও বিদ্যা বিতরণের মাধ্যমেই স্বদেশমাতার আশা পূর্ণ করা সম্ভব।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হেম শব্দের অর্থ—

ক. সুখাকর

খ. রহম

গ. মুক্তা

ঘ. স্বর্ণ

২. “থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে” বলতে কী বোবানো হয়েছে?

ক. মাতৃভূমির প্রতি অবজ্ঞা

খ. মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা

গ. জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ

ঘ. জন্মভূমির প্রতি আশ স্বীকার

নিচের উক্লীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

বঙ্গ আমার জননী আমার

ধাত্রী আমার আমার দেশ

কেল গো মা তোর শুক্ষ নয়ন

কেল গো মা তোর রুক্ষ কেশ

...

কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য

কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ

সংকোচি মিলিত কঢ়ে

ডাকে যখন আমার দেশ

৩. কবিতাংশের সঙ্গে “স্বদেশ” কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. দুঃখবোধ

খ. হীনমন্যতা

গ. দেশপ্রেম

ঘ. জিজ্ঞাসা

৪. উক্ত দিকটি নিচের কোন পঞ্জিকির সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. স্বদেশের সকল ব্যাপার

খ. ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ

গ. স্বদেশের শুভ সমাচার

ঘ. স্বদেশের প্রিয় প্রেম

সূজনশীল প্রশ্ন

মায়ের দেয়া মোটা কাপড়

মাথায় তুলে নে রে ভাই।

দীন দুঃখিনী মা যে আমার

তার বেশি আর সাধ্য নাই।

ক. দুঃখরচন্দ্র গুণ সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকাটির নাম কী?

খ. “তার চেয়ে রত্ন নাই আর” বলতে কী বোবানো হয়েছে?

গ. কবিতাংশটি যে দিক থেকে “স্বদেশ” কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘কবিতাংশটি “স্বদেশ” কবিতার সমষ্টি দিক উন্মোচন করেনি’— মূল্যায়ন কর।



বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি-পরিচিতি

আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি থামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহাঙ্গী দেবী। মায়ের তত্ত্বাবধানে ধার্মেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার হিন্দু কলেজের স্কুল শাখায় ভর্তি হন। সেখানে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রিষ্ঠধর্ম ধ্রুণ করে তিনি পিতৃপ্রদত্ত নামের উপরতে ‘মাইকেল’ শব্দ যোগ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে তাঁকে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে শিবপুরের বিশ্বপ্রসা কলেজে ভর্তি হতে হয়। সেখানেই তিনি প্রিক, লাতিন ও হিন্দু ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। মধুসূদন বহু ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ইংরেজি ও সংস্কৃতসহ ফরাসি, জার্মান এবং ইতালীয় ভাষাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। কিন্তু বিদেশি ভাষার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মাত্তভাষার কাছে ফিরে আসেন। মধুসূদন-পূর্ব হাজার বছরের বাংলা কবিতার ছন্দ ছিল পয়ার। একটি চরণের শেষে আর একটি চরণের মিল ছিল ওই ছন্দের অনড় প্রথা। মধুসূদন বাংলা কবিতার এ প্রথাকে ডেঙে দিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ছন্দকে বলা হয় ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’। তবে এটি বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই নবরূপায়ণ। বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা বা সন্তোরেও প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা নাটকের উষ্টবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি। আধুনিক নাটক ‘শর্মিষ্ঠা’, ‘পঞ্চাবঙ্গী’ ও ‘কৃষ্ণকুমারী’ এবং প্রহসন ‘একেই কি বলে সত্যতা?’ ও ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে ঝোঁ’ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : ‘তিলোভয়াস্ত্ব কাব্য’, ‘মেঘনাদবধ-কাব্য’, ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’, ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’, ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলি’।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯এ জুন কলকাতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুবরণ করেন।

“এতক্ষণে”- অরিদম কহিলা বিষাদে-

“জানিনু কেঘনে আসি লক্ষণ পশিল
রক্ষঃপুরো। হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শুলিশভুনিত
কুষ্টকর্ণ? ভাত্তপুত্র বাসববিজয়ী!
নিজগ্রহণ তাত, দেখাও তক্ষরে?
চপালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অন্তাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লক্ষার কলক আজি ভঙ্গিব আহবে।”



উত্তরিলা বিভীষণ, “বৃথা এ সাধনা,
 ধীমান! রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে
 তাঁহার বিগঞ্চ কাজ করিব, রক্ষিতে
 অনুরোধ?” উত্তরিলা কাতরে রাখণি;—
 “হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছ মরিবারে!
 রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
 আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
 স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাপন ললাটে;
 পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
 ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
 কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?
 কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
 করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
 যায় কি সে কতু, প্রতু, পক্ষিল সলিলে,
 শৈবালদলের ধাম? মুগেন্দ্র কেশরী,
 কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
 মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
 অবিদিত নহে বিষ্ণু তোমার চরণে।
 স্ফুর্দ্ধমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
 অন্তর্হীন ঘোধে কি সে সম্রোধে সংগ্রামে?
 কহ, মহারায়ী, এ কি মহারায়ীপ্রাপ্তা?
 নাহি শিশু লক্ষ্মপুরে, শুনি না হাসিবে
 এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
 এখনি! দেখিব আজি, কোনু দেববলে,
 বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
 দেব-দৈত্য-নর-রশ্মি, স্বচক্ষে দেখেছ,
 রক্ষণশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কী দেখি
 ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে?
 নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশ্চিল
 দস্তী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
 তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে



বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভয়ে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,— আত্-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?”

মহামন্ত্র-বলে যথা ন্মশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রঞ্জী
রাবণ-অনুজ, লক্ষ্মি রাবণ-আত্মজে;
“নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্তস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কলক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, তুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?”

রুষিলা বাসবত্রাস। গঞ্জীরে যেমতি
নিশীথে অস্তরে মন্ত্রে জীমৃতেন্দ্র কোশি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—“ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিধ্যাত জগতে
তুমি; — কেৱল ধর্ম মতে, কহ দাসে, শনি,
জ্ঞাতিত্ত্ব, আত্মত্ত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, শুণবান যদি
পরজন, শুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেযঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিসে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।”

[নির্বাচিত অংশ]



শব্দার্থ ও টীকা

- বিভীষণ** — রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর। রাম-রাবণের যুদ্ধে স্বপক্ষ ত্যাগকারী। রামের ভক্ত।
- ‘এতক্ষণে’—অরিন্দম কহিলা** — রংজন্ধার নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের অনুগ্রহেশের অন্যতম কারণ যে পথপ্রদর্শক বিভীষণ, তা অনুধাবন করে বিস্মিত ও বিপন্ন মেঘনাদের প্রতিক্রিয়া।
- অরিন্দম** — অরি বা শঙ্খকে দমন করে যে। এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।
- পশ্চিম** — প্রবেশ করল।
- রক্ষঃপুরে** — রাক্ষসদের পুরীতে বা নগরে। এখানে নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগারে।
- রক্ষঃশ্রেষ্ঠ** — রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, রাবণ।
- তাত** — পিতা। এখানে পিতৃব্য বা চাচা অর্থে।
- নিকষা** — রাবণের মা।
- শূলীশম্ভুনিভ** — শূলপাণি মহাদেবের মতো।
- বুস্তকর্ণ** — রাবণের মধ্যম সহোদর।
- বাসববিজয়ী** — দেবতাদের রাজা ইন্দ্র বা বাসবকে জয় করেছে যে। এখানে মেঘনাদ। একই কারণে মেঘনাদের অপর নাম ইন্দ্রজিঙ্গ।
- তক্ষ** — চোর।
- গঞ্জ** — তিরক্ষার করি।
- রামানুজ** — রাম+অনুজ = রামানুজ। এখানে রামের অনুজ লক্ষণকে বোঝানো হয়েছে।
- শমন-ভবনে** — যমালয়ে।
- ভঙ্গির আহবে** — যুদ্ধধারা বিনষ্ট করব।
- আহবে** — যুদ্ধে।
- ধীমান্** — ধীসম্পন্ন। জ্ঞানী।
- রাঘব** — রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এখানে রামচন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে।
- রাধবদাস** — রামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ।
- রাবণি** — রাবণের পুত্র। এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।
- স্থাপিলা বিধুরে বিধি**
- স্থাগুর ললাটে** — বিধাতা চাঁদকে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন।
- বিধু** — চাঁদ।
- স্থাগু** — নিশ্চল।



- রক্ষোরথী — রক্ষকুলের বীর।
- রথী — রথচালক। রথচালনার মাধ্যমে যুদ্ধ করে যে।
- শৈবালদলের ধাম — পুকুর। বন্ধ জলাশয়।
- শৈবাল — শেওলা।
- মৃগেন্দ্র কেশরী — কেশরযুক্ত পশুরাজ সিংহ।
- মৃগেন্দ্র — পশুরাজ সিংহ।
- কেশরী — কেশরযুক্ত প্রাণী। সিংহ।
- মহারথী — মহাবীর। শ্রেষ্ঠ বীর।
- মহারথীপ্রথা — শ্রেষ্ঠ বীরদের আচরণ-প্রথা।
- সৌমিত্রি — লক্ষণ। সুমিত্রার গর্ভজাত সন্তান বলে লক্ষণের অপর নাম সৌমিত্রি।
- নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগার — লঙ্ঘণ। পুরুষার গর্ভজাত সন্তান বলে লক্ষণের অপর নাম সৌমিত্রি।
‘মেঘনাদবধ-কাব্যে’ যুদ্ধবাত্রার প্রাক্কালে নিরন্ত মেঘনাদ নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা বৈশ্বানর বা অগ্নিদেবের পূজারত অবস্থায় লক্ষণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে নিহত হয়।
- প্রগল্ভে — নির্ভীক চিত্তে।
- দষ্টী — দষ্ট করে যে। দাষ্টিক।
- নন্দন কানন — স্বর্গের উদ্যান।
- মহাযন্ত্র-বলে যথা —
- নন্দশিরঃ ফলী — মন্ত্রপূত সাপ যেমন মাথা নত করে।
- লক্ষ্মি — লক্ষ করে।
- ভর্ত্সনা — ভর্ত্সনা বা তিরক্ষার করছ।
- মজাইলা — বিপদগ্রস্ত করলে।
- বসুধা — পৃথিবী।
- তেঁই — তজ্জন্য। সেহেতু।
- রংশিলা — রাগান্বিত হলো।
- বাসবত্রাস — বাসবের ভয়ের কারণ যে মেঘনাদ।
- মন্ত্র — শব্দ। ধ্বনি।
- জীমৃতেন্দ্র — মেঘের ডাক বা আওয়াজ।
- বলী — বলবান। বীর।
- জলাঞ্জলি — সম্পূর্ণ পরিত্যাগ।

শান্তে বলে, ...পরঃ

পরঃ সদা!

- শান্তমতে শুণহীন হলেও নির্গুণ অজনই প্রেয়, কেননা শুণবান হলেও পর সর্বদা পরই থেকে যায়।

নীচ

- হীন। নিকৃষ্ট। ইতর।

দুর্মতি

- অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি।

পাঠ-পরিচিতি

“বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ” কাব্যাংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ-কাব্যে’-র ‘বধো’ (বধ) নামক ষষ্ঠ সর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে। সর্বমোট নয়টি সর্গে বিন্যস্ত ‘মেঘনাদবধ-কাব্যে’র ষষ্ঠ সর্গে লক্ষণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে অসমসাহসী বীর মেঘনাদের। রামচন্দ্র কর্তৃক দ্বীপরাজ্য স্বর্ণলঙ্কা আক্রান্ত হলে রাজা রাবণ শক্রের উপর্যুপরি দৈব-কৌশলের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন। ভ্রাতা কুচকর্ণ ও পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদকে পিতা রাবণ পরবর্তী দিবসে অনুষ্ঠেয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে বরণ করে নেন। যুদ্ধজয় নিশ্চিত করার জন্য মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করতে মনস্তির করে। মায়া দেবীর আনুকূল্যে এবং রাবণের অনুজ বিভীষণের সহায়তায়, লক্ষণ শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশে সমর্থ হয়। কপট লক্ষণ নিরস্ত্র মেঘনাদের কাছে যুদ্ধ প্রার্থনা করলে মেঘনাদ বিস্ময় প্রকাশ করে। শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগারে লক্ষণের অনুপ্রবেশ যে মায়াবলে সম্পন্ন হয়েছে, বুঝতে বিলম্ব ঘটে না তার। ইতোমধ্যে লক্ষণ তলোয়ার কোষমুক্ত করলে মেঘনাদ যুদ্ধসাজ গ্রহণের জন্য সময় প্রার্থনা করে লক্ষণের কাছে। কিন্তু লক্ষণ তাকে সময় না দিয়ে আক্রমণ করে। এ সময়ই অকস্মাত যজ্ঞাগারের প্রবেশপথের দিকে চোখ পড়ে মেঘনাদের; দেখতে পায় বীরযোদ্ধা পিতৃব্য বিভীষণকে। যুদ্ধুর্তে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায় তার কাছে। খুল্লতাত বিভীষণকে প্রত্যক্ষ করে দেশপ্রেমিক নিরস্ত্র মেঘনাদ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, সেই নাটকীয় ভাষ্যই “বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ” অংশে সংকলিত হয়েছে। এ অংশে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাসযাত্কর্তা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে ঘৃণা। জ্ঞাতিত্ত, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসন্তানের সংহতির গুরুত্বের কথা যেমন এখানে ব্যক্ত হয়েছে তেমনি এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ঘড়ঘন্টকে অভিহিত করা হয়েছে নীচতা ও বর্বরতা বলে।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্ত বালীকি-রামায়ণকে নবমূল্য দান করেছেন এ কাব্যে। মানবকেন্দ্রিকতাই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সারকথা। ওই নবজাগরণের প্রেরণাতেই রাম-লক্ষণ মধুসূদনের লেখনীতে হীনকল্পে এবং রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদ যাবতীয় মানবীয় শুণের ধারকরাপে উপস্থাপিত। দেবতাদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাম-লক্ষণ নয়, পুরাণের রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদের প্রতিই মধুসূদনের মমতা ও শ্রদ্ধা।

“বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ” কাব্যাংশটি ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পঞ্জিকির সঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্জিকির চরণাঙ্কের মিলহীনতার কারণে এ ছন্দ ‘অমিলাক্ষ্মি ছন্দ’ নামে সমধিক পরিচিত। এ কাব্যাংশের প্রতিটি পঞ্জিকি ১৪ মাত্রায় এবং ৮ + ৬ মাত্রার দুটি পর্বে বিন্যস্ত। লক্ষ করার বিষয় যে, এখানে দুই পঞ্জিকির চরণাঙ্কিক মিলই কেবল পরিহার করা হয়নি, যতিপাত বা বিরামচিহ্নের স্বাধীন ব্যবহারও হয়েছে বিষয় বা বক্তব্যের অর্থের অনুষঙ্গে। এ কারণে ভাবপ্রকাশের প্রবহমানতাও কাব্যাংশটির ছন্দের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শমন-ভবন কী?

ক. দেবালয়

খ. যমালয়

গ. যজ্ঞাগার

ঘ. বাসবালয়

২. ‘হায় তাত উচিত কি তব এ কাজ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. কুষ্টকর্ণের সহায়তা

খ. লক্ষ্মণের প্রবেশ

গ. বিভীষণের সহায়তা

ঘ. রামচন্দ্রের আজ্ঞা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মতিউল একটি সফল অপারেশনের পর তারাপুর গ্রামে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের রাজাকার ইন্দ্রিস তথ্যটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দিল। হানাদার বাহিনী এসে কমান্ডার মতিউলকে মেরে ফেলে। মতিউল প্রতিরোধের সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না।

৩. উদ্দীপকের ইন্দ্রিস চরিত্রটি “বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ” কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে?

ক. কুষ্টকর্ণের

খ. বিভীষণের

গ. লক্ষ্মণের

ঘ. রামের

৪. উক্ত চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ চরণগুলো হলো—

i. নিজ গৃহপথ, তাত দেখাও তকরে?

ii. রাঘব দাস আমি; কী প্রকারে/তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব।

iii. গতি যার মীচ সহ, মীচ সে দুর্মৰ্ত্তি।

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

শপথ নিয়েও পলাশির প্রান্তরে প্রধান সেনাপতি মির জাফর যুদ্ধে অংশ নেননি। রায়দুর্গত, উমিঁচাদ, জগৎশেষ যুদ্ধে অসহযোগিতা করেছেন। মোহনলাল ও মিরমর্দান বিশ্বাসঘাতক হননি। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হয়েছেন। মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

ক. কাকে রাবণি বলা হয়েছে?

খ. ‘প্রফুল্ল কমলে কৌটবাস’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি “বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ” কবিতার সঙ্গে যে দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি “বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ” কবিতার আংশিক রূপায়ণ মাত্র— মূল্যায়ন কর।



মানব-বন্দনা

অক্ষয়কুমার বড়াল

কবি-পরিচিতি

অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার চোরাবাগান এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। কলকাতার হেয়ার স্কুলে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। বিষ্ণু সেখানে অধ্যয়ন শেষ না-করেই কর্মজীবনে ঢলে যান। কর্মজীবনে তিনি ব্যাংক ও ইলিউরেল কোম্পানিতে ঢাকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন। থাতিঁচানিক শিক্ষা শেষ করতে না পারলেও নিজের চেষ্টায় তিনি প্রভৃতি জ্ঞান অর্জন করেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে ‘বঙ্দদর্শন’ পত্রিকার অঞ্চলিয় সংখ্যায় তাঁর প্রথম কবিতা “রজনীর মৃত্যু” প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের কাব্যে আবেগের আতিশয়ের চেয়ে ভাবগত সংহতি ও বুদ্ধিমত্ত্ব কল্পনাই প্রধান। তাঁর কাব্যে ইংরেজ কবি ব্রাউনিং-এর বিশেষ প্রভাব আছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রদীপ’। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: ‘কনকাঞ্জলি’, ‘ভূল’, ‘শঙ্খ’, ‘এষা’। এছাড়াও তাঁর কিছু অনুবাদ কবিতা ও গান রয়েছে।

অক্ষয়কুমার বড়াল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯এ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

১

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর
নেত্র মেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশ পানে – কারে ডেকেছিল,
দেবে না মানবে?
কাতর আহান সেই যেযে যেষে উঠি,
লুটি গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উভর,
ধরায় আগ্রহে?
সেই ক্ষুদ্র অন্ধকারে, মরুৎ গর্জনে,
কার অঙ্গেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত-স্ফুর্ধার্ত
খুঁজিছে স্বজন!

২

আরক্ষ প্রভাত সূর্য উদিল যথন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্বী অরণ্যে ভরা, কর্দমে পিছিল
সলিলে শিশিরে!
শাখায় ঝাপটি পাথা গরুড় চিৎকারে
কাণে সর্পকুল,



ସମୁଖେ ଶ୍ଵାପଦ-ସଂଘ ବଦନ ବ୍ୟାଦାନି
 ଆହାଡ଼େ ଲାକ୍ଷ୍ମୀ;
 ଦଂଶିଛେ ଦଂଶକ ଗାତ୍ରେ, ପଦେ ସରୀସୃପ,
 ଶୂନ୍ୟେ ଶୈନ ଉଡ଼େ;—
 କେ ତାହାରେ ଉଦ୍‌ଧାରିଲ? ଦେବ ନା ମାନବ —
 ପ୍ରତରେ ଲଙ୍ଘଦେ?

୩

ଶୀର୍ଷ ଅବସନ୍ନ ଦେହ, ଗତିଶକ୍ତିହୀନ,
 କୁଞ୍ଚାଯ ଅସ୍ତିର;
 କେ ଦିଲ ତୁଳିଆ ମୁଖେ କ୍ଷାଦୁ ପକ୍ଷଫଳ,
 ପତ୍ରପୁଟେ ନୀର?
 କେ ଦିଲ ମୁଛାୟେ ଅଣ୍ଟ? କେ ବୁଲାଳ କର
 ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଆଦରେ?
 କେ ନବ ପଲ୍ଲବେ ଦିଲ ରଚିଆ ଶଯନ
 ଆପନ ଗହରେ?
 ଦିଲ କରେ ପୁଞ୍ଜଙ୍ଗଛ, ଶିରେ ପୁଞ୍ଜଲତା,
 ଅତିଥି ସଂକାର!
 ନିଶୀଥେ ବିଚିତ୍ର ସୁରେ ବିଚିତ୍ର ଭାଷାଯ
 ସପନସପାର !!

୪

ଶୈଶବେ କାହାର ସାଥେ ଜଳେ ଝଲେ ଭରି
 ଶିକାର-ସନ୍ଧାନ?
 କେ ଶିଖାଲ ଧନୁର୍ବେଦ, ବହିତ୍ର ଚାଲନା,
 ଚର୍ମ ପରିଧାନ?
 ଅର୍ଦ୍ଧଦର୍କ ମୃଗମାଂସ କାର ସାଥେ ବସି,
 କରିଲୁ ଭକ୍ଷଣ?
 କାଟେ କାଟେ ଅଣ୍ଟି ଜ୍ଵାଳି କାର ହଣ୍ଡ ଧରି
 କୁର୍ଦ୍ଦନ ନର୍ତ୍ତନ?
 କେ ଶିଖାଲ ଶିଲାକୁପେ, ଅଖଥେର ମୂଳେ
 କରିତେ ପ୍ରଗାମ?
 କେ ଶିଖାଲ ଝାତୁଭେଦ, ଚନ୍ଦ୍ର-ସୂର୍ୟ ମେଘେ
 ଦେବ-ଦେବୀ ନାମ?



৫

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে
 হইনু বাহির?
 মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি,
 দধি-দুষ্ক-ক্ষীর?
 সায়াহ্নে কুটির দ্বারে কার কষ্ট সাথে
 নিবিদ উচ্চারি?
 কার আশীর্বাদ লয়ে অঞ্চি সাক্ষী করি
 হইনু সংসারী?
 কে দিল ঔষধি রোগে ক্ষতে প্রলেপন –
 স্নেহে অনুরাগে?
 কার ছন্দে – সোম গঙ্গে – ইন্দ্র অঞ্চি বাযু
 দিল যজ্ঞ ভাগে?

৬

যৌবনে সাহায্যে কার নগর পতন,
 আসাদ নির্মাণ?
 কার খাক সাম যজ্ঞঃ চরক সুশ্রুত,
 সংহিতা পুরাণ?
 কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
 পথ, ঘাট, মাঠ?
 কে আজ পৃথিবীরাজ – জলে হলে ব্যোমে
 কার রাজ্যপাট?
 পঞ্চভূত বশীভূত প্রকৃতি উন্নীত
 কার জ্ঞানে বলে?
 ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য – জন্মিলেন হরি
 মথুরা কোশলে?

৭

প্রবীণ সমাজ পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
 জুড়ি দুই কর,
 নমি, হে বিবর্ত-বৃক্ষি! বিদ্যুৎ-মোহন,
 বজ্রমুষ্টিধর!
 চরণে ঝটিকাগতি– ছুটিছ উধাও



দলি নীহারিকা ।
 উদ্বীক্ষ তেজসনেত্র – হেরিছ নির্ভয়ে
 সপ্তসূর্য শিথা ।
 গ্রহে গ্রহে আবর্তন – গভীর মিলাদ
 শুনিছ শ্রবণে ?
 দোলে মহাকাল – কোলে অগু পরমাগু
 বুঁধিছ স্পর্শনে ?

৮

নমি, হে সার্থক কাম ! স্বরূপ তোমার
 নিত্য অভিনব !
 মর দেহে নহ মর, অমর অধিক
 ত্বৈর্য ধৈর্য তব ?
 লয়ে সলাঞ্চল দেহ, স্তুলবৃদ্ধি তুমি
 জন্মিলে জগতে !
 শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু
 উড়ালে পর্বতে !
 গড়িলে আপন মূর্তি – দেবতালাঙ্গন
 কালের পৃষ্ঠায় !
 গড়িছ ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞান
 আপন স্রষ্টায় ।

৯

নমি তোমা নরদেব ! কী গর্বে গৌরবে
 দাঁড়িয়েছ তুমি !
 সর্বাঙ্গে প্রভাতরশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
 পদে শশস্তুমি ।
 পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণি, সুবর্ণ কলস,
 বালসে কিরণে ;
 কলকষ্ট-সমুদ্ধিত নবীন উদ্গীথ
 গগনে পবনে ।
 হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ
 চলিছে সময় ;
 জ্ঞানে – ফিরিছ সঙ্গে – ক্রমব্যতিক্রম
 উদয়-বিলয় ।



১০

নমি আমি প্রতিজনে, আদিজ-চগ্নাল,
এভু, ঝীতদাস।
সিঙ্গুলে জলবিন্দু, বিশ্বুলে অংশ;
সমগ্রে প্রকাশ।
নমি ক্ষী-তত্ত্বজীবী, স্থপতি, তন্তক,
কর্ম, চর্মকার।
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড – দৃষ্টি অগোচরে,
বহু অদ্রি-ভার।
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়।
একত্রে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,-
আত্মার আত্মীয়।

শব্দার্থ ও টাকা

- মরুৎ - বাতাস।
- গরুড় - পুরাণে বর্ণিত পাখির রাজা ও বিশ্বুর বাহন।
- খাপদ - (কুকুরের মতো পা আছে এমন) হিঙ্গ মাংসাশী পশ্চ।
- ব্যাদানি - হা করে। প্রসারিত করে।
- লাঙ্গুল - পশ্চর লেজ। পুচ্ছ।
- শ্যেন - একজাতীয় শিকারি পাখি। বাজপাখি।
- লঙ্ঘড় - ছেট লাঠি। গদা।
- কে তাহরে উদ্ভারিল? - প্রকৃতি প্রদত্ত বুদ্ধি ও শক্তির সাহায্যে মানুষ নিজেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে – এই হচ্ছে কথাটির তাৎপর্য।
- পত্রপুট - পাতা দিয়ে তৈরি পাত্র। পাতার ঠোঙ।
- শৈশবে - কবি মানবসভ্যতার তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন। এর প্রথম স্তর হচ্ছে শৈশব। এ সময় মানুষের সামাজিক জীবনের সূচনা হয়। মানুষ পরম্পরারের ওপর নির্ভরশীল ও পরম্পরাকে সহযোগিতা করতে শেখে।
- ভ্রমি - বিচরণ করে, বেড়িয়ে।
- ধনুর্বেদ - তির নিক্ষেপ কৌশল সংক্রান্ত জ্ঞান বা বিদ্যা। প্রাচীন অন্তর্বিদ্যা।
- কাঠে কাঠে অঘি জ্বালি - মানুষ যখন থেকে আগুন জ্বালাতে শিখেছে তখন থেকেই সভ্যতার প্রথম ধাপে পা দিয়েছে।
- কে শিখাল...করিতে প্রণাম - প্রকৃতির রহস্য ও বিশ্বকে কেন্দ্র করে প্রথম ধর্মচেতনার উন্নয়। এই আদি ধর্মবিশ্বাস ছিল মূলত প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা (Natural religion)।

- মৌকা। পোত। বৈঠা। দাঁড়।
- আনন্দে লাফালাফি করা।
- মানবসভ্যতার দ্বিতীয় স্তরকে কবি কৈশোর বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় বৈদিক যুগেরও আদিকালের লক্ষণ এখানে স্পষ্ট। এই স্তরকের নিবিদ, ইন্দ্র, অম্বি, যজ্ঞভাগ ইত্যাদি শব্দ লক্ষণীয়। এসব শব্দ বৈদিক সাহিত্যেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে।
- বৈদিক মন্ত্রবিশেষ।
- হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দেবতাদের রাজা।
- আগুন। বৈদিক দেবতা বিশেষ।
- বাতাস। অন্তরিক্ষের দেবতা।
- যজ্ঞে যা আহুতি দেওয়া হতো তার এক-এক অংশ এক-এক দেবতার প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হয়। এটাই যজ্ঞভাগ।
- মানবসভ্যতার এ পর্যায়ে মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, সৃষ্টিক্ষমতা ও অবদানের অসাধারণত লক্ষণীয়। কবি চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমাজ শাসনব্যবস্থা, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রকৌশলবিজ্ঞানের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। তবে বিজ্ঞানের কল্যাণেই মানুষ প্রকৃতির ওপর সার্বিক আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে।
- অন্যতম বেদ গ্রন্থ। হিন্দু পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার চার মুখ থেকে চারটি বেদের সৃষ্টি। এগুলো হলো : খক্ক, সাম, যজুৎ, অথর্ব।
- যজুর্বেদ। চতুর্বেদের অন্যতম বেদ।
- প্রাচীন ভারতবর্ষের চিকিৎসক ও খায়ি এবং চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদপ্রণেতা।
- চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদের রচয়িতা জনৈক প্রাচীন খায়ি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ‘সুশ্রুত-সংহিতা’।
- যেখানে কোনো বিষয় সংকলিত বা সংহত করা হয়। যেমন : ঋগ্বেদ-সংহিতা, মন্ত্র-সংহিতা। প্রত্যেক বেদের মন্ত্রভাগ কিংবা প্রথম ও প্রধান অংশ।
- প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্তিমূলক ধর্মশাস্ত্র। যেমন : বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি।
- দুর্গ ইত্যাদির চার পাশের গভীর খাত। গড়খাই।
- দুই বৃহৎ জলভাগকে সংযুক্ত করে এমন সংকীর্ণ জলভাগ।
- আকাশ।
- প্রাচীন ধারণা অনুসারে জগৎ সৃষ্টির পাঁচটি মূল উপাদান : ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরণ, ব্যোম।
- ভোগ করতে।

- হরি**
- মধুরা**
- কোশলে**
- জন্মলেন হরি মধুরা কোশলে**
- প্রবীণ সমাজ পদে**
- বিবর্ত-বৃদ্ধি**
- বিদ্যুৎ-মোহন**
- বজ্রমুষ্টিধর**
- নীহারিকা**
- চরণে বাটিকাগতি...**
- দলি নীহারিকা**
- তেজসনেত্র**
- উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র...**
- সংগসূর্য শিখা জ্বলন্ত**
- ছাতে ছাতে... শুনিছ শ্রবণে**
- দোলে মহাকাল-কোলে**
- ...বুঁইছ স্পর্শনে**
- নমি, হে সার্থক কাম**
- মরদেহে নহ মর**
- সলাঞ্চুল**
- লয়ে সলাঞ্চুল দেহ**
- নারায়ণ। বিষ্ণু। কৃষ্ণ।
 - উত্তর প্রদেশের প্রাচীন এ নগরী শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এবং হিন্দুদের তীর্থস্থান।
 - প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্যে।
 - হিন্দু পুরাণ মতে, মানবসভ্যতার মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে স্ফটা মানব অবতারের রূপ নিয়ে মধুরায় কৃষ্ণ হয়ে এবং কোশলে রামচন্দ্র হয়ে জন্মাইছেন।
 - মানবসভ্যতার প্রৌঢ়ত্ব পর্বে মানুষ এক বিশাল মহিমায় উন্নীর্ণ হয়েছে। বিশাল সমাজের শক্তিতে মানুষ অপরিসীম শক্তির অধিকারী হয়েছে। এই স্তরকে কবি তারই গৌরবকীর্তন করেছেন। এই স্তরকে প্রধানত পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ যেসব শক্তি অর্জন করেছে সেগুলোর উল্লেখ আছে।
 - মানুষের জ্ঞানশক্তি ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে।
 - বিদ্যুৎকে বা তড়িৎশক্তিকে যে মুক্তি ও বশীভূত করেছে।
 - বজ্রকে যে হাতের মুঠোয় ধরতে সক্ষম হয়েছে।
 - দূরতম নক্ষত্রগুঁঞ্জ যা তুষারের মতো দেখায়।
 - মানুষের চলার গতি সীমিত। কিন্তু বিজ্ঞানের শক্তিতে মানুষ মহাবিশ্বের নক্ষত্রলোকে যাওয়ার গতি অর্জন করেছে।
 - দীপ্তিময় চোখ।
 - মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির সীমা খুব বেশি নয়। কিন্তু টেলিস্কোপ ব্যবহার করে মানুষ সূর্যের মতো বিভিন্ন নক্ষত্রও পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে।
 - মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে মহাজাগতিক ধ্বনি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়েছে।
 - মানুষ জগতের সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে অণু-পরমাণুর নিত্যগতিশীল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পেরেছে।
 - মানুষের ইচ্ছা কর্ম ও সৃজনের সাফল্যের জন্য কবি মানুষের বদ্ধনা করছেন।
 - মানুষ মরণশীল। কিন্তু কর্ম অবদানে মানুষ অমরত্বের মহিমা অর্জন করেছে।
 - লেজসহ।
 - লেজবিশিষ্ট বানরজাতীয় প্রাণীর বিবর্তিত ও বিকশিত রূপই বর্তমান মানুষ।



- রসাইলে মরু
গড়িলে আপন মূর্তি
- জলসেচে মরুভূমির মরুময়তা সুচিয়ে তাকে উর্বর ও রসমুক্ত করেছে মানুষ।
- দেবতা-লাঙ্ঘন
- মানবসভ্যতার বিকাশের ফলে জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি ও অবদানের দিক থেকে মানুষের যে বিশাল মহিমাময় মূর্তি গড়ে উঠেছে তার কাছে দেবতার মহিমা স্লান ও খাটো হয়ে গেছে।
- নরদেব
- মানবদেবতা। সর্বমানবের শক্তি ও মহিমার এক প্রতীকীরণ।
- শঙ্খভূমি
- ত্রুট্যক্ষেত্র। কচি ঘাসে আচ্ছাদিত মাঠ।
- উদগীথ
- বেদমন্ত্র। বৈদিক স্তোত্রগান।
- কলকষ্ট সম্মুখিত...গগনে পবনে
- আকাশে বাতাসে দেবতার মহিমাঞ্চাপক মন্ত্রের জায়গায় মানুষের মহিমা কীর্তনসূচক নতুন মন্ত্রগীতি অজন্ম কর্তৃ গীত হচ্ছে।
- ক্রম-ব্যক্তিক্রম
- নিয়ম ও অনিয়ম।
- উদয়-বিলয়
- সৃষ্টি ও ধৰ্ম।
- হৃদয়-স্পন্দন সনে
- ...উদয়-বিলয়
- পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা এত ব্যাপক ও অনিবার্য হয়ে উঠেছে যে, নিয়ম ও অনিয়ম, সৃষ্টি ও ধৰ্ম সবই মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।
- আদিজ-চঙ্গাল
- ব্রাহ্মণ থেকে চঙ্গাল পর্যন্ত। সর্বস্তরের মানুষ।
- নমি আমি...প্রভু, ক্রীতদাস
- সর্বস্তরের সকল মানুষকে কবি বন্দনা করেছেন। এ স্তবকে কবি মানবতার মহিমাকে স্পষ্টভাবে সমুদ্দর করেছেন।
- কৃষি-তন্ত্রজীবী
- কৃষক ও তাঁতি।
- তক্ষক
- ছুতোরের কাজ।
- অদ্রি
- পর্বত।

পাঠ-পরিচিতি

“মানব-বন্দনা” কবিতাটি সংকলিত হয়েছে অক্ষয়কুমার বড়ালের ‘প্রদীপ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে। “মানব-বন্দনা” কবিতায় কবি মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মানুষের অবদান ও মহিমাকে তুলে ধরেছেন। কবি মানুষকেই মানুষের দেবতা বলে গণ্য করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সাক্ষ্যপ্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদীর মতবাদের আলোকে এটি রচিত। পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির রহস্যগাথা বিবৃত হয়েছে এ কবিতায়। বিবৃত হয়েছে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ যে সভ্যতা নির্মাণ করে চলেছে তারও ইতিহাস। মানুষ তার নিজ সৃষ্টিশীল প্রতিভাবলে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছে যে আপন কর্তৃত ও মহিমা তারই বন্দনা করেছেন কবি এ কবিতায়। কবিতাটির ছন্দ অক্ষরবৃত্ত (পয়ার)। পর্ববিন্যাস : যুগল চরণের প্রথমটির পর্ব ৮/৬ এবং দ্বিতীয়টি ৬ মাত্রার। তবে অন্ত্যামিলের ভিত্তিতে এই যুগল চরণকে ২০ মাত্রার চরণ (৮ । ৬ । ৬) হিসেবে ধরাই সংগত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'নরদেব'-এর শিরে কী?

ক. প্রভাতরশ্মি

গ. সুবর্ণ কলস

খ. চূর্ণমেঘ

ঘ. মন্দির-শ্রেণি

২. 'কে আজ পৃথিবীরাজ - জলে স্থলে ব্যোমে/ কার রাজ্য পাট?' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মানুষের জয়

খ. দেবতার পরাজয়

গ. সভ্যতার বিবর্তন

ঘ. স্বষ্টির আধিপত্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

'আমাদের পাঠশালা' নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত প্রাণ কিছু মানুষ দায়িত্ব নিয়েছেন পথ-শিশুদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণ করার। এন্দের হাত ধরেই অবহেলিত শিশুরা নিচে জীবনের পাঠ। এ শিশুরাই আবার শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবে সর্বত্র।

৩. অনুচ্ছেদের নিবেদিত প্রাণ মানুষেরা "মানব বন্দনা" কবিতায় কার প্রতিনিধি?

ক. দেবতার

খ. রাজার

গ. মানবের

ঘ. স্বষ্টির

৪. উক্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে "মানব বন্দনা" কবিতার যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো-

i. সামষ্টিক শক্তির বিকাশ

ii. ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা বিনিময়

iii. আধিপত্য বিস্তারের শিক্ষা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

বরিশালের মধ্যবয়সী ইউসুফ রূপপুরে ভাতিজার বাড়িতে বেড়াতে এসে জানতে পারেন পাশেই ভবনখনে অনেক মানুষ আটকে পড়েছেন। কৌতুহলী ইউসুফ ছুটে যান সেখানে। ঘটনাস্থলে গিয়ে অসংখ্য মানুষের বাঁচার আর্তনাদ শুনে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সকলের সঙ্গে উদ্ঘারকাজে অংশ নেন। কিন্তু উদ্ঘারকাজের এক পর্যায়ে ঘাড়ে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। ডাঙ্কার জানান, ইউসুফ আর কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির এই অবস্থায় তার পরিবার দিশেহারা। তখন অনেক ব্যক্তি, সংগঠন ইউসুফ ও তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। আজ ইউসুফ ও তার পরিবার একা নন, সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ আজ তাঁর স্বজন।

ক. 'মরমৎ গর্জন' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'আজ্ঞার আজ্ঞীয়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. ইউসুফের কার্যক্রমে "মানব বন্দনা" কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইউসুফ চরিত্রে কবি অক্ষয়কুমার বাড়ালের অনুভূতির যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে— মন্তব্যটি যাচাই কর।



সুখ

কায়কোবাদ

কবি-পরিচিতি

১৮৫৭ সালে ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার আগলা-পূর্বগাড়া গ্রামে কবি কায়কোবাদের জন্ম। তাঁর প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। ‘কায়কোবাদ’ কবির সাহিত্যিক নাম। প্রথমে ঢাকার সেন্ট প্রেসার স্কুলে ভর্তি হলেও পিতার অকালমৃত্যুতে তিনি পড়াশোনা ছাপিয়ে যেতে পারেননি। পরে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে এন্ট্রাল পর্যব্ল পড়াশোনা করেন এবং আগলা গ্রামেরই পোস্টম্যাস্টার পদে ঢাকার প্রহণ করেন।

বাংলা কাব্যধারায় কায়কোবাদ গীতিকবি হিসেবেই খ্যাত। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি ‘বিরহবিলাপ’ কাব্য রচনা করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির পতনের কাহিনি নিয়ে তাঁর রচিত ‘মহাশাশান’ মহাকাব্যের জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো: ‘কুসুমকানন’, ‘শিবমন্দির’, ‘আমিয় ধারা’, ‘মহরম শরীফ’ ও ‘শৃঙ্গান-তত্ত্ব’। কবি কায়কোবাদ ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক ‘কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন’ উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৫১ সালের ২১এ জুলাই তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

“সুখ সুখ” বলে তুমি, কেন কর হা-হৃতাশ,
সুখ ত পাবে না কোথা, বৃথা সে সুখের আশ!
পথিক মরহু মাঝে ধুঁজিয়া বেড়ায় জল,
জল ত মিলে না সেথা, মরীচিকা করে ছল!
তেমতি এ বিশ্ব মাঝে, সুখ ত পাবে না তুমি,
মরীচিকা প্রায় সুখ, — এ বিশ্ব যে মরহুমি!
ধন রত্ন সুখৈশ্বর্য কিছুতেই সুখ নাই,
সুখ পর-উপকারে, তারি মাঝে খৌজ ভাই!
'আমিত্ব'কে বলি দিয়া স্বার্থ ত্যাগ কর যদি,
পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি!
নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
যুছালে পরের অশ্র— যুছালে পরের ব্যথা!
আপনাকে বিলাইয়া দীনদুঃখীদের মাঝে,
বিদুরিলে পর দুঃখ সকালে বিকালে সাঁবো!
তবেই পাইবে সুখ আত্মার ভিতরে তুমি,
যা রূপিবে— তাই পাবে, সংসার যে কর্মভূমি!



শব্দার্থ ও টীকা

- মরুভূমি**
- মরুভূমি।
- জল তো মিলে**
- জল, উষ্ণিদ ও জীবশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ স্থান হচ্ছে মরুভূমি। সেই মরুভূমির মাঝে পানীয় জল খুঁজে পাওয়া ভার। কখনো কখনো উন্নত বিস্তীর্ণ বালুরাশিকে সমুদ্র বলে অম হয়। এই ভাস্তিই হলো মরীচিকা, ছলনা বা মোহ। অর্ধাং ধন-রত্ন অর্থ-সম্পদ প্রকৃত সুখের নিয়ামক নয়। সুখ খুঁজতে গিয়ে এসব উপকরণের পেছনে ছোটা — মরীচিকার পেছনে ছোটার মতোই।
- এ বিশ্ব যে মরুভূমি**
- অর্থ-বিস্ত, ধন-সম্পদের অধিকারী মানুষ প্রকৃত সুখী নয়। প্রকৃত সুখ হলো আত্ম-সুখ। ধন-সম্পদ বাহ্য-সুখ। বাহ্য-সুখের অধিকারী মানুষের হাদয়ে মরুভূমি।
 - অহমিকা বিসর্জন দিয়ে।
- ‘আমিত্ব’কে বলি দিয়া
বিদূরিলে পর দুঃখ ...**
- সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় অর্ধাং সারা জীবন সবার দুঃখ ঘোচালে।
- বিকালে সাঁয়ে**
- সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় অর্ধাং সারা জীবন সবার দুঃখ ঘোচালে।
- তবে পাইবে সুখ আত্মার
ভিতরে**
- সবার দুঃখ-কষ্ট যত্নগা দূর করতে পারলে বা করার প্রচেষ্টায় যে আত্মিক প্রশাস্তি লাভ করা যায় কবি সেকথাই এখানে বলেছেন।
- যা রূপিবে – তাই পাবে**
- যা বপন করবে তার ফল পাবে, অর্ধাং ভালো কাজের জন্য ভালো ফল পাওয়া যায়।

পাঠ-পরিচিতি

কায়কোবাদ রচনাবলির অন্তর্গত ‘অমিয়-ধারা’ কাব্যঘন্ট থেকে “সুখ” কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। ১৯২৩ সালে ‘অমিয়-ধারা’ প্রথম প্রাঞ্চাকারে প্রকাশিত হয়।

মরুভূমিতে পানীয় জল খোঁজার মতোই মানুষ সুখের অব্বেষণে মশগুল। ধন-সম্পদ, বিস্ত-বৈভব ইত্যাকার সম্পদের অধিকারী হয়ে মানুষ সুখী হতে চায়। কিন্তু কবি বলেছেন, বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েও প্রকৃত সুখী হওয়া যায় না। প্রকৃত সুখী হতে হলে সবাইকে তার ভেতরকার ‘আমিত্ব’কে বিসর্জন দিয়ে নিরহঙ্কারী হতে হবে। বিসর্জন দিতে হবে আপন স্বার্থপর সুখাষ্঵েষ। নিজের সকল কর্ম নিয়োজিত করতে হবে পরাহিতে। দীনদুঃখীর ব্যথা দূর করার মধ্যেই খুঁজতে হবে আত্মসুখ। অপরের উপকারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। অপরের দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত করতে পারার মধ্যেই প্রকৃত অর্থে মানুষের আত্মিক সুখ ও শান্তি নিহিত বলে কবি মনে করেন।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কে ছল করে?

ক. সংসার

খ. কর্মভূমি

গ. মরুভূমি

ঘ. মরীচিকা

২. ‘আমিত্ত’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. ব্যক্তিগত স্বার্থ

খ. সামষ্টিক সম্প্রীতি

গ. পরহিত ব্রত

ঘ. পারিবারিক স্বার্থ

নিচের কবিতাঙ্গটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে

পার না মুছিতে নয়ন ধার?

পরহিত ব্রতে পার না রাখিতে

চাপিয়া আপন বিষাদ ভার?

৩. কবিতাংশের প্রথম দুই চরণের ভাবের সঙ্গে “সুখ” কবিতার সাদৃশ্য হলো—

ক. কর্মের মধ্য দিয়ে সুখ

খ. নিজের সুখই প্রকৃত সুখ

গ. অপরের সুখে সুখী হওয়া

ঘ. পরের জন্য আত্মানেই সুখ

৪. উপর্যুক্ত পঞ্জিকালা ও “সুখ” কবিতা উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে—

i. পরের কল্যাণে নিজের স্বার্থ ত্যাগ

ii. অন্যের সুখে নিজের দুঃখ ভুলে যাওয়া

iii. পরাণীকাতরতা পরিহার করা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i, ii

খ. i, iii

গ. ii, iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন-ঘন সকলি দাও,

তার চেয়ে সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ, সুখ সুখ করে কেঁদোনা আর,

যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে, ততই বাড়িবে হৃদয়ভার।

ক. কবি কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী?

খ. ‘বৃথা সুখের আশ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. কবিতাংশের জীবনদর্শন “সুখ” কবিতার সাথে যে দিক থেকে সাযুজ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “সুখ” কবিতায় কবি কায়কোবাদ উক্ত জীবনদর্শন বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন—মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।



সোনার তরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচিতি

অসমান্য প্রতিভার অধিকারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার একটি বৃহৎকাল বাংলা সাহিত্যের ‘রবীন্দ্রযুগ’ নামে পরিচিত। মানবধর্মের জয় ও সৌন্দর্য-ভূষণ রোমান্টিক এই কবির কবিতার মূল সুর। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, মাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ছিলেন অনন্য চিত্রশিল্পী, অনুসন্ধিসু বিশ্বপরিব্রাজক, দক্ষ সম্পাদক এবং অসমান্য শিক্ষা-সংগঠক ও চিন্তক। নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহী হলেও ‘বিশ্বভারতী’ নামের বিশ্ববিদ্যালয়-এর তিনি স্বাপ্নিক ও প্রতিষ্ঠাতা। যাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য ‘বনফুল’ প্রকাশিত হয়। ‘গীতাঞ্জলি’ এবং অন্যান্য কাব্যের কবিতার সমগ্রে স্ব-অনুদিত ‘Song Offerings’ প্রচ্ছের জন্য ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এশীয় হিসেবে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলা ছোটগল্পের তিনি পথিকৃৎ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ‘মানসী’, ‘সোনার তরী’, ‘চিরা’, ‘ক্ষণিকা’, ‘বলাকা’, ‘পুনশ্চ’, ‘জনাদিনে’, ‘শেষ লেখা’ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কাব্যনাট্য ‘বিসর্জন’ ও ‘চিরাঙ্গদা’ এবং কাহিনি-কবিতার সংকলন ‘কথা’ ও ‘কাহিনি’ তাঁর ভিল্ল স্বাদের রচনা। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।

কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

রাশি রাশি ভারা ভারা

ধান কাটা হলো সারা,

তরা নদী ক্ষুরধারা

খরপরশা—

কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা—

চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা॥

পরপারে দেখি আঁকা

তরুছায়ামসী-মাখা

গ্রামখানি মেঘে ঢাকা

প্রভাতবেলা—

এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

তরা পালে চলে যায়,

কোনো দিকে নাহি চায়,



চেউগলি নিরূপায়

ভাঙে দু ধারে-

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ॥

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?

বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে ।

যেয়ো যেথা যেতে চাও,

যারে খুশি তারে দাও -

শুধু তুমি নিয়ে যাও

ক্ষণিক হেসে

আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥

যত চাও তত লও তরী-পরে ।

আর আছে— আর নাই, দিয়েছি ভরে ॥

এতকাল নদীকূলে

যাহা লয়ে ছিনু ভুলে

সকলি দিলাম তুলে

থরে বিথরে—

এখন আমারে লহো করুণা করে ॥

ঠাই নাই, ঠাই নাই— ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি ।

শ্রাবণগাগন ঘিরে

ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,

শূন্য নদীর তীরে

রহিনু পড়ি—

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

শব্দার্থ ও টীকা

গরজে

- গর্জন করে ।

ভারা ভারা

- ‘ভারা’ অর্থ ধান রাখার পাত্র । এরকম পাত্রের সমষ্টি বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ।

ক্ষুরধারা

- ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা শ্রোত ।

থরপরশা

- ধারালো বর্ণ । এখানে ধারালো বর্ণার মতো ।

আমি
আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল
করিছে খেলা

তরঢ়ায়ামসী-মাঝা
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে
আসে পারে

কোনো দিকে নাহি চায়
দেখে যেন মনে হয়
চিনি উহারে

ওগো, তুমি কোথা যাও
কোন বিদেশে?

বারেক ভিড়াও তরী
কূলেতে এসে

আমার সোনার ধান
আর আছে
আর নাই, দিয়েছি ভরে

থরে বিথরে
এখন আমারে লহো
করণা করে

- সাধারণ অর্থে কৃষক। প্রতীকী অর্থে শিল্পস্তো কবি।
- কৃষক কিংবা শিল্পস্তো কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা।
- ধানক্ষেতটি ছেট দ্বীপের আঙিকে চিহ্নিত। তার পাশে ঘূর্ণায়মান শ্রোতের উদ্দামতা। নদীর ‘বাঁকা’ জলশ্রোতে বেষ্টিত ছেট ক্ষেত্রটুকুর আশ বিলীয়মান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। ‘বাঁকা জল’ এখানে অনন্ত কালশ্রোতের প্রতীক।
- ওপারের মেঝে ঢাকা গ্রামটি যেন গাছের ছায়ার কালো রঙে মাঝানো।
- স্কুরের মতো ধারালো জলশ্রোতে গান গাইতে গাইতে যে মাঝি পারের দিকে এগিয়ে আসছে, রবীন্দ্র-ভাবনায় সে নির্মোহ মহাকালের প্রতীক।
- মহাকালের প্রতীক এই মাঝি নিরাসক বলেই তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিপাত নেই।
- এই আগম্ভুক মাঝি কৃষক বা শিল্পস্তো কবির হয়ত চেনা। কেননা, চেনা মনে হলেও কৃষক বা শিল্পস্তো কবির সংশয় থেকেই যায়।
- নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষক বা কবির চেষ্টা। ‘বিদেশ’ এখানে চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- চিরায়ত শিল্পলোকে ঠাই পাওয়ার জন্যই কৃষকরূপী কবির ব্যাকুল অনুনয় এখানে প্রকাশিত।
- কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল। ব্যঙ্গনার্থে শিল্পস্তো কবির সৃষ্টিসম্ভার।
- ছেট জমিতে উৎপন্ন ফসলের সবটাই অর্থাৎ কবির সমগ্র সৃষ্টি তুলে দেওয়া হয়েছে মহাকালের শ্রোতে ভেসে আসা সোনার তরী-রূপী চিরায়ত শিল্পলোকে।
- স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে।
- ফসল বা সৃষ্টিসম্ভার তুলে দেওয়া হয়েছে নৌকায়। এখন ফসল বা সৃষ্টির প্রষ্টা স্থান পেতে চায় ওই মহাকালের নৌকায়।



ঠাই নাই, ঠাই নাই

ছোট সে তরী

শূন্য নদীর তীরে রহিলু পড়ি

- সোনার তরীতে মহৎ সৃষ্টিরই স্থান সংকুলান হয় কেবল। ব্যক্তিসম্ভাৱে তাৰ শাৰীৰিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাৱে হতে হয় মহাকালেৰ নিষ্ঠুৱ কালঘাসেৰ শিকার।
- নিঃসঙ্গ অপূৰ্বতাৱ বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুৰ প্ৰতীক্ষাৰ ইঙ্গিত। এ প্ৰসঙ্গে রবীন্দ্ৰনাথ লিখেছেন : “মহাকাল আমাৰ সৰ্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলাৰ মধ্যে। ... সোনার তৰীৰ নেয়ে আমাৰ সোনাৰ ধান লইয়া যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে লয় না।”

পাঠ-পৰিচিতি

“সোনার তৰী” রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৱেৱ ‘সোনার তৰী’ কাৰ্যগ্ৰহেৰ নাম-কবিতা। শতাধিক বছৰ ধৰে এ কবিতা বিগুল আলোচনা ও নানামূৰ্খী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপৰ্য অভিষিক্ত। একই সঙ্গে, কবিতাটি গৃহ রহস্য ও শ্ৰেষ্ঠত্বেৰও স্মাৰক। মহৎ সাহিত্যেৰ একটি বিশেষ গুণ হলো কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনাৰ আলোকে তাৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব নিৱেপিত হতে থাকে। বাংলা কবিতাৰ ইতিহাসে “সোনার তৰী” তেমনি আশ্চৰ্যসুন্দৰ এক চিৱায়ত আবেদনবাহী কবিতা।

কবিতাটিতে দেখা যায়, চারপাশেৰ প্ৰবল শ্ৰোতোৱ মধ্যে জেগে থাকা দীপেৰ মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনাৰ ধানেৰ সংস্থাৱ নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিঃসঙ্গ এক কৃষক। আকাশেৰ ঘন মেঘ আৱ ভাৱী বৰ্ষণে পাশেৰ খৱশ্বৰোত্তা নদী হয়ে উঠেছে হিংস্র। চাৰদিকেৰ ‘বাঁকা জল’ কৃষকেৰ মনে সৃষ্টি কৰেছে ঘনঘোৱ আশক্ষা। এৱকম এক পৰিস্থিতিতে ওই খৱশ্বৰোত্তা নদীতে একটি ভৱাপাল সোনাৰ নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাৰিকে দেখা যায়। উৎকৃষ্টিত কৃষক নৌকা কুলে ভিড়িয়ে তাৰ উৎপাদিত সোনাৰ ধান নিয়ে যাওয়াৰ জন্য মাৰিকে সকাতৰে মিলতি জানালে ওই সোনাৰ ধানেৰ সংস্থাৱ নৌকায় তুলে নিয়ে মাৰি চলে যায়। ছোট নৌকা বলে স্থান সংকুলান হয় না কৃষকেৰ। শূন্য নদীৰ তীৰে আশাহত কৃষকেৰ বেদনা শুমড়ে মৱে।

এ কবিতায় নিবিড়ভাৱে মিশে আছে কবিৰ জীবনদৰ্শন। মহাকালেৰ শ্ৰোতো জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষেৰই সৃষ্টি সোনাৰ ফসল। তাৰ ব্যক্তিসম্ভাৱে শাৰীৰিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাৱে হতে হয় মহাকালেৰ নিষ্ঠুৱ কালঘাসেৰ শিকার।

“সোনার তৰী” মাত্ৰাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এৱ অধিকাংশ পঞ্জি ৮+৫ মাত্ৰাৰ পূৰ্ণপৰ্বে বিন্যস্ত।

বহুনিৰ্বাচনি প্ৰশ্ন

১. ‘ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে’— এখানে ‘তুমি’ কে?

- | | |
|---------|--------|
| ক. কৃষক | খ. তৰী |
| গ. মাৰি | ঘ. কবি |

২. কবি ‘ছোটো খেত’ বলতে কী বোৰাতে চেয়েছেন?

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ক. আয়তনে ছোট ক্ষেত | খ. নদীৰ ছোটো চৰ |
| গ. মানুষেৰ জীবনপৰিধি | ঘ. অজানাৰ দেশ |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

জয়নুল আবেদিন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি শিল্পাচার্য নামে পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা, সংগ্রাম, সাঁওতাল রঘনী, ঝড় এবং আরও অনেক ছবি। পৃথিবীর মানুষ এই শিল্পীর পেঞ্জলের আঁচড়ে প্রতিফলিত দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষও সেই সময়কে আজও অনুভব করে। বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন পুরোধা ব্যক্তি।

৩. জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে “সোনার তরী” কবিতার কিসের সাদৃশ্য রয়েছে?

- | | |
|---------|------------|
| ক. মাঝি | খ. ভরা নদী |
| গ. তরী | ঘ. কৃষক |

৪. উক্ত সাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়—

- ক. জীবন অতি সংক্ষিপ্ত
- খ. সৃষ্টি অবিনশ্বর
- গ. সম্পদ ক্ষণস্থায়ী
- ঘ. সময় অনন্ত প্রবাহী

সূজলশীল প্রশ্ন

মাদার তেরেসা অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের আধার ছিলেন। আলবেনিয়ান বৎশোভূত হয়েও তিনি তাঁর কাজের জন্য সারা পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৫০ সালে তিনি কলকাতায় মিশনারিজ অব চ্যারিটি নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই চ্যারিটি হোম সমষ্টি পৃথিবীর দরিদ্র, অসুস্থ, অনাথ ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের জন্য কাজ করে। এই কাজের জন্য ১৯৭৯ সালে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেই পুরস্কারের সমন্ত অর্থ তিনি সেবার কাজে ব্যয় করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ আজও তাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

- ক. বাংলা কত তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম প্রাঙ্গণ করেন?
- খ. ‘বাঁকা জল’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. “সোনার তরী” কবিতার কোন বিষয়টি মাদার তেরেসার জীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘মাদার তেরেসার জীবন পরিণতিই “সোনার তরী” কবিতার মূল উপজীব্য’— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

ঐকতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচিতি : “সোনার তরী” কবিতা অংশে দ্রষ্টব্য

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি ।
দেশে দেশে কত-না লগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিঙ্গু মর,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে । বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি সুন্দর তারি এক কোণ ।
সেই ক্ষেত্রে পড়ি প্রহ্ল ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অঙ্কয় উৎসাহে —
যেখা পাই চিরময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি ।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালক্ষ ধনে ।
আমি পৃথিবীর কবি, যেখা তার যত উঠে ধনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌছিল না বহুতর ডাক —
রয়ে গেছে ফাঁক ।
প্রকৃতির ঐকতানপ্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে;
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ—
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের ঘার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার ।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচির কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার ।
অতি সুন্দর অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে ।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে ।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা ।



তাই আমি মেনে নিই সে নিদার কথা
 আমার সুরের অপূর্ণতা।
 আমার কবিতা, জানি আমি,
 গেলেও বিচির পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
 কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
 কর্মে ও কথায় সত্য আত্মায়তা করেছে অর্জন,
 যে আছে মাটির কাছাকাছি,
 সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
 এসো কবি অখ্যাতজনের
 নির্বাক মনের।
 মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার -
 প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,
 অবজ্ঞার তাপে শুক নিরালন্দ সেই মরুভূমি
 রাসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
 অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
 তাই তুমি দাও তো উদ্বারি।
 সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
 একতারা যাহাদের তারাও সমান যেন পায় -
 মুক যারা দুঃখে সুখে,
 নতশির স্তুক যারা বিশ্বের সম্মুখে,
 ওগো শুণী,
 কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

বিপুলা

- বিশাল প্রশস্ত। এখানে নারীবাচক শব্দ হিসেবে বিপুলা বলে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে।

‘বিশাল বিশ্বের আয়োজন;

মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র
 তারি এক কোণ।’

- জীব ও জড়-বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে এই বিশাল বিশ্বজগৎ। কিন্তু কবির মন জুড়ে রয়েছে তারই ছোট একটি কোণ।

‘যেথে পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
 কুড়াইয়া আনি।’

- কবি তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্পদ কুড়িয়ে আনেন।

‘জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে

পূরণ করিয়া লই যত পারি
 ভিক্ষালঙ্ক ধনে।’

- নানা সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে কবি নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

স্বরসাধনা

- এখানে সুর বা সংগীত সাধনা বোঝানো হয়েছে।



‘এই স্বরসাধনায় পৌছিল না
বহুতর ডাক রয়ে গেছে ফাঁক ।’
ঐকতান

‘অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের
চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চ মধ্যে
বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে ।’

‘মাঝে মাঝে গেছি আমি
ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি
ছিল না একেবারে ।’

‘জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃতিম পণ্যে
ব্যর্থ হয় গানের পসরা ।’

‘এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের’

রস

‘অবজ্ঞার তাপে শুক নিরানন্দ
সেই মরুভূমি রসে পূর্ণ
করি দাও তুমি ।’

উদ্বারি

সাহিত্যের ঐকতান
সংগীত সভায়

- কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে কবি যে স্বরসাধনা করেছেন তাতে ঘটাই রয়ে গেছে।
- বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্টি সুর, সমন্বয়। এখানে বহু সুরের সমন্বয়ে এক সুরে বাঁধা পৃথিবীর সুরকে বোঝানো হয়েছে। সকল মানুষের কথা বলা সাহিত্য-সুরকে তিনি সাহিত্যের ঐকতান বলেছেন।

- সম্মানবঞ্চিত ব্রাত্যজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের উচ্চ মধ্যে কবি আসন গ্রহণ করেছেন। তাই সেখানকার সংকীর্ণ জ্ঞানালা দিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনকে তিনি দেখতে পারেননি।

- মাঝেমধ্যে কবি ব্রাত্য মানুষের পাড়ায় ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিয়েছেন। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের সঙ্গে ভালোভাবে যোগসূত্র রচনা সম্ভব হয়নি।

- জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ ঘটাতে না পারলে শিল্পীর সৃষ্টি কৃতিম পণ্যে পরিণত হয়। ব্রাত্য তথা প্রাণিক মানুষকে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে যোগ্য স্থান দিলেই তবে শিল্প সাধনা পূর্ণতা পায়।

- রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই অনাগত কবিকে আহ্বান করছেন, যিনি অখ্যাত মানুষের, অব্যক্ত মনের জীবনকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন।
- এখানে সাহিত্যরস বা শিল্পরস বোঝানো হয়েছে। কবিরা রসসূচির জন্য কবিতা রচনা করেন। সেই রস সৃষ্টি হয় পাঠকের অন্তরে।

- জেলে-তাঁতি প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ সাহিত্যের বিষয়সভায় উপেক্ষার কারণে স্থানলাভে বঞ্চিত হওয়ায় সাহিত্যের ভূবন আনন্দহীন উন্নয়ন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির সেই উষরতাকে রসে পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতের কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আহ্বান।
- ওপরে বা উর্ধ্বে অকাশ করে দাও। অন্তরে যে উৎস (এখানে রসের উৎস) রয়েছে, তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে।

- সাহিত্যে জীবনের সর্বপ্রাপ্তস্পর্শী সমন্বয় বা ঐকতান।

‘একতরা যাহাদের তারাও

সমান যেন পায়’

‘মূক যারা দুঃখে সুখে,

নতশির স্তুর যারা

বিশ্বের সমুখে’

— অবজ্ঞাত বা উপোক্ষিত মানুষও যেন সমান লাভ করে সে-কথা বলা হয়েছে।

— দুঃখ-সুখ সহ্য করা নির্বাক মানুষ, যারা এগিয়ে চলা প্রথিবীতে এখনো
মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

পাঠ-পরিচিতি

“ঐকতান” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জন্মদিনে’ কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা। কবির মৃত্যুর মাত্র চার মাস আগে ১৩৪৮ বঙাদের পহেলা বৈশাখ ‘জন্মদিনে’ কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৪৭ বঙাদের ফাল্গুন সংখ্যা ‘প্রবাসী’তে কবিতাটি ‘ঐকতান’-নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। “ঐকতান” অশীতিপুর স্থিতপ্রভৃতি কবির আত্ম-সমালোচনা; কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত সীকারোভি।

দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমারে শেষপ্রাপ্তে পৌছে স্থিতপ্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ পেছন ফিরে তাকিয়ে সমষ্টি জীবনের সাহিত্যসাধনার সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব খুঁজেছেন “ঐকতান” কবিতায়। তিনি অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন এখানে। জীবন-মৃত্যুর সংক্ষিপ্তে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেছেন নিজের অকিঞ্চিত্করণ ও ব্যর্থতার স্বরূপ। কবি বুঝতে পেরেছেন, এই প্রথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজ্ঞান ও অদেখা রয়ে গিয়েছে। বিশ্বের বিশাল আয়োজনে তাঁর মন জুড়ে ছিল কেবল ছোট একটি কোণ। জ্ঞানের দীনতার কারণেই নানা দেশের বিচির্ত্ব অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন এছের চিত্রময় বর্ণনার বাণী কবি ডিক্ষালক্ষ ধনের মতো সংযতে আহরণ করে নিজের কাব্যভাষার পূর্ণ করেছেন। তবু বিপুল এ প্রথিবীর সর্বত্র তিনি প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাননি। চারি ক্ষেত্রে হাল চষে, তাঁতি তাঁত বোলে, জেলে জাল ফেলে— এসব শ্রমজীবী মানুষের উপর ভর করেই জীবনসংসার এগিয়ে চলে। কিন্তু কবি এসব হতদানি প্রাপ্তক্ষেত্রে মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সমাজের উচ্চ মধ্যে আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে যে জীবন ও জগৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তা ছিল খণ্ডিত তথা অপূর্ণ। ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বহুতর মানব-জীবনধারার ঐকতান সৃষ্টি না করতে পারলে শিল্পীর গানের পসরা তথা সৃষ্টিসংগ্রাম যে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়, কবিতায় এই আত্মোপলক্ষির প্রকাশ ঘটেছে। তিনি বলেছেন, তাঁর কবিতা বিচির্ত্ব পথে অগ্রসর হলেও জীবনের সকল স্তরে পৌছাতে পারেনি। ফলে, জীবন-সায়াহে কবি অনাগত ভবিষ্যতের সেই মৃত্তিকা-সংলগ্ন মহৎ কবিরই আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছেন, যিনি শ্রমজীবী মানুষের অংশীদার হয়ে সত্য ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবেন আজীবন্তার বদ্ধন। “ঐকতান” কবিতায় যুগপৎ কবির নিজের এবং তাঁর সমকালীন বাংলা কবিতার বিষয়গত সীমাবদ্ধতার দিক উন্মোচিত হয়েছে।

কবিতাটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতাটিতে ৮+৬ এবং ৮+১০ মাত্রার পর্বই অধিক। তবে এতে কখনো-কখনো ৯ মাত্রার অসমপর্ব এবং ৩ ও ৪ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি কী কুড়িয়ে আনেন?

ক. চিত্রময়ী বাণী খ. ডিক্ষালক্ষ ধন

গ. আনন্দের ভোগ ঘ. গানের পসরা

২. সমাজের উচ্চমধ্যে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে— এখানে ‘সংকীর্ণ বাতায়ন’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. ছোট জানালা খ. ক্ষুদ্র গঢ়ী

গ. জনবিচ্ছিন্নতা ঘ. কোলাহলপূর্ণতা



নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উভয় দাও :

সুকান্ত ভট্টাচার্য শ্রমজীবী মানুষের কবি। তিনি কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও অধিকারের কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে তিনি তাদের শক্তি জুগিয়েছেন। তাঁর ওপর আঘাত এসেছে কিন্তু তিনি আপন পথ থেকে বিচ্যুত হননি।

৩. সুকান্তের মধ্যে “ঐকতান” কবিতার কোন দিকটি বিদ্যমান?

ক. জন-সম্পৃক্ততা

খ. নিরহঙ্কারী

গ. মহত্ব

ঘ. জনপ্রিয়তা

৪. “ঐকতান” কবিতায় কবি সুকান্তের মতোই এমন আরও কবির আবর্ত্তা প্রত্যাশা করেছেন। কারণ এই কবিনা—

i. জনগণের মর্মের ব্যথা বোঝে

ii. কাজে ও কথায় তারা এক

iii. এরা সাধারণের জীবনঘনিষ্ঠ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i, ii

খ. i, iii

গ. ii, iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে রফিকুল বারি রাজনীতিতে মনোযোগী হতে চান। সুস্থ রাজনীতির মাধ্যমে দেশের মানুষের ভাগ্যেন্নয়ন তার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেন এবং সভা-সমিতিতে যোগ দেন। একজন সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে শহরের একটি বিশেষ শ্রেণির সবাই তাঁকে চেনে। একবার সৈদে গ্রামের বাড়ি গিয়ে তিনি বুবাতে পারেন, দেশের মানুষের কথা ভাবলেও গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নয়নকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্বন্ধে নয়। এরপর থেকে তিনি গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশতে শুরু করেন, তাদের জন্য কাজ করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি সাধারণের প্রিয় নেতা হয়ে উঠেন।

ক. কাছে থেকে দূরে যারা, কবি তাদের কী শুনাতে চেয়েছেন?

খ. কবি সর্বত্র প্রবেশের দ্বার পান না কেন?

গ. রফিকুল বারির মধ্যে “ঐকতান” কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “জীবনে জীবন যোগ করা/না হলে কৃত্রিম পথে ব্যর্থ হয় গানের পসরা”— কবির এই উপলক্ষ্মির আলোকে রফিকুল বারির নেতা হয়ে উঠার বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

ନବାନ୍ତ ସତୀଦ୍ରୁନାଥ ସେନଶୁଣ୍ଡ

କବି-ପରିଚିତି

ସତୀଦ୍ରୁନାଥ ସେନଶୁଣ୍ଡ ପଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଧମାନ ଜେଲାର ପାତିଲପାଡ଼ା ଥାମେ ୧୮୮୭ ଖ୍ରିସ୍ଟଦେର ୨୬୬ ଜୁଲାଇତାରିହଣ କରେନ । ତା'ର ପିତାର ନାମ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ସେନଶୁଣ୍ଡ । ସତୀଦ୍ରୁନାଥ ପେଶୀଯ ଛିଲେନ ଏକଜଳ ପ୍ରକୋଷଣୀ । ଦୁଃଖକେଇ ଜୀବନେର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସତ୍ୟ ବଲେ ଜେନେଛିଲେନ ତିନି । ମଧ୍ୟବିଷ୍ଟ ବାଣିଜୀବୀ କ୍ରମଜୀବୀ ମନୁଷେର ସମ୍ପଦ ଓ ବନ୍ଦନରେ ସଂଘାତକେ ତିନି କବିତାଯ ଭୁଲେ ଧରେଛେ । କଞ୍ଚଳାବିଲାସ କିଂବା ଭାବାଲୁତାଯ ଛିଲ ତା'ର ଚରମ ଅବିଶ୍ୱାସ । ନତୁନ ଧରନେର କବିତା ରଚନା କରେ ରବୀଦ୍ରୁନାଥେର ଅନୁମାରୀ କବିଦେର ନତୁନ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଯେ ଚାରପାଶେର ଜୀବନକେ ଦେଖାର ଆବାନ ଜାନିଯେଛିଲେନ ତିନି । ତା'ର ଏହି ନବୀନ ଦୃଷ୍ଟିଭାବୀ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେର ଅନେକ କବିକେଇ ପ୍ରଭାବିତ କରେଛି । ବିଷୟ ଓ ଗଠନର ଦିକ ଥିଲେ ତିନି କବିତାକେ ଦେଲେ ସାଜାତେ ଆହୁତି ଛିଲେନ । ଏକେବାରେଇ ଦୈନକିଳି ଜୀବନେର ନାନାକିଛୁ ଯେ ଶିଳ୍ପେର ସୀମା ଲଜ୍ଜନ ନା କରେଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟେ କାବ୍ୟ-ବିଷୟ ହତେ ପାରେ ତାର ପରିଚୟ ରଯେଛେ ତା'ର କାବ୍ୟେ । ସେଇମଙ୍ଗେ ତା'ର କାବ୍ୟେ ହୁଳ ପେଯେଛେ ଗନ୍ୟମୁଲଭ ଶବ୍ଦ ଓ ଉପମାର ଅଭିନବତ୍ତ । ତା'ର କବିତାର ବନ୍ଦବ୍ୟ ଯେମନ ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟକଦେର ଚମକ ଲାଗିଯେଛି ତେମିଳ ତା'ର ବଲାର ଭଙ୍ଗ ପାଠକକେ କରେଛିଲ ମୁହଁ । ସତୀଦ୍ରୁନାଥେର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟରୁ ମୁହଁ ‘ମରୀଚିକା’ । ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟାବ୍ଲେର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ‘ମରନିଶିଖା’, ‘ମରମାଯା’, ‘ସାରମ’, ‘ତ୍ରିଆମା’, ‘ନିଶାନ୍ତିକା’ ପ୍ରଭୃତି । ଶେଷ ବୟାସେ ତିନି ‘ହ୍ୟାମଲେଟ’, ‘ମାକବେଥ୍’, ‘ଓଥ୍ରୋଲୀ’, ‘କୁରାରସନ୍ତର’ ପ୍ରଭୃତି ଚିରାଯତ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ କରେଛିଲେନ ।

ତିନି ୧୯୫୪ ଖ୍ରିସ୍ଟଦେର ୧୭୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେନ ।

ଏସେହ ବନ୍ଦୁ? ତୋମାର କଥାଇ ଜାଗଛିଲ ଭାଇ ପ୍ରାଣେ,—
 କାଳ ରାତେ ମୋର ମହି ପଢ଼େ ଗେହେ କ୍ଷେତ୍ରଭାର ପାକା ଧାନେ ।
 ଧାନ୍ୟରେ ପ୍ରାଣେ ଭରା ଅଶ୍ରାନେ ଶୁଭ ନବାନ୍ତ ଆଜ,
 ପାଡ଼ାଯ ପାଡ଼ାଯ ଉଠେ ଉଠସବ, ବନ୍ଦ ମାଠେର କାଜ ।
 ଲେପିଯା ଆଣିଲା ଦ୍ୟାଯ ଆଲ୍ପଣା ଭରା ମରାଇଏର ପାଶେ;
 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୌଧ ହୟ ବାଣିଜ୍ୟ ତ୍ୟାଜି’ ଏବାର ନିବସେ ଚାଷେ ।
 ଏମନ ବଚରେ ରାତାରାତି ମୋର ପାକା ଧାନେ ପଡ଼େ ମହି!
 ଦାଉୟାର ଖୁଟିତେ ଟେସ୍ ଦିଯେ ବସୋ,— ସେ ଦୁଖେର କଥା କହି;
 ବୋଶେଖ, ଜ୍ୟାଷ୍ଟ, ଆସାତ୍, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରା, ଆଶ୍ଵିନ,—
 ଆଶା-ଆତକେ ଖେଯାଲ ଛିଲ ନା କୋଥା ଦିଯେ କାଟେ ଦିନ ।
 ଦୁର୍ଘୋଗେ ସବେ ବାଲିର ବୀଧିନେ ବୀଧିନୁ ବନ୍ୟାଧାରା,
 ବୁକେର ରଙ୍ଗ ଜଳ କୋରେ କତ୍ତ ସେଚିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଚାରା ।
 କାର୍ତ୍ତିକେ ଦେଖି ଚାରିଦିକି,— ଏକି! ଏବାର ତ ନହେ ଫାଁକି!
 ପାଁଚରଙ୍ଗ ଧାନେ ହକ୍-କାଟା ମାଠ ଜୁଡ଼ାଯ ଚାଷାର ଆଁଥି ।
 ଅଶ୍ରାନେ ଥାକେ ଥାକେ
 କାଟିଯା ତୋଲାଯ ଖାମାରେ ଗୋଲାଯ ଯାହାର ଯେମନ ପାକେ ।
 ଆମି ରୋଜ ଭାବି— ଫୁଲଟା ନାବି, ଆରା କଟା ଦିନ ଯାକ,
 ଭରା ଅଶ୍ରାନେ ଘଟେନା— ତ କୋନୋ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ।
 ମରାଇ-ସାରାଇ ଶେ କୋରେ, ସବେ ଖାମାରେ ଦିଇଛି ହାତ,
 କାଳକେ ହଠାତ୍,—
 ବନ୍ଦ, ଦୋହାଇ, ତୁଲୋନାକୋ ହାଇ, ହଇନୁ ଅପଗଲ୍ଭ,—
 କ୍ଷମା କରୋ ସର୍ବା,— ବନ୍ଦ କରିନୁ ତୁଚ୍ଛ ଧାନେର ଗଲ୍ଲ ।



শব্দার্থ ও টিকা

নবান্ন

- ফসল কাটার উৎসব। হ্রাম-বাংলায় প্রতিবছর হেমন্তকালে ঘরে ফসল তোলার উপলক্ষে নাচ-গানসহ নতুন ধানে তৈরি নানারকম খাবারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে পালিত হয় নবান্ন উৎসব।

মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভৱা
পাকা ধানে

- “পাকা ধানে মই দেওয়া” একটি বাংলা প্রবাদ। এর অর্থ হলো প্রায়সম্পূর্ণ কোনো কাজ পণ্ড করা। অন্যের ক্ষতি করা। জমিতে মই দেওয়া হয় বীজ বোনা কিংবা চারা সাগানোর আগে; মাটিকে নরম ঝুরঝুরে করার জন্য। কিন্তু যে জমি ফসলে পূর্ণ, যখন ফসল কাটার সময় আসল তখন মই দিলে তো সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষতি বোঝাতে ব্যবহৃত এই প্রবাদটিকে কবি কৌশলে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন।

আল্পনা

- গ্রামে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বাড়ির আঙিনায় হাতে আঁকা নকশা। প্রতিহ্যগতভাবে আতপ চাল বেঠে তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল এবং নানারকম রং মিশিয়ে আল্পনার উপকরণ প্রস্তুত করা হয়। ইদানীঁ সিনথেটিক রং দিয়েও আল্পনা আঁকা হয়।
- হোগলা, বেত ইত্যাদি দিয়ে তৈরি শস্য জমা রাখার বড় আধার। ধানের গোলা।

লক্ষ্মী বোধ হয় বাণিজ্য ত্যাজি
এবার নিবসে চাবে

- প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে— “বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী”। অর্থাৎ, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রচুর অর্ধলাভ হয় তথা ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর আগমন ঘটে। আলোচ্য কবিতায় কবি প্রবাদটিকে পাল্টে দিয়েছেন। কবিতায় বর্ণিত কৃষকের মাঠে এবার এমন ফসল হয়েছে যে, কৃষকের মনে হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী এবার বাণিজ্যের পরিবর্তে ফসলের ক্ষেতে বিরাজ করছেন। আর তাই প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কৃষককে আনন্দ-স্বপ্নে বিভোর করছে।

দাওয়া
বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা

- ঘরের আঙিনা।
- বাংলা প্রবাদ “বালির বাঁধ”কে কবি শৈলিকভাবে এই কবিতায় ব্যবহার করেছেন। “বালির বাঁধ”-এর অর্থ হলো এমন কিছু যা ক্ষণভঙ্গের কবি ফসল বাঁচানোর লক্ষ্যে সকল দুর্যোগ ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে নিজের যথাসাধ্য চেষ্টাকে কাজে লাগিয়েছেন কিন্তু তার সবই বালির বাঁধের মতো শেষ পর্যন্ত বিফলে গেছে।

বুকের রক্ত জল কোরে
কঙ্গ সেচিনু পাখু চারা

- কৃষকের ফসল ফলানোর অপরিহার্য শর্ত হলো পর্যাপ্ত জলসেচের ব্যবস্থা। এদেশের প্রেক্ষাপটে এই সেচ ব্যবস্থাও কখনও হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বাংলার কৃষক তার ফসলের মাঠ সেচ দিয়ে সজীব রাখে। মলিন মৃতপ্রায় চারাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ শ্রম ঢালে।

| | |
|----------------------------|---|
| পাঞ্চ | — ফ্যাকাশে মলিন। |
| পাঁচরঙ্গা ধানে ছক-কাটা মাঠ | — গ্রাম-বাংলায় কাঁচা-পাকা ধানে ভরে থাকা সীমানা নির্দেশিত ফসলের মাঠগুলোর সৌন্দর্য এই পঞ্জিতে তুলে ধরা হয়েছে। |
| নাবি | — দেরিতে হয় এমন। |
| দুর্বিপাক | — বিপদ। দুর্ঘট। |
| মরাই-সারাই | — গোলা মেরামত। |
| অপ্রগল্ভ | — অচথঙ্গ বিনয়ী, আচরণে শালীন। |

পাঠ-পরিচিতি

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের “নবান্ন” কবিতাটি তাঁর ‘মরুমায়া’ গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। একদিকে বাংলার কৃষকের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনাময় বাস্তবতা এই কবিতায় শিল্প-অবয়ব লাভ করেছে; অপরদিকে, ‘কৃষক’ আর ‘পাকা ধান’-এর প্রতীকে কবির আপন সৃষ্টির ধ্বন্স হওয়ার বেদনা দ্যোতিত হয়েছে।

জৈনেক বন্ধুর সঙ্গে কবি তাঁর মনের দৃঢ়বকথা বলে চলেছেন — এমন ভঙ্গি ব্যবহার করে কবিতাটির সূচনা। কবির সেই বেদনা-কাহনে উঠে এসেছে তাঁর ক্ষেতভূত পাকা ধান কীভাবে এক রাতে ধ্বন্স হয়ে গেছে সেই কথা। ফসল কাটার সময় সমাগত বিবেচনা করে কৃষক-কবির বাড়ি সেজে উঠেছিল আল্পনায়, গোলাঘর মেরামত করে ধান সংগ্রহের সকল আয়োজন হয়েছিল সম্পন্ন। একদিকে বাড়িতে এতসব আয়োজন আর অন্যদিকে মাঠে ফসল কাটার প্রতীক্ষা। এ যেন বাংলার কৃষক-জীবনের অক্তরিম ঝুপায়ণ। কৃষকেরা মাসের পর মাস ধরে বন্ধ জল করা শ্রমে চারাগাছ থেকে তিল তিল করে বড় করে তোলে পাকা ধান। এই সময় জুড়ে বিভিন্ন প্রকৃতিসৃষ্টি ও মনুষ্যসৃষ্টি দুর্ঘাগের আশঙ্কায় দুলে ওঠে তাদের হৃদয়। তবু তারা স্বপ্ন দেখে, বিভোর হয় আসন্ন সুখময় দিনের কল্পনায়। কবির একইভাবে ধান কাটার অপেক্ষায় দিন শুনেছেন। অথবায়ণ মাসে দুর্বিপাক ঘটার শঙ্খা না থাকায় ভেবেছেন ফসলগুলো আরেকটু পরিপন্থ হলে তবে কাটবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁর পাকা ধানে মই পড়ে গেছে। কিন্তু মই দেওয়া তো কোনো আকৃতিক দুর্ঘাগ নয়। তবে কি কবি কারও শক্তিতে শিকার? এই প্রশ্নের উত্তর কবিতায় নেই। এর কারণ অনুসন্ধানের তাগিদ তিনি অনুভব করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির দৃঢ় শেষ হয় না। কবির এই কষ্টের কথা শোনার দৈর্ঘ্যও কারও হয় না। কবির বন্ধুর অসহিষ্ণুতা থামিয়ে দেয় কবিকে। ফসল হারিয়ে নিষ্ঠ হওয়ার এই অযোধ বাস্তবতা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় এক অসমাপ্ত গঞ্জে। এভাবেই বেদনার রেশ টেনে নবান্নের আনন্দ মুছে দিয়ে সমাপ্ত হয় কবিতাটি।

কবিতাটির একটি প্রতীকী তাংপর্যও লক্ষণীয়। ‘পাকা ধান’-এর প্রতীকে, কৃষকের ক্লপকলে যতীন্দ্রনাথ আপন সৃষ্টিকে আরও নিজের করে পেতে চান। কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্ম যখন সমালোচিত হয়, সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয় না তখন কবি বেদনাহত হন। পাকা ধান নষ্ট হওয়া হতসম্বল কৃষকের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পান তিনি। এভাবে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গ নিয়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভবকে শিল্পায়িত করেছেন আলোচ্য “নবান্ন” কবিতায়।

কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্ব বিভাগ মুখ্যত ৬+৬+৬+২। অর্থাৎ, চরণের শেষে ২ মাত্রার একটি পর্ব বিদ্যমান। অবশ্য কোনো চরণে এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “নবান্ন” কবিতায় কবি কোথায় বসে তার বন্ধুকে গল্প শোনার কথা বলেছেন?
- ক. ঘরের মেঝেতে পাটি বিহিয়ে
 - খ. দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে
 - গ. বসার ঘরের চেয়ারে বসে
 - ঘ. বারান্দায় রাখা মাদুরে বসে
২. ‘দৈব-দুর্বিপাক’ বলতে কোন ধরনের দুর্যোগকে বোঝানো হয়েছে?
- ক. প্রাকৃতিক
 - খ. দেবতাসৃষ্ট
 - গ. আকস্মিক
 - ঘ. মানবসৃষ্ট

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ঢ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

আগামীকাল বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। করতোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ উদ্বৃক্ষণার শৈষ নেই। সবাই মিলে আজ বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটি আলপনায় ভরে তুলতে কাজে নেমেছে। ছোট ছোট হাত, কচি মন আর নানা রংয়ের মিশ্রণে রাস্তাটি হয়ে উঠেছে আমাদের লোকজ গ্রাম্যের আধার। কিন্তু সক্ষ্য বেলার আকস্মিক ঝড়বৃষ্টি কচি মনের সব স্পন্দন মুছে দেয়।

৩. উদ্বীপকে “নবান্ন” কবিতার যে দিকগুলোর ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো-

i. উৎসবের প্রস্তুতি

ii. স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা

iii. প্রতিহিংসার বহির্প্রকাশ

নিচের কোনটি ঠিকঃ

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত বঙ্গব্য পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে “নবান্ন” কবিতাটিকে কোন শ্রেণিভুক্ত করা যায়?

ক. সংলাপধর্মী

খ. কাহিনিধর্মী

গ. প্রতীকধর্মী

ঘ. বৃপ্কাশন্ত্রী

সূজনশীল প্রশ্ন

অকালে ঘরে গেল একটি স্বপ্ন

নিম্ন প্রতিবেদক, ‘দৈনিক দর্শন’ # আগেলবাড়া, বরিশাল। তারিখ : ১৫/০৫/২০১৬

এক নিমেষেই চুরমার হলো ধনঞ্জয়ের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। চিকিৎসার অভাবে জ্বীর মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তান মৃত্যুঞ্জয়কে অনেক বড় ডাঙ্গার বানানোর প্রত্যয় গ্রহণ করেন তিনি। উদ্দেশ্য, তার জ্বীর মতো আর কেউ যেন অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়। অন্যের জমিতে কাজ করে কখনোবা এলাকার ছোট ছেট ছেলে-মেয়েকে পড়িয়ে ছেলের পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছেন ধনঞ্জয়। গতকাল তিনি জানতে পেরেছেন যে, ছেলে তার ডাঙ্গার পাস করেছে। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন এবার পূরণ হবে। কিন্তু স্বপ্ন তাঁর চুরমার হয়ে গেল। সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণ।

ক. “নবান্ন” কবিতায় কোথায় আলপনা আঁকার কথা বলা হয়েছে?

খ. ‘মই পড়ে গেছে ক্ষেতভো পাকা ধানে’।— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্বীপকে ধনঞ্জয়ের মধ্যে “নবান্ন” কবিতার যে দিকটির আভাস পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্বীপক ও “নবান্ন” কবিতার মূল বঙ্গব্যের পার্থক্য অনেক’— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

ফর্ম-৩৪, সাহিত্যপাঠ একাদশ, দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি



বিদ্রোহী কাঞ্জী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি

কাঞ্জী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা কাব্যজগতের এক অনন্য শিল্পী। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। নজরুল ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আট বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে কবির পরিবার চরম দারিদ্র্য পতিত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রামের মস্তব থেকে নিম্ন প্রাণীমারি পাস করে সেখানেই এক বছর শিক্ষকতা করেন নজরুল। বারো বছর বয়সে তিনি লেটোর দলে যোগ দেন এবং দলের জন্য পালাগান রচনা করেন। বস্তুত তখন থেকেই তিনি সৃষ্টিশীল সভার অধিকারী হয়ে উঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) শুরু হওয়ার পর ১৯১৭ সালে ১৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে তিনি যোগদান করেন এবং করাচিতে যান; পরে হাবিলদার পদে উন্নীত হন।

১৯২০ সালের শুরুতে বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে তিনি কলকাতায় আসেন এবং পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সাঞ্চাহিক ‘বিজগী’তে “বিদ্রোহী” কবিতা প্রকাশিত হলে চারদিকে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ‘লাঙ্গল’, ‘নববৃগ’, ‘ধূমকেতু’-সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যসমূহ : ‘আঘি-বীণা’, ‘বিমের বাঁশি’, ‘সাম্যবাদী’, ‘সর্বহারা’, ‘সিন্ধু হিন্দোল’, ‘চক্রবাক’, ‘সন্ধ্যা’, ‘প্রলয়-শিখা’। এছাড়াও তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অসংখ্য সংগীতের স্বৃষ্টি নজরুল। দেশাভিবেক গান, শ্যামাসংগীত, গজল রচনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ভারত সরকার তাঁকে ‘পদ্মভূষণ’ (১৯৬০) উপাধিতে ভূষিত করে। ‘জগত্প্রারণী স্বর্ণপদক’, ‘একুশে পদক’-সহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় তিনি ভূষিত হন। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে আনা হয় এবং জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট কবি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

বল বীর—

বল উন্নত ময় শির!

শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,

মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!

আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথুৰ,

আমি দুর্বার,

আমি ভেঙে করি সব চুরমার!

আমি অনিয়ম উচ্ছ্বল,

আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!

আমি মানি না কো কোন আইন,

আমি ভৱা-তরী করি ভৱা-ভুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন।

আমি ধূর্ণটি, আমি এলোকেশে বাড় অকাল-বৈশোধীর

আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্র!



বল বীর—

চির-উন্নত মম শির!

আমি সৃষ্টি, আমি ধৰ্মস, আমি লোকালয়, আমি শুণান,
আমি অবসান, নিশাবসান।

আমি ইন্দ্ৰাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য

মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশৱী আৱ হাতে রণ-তুর্য;

আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,

আমি আপনারে ছাড়া কৱি না কাহারে কুৰ্ণিশ!

আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওক্কার,

আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হৃক্কার,

আমি পিগাক-পাণিৰ ডমক ত্ৰিশূল, ধৰ্মৱাজেৰ দণ্ড,

আমি চক্ৰ ও মহা শঙ্খ, আমি প্ৰণব-নাদ প্ৰাচণ!

আমি ক্ষ্যাপা দুৰ্বাসা, বিশ্বামিত্ৰ-শিষ্য,

আমি দাবানল-দাহ, দাহন কৱিৰ বিশ্ব।

আমি উন্মান মন উদাসীৱ,

আমি বিধবাৰ বুকে ক্ৰন্দন-শ্বাস, হা হৃতাশ আমি হৃতাশীৱ।

আমি বৰ্ষিত ব্যথা পথবাসী চিৰ গৃহহারা যত পথিকেৱ,

আমি অবমানিতেৰ মৱম বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্ৰিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি কৈৱ

আমি উত্তৱ-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূৱৰী হাওয়া,

আমি পথিক-কবিৰ গভীৰ রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।

আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্ৰ-কন্দ্ৰ রবি

আমি মৰু-নিৰ্বৰ বাৰ বাৰ, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!

আমি অৰ্কিয়াসেৱ বাঁশৱী,

মহা- সিঙ্গু উতলা দ্বুমদ্বুম

দ্বুম চুমু দিয়ে কৱি নিখিল বিশ্বে নিবৃত্তুম

মম বাঁশৱীৰ তানে পাশৱি

আমি শ্যামেৱ হাতেৱ বাঁশৱী।

আমি কুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,

ভয়ে সং নৱক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।

আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অধিল ব্যাপিয়া!

আমি পৱনুৱামেৱ কঠোৱ কুঠার

মিঞ্জক্ষত্ৰিয় কৱিৰ বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্তি উদার!



আমি হল বলরাম-কঙ্কা
 আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে ।
 মহা- বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
 আমি সেই দিন হব শান্ত,
 যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না-
 অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-
 বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
 আমি সেই দিন হব শান্ত ।
 আমি চির-বিদ্রোহী বীর-
 বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির !

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

- নেহারি** — দেখে; প্রত্যক্ষ করে ।
- শির নেহারি** – শিখর হিমাত্তির;
- আমার** — আমার শির বা মস্তক প্রত্যক্ষ করে হিমালয়ের শিখর বা শীর্ষচূড়া পর্যন্ত মাথা নত করে আছে ।
- মহাপ্রলয়** — সৃষ্টির ধ্বংসকাল । এই প্রলয়কালে সৃষ্টির দেবতা ব্ৰহ্মারও আয়ুৱ অবসান ঘটে ।
- নটৱাজ** — মহাদেবের আৱ এক নাম । সৃষ্টির ধ্বংসকালে ধ্বংসের এই দেবতার ভয়কর নৃত্যময় মৃত্তি ।
- কানুন** — আইন ।
- টর্পেডো** — ডুবোজাহাজ থেকে নিষ্কেপযোগ্য এক ধৰনের অন্তর্ভুক্ত ।
- ভীষণ**— ভয়নক; পঞ্চ-পাঞ্চবের দ্বিতীয় পাঞ্চব, ইনি গদা নিয়ে যুদ্ধে পারঙ্গম ।
- ধূর্জটি** — শিব বা মহাদেবের অন্য নাম । জটাধাৰী শিবের জট ধূৰুকপী বলে তাকে ধূর্জটি বলা হয় ।
- এলোকেশে** — যার চূল বা কেশ এলানো । এখানে অকাল বৈশাখীৰ বাড়ের সঙ্গে এলানো চূলের তুলনা কৰা হয়েছে ।
- আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতীৰ** — আমি বিশ্ব বিধাতার বিদ্রোহী পুত্র ।
- নিশাবসান** — রাতের শেষ বা অবসান ।
- ইন্দ্ৰানী-সুত** — ইন্দ্ৰের স্তৰী ইন্দ্ৰানী বা শটী । তার পুত্ৰের নাম জয়ন্ত ।
- বেদুইন** — আৱবদেশের একটি যাযাবৰ জাতি ।
- চেঙ্গিস** — চেঙ্গিস খান (১১৬২-১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) । মোঙ্গল জাতিৰ অন্যতম যোদ্ধা ও সামৰিক নেতা ।
- কুর্নিশ** — কিছুটা পিছিয়ে সম্পূর্ণ সালাম বা অভিবাদন ।



ঈশান-বিশাণে ওক্তার

ইন্দ্রাফিলের শিঙা

পিণাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল

আমি চক্র ও মহাশঙ্খ

প্রণব-মাদ

দুর্বাসা

বিশ্বমাত্রিক

হতাশী

লিদায়

মরু-নির্বর্ষ

অর্কিয়াস

তান

পাশরি

হাবিয়া দোজখ

পরশুরাম

- ঈশান কোণ থেকে শিঙা থেকে ধ্বনিত ওক্তার বা ‘ওঁকার’ বা ‘ওঁ’ ধ্বনি।
- পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত বিশিষ্ট ফেরেশতার নাম ইন্দ্রাফিল। ইনি বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিয়ামত বা প্রলয়কালে হ্যরত ইন্দ্রাফিলের ব্যবহৃত শিঙা।
- শিব বা মহাদেব পিণাক নামক ধনু ধারণ করেন বলে তার নাম পিণাক পাণি। তাঁর অন্য হাতে থাকে ডমরু নামক ডুগডুগি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ও ত্রিশূল।
- বিষ্ণু বা সুদর্শন চার হাত বিশিষ্ট। তাঁর একটি হাতে থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। এখানে বিষ্ণুর হাতের চক্র ও শঙ্খকে বোঝানো হয়েছে।
- ওক্তার ধ্বনি।
- ভারতীয় পুরাণের কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট মুনি। মহর্ষি অত্রির উরায়ে ও তাঁর স্ত্রী অনসূয়ার গতে দুর্বাসার জন্ম। এর কোপানলে পড়ে অনেকেই দন্ত হল।
- বিশিষ্ট ব্রহ্মর্ষি। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর তপস্যার ফলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।
- হা-হতাশ করে যে।
- শীঘ্ৰ।
- মরুভূমিৰ বারলা।
- ছিক পুরাণের গানের দেবতা এ্যাপোলো ও মিউজ ক্যাল্লোপিৰ পুত্র অর্কিয়াস ছিলেন মহান কবি ও শিঙ্গী। তবে মতান্তরে ইনি খ্রেসের রাজা ইঞ্চাসের সন্তান। ইনি যন্ত্রসংগীতে পারদশী ছিলেন। তিনি যন্ত্রসংগীতে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। ইনি সুরের ইন্দ্ৰজাল বিস্তার করে ভালোবাসার পাত্ৰী ইউরিডিসের মন জয় করেছিলেন। সুরের জাল বিস্তার করে অর্কিয়াস মৃত ইউরিডিসের প্রাণ ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সামান্য ভুলের জন্য ঐ সাফল্য তাঁর অধরা থেকে যায়।
- সুরের বিস্তার।
- ভুলে যাই; বিস্মৃত হওয়া।
- সাতটি দোজখের একটি দোজখ।
- বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। জমদগ্নি ও রেণুকার পঞ্চম পুত্র। অস্ত্র হিসেবে পরশ বা কুঠার ধারণ করায় তাঁর নাম হয় পরশুরাম। ইনি পিতার আদেশে কুঠার দিয়ে মাতৃহত্যা করেন। আবার সাধনাবলে মাকে বাঁচিয়ে তোলেন।

পরশুরামের কঠোর.... বিশ্ব

হল

বলরাম

থড়গ

কৃপাণ

ভীম রণ-ভূমে রাণিবে না

- পরশুরাম একুশ বার ক্ষত্রিয়দের নিধন করেন। শ্রী কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভাতা।
- লাঙল; বলরামের অন্ত্র।
- শ্রী কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভাতা।
- অন্ত্রবিশেষ। বলিদানে ব্যবহৃত হয়।
- তলোয়ার বা তরবারি সদৃশ অন্ত্রবিশেষ।
- ভয়ানক রণক্ষেত্রে অন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।

পাঠ-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত “বিদ্রোহী” কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’ (১৯২২) থেকে সংকলিত হয়েছে। অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা “বিদ্রোহী”।

“বিদ্রোহী” বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রনাথে এ কবিতার মধ্য দিয়ে এক প্রাতিস্থিক কবিকল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটে— যা বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বিরল স্মরণীয় ঘটনা।

“বিদ্রোহী” কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদস্ত আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে। কবিতায় সগর্বে কবি নিজের বিদ্রোহী কবিসন্তার প্রকাশ ঘটিয়ে উপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেন। এ কবিতায় সংযুক্ত রয়েছে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষেত্র ও বিদ্রোহ। কবি সকল অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে ঘোষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে উপকরণ উপাদান সমীকৃত করে নিজের বিদ্রোহী সন্তার অবয়ব রচনা করেন। কবিতার শেষে ধ্বনিত হয় অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান কাম্য। বিদ্রোহী কবি উৎকর্ষ ঘোষণায় জানিয়ে দেন যে, উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দনরোল যতদিন পর্যন্ত প্রশংসিত না হবে ততদিন এই বিদ্রোহী কবিসন্তা শাস্ত হবে না। এই চির বিদ্রোহী অভিন্নে চির উন্নত শিরৱাপে বিরাজ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি কার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. বধিতের | খ. বিধাতার |
| গ. পরশুরামের | ঘ. ইম্রাফিলের |

২। ‘একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য’— এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন সন্তান প্রকাশ পেয়েছে?

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ক. প্রেম ও দ্রোহ | খ. বিদ্রোহী ও বংশীবাদক |
| গ. বিদ্রোহী ও অত্যাচারিত | ঘ. বিদ্রোহী ও বীরযোদ্ধা |



উদ্বীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং থাণ্ডের উভয় দাও।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এক অকৃতোভয় নেতৃত্ব ছিলেন। নানা জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করে তিনি জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিতে সক্ষম হন।

৩। জাতির জনকের মধ্যে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত?

i. বিদ্রোহ

ii. অদেশ প্রেম

iii. নেতৃত্ব

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪। প্রকাশিত দিক/দিকগুলি কোন পঞ্জিকিতে পাওয়া যায়?

ক. আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্ণিশ

খ. আমি পথিক কবির গভীর রাগিণী, বেনু-বীণে গান গাওয়া

গ. আমি রংষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া

ঘ. আমি চির বিদ্রোহী বীর- বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির

সূজনশীল প্রশ্ন

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু

এই স্রষ্টার শনি মহাকা঳ ধূমকেতু!

সাত-সাতশ নরক-জ্বালা জলে মম ললাটে।

মম ধূম-কুঙ্গলী করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে।

আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি পাপের অনুত্তাপ-তাপ হাহাকার

আর মর্ত্যে শাহারা- গোবী-ছাপ

আমি অশিব তিঙ্ক অভিশাপ।

ক. কবি কী মানেন না?

খ. ‘যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা’- একথা বলার কারণ কী?

গ. উদ্বীপকের সাথে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্বীপকটি ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সমগ্রভাব ধারন করেনা’- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।



সাম্যবাদী কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি : “বিদ্রোহী” কবিতা অংশে দ্রষ্টব্য

গাহি সাম্যের গান—

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিপ্তান।

গাহি সাম্যের গান!

কে তুমি?— পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কল্ফুসিয়াস্? চার্বাক—চেলা? বলে যাও, বল আরও!

বঙ্গ, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরাল-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক—
জেন্দাবেস্তা-গ্রহ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ,—
কিষ্ট কেন এ পঙ্কজম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি? — পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শান্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ থ্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!

বঙ্গ, বঙ্গিনি ঝুট,

এইখানে এসে ঝুটইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সে মীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্জিদ এই, মন্দির এই, শির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈস্মা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,



এই মাঠে হলো মেঘের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।
 এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
 ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
 এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
 এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!

মিথ্যা শুনিনি তাই,

এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|-------------------------------|---|
| সাম্য | - সমদর্শিতা। সমতা। |
| সাম্যবাদ | - জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদ। |
| পার্সি | - পারস্যদেশের বা ইরানের নাগরিক। |
| জৈন | - জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মতাবলম্বী জাতি। |
| ইহুদি | - প্রাচীন ইরুশেল বা জু-জাতি ও ধর্ম-সম্পদায়ের মানুষ। |
| সাঁওতাল, ভীল | - ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম নৃগোষ্ঠীবিশেষ। |
| গারো | - গারো পর্বত অঞ্চলের অধিবাসী। স্কুদ্র নৃ-গোষ্ঠীবিশেষ। |
| কন্ফুসিয়াস | - চীনা দার্শনিক। এখানে তাঁর অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে। |
| চার্বাক | - একজন বঙ্গবাদী দার্শনিক ও মুনি। তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন না। |
| জেন্দাবেন্তা | - পারস্যের অঞ্চল উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা। |
| সকল শাস্ত্র ... দেখ নিজ প্রাণ | - ইসলাম ধর্মবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফ, হিন্দুদের বেদ, খ্রিস্টান সম্পদায়ের বাইবেল—এভাবে পৃথিবীর নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থ। কবি এখানে বলতে চেয়েছেন সকল ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই সংকলিত আছে তা হচ্ছে মানবতাবোধ, সমতার দৃষ্টিভঙ্গি। |
| যুগাবতার | - বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ বা অবতার। |
| দেউল | - দেবালয়। মন্দির। |
| বুট | - মিথ্যা। |
| নীলাচল | - জগন্নাথক্ষেত্র। নীলবর্ণযুক্ত পাহাড়। যে বিশাল পাহাড়ের পরিসীমা নির্ধারণ করা যায় না। |
| কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া | - হিন্দুদের ধর্মীয় কয়েকটি পবিত্র স্থান। |
| জেরুজালেম | - বাযতুল-মোকাদ্দাস। ফিলিস্তিনে অবস্থিত এই স্থানটি মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পুণ্যস্থান। |



মসজিদ এই ... এই হৃদয়

- মানুষের হৃদয়ই মসজিদ, মনির গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পরিত্ব।

বাংশির কিশোর গাহিলেন

মহা-গীতা

- হিন্দুধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শাক্যমুনি

- শাকবৎশে জন্ম ঘার। বুদ্ধদেব।

কন্দরে

- পর্বতের গুহা। (হৃদয়ের) গভীর গোপন স্থান।

আরব-দুলাল

- আরব সন্তান। এখানে হজরত মুহম্মদ (স) কে বোঝানো হয়েছে।

কোরানের সাম-গান

- পরিত্ব কোরানের সাম্যের বাণী।

পাঠ-পরিচিতি

আবদুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ‘নজরুল রচনাবলি’র প্রথম খণ্ড থেকে “সাম্যবাদী” কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘সাম্যবাদী’ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটিতে বৈষ্যবিহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। কবি এই ‘সাম্যের গান’ গেয়েই গোটা মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে আগ্রহী। কবির বিশ্বাস মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে উঠার চেয়ে সম্মানের আর কিছু হতে পারে না। নজরুলের এই আদর্শ আজও প্রতিটি সত্যিকার মানুষের জীবনপথের প্রেরণা। কিন্তু মানুষ এখনও সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে রাজনীতি করছে, মানুষকে শোষণ করছে, একের বিরুদ্ধে অন্যকে উৎস্ফে দিচ্ছে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষকে পরস্পর থেকে দূরে ঢেলে দিচ্ছে। নজরুল এই কবিতায় সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : “মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর”। তাই তিনি জোর দেন অন্তর-ধর্মের ওপর। ধর্মস্থ পড়ে যে জ্ঞান মানুষ আহরণ করতে পারে, তাকে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন প্রাপ্ত মানবিকতাবোধ। মানুষের হৃদয়ের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ কোনো তীর্থ নেই, এই প্রতীতি কবির স্বোপার্জিত অনুভব। এ কারণেই কবি মানবিক মেলবন্ধনের এক অপূর্ব সংগীত পরিবেশন করতে আগ্রহী। এ গানে মানুষে মানুষে সব ব্যবধান ঘুচে যাবে। মানবতার সুবাস ছড়ানো আত্মার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই জীবনকে পবিত্রতম করে তোলা সম্ভব, এই মর্মবাণীকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই এই কবিতায় নজরুলের অষ্টিট।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘জেন্দা’ একটি—

ক. প্রহৃ

খ. জাতি

গ. ব্যক্তি

ঘ. ভাষা

২. মৃত পুঁথি-কঙ্কাল কথাটি ধারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. পুরনো বই পুস্তক

খ. মানুষের কঙ্কাল

গ. অতীত ইতিহাস

ঘ. পুরনো ধ্যান-ধারণা



নিচের কবিতাখণ্ডটি গড়ে ও সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রীতি ও প্রেমের পূর্ণ বাঁধনে

যবে মিলি পরম্পরে

স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন

আমাদের কুঁড়ে ঘরে ।

৩. উদ্দীপকে “সাম্যবাদী” কবিতার যে দিকটি উচ্চারিত হয়েছে তা হলো—

i. সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বাণী

ii. অসাম্প্রদায়িকতার বাণী

iii. পারম্পরিক ভালোবাসার বাণী

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪। কাজী নজরুল ইসলামকে সাম্যবাদী কবি বলা হয়, কারণ তিনি—

i. নারী-পুরুষের সমতা চেয়েছেন

ii. ধনী-গরিবের সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন

iii. ধর্মীয় বিভেদ ভুলে যেতে বলেছেন

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

শুধাও আমাকে “এতদুর তুমি কোন প্রেরণায় এলে

তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি শেন নাই

সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।”

এক সাথে আছি একসাথে বাঁচি আরও একসাথে থাকবই

সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই ।

ক. ‘যুগাবতার’ অর্থ কী?

খ. কবি কেন সাম্যের গান গেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে “সাম্যবাদী” কবিতার কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্দিষ্ট দিকটি হৃদয়ে লালন করার মাধ্যমে আমরা সুন্দর-সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে পারব।’— বিশ্লেষণ কর।

প্রতিদান

জ্ঞানীমউদ্দীন

কবি-পরিচিতি

জ্ঞানীমউদ্দীন ফরিদপুরের তাম্বলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আনসারউদ্দীন মোল্লা এবং মায়ের নাম আমিনা খাতুন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর প্রামে। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাস করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিপ্লোমাতে অধ্যয়নকালে “কবর” কবিতা রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং ছাত্রাবস্থায়ই কবিতাটি স্কুল পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

জ্ঞানীমউদ্দীন ‘পল্লী-কবি’ হিসেবে সমধিক পরিচিত। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। পরে সরকারের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগে উচ্চপদে আসীন হন। পল্লীজীবন তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ, সহজ-সরল প্রাকৃতিক জীব উপযুক্ত শব্দ উপমা ও চিত্রের মাধ্যমে তাঁর কাব্যে এক অনন্য সাধারণ মাত্রায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত ‘নকসী কাঁথার মাঠ’ কাব্যটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য জনপ্রিয় ও সমাদৃত গ্রন্থ হচ্ছে : ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’, ‘বালুচর’, ‘ধানখেত’, ‘রঙিলা নায়ের মাঝি’। সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিপিট উপাধি প্রদান করে।

জ্ঞানীমউদ্দীন ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিরাগী—
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি,
দীঘল রজনী তার তরে জাগি’ ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।
আমার এ কুল ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার কুল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি।
যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম-ভর,—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি’
রঙিল ফুলের সোহাগ-জড়ান ফুল মালঘঁ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঝুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে করে তারি মুখখানি,
কত ঠাই হতে কত কী যে আনি’ সাজাই নিরসন-
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।



শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| যেবা | — যে। যিনি। |
| বিরাগী | — নিষ্পত্তি, উদাসীন। |
| দীঘল রঞ্জনী | — দীর্ঘ রাত। |
| ঘূম যে হয়েছে | — নির্ধূম রাত কাটানোর কথা বলা হয়েছে। |
| বিষে-ভরা বাণ | — কটু কথা। হিংসাত্মক ভাষা। |
| সোহাগ | — আদর। ভালবাসা। |
| মালধও | — ফুলের বাগান। |
| নিষ্ঠারিয়া | — নিষ্ঠুর। নির্দয়। |
| ঠাই | — স্থান। আঞ্চলিক। |
| নিরন্তর | — নিয়ত। অবিরাম। |

পাঠ পরিচিতি

‘প্রতিদান’ কবিতাটি কবি জসীমউদ্দীনের ‘বালুচর’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় কবি স্কুল শার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহনি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কল্পে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রাতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কেননা তালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী। কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর, বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘প্রতিদান’ কবিতায় কবি কাঁটা পেয়ে কী দান করেছেন?

- | | |
|--------|---------|
| ক. ফুল | খ. ঘৃণা |
| গ. বাণ | ঘ. ঘর |

২। ‘আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর’— এ পঙ্কজিতে কী বোঝানো হয়েছে?

- | | |
|-------------------|----------------|
| ক. পরোপকার | খ. আত্মানি |
| গ. সর্বসহা মনোভাব | ঘ. কৃতজ্ঞতাবোধ |

নিচের উদ্ধৃতিটি পড়ে ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইমাম হাসান (রাঃ) তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যাকারী জাএদাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং বললেন, পরকালে তাকে বেহেশত প্রদানের জন্য আল্লাহ'র কাছে সুপারিশ করবেন।



৩। উদ্দীপকের হাসান (রাঃ) এর সাথে ‘প্রতিদান’ কবিতার কোন পঙ্কজির মিল আছে?

- ক. কত ঠাই হতে কত কী যে আমি সাজাই নিরস্তর
- খ. দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘূম যে হরেছে মোর
- গ. রঙিন ফুলের সোহাগ জড়ান ফুল মালধও ধরি
- ঘ. যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি

৪। উপর্যুক্ত মিলের কারণ-

- i. ক্ষমাশীলতা
- ii. আত্মপ্রশংসন
- iii. পারস্পরিক সৌহার্দ্য

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

এক বুড়ি হয়রত মুহম্মদ (স.) এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো এবং পথ চলতে নবির পায়ে কাঁটা ফুটলে আনন্দিত হতো। একদিন পথে কাঁটা না দেখে নবিজী চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং বুড়ির বাড়িতে গিয়ে দেখলেন বুড়ি অসুস্থ। নবি (স.) কে দেখে বুড়ি ভীত হলেন। তিনি বুড়িকে ক্ষমা করে দিলেন এবং সেবাযত্ত দিয়ে সুস্থ করে তুললেন।

ক. কবি কাকে বুকভরা গান দেন?

খ. কবিকে যে পর করেছে তাকে আপন করার জন্য কেন্দে বেড়ান কেন?

গ. উদ্দীপকের ভাবের সাথে ‘প্রতিদান’ কবিতার মূলভাবের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্দীপক ও ‘প্রতিদান’ কবিতার ভাবার্থ ধারণ করলে একটি সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব’- বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।



সুচেতনা জীবনানন্দ দাশ

কবি-পরিচিতি

আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রের্ণ কবি জীবনানন্দ দাশ। ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন বরিশাল প্রজ্ঞমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি। মাঝের কাছ থেকে তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। স্বল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করলেও মূলত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় সৃষ্টি ও গভীর অনুভবের এক জগৎ তৈরি করেন। বিশেষ করে গ্রামবাংলার নিসর্গের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা চলে না। সেই নিসর্গের সঙ্গে অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্রা যুক্ত হয়ে তাঁর হাতে অনন্যসাধারণ কবিতাশিল্প রচিত হয়েছে। এই অসাধারণ কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্রবূপময়’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া ব্যক্তিমানবের নিঃসঙ্গতা, আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণা ও হাহাকার এবং সর্বোপরি জীবন ও জগতের রহস্য ও মাহাত্ম্য সন্ধানে তিনি এক অপ্রতিম কবিভাষা সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধিদেব বস্তু তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন ‘নির্জনতম কবি’ বলে। উপমা, চিত্রকলা, প্রতীক সংজ্ঞা, আলো-আৰাদের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার এবং অনুভবের বিচ্ছিন্ন মাত্রার ব্যবহারে তাঁর কবিতা লাভ করেছে অসাধারণভূত। তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা বাঙালির জাতিসঙ্গ বিকাশের আনন্দেশনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে তৈরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ স্থান রয়েছে। জীবনানন্দের উপ্লব্ধিযোগ্য কাব্যস্থু : ‘ঘৰা পালক’, ‘ধূসৱ পাখুলিপি’, ‘বনলতা সেন’, ‘মহাপথিবী’, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’, ‘বৃপ্সী বাংলা’। ‘কবিতার কথা’ তাঁর প্রবন্ধস্থু এবং ‘মাল্যবান’ ও ‘সুতীর্থ’ তাঁর বিখ্যাত দুইটি উপন্যাস।

জীবনানন্দ দাশ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ শে অক্টোবর কলকাতায় দ্রাম দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।

আজকে অনেক রুঢ় বৌদ্ধে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়ত নিহত
ভাই বোন বস্তু পরিজন পাঁড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও খণ্ডী পৃথিবীরই কাছে।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে- এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;



এ-বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
 প্রায় ততদুর ভালো মানব-সমাজ
 আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
 গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, চের দূর অস্তিম প্রভাতে।
 মাটি-পৃথিবীর টালে মানবজগনের ঘরে কখন এসেছি,
 না এলেই ভালো হতো অনুভব ক'রে;
 এসে যে গভীরতর লাভ হলো সে-সব বুঝেছি
 শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
 দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—
 শাশ্বত রাত্তির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

শব্দার্থ ও টিকা

সুচেতনা....নির্জনতা আছে

- সুচেতনা নামে এক শুভ চেতনার কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। কবির কল্পনায় ধীপের মতো বিচ্ছিন্ন এই চেতনার সবুজে বিরাজ করছে নির্জনতা। অর্থাৎ এই শুভ চেতনা সর্বত্র বিস্তারিত, বিরাজমান নয়।

এই পৃথিবীর.....সত্য নয়

- সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি বহু যুদ্ধ-রক্ষপাত-প্রাণহানী সংঘটিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তবে এই ধর্মসাম্মত দিকটিই পৃথিবীর শেষ সত্য নয়।

আজকে অনেক.....পরিজন পড়ে আছে

- প্রেম, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে শিয়েও পৃথিবীতে অগণিত প্রাণহানি, রক্ষপাতের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ অনেক রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়েই পৌছাতে হয় ভালোবাসার পরিপায়ে।

এই পথে আলো....ক্রমমুক্তি হবে

- পৃথিবীব্যাপ্ত গভীর অসুখ বা বিপর্যয় থেকে মুক্তির পথই শুভ চেতনা। ইতিবাচক এ চেতনার আলো প্রজননের মাধ্যমেই সকল বিপর্যয় থেকে পৃথিবী ও মানুষের মুক্তি ঘটবে।

মাটি-পৃথিবীর টালে.....সে-সব বুঝেছি

- ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীতে মানবজগনে জন্ম না নেওয়াকে আপাতভাবে কাস্তিক্ত মনে হলেও এই পৃথিবী ও শুভ চেতনা থেকে প্রাপ্তিই শেখাবধি আমাদের গভীরভাবে প্রাপ্তি ও খণ্ডী করে।

শাশ্বত রাত্তির.....অনন্ত সূর্যোদয়

- পৃথিবীব্যাপ্ত অঙ্গকার বা অঙ্গভের অঙ্গরালেই আছে সূর্যোদয়, মুক্তির দিশা। সুচেতনার বিকাশেই এই আলোকজ্ঞাল পৃথিবীর দেখা মিলবে, এটিই কবির বিশ্বাস।



পাঠ-পরিচিতি

“সুচেতনা” কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। “সুচেতনা” জীবনানন্দ দাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ কবিতায় সুচেতনা সংবোধনে কবি তাঁর প্রার্থিত, আরাধ্য এক চেতনানিহিত বিশ্বাসকে শিল্পিত করেছেন। কবির বিশ্বাসমতে, সুচেতনা দূরতম দীপসদৃশ একটি ধারণা, যা পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত নয়। চেতনাগত এই সন্তা বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলোকিক পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ত করে রাখে। জীবন্তাঙ্গির এই চেতনাগত সত্যই পৃথিবীর ক্রমমুক্তির আলোকে প্রজলিত রাখবে, মানবসমাজের অগ্রায়াত্মকে নিশ্চিত করবে। শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয়কে প্রকাশ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি জীবনানন্দ দাশের বিশ্বাস মতে সুচেতনা-

- | | |
|--------------------|------------------|
| ক. বিকেলের নক্ষত্র | খ. শাশ্বত রাত্রি |
| গ. দূরতর দ্঵ীপ | ঘ. দারণচিনি বন |

২. ‘মানুষ তবু খণ্ডী পৃথিবীরই কাছে’ উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে-

- | | |
|--------------------|------------------------|
| ক. ইহলোকিকতা | খ. ভাবালুতা |
| গ. সাম্যবাদী চেতনা | ঘ. পরাবাস্তববাদী চেতনা |

নিচের উক্তিগুটি পড়ে ঢে ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

তবে পাল খোলো, তবে নোঙ্গে তোলো;
এবার অনেক পথ শেষে সকানী
হেরার তোরণ মিলবে সম্মুখে জানি।

৩. উক্তিপুর ও কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে-

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ক. অতীতের মোহযুক্তা | খ. দেশপ্রেমের চেতনা |
| গ. সংকট উত্তরণের প্রত্যাশা | ঘ. সমকাল নিয়ে হতাশা |

৪. ‘হেরার তোরণ মিলবে সম্মুখে জানি’- উক্তির সাথে ‘সুচেতনা’ কবিতার কোন চরণের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়?

- | |
|---|
| ক. এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য |
| খ. মানুষ তবু খণ্ডী পৃথিবীরই কাছে |
| গ. সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ |
| ঘ. শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয় |



সৃজনশীল প্রশ্ন

“অঙ্গুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
 যারা অঙ্ক সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
 যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই গ্রীতি নেই করণার আলোড়ন নেই
 পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া ।
 যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
 এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
 মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
 শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয় ।”

- ক. ‘সুচেতনা’ কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে?
- খ. ‘পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন’— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. উক্তীপকটিতে ‘সুচেতনা’ কবিতাটির কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উক্তীপকটিতে ‘সুচেতনা’ কবিতার সমগ্র দিক উন্মোচিত হয় নি।”— উক্তিটি মূল্যায়ন কর।



তাহারেই পড়ে মনে

সুফিয়া কামাল

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলা কবি ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর জন্ম ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ২০এ জুন বরিশালে। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। কবির পিতার নাম সৈয়দ আবদুল বারী এবং মায়ের নাম সাবেরা বেগম। যে সময়ে সুফিয়া কামালের জন্ম তখন বাঙালি মুসলমান নারীদের কাটাতে হতো গৃহবন্দি জীবন। স্কুল কলেজে গড়ার কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। ওই বিরুদ্ধ পরিবেশে সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। পারিবারিক নানা উদ্ধান পতনের মধ্যে তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। তাই মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে তিনি শুধু কবি হিসেবেই বরণীয় হননি, জননী সম্বন্ধগে ভূষিত হয়েছেন।

সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : ‘সাঁওরের মায়া’, ‘মায়া কাজল’, ‘কেয়ার কাঁটা’, ‘উদান পৃথিবী’ ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি গল্প, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্গপদকসহ বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০এ নতুনবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

“হে কবি, নীরব কেন ফাণুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?”

কহিল সে স্নিগ্ধ আঁধি তুলি-
“দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?

বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দধিনা সমীর তার গঙ্গে গঙ্গে হয়েছে কি অধীর আকুল?”
“এখনো দেখনি তুমি?” কহিলাম, “কেন কবি আজ
এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?”

কহিল সে সুদূরে চাহিয়া-
“অলঝের পাথার বাহিয়া

তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।”

কহিলাম, “ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,
বসন্ত-বন্দনা তব কর্ষে শুনি- এ ঘোর মিনতি।”

কহিল সে মৃদু মধু-স্বরে-
“নাই হলো, না হোক এবারে-

আমারে গাহিতে গান, বসন্তেরে আনিতে বরিয়া-
রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাণুনে স্মরিয়া।”



কহিলাম : “ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?

যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।”

কহিল সে পরম হেলায়-

“বৃথা কেন? ফাণুন বেলায়

ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুল্পারতি লভেনি কি ঝুতুর রাজন?

মাধবী কুঁড়ির বুকে গঙ্গ নাই? করে নাই অর্ধ্য বিরচন?”

“হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?”

কহিলাম, “উপেক্ষায় ঝুতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?”

কহিল সে কাছে সরে আসি-

“কুহেলি উন্নরী তলে মাঘের সন্ধ্যাসী-

শিয়াছে চলিয়া ধীরে পুল্পশূন্য দিগন্তের পথে

রিক্ত হচ্ছে! তাহারেই পড়ে ঘনে, ভুলিতে পারি না কোনো ঘতে।”

শব্দার্থ ও টীকা

হে কবি

- কবিভক্ত এখানে কবিকে সম্মোধন করেছেন।

নীরব কেন

- উদাসীন হয়ে আছেন কেন? কেন কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না।

ফাণুন যে এসেছে ধরায়

- পৃথিবীতে ফালুন অর্থাৎ বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে।

তব বন্দনায়

- তোমার রচিত বন্দনা-গানের সাহায্যে। অর্থাৎ বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে কি তুমি বরণ করে নেবে না?

দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?

- কবির জিজ্ঞাসা— বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে কি না। উদাসীন কবি যে তা লক্ষ করেননি তার এই জিজ্ঞাসা থেকে তা স্পষ্ট হয়।

বাতাবি লেবুর ফুল...

অধীর আকুল

- বসন্তের আগমনে বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গঙ্গে দখিনা বাতাস দিঘিদিক সুগন্ধে ভরে তোলে। কিন্তু উন্ননা কবি এসব কিছুই লক্ষ করেননি। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর উদাসীনতাকেই স্পষ্ট করে।

এখনো দেখনি তুমি?

- কবিভক্তের এ কথায় আমরা নিশ্চিত হই প্রকৃতিতে বসন্তের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কবি তা লক্ষ করছেন না।

কোথা তব নব পুল্পসাজ

- বসন্ত এসেছে অথচ কবি নতুন ফুলে ঘর সাজাননি। নিজেও ফুলের অলংকারে সাজেননি।

অলখ

- অলক্ষ। দৃষ্টি অগোচরে।



- পাথার** - সমুদ্র।
- বসন্তের আনিতে...**
- ফাণুন স্মরিয়া** - কবি বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে বর্ণনা করলেও বসন্ত অপেক্ষা করেনি। ফাণুন আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে।
- করিলে বৃথাই** - ব্যর্থ করলে। অর্থাৎ কবি-ভক্তের অনুযোগ-বসন্তকে কবি বরণ না করায় বসন্তের আবেদন শুরুত্ব হারিয়েছে।
- পুষ্পারতি** - ফুলের বন্দনা বা নিবেদন।
- পুষ্পারতি লভে নি কি**
- খতুর রাজন?** - খতুরাজ বসন্তকে বরণ ও বন্দনা করার জন্য গাছে ফুল ফোটেনি? অর্থাৎ বসন্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই যেন ফুল ফোটে।
- মাধবী** - বাসন্তী লতা বা তার ফুল।
- অর্ঘ্য বিরচন** - অঞ্জলি বা উপহার রচনা। প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে।
- উপেক্ষায় খতুরাজে কেন**
- কবি দাও তুমি ব্যথা** - কবিভক্ত বুঝতে পারছেন না, কবি যথারীতি সানন্দে বসন্ত বন্দনা না করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন।
- কুহেলি** - কুয়াশা।
- উকুরী** - চাদর। উকুরীয়।
- কুহেলি উকুরী তলে**
- মাঘের সন্ধ্যাসী** - কবি শীতকে মাঘের সন্ধ্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। যে সন্ধ্যাসী কুয়াশার চাদর পরিধান করে আছে।
- পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে** - শীত প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। গাছের পাতা যায় বারে। গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ধ্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে।
- তাহারেই পড়ে মনে** - প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষম্ব ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তার কর্ত নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্ত তার মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন, মনে কোনো আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা-পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্ণতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইঙ্গিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

পাঠ-পরিচিতি

“তাহারেই পড়ে মনে” কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বসন্ত-প্রকৃতির অপবৃপ সৌন্দর্য যে কবিমনে আনন্দের শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে ছন্দে সুরে ফুটিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কবিমন যদি কোনো কারণে শোকাচ্ছন্ন কিংবা বেদনা-ভারাতুর থাকে তবে বসন্ত তার সমন্বয় সত্ত্বেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে না।

এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দৃঢ়খ্যময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে (১৯৩২) কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক দৃঢ়সহ বিষণ্ণতা। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে। “তাহারেই পড়ে মনে” কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে এই বিষণ্ণময় রিক্ততার সুর। তাই বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা।

কবিতাটির আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর নাটকীয়তা। গঠনরীতির দিক থেকে এটি সংগ্রামনির্ভর রচনা। কবিতার আবেগময় ভাববস্তুর বেদনাখন বিষণ্ণতার সুর এবং সুলভিত ছন্দ এতই মাধুর্যমতি যে তা সহজেই পাঠকের অন্তর ছুঁয়ে যায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘উত্তরী’ শব্দের অর্থ কী?

ক. চাদর

খ. কুয়াশা

গ. সমীর

ঘ. উত্তর দিক

২. ‘কহিল সে স্লিঙ্ক আঁধি তুলি’-চরণটিতে ‘স্লিঙ্ক আঁধি’ বলতে বোঝায়-

ক. মায়াবী দৃষ্টি

খ. কোমল নেতৃ

গ. অশ্রুসিক্ত নয়ন

ঘ. উৎসুক চাহনি

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

শাহজাহানের অমর সৃষ্টি তাজমহল। তাজমহলকে ঘিরে আছে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী মমতাজের স্মৃতি। তাই পৃথিবীর সমন্বয় একত্র করে তিনি সাজিয়েছেন প্রিয়তম স্ত্রীর সমাধি।

৩. নিচের কোন চরণটিতে উদ্দীপকের ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে?

ক. যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।

খ. তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।

গ. তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?

ঘ. বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?

৪. শাহজাহান ও সুফিয়া কামালের আচরণের ভিন্নতা থাকলেও বলা যায় উভয়ই-

ক. আবেগাশ্রয়ী ও অহঙ্কারী

খ. অভিমানী ও স্নেহ পরায়ণ

গ. স্মৃতিকাতর ও প্রেমময়

ঘ. উদাসীন ও মেধাবী



সুজনশীল প্রশ্ন

যারে খুব বেসেছিলু ভালো
 সে মোরে ছেড়ে চলে গেল
 যে ছিল মোর জীবন ছায়া
 রেখে গেছে শুধু মায়া ।
 লাগে না ভালো অপরূপ অকৃতি
 যতই করুক কেউ মিনতি
 আমি এখন রিত শূন্য
 মন পড়ে রয়েছে তার জন্য
 সে দিল মোরে কেবলে ফাঁকি
 আমি এখন বড় একাকী ।

- ক. “তাহারেই পড়ে মনে” কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
- খ. “উপেক্ষায় ঝতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?”— উক্তিটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. উদ্দীপকে “তাহারেই পড়ে মনে” কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উদ্দীপকটি “তাহারেই পড়ে মনে” কবিতার সুরকে প্রকাশ করতে পারেনি।’—তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

সেই অন্ত আহসান হাবীব

কবি-পরিচিতি

আহসান হাবীব বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের পিরোজপুর জেলার শংকরগামা থানায় ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের দোসরা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হামিজুদ্দিন হাওলাদার এবং মাতার নাম জমিলা খাতুন। স্কুলজীবনেই তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় কবিকে কলেজ ছেড়ে ভাগ্যাবেষণে কলকাতায় চলে আসতে হয়। পত্রিকা, রেডিও, প্রকাশনা সংস্থা প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেও আহসান হাবীব শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতা, বিশেষ করে পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবেই জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেন। ১৯৫০-এর দিকে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকা আসেন। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় কাজ করবার পরে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যোগ দেন ‘দৈনিক বাংলা’ (তৎকালীন ‘দৈনিক পাকিস্তান’) পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে। আমৃত্যু এই পত্রিকার সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন। ব্রহ্মভাসী, আত্মসংস্কৃত, স্পষ্টবাদী ইই কবি ছিলেন মূলত মানবদরদি শিল্পী। দেশ ও জনতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর সংবেদনশীলতা। ব্যক্তিগত অনুচৃতি, অভিজ্ঞতা, যুক্তিবিচারের আলোকে এক সুগভীর জীবনযানিষ্ঠ আশাবাদী চেতনা তাঁর কবিতার মূল সুর। কবি আহসান হাবীবের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : ‘রাত্রিশেষ’, ‘ছায়াহরিণ’, ‘সারা দুপুর’, ‘মেঝে বলে তৈরে যাবো’, ‘দু’হাতে দুই আদিম পাথর’, ‘বিদীর্ঘ দর্পণে মুখ’ প্রভৃতি। এছাড়া উপন্যাস ও শিশুসাহিত্যেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

তিনি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

আমাকে সেই অন্ত ফিরিয়ে দাও
সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি
সেই অমোঘ অনন্য অন্ত
আমাকে ফিরিয়ে দাও।

সেই অন্ত আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অন্ত উত্তোলিত হলে
পৃথিবীর যাবতীয় অন্ত হবে আনত
যে অন্ত উত্তোলিত হলে
অরণ্য হবে আরও সবুজ
নদী আরও কল্পালিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।

যে অন্ত উত্তোলিত হলে
ফসলের মাঠে আশুন জ্বলবে না
ঝাঁ ঝাঁ করবে না গৃহস্থালি।

সেই অন্ত আমাকে ফিরিয়ে দাও



যে অন্ত ব্যাঞ্চ হলে
 নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না
 মানব বসতির বুকে
 মুহূর্তের অঘ্যৎপাত
 লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্ক-বিকৃত
 আমাদের চেতনা জড়ে তারা করবে না আর্তনাদ
 সেই অন্ত যে অন্ত উত্তোলিত হলে
 বার বার বিধ্বস্ত হবে না দ্রয়নগরী।
 আমি সেই অবিনাশী অন্তের প্রত্যাশী
 যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার
 এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত।
 যে অন্ত আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন
 যে অন্ত মানুষকে বিছিন্ন করে না
 করে সমাবিষ্ট
 সেই অমোঘ অন্ত-ভালোবাসা
 পৃথিবীতে ব্যাঞ্চ করো।

শব্দার্থ ও টীকা

- অমোঘ - **অব্যর্থ, সার্থক, অবশ্যঙ্গাবী।**
- যে অন্ত উত্তোলিত হলে
 পৃথিবীর যাবতীয় অন্ত
 হবে আনত - **কবি ভালোবাসা আর শান্তির অন্ত দিয়ে সকল মারণান্তকে পরাভূত করবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।**
- যে অন্ত উত্তোলিত হলে
 ফসলের মাঠে আগুন
 জলবে না - **কবি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসা দিয়ে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব।**
ভালোবাসা থাকলে মানুষ মানুষকে শক্ত ভাবে না, কৃষকের দুঃখ-জ্বালার আসান হবে এবং বিদ্রোহের আগুন জলবে না।
- যে অন্ত ব্যাঞ্চ হলে
 নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে
 আগুন ঝরবে না - **কবি এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত ছেট-বড় ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বুঝিয়েছেন।** কবি চান,
মানুষ যেন যুদ্ধের ভয়াবহতায় জড়িয়ে না পড়ে, বিশ্বে যেন শান্তি নিশ্চিত হয়।
- ফর্মা-৩৭, সাহিত্যপাঠ একাদশ, দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি



মানব বসতির বুকে মুহূর্তের
অগ্র্যৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে
করবে পঙ্কু-বিকৃত

- ভালোবাসাইন বিদ্রেশপূর্ণ পৃথিবীতে যুদ্ধের অনিবার্য ক্ষতি সম্পর্কে নিজের উৎকর্ষা করি এখানে প্রকাশ করেছেন। অনুমান করা যায়, কবিতাটিন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার স্মৃতি জাগিত হিল। তাই আশবিক বোমার আঘাতে মৃত কিংবা প্রজন্ম-পরম্পরায় পঙ্কত বরণকারী বহু মানুষের আর্তনাদ করিব এই যুদ্ধবিরোধী মননকে আন্দোলিত করেছে।
- থ্রাচীন গ্রিসের স্থাপত্যকলায় নদিত এক শহর। মানুষের হিংসা-বিদ্রে ঈর্ষা আর দঙ্গের শিকার হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ধ্বংস হয়েছে এই নগরী। যুদ্ধের নির্মতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত এই ট্রায়।
- কোনো যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব।
- সমভাবে আবিষ্ট। সমাবেশ হয়েছে এমন; সমবেত হওয়া অর্থে।

পাঠ-পরিচিতি

“সেই অন্ত” কবিতাটি আহসান হাবীবের ‘বিদীর্ঘ দর্পণে মুখ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এই কবিতায় কবির একমাত্র প্রত্যাশা – ভালোবাসা নামের মহান অন্তকে পুনরায় এই মানবসমাজে ফিরে পাওয়া। কবির কাছে ভালোবাসা কেবল কোনো আবেগ কিংবা অনুভূতির দ্যোতনা জাগায় না। তাঁর বিশ্বাস, এটি মানুষকে সকল অঙ্গে থেকে পরিদ্রাগের পথ বাতলে দেয়। তাই কবি বিশ্বের মানবকুলের কাছেই এই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছেন। মানুষ যদি অপর মানুষের হিংসা, লোভ, ঈর্ষা থেকে মুক্ত থাকে তবে পৃথিবীতে বিরাজ করবে শান্তি; পৃথিবী এগিয়ে যাবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিশ্বের বিষবাচ্পকে যদি অপসারণ করতে হয় তবে ভালোবাসা নামক অন্তকে কবির কাছে এবং কবির মতো আরও বহু মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। কবি জানেন, হিংসা আর স্বার্থপ্রতার করাল প্রাসে অনেকেই মানবিকতাখন্দ্য হয়ে পড়ে। আর তাই কবি মানবিকতার সেই হতবোধকে ফিরে পেতে চান তথা মানব সমাজে ফিরিয়ে দিতে চান। পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চান অফুরান ভালোবাসা।

কবিতাটির গঠনগত বিশেষত্ব হলো, এর অনাড়ির সহজ গতিময়তা। কোনো ভাবি শব্দ ব্যবহার না করে সাবলীল ভাষায় কবি তাঁর একান্ত প্রত্যাশিত ভালোবাসার প্রত্যাবর্তন কামনা করেছেন। এই কবিতাটি শান্তিপ্রিয় পৃথিবীবাসীর জন্য এক চিরায়ত প্রার্থনাসংগীত।

কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্বঙ্গলোর বিন্যাসও অসম।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “সেই অন্ত” কবিতাটি আহসান হাবীবের কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. রাত্রিশেষ

খ. ছায়াহরিণ

গ. বিদীর্ঘ দর্পণে মুখ

ঘ. মেঘ বলে চৈত্রে যাবো

২. “সেই অন্ত” কবিতায় ‘অমোঘ অন্ত’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মোহবিষ্ট অন্ত

খ. অব্যর্থ অন্ত

গ. অনন্য অন্ত

ঘ. খেলনা অন্ত



উদ্বীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রলেখ উভয় দাও।

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে তা বহুদুর?

মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।

...

প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরম্পরে,

স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

৩. উদ্বীপকের সাথে “সেই অন্ত” কবিতার মিল রয়েছে—

i. অহিংসায়

ii. আত্মাগে

iii. সৌহার্দ্য

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. উপর্যুক্ত মিলের যথার্থতা পরিলক্ষিত হয় নিচের কোন চরণে?

ক. ভালোবাসা দিয়ে সব জয় করা সম্ভব।

খ. অর্ধবিড় দিয়ে সব জয় করা যায়।

গ. পারম্পরিক সহযোগিতায় সমৃদ্ধি সাধিত হয়।

ঘ. স্বার্থপ্রতা ভালোবাসার অঙ্গরায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

সবারে বাসির ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ

সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ

মানুষের মাঝে কভু রবে না বিচ্ছেদ—

সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।

...

হিংসা দ্বেষ রাখিবে না কেহ কারে করিবে না ঘৃণা

পরম্পরে বাঁধি দিব প্রীতির বন্ধনে

বিশ্বজুড়ে এক সুরে বাজিবে গো মিলনের বীণা

মানব জাগিবে নব জীবন স্পন্দনে।

ক. “সেই অন্ত” কবিতায় বর্ণিত নগরাটির নাম কী?

খ. “লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্কু-বিকৃত।”— উক্তিটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্বীপকে “সেই অন্ত” কবিতার কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত ভাবই যেন “সেই অন্ত” কবিতার চূড়ান্ত প্রতিফলন”— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।



পদ্মা ফরুখ আহমদ

কবি-পরিচিতি

ফরুখ আহমদের জন্য ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জুন মাঞ্চাৰ জেলার মাঝআইল থানে। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হাতেম আলী। কর্মজীবনে বহুবিচিত্র পেশা অবলম্বন করেছেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন ঢাকা বেতারে 'স্টাফ রাইটার' হিসেবে। ঢাকাশের দশকে আবির্ভূত শক্তিমান কবিদের অন্যতম ফরুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এরপর একে একে তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ, কাব্যনাট্য ও কাহিনিকাব্য প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী এ কবিয় কবিতায় প্রধানত প্রকাশ ঘটেছে ইসলামি আদর্শ ও জীবনবোধের। তাঁর অন্য গ্রন্থগুলোর নাম— কাব্যগ্রন্থ : 'সিরাজাম মুনীরা'; কাব্যনাট্য : 'নৌকেল ও হাতেম'; সনেট সংকলন : 'মুহূর্তের কবিতা' এবং কাহিনিকাব্য : 'হাতেম তারী'। এছাড়া তিনি ছোটদের জন্য বেশ কিছু ছড়া ও কবিতা লিখে গেছেন। সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেছেন এবং মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের বাদ,
জীবনের পথে পথে অভিষ্ঠতা কুড়ায়ে প্রচুর
কেঁপেছে তোমাকে দেখে জলদস্য— দুরস্ত হার্মাদ,

তোমার তরঙ্গভঙ্গে বর্ণ তার হয়েছে পাঞ্চুর!
সংঘাসী মানুষ তরু দুই তীরে চালায়ে লাঙল
কঠিন শ্রমের ফল— শস্য দানা পেয়েছে প্রচুর;

উর্বর তোমার চরে ফলায়েছে পর্যাণু ফসল!
জীবন-মৃত্যুর দলে নিঃসংশয়, নিভীক জওয়ান
সবুজের সমারোহে জীবনের পেয়েছে সম্বল।

বর্ষায় তোমার শ্রোতে গেছে ভেসে সাজানো বাগান,
অসংখ্য জীবন, আর জীবনের অজন্ম সম্ভার,
হে নদী! জেগেছে তরু পরিপূর্ণ আহ্বান,

মৃত জড়তার বুকে খুলেছে মুক্তির স্বর্ণদ্বার
তোমার সুতীব্র গতি; তোমার প্রদীপ্ত শ্রোতধারা ॥



শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|------------------------|--|
| ঘূর্ণি | — জল বা বায়ুর প্রচণ্ড আবর্তন। |
| সমুদ্রের স্বাদ | — সমুদ্র-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বোঝানো হয়েছে। |
| জলদস্য | — যে দস্যু নদী বা সমুদ্রগথে ডাকাতি করে। |
| হার্মাদ | — পর্তুগিজ জলদস্য। স্প্যানিশ শব্দ Armada. |
| তরঙ্গভঙ্গে | — টেউয়ের আবর্তনে। |
| পাঞ্চুর | — ফ্যাকশে, সাদাটে হলুদ বর্ণবিশিষ্ট। |
| উর্বর | — উৎপাদন শক্তিবিশিষ্ট। |
| ফলায়েছে | — উৎপাদন করেছে। |
| নিঃসংশয় | — সন্দেহহীন। |
| জওয়ান | — শক্তিশালী ও বলবান ব্যক্তি। ফারসি শব্দ। |
| সমারোহে | — আড়ম্বর, জাঁকজমক। |
| সম্বল | — পাথেয়, অবলম্বন। জীবিকা অর্জনের উপায়। |
| মৃত জড়তার ... মুক্তির | — পদ্মার তীব্র গতি মানুষের জীবনপ্রবাহের গতির গতিহীন স্তুক্তার বুকে এনে দেয় মুক্তির স্পন্দন। |
| প্রদীপ্তি | — উজ্জ্বল, ভাস্বর। |
| শ্রোতধারা | — শ্রোতের ধারা। |

পাঠ-পরিচিতি

ফরুরুখ আহমদের “পদ্মা” কবিতাটি ‘কাফেলা’ (১৯৮০) নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। ‘কাফেলা’ কাব্য সাতটি সন্তোর সমন্বয়ে রচিত। সংকলনভুক্ত কবিতাটি পাঁচ সংখ্যক সন্তো।

নদীমাত্রক বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। এসবের মধ্যে পদ্মা সর্ববৃহৎ। ‘পদ্মা’ কবিতায় এ নদীর দুই রূপ প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে এর ভয়ংকর, প্রমত্ত রূপ- যা দেখে বহু সমুদ্র ঘোরার অভিজ্ঞতায়- খাদ, দুরস্ত জলদস্যদের ঘনেও ভয়ের সংগ্রাম হয়। অন্যদিকে, পদ্মার পলিতে প্লাবিত এর দুই পাড়ের উর্বর ভূমি মানুষকে দিয়েছে পর্যাপ্ত ফসল, জীবনদায়িনী সুবেজের সমারোহ। আবার, এই পদ্মাই বর্ষাকালে জলশ্রোতে ক্ষীত হয়ে ভাসিয়ে নেয় মানুষের সাজানো বাগান, ঘর, এমনকি জীবন পর্যন্ত। সেই ধৰ্মসন্তুপের ভেতর থেকে আবারও প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠে পদ্মাকে ঘিরেই। অর্থাৎ একই পদ্মা কখনও ধৰ্মসাত্ত্বক রূপে, কখনও কল্যাণময়ী হয়ে এদেশের জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

“পদ্মা” চতুর্দশপদী (sonnet) কবিতা। তিন পঞ্চাঙ্গিযুক্ত চারটি স্তবক এবং শেষে দুই পঞ্চাঙ্গিযুক্ত একটি স্তবকে কবিতাটি বিন্যস্ত। প্রতি পঞ্চাঙ্গিতে রয়েছে ১৮ মাত্রা। কবিতাটির মিলবিন্যাস- কখক খগখ গঘগ ঘঙঘ গঞঞ।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পদ্মাকে দেখে কেঁপে উঠেছে-

ক. নির্ভীক জোয়ান

খ. দুরত হার্মান

গ. সংগ্রামী মানুষ

ঘ. প্রদীপ্ত শ্রোতধারা

২. ‘জীবনের পথে পথে অভিজ্ঞতা কুড়ায়ে প্রচুর’— কাদের কথা বলা হয়েছে?

ক. জলদস্য

খ. পদ্মা তীরের মানুষ

গ. সংগ্রামী চাহী

ঘ. নির্ভীক জোয়ান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ভাঙ্গন প্রবণ তীরে যাদের আবাস তারা কেউ

সুখে নেই বরং দুঃখেই কাটে তাদের দিনকাল।

৩. উদ্দীপক ও ‘পদ্মা’ কবিতাটির মধ্যে মিল রয়েছে-

i. নদী তীরবর্তী মানুষের দুর্ভোগ

খ. ii

ii. নদীর জীবন প্রবাহ

ঘ. ii ও iii

iii. কৃষিতে নদীর প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

গ. i ও ii

৪. ‘বরং দুঃখেই কাটে তাদের দিনকাল’— চরণটির ভাবের সাথে ‘পদ্মা’ কবিতার নিচের কোন চরণের ভাবের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. তোমার তরঙ্গজে বর্ণে তার হয়েছে পাখুর

খ. সবুজের সমারোহে জীবনের পেয়েছে সম্মল

গ. বর্ষায় তোমার স্নাতে গেছে ভেসে সাজানো বাগান

ঘ. মৃত জড়তার বুকে খুলেছে মুক্তির স্বর্ণদ্বার

সূজনশীল প্রশ্ন

প্রমত্তা পদ্মার সর্বগ্রামী রূপ নিয়ে বিখ্যাত শিল্পী আবদুল আলীমের ‘সর্বনাশা পদ্মা নদী’ নামে বহুল প্রচলিত একটি গান রয়েছে। নদী তীরবর্তী মানুষের হাহাকার ডরা দীর্ঘশ্বাস গানটিতে ফুটে উঠেছে-

“পদ্মারে তোর তুফান দেইখা

পরান কাঁপে ডরে

ফেইলা আমায় মারিসনা তোর

সর্বনাশা ঝড়।”

ক. জীবন-মৃত্যুর দলে নিঃসংশয় কারা?

খ. ‘মৃত জড়তার বুকে খুলেছে মুক্তির স্বর্ণদ্বার’— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটির সাথে ‘পদ্মা’ কবিতার কোন দিকটির সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘পদ্মা’ কবিতার আংশিক রূপায়ণ মাত্র”— উকিটি বিশ্লেষণ কর।



ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শামসুর রাহমান

কবি-পরিচিতি

শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর পাড়াতলি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মুখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মাতার নাম আমেনা খাতুন। তিনি ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ‘দৈনিক মর্নিং নিউজ’-এ সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ‘দৈনিক পাকিস্তান’ (পরে ‘দৈনিক বাংলা’) পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ‘সাংগীতিক সোনার বাংলা’ পত্রিকায় কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। আজীবন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্যসাধনায় নিয়োজিত ছিলেন; তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের পক্ষে, ছিলেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পক্ষে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুক্ত ও পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি অকুর্ত সমর্থন তাঁর কবিতাকে করেছে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নগর জীবনের যন্ত্রণা, একাকিন্ত, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি তাঁর কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

শামসুর রাহমানের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : ‘প্রথম গান দিতীয় মৃত্যুর আগে’, ‘রৌদ্র করোচিতে’, ‘বিক্ষমতা নীলিমা’, ‘নিরালোকে দিব্যরথ’, ‘নিজ বাসভূমি’, ‘বন্দী শিবির থেকে’, ‘ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা’, ‘উচ্চট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ’, ‘বুক তার বাংলাদেশের হস্তয়’ ইত্যাদি। এছাড়া গঞ্জ-উপন্যাস, শিশু সাহিত্য ও অনুবাদ কর্মেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আদমজি পুরকার, বাংলা একাডেমি পুরকার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরকারসহ অসংখ্য পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়—ফুল নয়, ওরা
শহিদের বাল্কিত রক্তের বুদ্ধদ, স্মৃতিগঙ্গে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।
এ—রঙের বিপরীত আছে অন্য রং,
যে-রং লাগে না ভালো চোখে, যে-রং সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল-সন্ধ্যায়—
এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট, সারা দেশ
ঘাতকের অগুভ আস্তানা।



আমি আর আমার মতোই বছ লোক

রাত্রি-দিন ভুলুষ্টি ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,
কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তচ্ছন্দ।

বুঝি তাই উনিশশো উনসত্ত্বেও

আবার সালাম নামে রাজপথে, শুন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের ধাবার সম্মুখে।

সালামের চোখ আজ আলোচিত ঢাকা,

সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই

জনসাধারণ

দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো

বরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা

আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে

এখনো বীরের রঙে দৃঢ়খনী মাতার অশ্রুজলে

ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চতুরে

হৃদয়ের হরিণ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,

শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়। [সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

আবার ফুটেছে দ্যাখো ...

আমাদের চেতনারই রং

- প্রতি বছর শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। কবির মনে হয় যেন
ভাষা-শহিদদের রঙের বুদ্ধি কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। তাই একুশের
কৃষ্ণচূড়াকে কবি আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান। ভাষার
জন্য যাঁরা রঙ দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ত্যাগ আর মহিমা
যেন মৃত হয়ে ওঠে থেরে থেরে ফুটে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়ার স্বকে-স্বকে।

মানবিক বাগান

- মানবীয় জগৎ। মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ।

কমলবন

- পদ্মবন। কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে ‘কমলবন’
প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।



বুধি তাই উনিশশো ...

থাবার সম্মুখে ।

- ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র-অসম্মোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন উনিশশো উন্সঙ্গে ব্যাপক গণআভ্যূতানে রূপ নেয়। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ছিল অপ্রতিরোধ্য। এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জেহা প্রমুখ। এ অংশে কবি শোষণ আর বখনীর বিরুদ্ধে কৃধে দাঁড়ানো ও আত্মাহতি দেওয়া বীর জনতাকে ভাষা-শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন।

সেই মুল আমাদেরই ধারণ - ফুল বলতে এখানে বাংলা ভাষা বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

“ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯” শীর্ষক কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের ‘নিজ বাসভূমি’ কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। “ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯” দেশপ্রেম, গণজাগরণ ও সংগ্রামী চেতনার কবিতা।

১৯৬৯-এ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, কবিতাটি সেই গণজাগরণের পটভূমিতে রচিত। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষ সুরক্ষা হয়ে ওঠে ১৯৬৯-এ। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ, হাটিবাজার, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় ঢাকার রাজপথে। শামসুর রাহমান বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার অসাধারণ এক শিঙ্গভাষ্য রচনা করেছেন এই কবিতায়।

কবিতাটিতে দেশমাত্রকার প্রতি জনতার বিপুল ভালোবাসা সংবর্ধিত হয়েছে। দেশকে ভালোবেসে মানুষের আত্মান ও আত্মাহতির প্রেরণাকে কবি গভীর মর্মতা ও শুদ্ধার সঙ্গে মৃত্যু করে তুলেছেন। কবিতাটি একুশের বন্ধুবরা দিনগুলোতে স্বেরশাসনের বিরুদ্ধে এদেশের সংগ্রামী মানুষের আত্মাহতির মাহাত্ম্যে প্রগাঢ়তা লাভ করেছে। গদ্যছন্দ ও প্রবহমান ভাষার সুষ্ঠু বিকাশে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯” কবিতায় বর্ণমালাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

ক. নক্ষত্র

খ. রক্ত

গ. ফুল

ঘ. রৌপ্য



২. “আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে”— চরণটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দিকটি তুলে ধরে?

ক. গণআন্দোলন

খ. ভাষা আন্দোলন

গ. স্বাধীনতা আন্দোলন

ঘ. স্বদেশি আন্দোলন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ঢ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৯৭১ সালে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জন দেন মতিউর রহমান, মোস্তফা কামাল, মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

৩. উদ্দীপকের ত্যাগী মানুষদের প্রতিচ্ছবি “ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯” কবিতায় যাদের নির্দেশ করে তারা হলেন—

i. সালাম

ii. বরকত

iii. দুঃখিনী মাতা

কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. ওই ব্যক্তিদের আত্মত্যাগের মূলমূল কী ছিল?

ক. আদর্শ

খ. দেশপ্রেম

গ. বিদ্রোহ

ঘ. স্বাধিকার

সূজনশীল প্রশ্ন

কগালে কজিতে লাল সালু বেঁধে

এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,

লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক

হাতের মুঠোয় মৃত্যু চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,

নিম্নবিত্ত, কর্মণ কেরানি, নারী, বৃক্ষ, ভবঘুরে

আর তোমাদের মত শিশু পাতা কুড়ানিরা দল বেঁধে।

ক. শহরের পথে থরে থরে কী ফুটেছে?

খ. “এ—রঙের বিপরীত আছে অন্য রং” বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি “ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯” কবিতার যে সাদৃশ্য নির্দেশ করে তার পরিচয় দাও।

ঘ. ‘উদ্দীপকের বক্তব্য “ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯” কবিতার অঙ্গাংশ’— যৌক্তিকতা দেখাও।



আঠারো বছর বয়স সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি-পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। তাঁর পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলার কোটাপিপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, মায়ের নাম সুনীতি দেবী। ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত ছিলেন অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন। তিনি ‘দৈনিক স্বাধীনতা’র কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং মড়ার পূর্ব পর্যন্ত এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সুকান্ত তাঁর কাব্যে অন্যায়-অবিচার শোষণ-বক্ষলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন। বাঙ্গাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তাঁর কবিতা মুক্তিকামী বাঙালির মনে বিশেষ শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। ‘ছাড়পত্র’ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : ‘যুম নেই’, ‘পূর্বাভাস’। অন্যান্য রচনা : ‘মিঠেকড়া’, ‘অভিযান’, ‘হ্রতাল’ ইত্যাদি। তিনি ফ্যাসিবিরোধী সেখক শিল্পী সংমের পক্ষে ‘আকাল’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মে মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রতিভাবান এ কবির অকালমৃত্যু হয়।

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্ষদানের পুণ্য
বাস্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া বুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আজ্ঞাকে শপথের কেশাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আৱ প্রথৰ
এ বয়সে কালে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।
আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে

অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো ।

তবু আঠারোর শুলেছি জয়বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্বোগে আর বড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে ।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥

শব্দার্থ ও টীকা

আঠারো বছর বয়স কী দৃঢ়সহ

- এ বয়স মানবজীবনের এক উভরণকালীন পর্যায়। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ এ বয়সে। অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হয় তাকে। এসময় থেকে তাকে এক কঠিন ও দৃঢ়সহ অবস্থায় পড়তে হয়।

স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি

- অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি এ বয়সেই মানুষ নিয়ে থাকে।

বিরাট দৃঢ়সাহসেরা দেয় যে উকি

- নানা দৃঢ়সাহসী স্পন্দন, কল্পনা ও উদ্যোগ এ বয়সের তরুণদের মনকে ধিরে ধরে।

আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা

- যৌবনে পদার্পণ করে এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য

- দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবেলায়। প্রাণ দিয়েছে অজানাকে জানবার জন্য, দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংহায়ে। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে।

সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে

- তারণ্য স্পন্দন দেখে নতুন জীবনের, নব নব অগ্রগতি সাধনের। তাই সেইসব স্পন্দন বাস্তবায়নে, নিত্য-নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়াল হয়ে তরুণ-প্রাণ এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে।

তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা

- চারপাশের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, সামাজিক বৈবর্য ও ভেদাভেদ ইত্যাদি দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুঢ় হয়ে ওঠে।



এ বয়সে প্রাণ তীব্র আৱ প্ৰথম

- অনুভূতিৰ তীব্রতা ও সুগভীৰ সংবেদনশীলতা এ বয়সেই মানুষৰে জীবনে বিশেষ তীব্র হয়ে দেখা দেয় এবং মনোজগতে তাৱ প্ৰতিক্ৰিয়াও হয় গভীৱ।

এ বয়সে কালে আসে কত মন্ত্রণা

- ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতৃত্বাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ, ভাৰধাৰণাৰ সঙ্গে পৱিচিত হতে শুৰু কৱে এই বয়সেৰ তক্ষণেৰা।

দুৰ্ঘোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভাৱ

- জীবনেৰ এই সঞ্চিক্ষণে শাৰীৱিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্ৰম কৱতে হয়। এই সময় সচেতন ও সচেষ্টভাৱে নিজেকে পৱিচালনা কৱতে না পাৱলে পদস্থালন হতে পাৱে। জীবনে বিপৰ্যয় নেমে আসতে পাৱে।

এ বয়স কালো লক্ষ দীৰ্ঘশ্বাসে

- সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পৱিচালনা কৱতে না পাৱাৰ অজন্তু বৰ্যতাৰ দীৰ্ঘশ্বাসে এ বয়স নেতৃত্বাচক কালো অধ্যায় হয়ে উঠতে পাৱে।

পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে

- এ বয়স দেহ ও মনেৰ স্থিতিভাৱ, নিশ্চলতা, জৰাজীৰ্ণতাকে অতিক্ৰম কৱে দুৰ্বাৰ গতিতে। প্ৰগতি ও অগ্ৰগতিৰ পথে নিৱন্ত্ৰণ ধাৰমান্তাই এ বয়সেৰ বৈশিষ্ট্য।

এ দেশেৰ বুকে আঠারো

আসুক নেমে

- আঠারো বছৰ বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। জড় নিশ্চল প্ৰথাবন্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনাৰ স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাৰ্থত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলাৰ দুৰ্বাৰ গতি— এসবই আঠারো বছৰ বয়সেৰ বৈশিষ্ট্য। কৰি প্ৰাৰ্থনা কৱেন, এসব বৈশিষ্ট্য যেন জাতীয় জীবনে চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

পাঠ-পৱিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচাৰ্যেৰ “আঠারো বছৰ বয়স” কবিতাটি ১৯৪৮ খ্ৰিষ্টাব্দে প্ৰকাশিত তাৰ ‘ছাড়পত্ৰ’ কাৰ্যতাৰ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতায় কৰি নিজেৰ অভিজ্ঞতাৰ আলোকে বয়সমন্ধিকালেৰ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধৰেছেন। কৈশোৱ থেকে যৌবনে পদাৰ্পণেৰ এ বয়সটি উত্তেজনাৰ, অবল আবেগ ও উচ্ছ্঵াসে জীবনেৰ ঝুকি নেবাৰ উপযোগী। এ বয়স অদ্যম দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেৱিয়ে যাওয়াৰ এবং অন্যায়েৰ বিৱৰণে মাথা উঁচু কৱে দাঁড়াবাৰ জন্য প্ৰস্তুত। এদেৱ ধৰ্মই হলো আত্মাগোৱ মহান মন্ত্ৰে উজ্জীবিত হওয়া, আঘাত-সংঘাতেৰ মধ্যে রাঙ্গশপথ নিয়ে বাঁপিয়ে পড়া। পাশাপাশি স্যাজজীবনেৰ নানা বিকাৱ, অসুস্থতা ও সৰ্বনাশেৰ অভিঘাতে হয়ে উঠতে পাৱে এৱা ভয়ংকৰ।

কিন্তু এ বয়সেৰ আছে সমস্ত দুৰ্ঘোগ আৱ দুৰ্বিপাক মোকাবিলা কৱাৰ অদ্যম প্ৰাণশক্তি। ফলে তাৱণ্য ও যৌবনশক্তি দুৰ্বাৰ বেগে এগিয়ে যায় প্ৰগতিৰ পথে। যৌবনেৰ উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুৰ্বাৰ গতি, নতুন জীবন রচনাৰ স্বপ্ন এবং কল্যাণৰ্থত— এসব বৈশিষ্ট্যেৰ জন্য কৰি প্ৰত্যাশা কৱেছেন নানা সমস্যাপীড়িত দেশে তাৱণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনেৰ চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

‘আঠারো বছৰ বয়স’ কবিতাটি মাত্ৰাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

বহনির্বাচনি প্রশ্ন

- i. তারণ্য
 ii. আত্মত্যাগ
 iii. সর্বনাশের অভিযাত
 নিচের কোনটি ঠিক?
 ক. i ও ii
 গ. ii ও iii

খ. i ও iii
 ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত দিক নিচের কোন চরণযুগলে প্রকাশ পেয়েছে?
 ক. এ বয়স জানে রক্ষদানের পুণ্য
 বাস্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে
 গ. প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূণ্য
 সংপ্রে আজাকে শপথের কোলাহলে

খ. আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
 পদাঘাতে চায় ভাঙ্গতে পাথর বাধা
 ঘ. এ বয়স বাঁচে দুর্ঘোগে আর বাড়ে,
 বিপদের মধ্যে এ বয়স অগ্রণী

সুজনশীল অঞ্চল

সুজন ও সাধন সহপাঠী এবং লেখাপড়ায় বেশ ভালো। স্কুল জীবন পার হতে না হতেই সুজন মিশে যায় কিছু অসৎ বন্ধুর সাথে। লেখা-পড়ার পাঠ চুকে যায় ওখানেই। তার নাম শনলে মানুষ আঁতকে উঠে। অপর দিকে সাধন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। ভাষা আন্দোলন শুরু হলে সে তাতে ঝাপিয়ে পড়ে— মিছিলে সে নেতৃত্ব দেয়। সংগঠিত করে সহপাঠীদের, আর প্রতিজ্ঞা করে— জীবন দিয়ে হলেও মাতৃভাষার মান রক্ষা করবেই।

- ক. কোন বয়সে দুশ্মানসেরা উঁকি দেয়?

খ. “বাল্পের বেগে সিংহারের মতো চলে”— একথা দিয়ে সুকান্ত উট্টাচার্য কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্ধীপকের সুজনের মাঝে “আঠারো বছর বয়স” কবিতায় কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ঘ. উক্ত দিকটি কি “আঠারো বছর বয়স” কবিতার মূলভাব— তোমার মতের পক্ষে যত্ন দিয়ে বিচার কর।

আলো চাই

সিকান্দার আবু জাফর

কবি-পরিচিতি

সিকান্দার আবু জাফর ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম সৈয়দ আবু জাফর মুহম্মদ বখত সিকান্দার। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মঙ্গলনুরুল্লাহ হাশেমী। আবু জাফর ১৯৩৬ সালে প্রবেশিকা ও পরে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতার মিলিটারি একাউন্টেস বিভাগে যোগদান করে পেশাগত জীবন শুরু করেন। পরে সিঙ্গল সাপ্লাই অফিসে ঢাকার করেন। মূলত তিনি পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ‘দৈনিক নবযুগ’ পত্রিকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু হয়। তিনি ‘ইস্তেফাক’, ‘সংবাদ’, ‘মিল্টার’ প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা ‘সমকাল’। সে সময়ের তরঙ্গ লেখকদের উৎসাহদান, জাতীয়তাবোধ ও বাঞ্ছালি চেতনায় অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি অসামান্য ভূমিকা প্রেরণেছে। ১৯৭১ -এ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সাধীনতা, দেশপ্রেম ও বিপ্লবের চেতনা-সম্পন্ন অনেক গান রচনা করেন। তাঁর রচিত ‘আমাদের সংগ্রাম চলবেই’ গানটি মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মুক্তিকামী জনতাকে অনুপ্রাণিত করে।

সিকান্দার আবু জাফর সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ করেছেন। তবে তাঁর মূল পরিচয় তিনি কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিগুলো হলো— কাব্যগ্রন্থ : ‘অসন্ন প্রের’, ‘বৈরী বৃষ্টিতে’, ‘তিমিরান্তিক’, ‘কবিতা’, ‘বৃক্ষিক লগ্ন’, ‘বাংলা ছাড়ো’; নাটক : ‘শবুন্ত উপাখ্যান’, ‘সিরাজউদ্দৌলা’, ‘মহাকবি আলাওল’; উপন্যাস : ‘মাটি আর অশ্রু’, ‘পুরুষী’, ‘নতুন সকাল’; কিশোর পাঠ্য : ‘জয়ের পথে’। তিনি ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৮৪ সালে একুশে পদকে (মরণোত্তর) ভূষিত হন।

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট সিকান্দার আবু জাফর মৃত্যুবরণ করেন।

শাখে শাখে চৈত্রের পল্লবে
দেখেছি বিমুক্ত চোখে সবুজের বর্ণ সমারোহ;
সে-বর্ণের কিছু আছে রহস্য জাটিল
কিছু আছে অন্তরের কথা।
পত্রিকারা শাখা-বৃক্ষ-প্রাণে
কী অব্যক্ত অনুনয় ছিল,
রুক্ষ শাখা উর্ধ্বশূন্যে কি কথা শোনালো,
উচ্ছুসিত বেদনার প্রাণস্পন্দন নিয়ে
কোথা থেকে এলো এই সবুজের শিশু,
তার কিছু ইতিহাস অদৃশ্য অক্ষরে আছে লেখা।
সে-দুর্জ্জয় নীরব কাহিনি
রাত্রিদিন বারবার করে



শুনতে চেয়েছি আমি উন্মুখ শ্রবণে।
 শোনার অতীত যত কথা
 দেখার অতীত যত অপ্রতিম রূপ
 তাই দিয়ে রূপে-রসে সৃষ্টির নিভৃত মর্মবাণী
 লিপিবদ্ধ আছে সঙ্গেপনে।
 সে-রূপের কিছু আলো পেয়েছি হৃদয়ে
 কিছু কথা শুনেছি কথনে
 মর্মের শ্রবণে
 বুঝিনি অনেক কিছু তার।
 যেটুকু বুঝেছি তাও কথা নেই শোনাবার মতো।
 তবু সেই সুনিষ্ঠিত বাণী
 অস্পষ্ট স্থানের মতো অনুভূতি ধিরে
 স্পর্শ তার রেখে যায়, প্রলোভন রেখে যায় আরও,
 আমি তাকে পাইনি আমার
 চেতনার সহজ সন্ধানে।
 তবু তাকে দেখবার বুঝবার অশেষ বিস্ময়ে
 রূদ্ধবার হৃদয়ের কাছে
 অনুনয় করি বারংবার :
 আলো চাই— আরও আলো, অন্তরে, তৈরিতম আলো।

শব্দার্থ ও টীকা

শাখে শাখে ... কিছু
 আছে অন্তরের কথা

পত্র বরা শাখা-বৃক্ষ-প্রাণে
 ... অদৃশ্য অক্ষরে
 আছে লেখা

- চৈত্রের পত্রপল্লব বহু বর্ণিল। এই বর্ণিলতার মধ্যে অফুরন্ত রহস্য দুকিয়ে থাকে। যিনি সৃষ্টিশীল মানুষ, প্রকৃতিকে দেখার চোখ আছে যার, তিনি সেই রহস্যের মধ্যে মানব-মনের কথা শুনতে পান।
- বারে যাওয়ার মধ্যে দৃঢ়খ থাকে। মানুষ যেমন সংসারের বঙ্গন থেকে, পৃথিবীর বঙ্গন থেকে চলে যেতে চায় না কিংবা তার প্রিয়জনকে চলে যেতে দিতে চায় না, কবিও তেমনি কল্পনায় একটি পাতাবারা রূপের মধ্যেও তুলে ধরেন বেদনার হাহাকার, অব্যক্ত অনুনয়। কিন্তু বেদনাই শেষ কথা নয় সৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, আছে প্রাণের কোলাহল। ‘সবুজ শিশু’ তারই প্রতীক। আর এই সৃষ্টির মধ্যে গোপন এক ইতিহাসের মতো লেখা থাকে জীবনের জয়গান।

শোনার অতীত যত
কথা ... লিপিবদ্ধ

আছে সংগোপনে

সে রূপের কিছু

আলো ... বুবিনি

অনেক কিছু তার

তবু তাকে দেখবার

বুবার ... তীব্রতম

আলো

- প্রকৃতি চিরকালই রহস্যময়। কত না-জানা কথা, কত না-শোনা গান আর কত না-দেখা রূপ যে প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকে তার ইয়ত্তা নেই।

- প্রকৃতির বিপুল রহস্য আর অপরিমেয় সৌন্দর্যের আওড় সব সৃষ্টিশীল মানুষেরই কাঞ্জিত। কবিও সেই রূপের, সেই সৌন্দর্যের, সেই রহস্যের কিছু আলো লাভ করেছেন। সেই রহস্যময় জগতের কিছু কথা তাল-লয়-ছন্দে অনুভব করেছেন। কিন্তু সেই রহস্যের খুব সামান্যই তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ধারণ করতে পেরেছেন— আর এই তাঁর আক্ষেপ।

- কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে জীবন ও প্রকৃতির যত রহস্য ও সৌন্দর্য উন্মোচন করুন না কেন, তিনি কখনই পরিপূর্ণ তৃষ্ণি লাভ করেন না। তিনি প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে অবলোকন করতে চান, উন্মোচন করতে চান এর গোপন রহস্য ও আনন্দকে।

পাঠ-পরিচিতি

“আলো চাই” শীর্ষক কবিতাটি কবির ‘প্রথম প্রহর’ (১৯৬৫) শীর্ষক কাব্যস্থু থেকে চয়ন করা হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে যে বিপুল রহস্য ও সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এই কবিতায় কবি তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির অঙ্গোকে যেন সংগোপনে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির নিডৃত মর্মবাণী। এই মর্মবিচ্ছুরিত আলোর স্পর্শে কবি-হন্দয় সর্বদা উদ্বিষ্ট ও অনুপ্রাণিত। কবি মনে করেন, আনন্দ-বেদনায়, নীরবতা ও শব্দময়তায়, ছন্দ-তাল-লয়ে প্রকৃতি চিরকালই ঐশ্বর্যময়। প্রকৃতির সেই বিপুল ঐশ্বর্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া একজন কবি নিজের অর্জন নিয়ে কখনোই তৃপ্তিলাভ করেন না। সেই অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে কবি সৃষ্টিশীল সন্তান কাছে শক্তি ও আলোর প্রার্থনা করেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “আলো চাই” কবিতায় কোন মাসে সবুজের সমারোহ দেখা যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. চৈত্র

খ. বৈশাখ

গ. মাঘ

ঘ. ফাল্গুন

২. “পত্রবারা শাখা-বৃক্ষ” কিসের ইঙ্গিত বহন করে?

ক. সৃষ্টির

খ. বেদনার

গ. মৃত্যুর

ঘ. নবজাগরণের



নিচের উক্তীপক্টি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল

নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।

হাসি মুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়

ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

৩. উক্তীপকে ফুটে ওঠা দিকটি “আলো চাই” কবিতার যে দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো—

ক. প্রকৃতির সৌন্দর্য

খ. প্রকৃতির রহস্য

গ. বাংলার ঐশ্বর্য

ঘ. বাংলার সৃষ্টিশীলতা

৪. উক্তীপকের মাঝে “আলো চাই” কবিতায় কবির চাওয়ার কোন দিকটি অনুপস্থিত?

ক. সৌন্দর্যবোধ

খ. আত্মত্ব

গ. অতৃপ্তি

ঘ. প্রত্যাশা

সৃজনশীল প্রশ্ন

স্তবক-১ : পুল্পে পুল্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাথি,

গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে দেয়ে—

তারা ফুলের ওপর ঘূমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

স্তবক-২ : জাগাও মুমুর্শ ধরা প্রাণ।

ফুলের ফসল আনো, খাদ্য আনো ক্ষুধার্তের লাগি

আত্মার আনন্দ আনো, আনো যারা রহিয়াছে জাগি

তিমির প্রহর ভরি অতল্ল নয়ন, তার তরে

ছড়াও প্রভাত আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।

ক. “আলো চাই” কবিতায় কবি বিমুখ নয়নে কী দেখেছেন?

খ. “পত্রবারা শাখা-বৃন্ত-প্রাণে/কী অব্যক্ত অনুনয় ছিল”— উক্ত বঙ্গবেয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উক্তীপকের প্রথম স্তবকে “আলো চাই” কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা তুলে ধর।

ঘ. স্তবকদ্বয়ের সমন্বিত ভাবই “আলো চাই” কবিতার পূর্ণ প্রতিফলন— মন্তব্যটির যাথার্থ্য যাচাই কর।



আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম শাহ আবদুল করিম

কবি-পরিচিতি

শাহ আবদুল করিম ১৯১৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জের দিয়াই উপজেলার ধল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইব্রাহিম আলী, মা নাইওরজান বিবি। বাউল করিম বাংলা লোকগানের অগ্রগণ্য সাধকদের একজন। জীবনের প্রতি, ভাবাদর্শের প্রতি, অবাবিল ভাসোবাসার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ক্ষিরিয়ে আনে তাঁর গান। ভাটি বাংলার এই লোকবির ভাবমানস জুড়ে রয়েছে মরমি সাধনার বহুমাত্রিক বিস্তার। তবে কেবল অধ্যাত্মচেতনা নয়, মাটি ও মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততায়ও উজ্জ্বল তাঁর শিখলোক। জনপ্রিয় ও তত্ত্ববহুল গানের পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন অজ্ঞ গণসংগীত, যা দুঃখজয়ের গান হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

১৯৪৮ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ ‘আফতাব সংগীত’ প্রকাশিত হয়। ‘গণসংগীত’, ‘কালনীর চেউ’, ‘ধলমেলা’, ‘ভাটির চিঠি’, ‘কালনীর কুলে’ ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। তিনি একুশে পদকসহ (২০০১) বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন।

শাহ আবদুল করিম ২০০৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
ଆমের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান ঘাটুগান গাইতাম ||
বৰ্ষা যখন হইত গাজির গাইন আইত
রঙে-চঙে গাইত আনন্দ পাইতাম
বাউলা গান ঘাটুগান আনন্দের তুফান
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম ||
হিন্দু বাড়িত্ব যাত্রাগান হইত
নিমজ্জন দিত আমরা যাইতাম
কে হবে মেম্বার কে হবে ধামসরকার
আমরা কি তার খবর লইতাম ||
বিবাদ ঘটিলে পঞ্চাইতের বলে
গরিব কাঙালে বিচার পাইতাম
মানুষ ছিল সরল ছিল ধর্মবল
এখন সবাই পাগল-বড়লোক হইতাম ||
করি ভাবনা সেদিন আৱ পাব না
ছিল বাসনা সুখী হইতাম
দিন হতে দিন আসে যে কঠিন
করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম ||

শব্দর্থ ও টিকা

বাউল গান

- বাউল সাধক সম্প্রদায়ের গান। বাংলা লোকগীতির একটি প্রধান ধারা।
- যয়মনসিংহ ও সিলেট জেলার ভাটি অঞ্চলে প্রচলিত একপ্রকার লোকগীতি। সাধারণত বর্ষাকালে বড় বড় নৌকায় এই গানের আসর বসে। নদীর ঘাটে ঘাটে ঘুরে এই গান পরিবেশিত হয়। এই গানের কেন্দ্রীয় চরিত্র যে কিশোরটি মেয়ে সেজে নেচে নেচে গান গায়, তাকেও ঘাটু বলা হয়ে থাকে। ঘাটুগান মূলত প্রণয়-গীতি।

গাজির গাইন

- গাজির গান। গাজি পিরের মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক লোকগীতি। গাজি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বাঘের অধিষ্ঠাতারূপে পরিগণিত। গাজির গান গেয়ে বাঘের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ কামনা করা হয়।

সারিগান

- একপ্রকার কর্মগীতি। সারিবদ্ধ বা একত্রে কাজ করার সময় গাওয়া হয় বলে একে সারিগান বলে। সাধারণত নৌকা বেয়ে যাওয়ার সময় মাঝিরা সম্মিলিতভাবে এই গান গায়। কোথাও কোথাও ছাদপেটা, গাড়িঠেলা প্রভৃতি কায়িকশুমের কাজেও সারিগান গাওয়া হয়।

নাও দৌড়াইতাম

- নৌকা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম। নদীমাতৃক গ্রাম-বাংলায় বর্ষাকালে এই ‘নৌকা বাইচ’ অনুষ্ঠিত হয়।

বাড়িস্ত

- বাড়িগুলোতে।

যাত্রাগান

- দেশীয় একপ্রকার নাট্যাভিনয়। যাত্রাপালা হিসেবে সমধিক পরিচিত। সূচনাকালে যাত্রাপালায় সংগীতের প্রাধান্য ধাকলেও পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে এতে সংলাপের প্রাধান্য সূচিত হয়।

পঞ্জাইত

- গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারসভা।

বড়লোক হইতাম

- বড়লোক হতে চাই।

দীনহীন

- ধর্মপথের দিশাহীন। সহায় সম্বলহীন।

পাঠ-পরিচিতি

শাহ আবদুল করিমের “আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম” রচনাটি ২০১০ সালে প্রকাশিত ওভেন্টু ইমাম সম্পাদিত ‘শাহ আবদুল করিম : পাঠ ও পাঠকৃতি’ শীর্ষক সংকলন থেকে সংগৃহীত।

আবহমান গ্রাম-বাংলার চিরচেনা ঐতিহ্য, পুরনো দিনের স্মৃতি কবিতাটিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। আগে গ্রামের মানুষের মধ্যে অক্তিব্র সৌহার্দের বন্ধন ছিল, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদাই ছিল সর্বদা আটুট। বছরের বিভিন্ন সময়ে সবাই মিলে উপভোগ করত বাউল গান, ঘাটুগান, গাজির গান, সারি গান, যাত্রাগান, নৌকা-বাইচ ইত্যাদি। অর্ধাং বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির মধ্যে আবাহন করেই সকলের চিন্তা আনন্দে উদ্বেগিত হতো। কখনো বিবাদ-বিসংবাদ ঘটলে সাধারণ মানুষ গ্রামের প্রধানদের কাছেই বিচার পেত। সহজ, সরল, ধর্মবলে বলীয়ান এ মানুষগুলো এখনকার মতো দ্রুত বড়লোক হওয়ার স্পন্দন দেখত না। বর্তমানের কঠিন বাস্তবতায় মানবিক অশাস্তির শিকার কবি স্মৃতিকাতর হয়ে উঠেছেন। তিনি ঐতিহ্যের রসে সিঞ্চ হয়ে সুন্ধী হওয়ার পুরনো পথই খুঁজে বেঢ়াচ্ছেন।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাধের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে গাওয়া হয়

ক. বাড়িলা গান

গ. ঘাটু গান

খ. গাজির গান

ঘ. জারি গান

২. “আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম” চরণটি ধারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. আগের দিন সুখের ছিল

গ. আগে মানুষ নির্ভোত ছিল

খ. পূর্বে মানুষ সমৃদ্ধ ছিল

ঘ. অতীতে মানুষ সহানুভূতিশীল ছিল

উদ্দীপকটি পড়ে ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

“মনে পড়ে যায় কতো সৃতি মায়া-ভরা”— গানটি শুনলেই বৃদ্ধ হামিদ সাহেব তাঁর ছেলেবেলায় ফিরে যান।

তাঁর মনে পড়ে কত কথা— সেসময় মানুষে মানুষে কত মিল ছিল, ধর্মী-গরিবে এত দূরত্ব ছিল না, উৎসবে-পার্বণে কতোইনা আনন্দ হতো! তাঁর মনে হয়, আবারও যদি সেই দিনগুলো ফিরে আসত!

৩. উদ্দীপকের সাথে “আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম” কবিতার কবির অনুভূতির সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো হলো—

i. অতীতচারিতা

ii. স্বপ্নচারিতা

iii. বাস্তবতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

গ. i ও iii

খ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. উপর্যুক্ত সাদৃশ্যের যথার্থ্য পরিলক্ষিত হয় নিচের কোন চরণে?

ক. এখন সবাই পাগল-বড়লোক হইতাম

খ. গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম

গ. দিন হতে দিন আসে যে কঠিন

ঘ. করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম

সূজনশীল প্রশ্ন

একতারা বাজাইও না দোতারা বাজাইও না

একতারা বাজাইও না ঢাকচোল বাজাইও না

গটার আর বংশো বাজাও রে

একতারা বাজাইলে মনে পইড়া যায়

আমার একতারা বাজাইলে মনে পইড়া যায়

একদিন বাঙালি ছিলাম রে।

ক. বর্ণায় কোন গান গাওয়া হতো?

খ. “দিন হতে দিন আসে যে কঠিন”— উক্তিটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সাথে “আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম” গীতি-কবিতার কী মিল আছে?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি “আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম” কাবতার আংশিক রূপায়ণ মাত্র— বিচার কর।



আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

কবি-পরিচিতি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার অস্তর্গত বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ক্রেতৃয়ার জন্মাবস্থা করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (সম্মান)-সহ এমএ পাস করে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী এবং ১৯৮৪-তে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

তাঁর কবিতার বিষয়ে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং এই বিষয়ক সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : ‘সাত নৰীর হার’, ‘কখনো রং কখনো সুর’, ‘কম্বলের চোখ’, ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’, ‘বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা’, ‘আমার সময়’ প্রভৃতি। এছাড়া ইংরেজি ভাষায়ও তাঁর একাধিক প্রস্তুত প্রকাশিত হয়েছে।

২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১৯এ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি ।

তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল

তাঁর পিঠে রক্তজবার ঘতো ক্ষত ছিল ।

তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন

অরণ্য এবং শ্বাপনের কথা বলতেন

পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন

তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন ।

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা

কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা ।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে বাড়ের আর্তনাদ শুনবে ।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে দিগন্তের অধিকার থেকে বাস্তিত হবে ।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে আজন্ম গ্রন্তিদাস থেকে যাবে ।

আমি উচ্চারিত সত্যের ঘতো



স্মৃতির কথা বলছি।
 উনোনের আঙুলে আলোকিত
 একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।
 আমি আমার মায়ের কথা বলছি,
 তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
 যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।
 যে কবিতা শুনতে জানে না
 সে নদীতে ভাসতে পারে না।
 যে কবিতা শুনতে জানে না
 সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।
 যে কবিতা শুনতে জানে না
 সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্ল শুনতে পারে না।
 আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
 আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
 আমি বিচলিত দ্বেষের কথা বলছি
 গৰ্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
 আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।
 ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
 যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
 মায়ের ছেলেরা চলে যায়,
 আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।
 যে কবিতা শুনতে জানে না
 সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
 যে কবিতা শুনতে জানে না
 সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।
 যে কবিতা শুনতে জানে না
 সে সূর্যকে হর্ষণিণী ধরে রাখতে পারে না।
 আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
 আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
 তাঁর পিঠে রঞ্জিবার মতো ক্ষত ছিল
 কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

যে কর্ষণ করে
 শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।
 যে মৎস্য লালন করে
 প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।
 যে গাড়ীর পরিচর্যা করে
 জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায় করবে।
 যে লোহখণকে প্রজ্ঞাপিত করে
 ইম্পাতের তরবারি তাকে সশন্ত করবে।
 দীর্ঘদেহ পুত্রগণ
 আমি তোমাদের বলছি।
 আমি আমার মায়ের কথা বলছি
 বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
 ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি
 আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।
 আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।
 সশন্ত সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
 সুপুরূষ ভালোবাসার সুরক্ষ সংগীত কবিতা
 জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
 রক্ষজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।
 আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো
 আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

কিংবদন্তি

- জনশ্রুতি। সোকপরম্পরায় শ্রদ্ধ ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী।

পিঠে রক্ষজবার মতো ক্ষত

- মানুষের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সেই অত্যাচারের আঘাত যে এখনও তাজা রয়েছে তা বোঝাতেই রক্ষজবার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, আঘাত রয়েছে পিঠে। অর্থাৎ, শক্ররা ভীরুক কাপুরুষের মতো পিছন থেকে আক্রমণ করেছে কিংবা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছে, মুক্ত মানুষের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ের বীরোচিত সাহস দেখায়নি।



- শ্বাপন – হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্মে।
- উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা – আগুনে সবকিছু শুচি হয়ে ওঠে। তাই আগুনের উভাপে পরিষেবা হয়ে সকল প্রাণি মুছে ফেলে আলোয় তরা মুক্তিজীবনের প্রত্যাশা জানাতে উজ্জ্বল জানালার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।
- বিচলিত স্নেহ – আপনজনের উৎকর্ষ। মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাদের স্বজনরা উদ্বিঘ্ন হন। ভালোবাসা আর শক্তা একসঙ্গে মিশে যায়।
- ভালোবাসা দিলে মা মরে যায় – মুক্তি বা স্বাধীনতার প্রয়োজনে কখনো আত্মোৎসর্গ অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য হেঢ়ে যেতে হয় মাকে। মা, পরিবারকে ছাপিয়ে দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসাকেই এখানে বোঝানো হয়েছে।
- সূর্যকে হৃষিপিণ্ডে ধরে রাখা – সূর্য সকল শক্তির উৎস। তাই এই সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য। কবির মতে, এই সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো কবিতা শোনা; কবিতাকে আস্থা করা। কেননা, কবির কাছে শুধু কবিতাই সত্য আর সত্যই শক্তি।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি আবু জাফর শুবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’-র নাম কবিতা। রচনাটিতে বিষয় ও আঙ্কিকগত অভিনবত্ব রয়েছে। আলোচ্য কবিতাটিতে উচ্চারিত হয়েছে ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির দৃঢ় ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে, রচনার প্রেক্ষাপটে আছে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস; এই জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উজ্জ্বাসনের অনিন্দ্য অনুষঙ্গসমূহ। তিনি এই কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে মানবমুক্তির আকাঞ্জায় সোচ্চার হন। কবির একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হয়ে উপস্থাপিত হয় একটি বিশেষ শব্দবৰ্জন ‘কবিতা’। কবি তাঁর পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। কবির বর্ণিত এই ইতিহাস মাটির কাছাকাছি মানুষের ইতিহাস; বাংলার ভূমিজীবী অনার্য জ্ঞাতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস। ‘কবিতা’ ও সত্যের অভেদকল্পনার মধ্য দিয়ে কবি নিয়ে আসেন মায়ের কথা, বোনের কথা, ভাইয়ের কথা, পরিবারের কথা। কবি এ-ও জানেন মুক্তির পূর্বশর্ত যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে পরিবার থেকে দূরে সরে যেতে হয়। ভালোবাসার জন্য, তাদেরকে মুক্ত করবার জন্যই তাদের হেঢ়ে যেতে হয়। এই অমোঘ সত্য কবি জেনেছেন আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস থেকে।

কবিতাটির রসোপলক্ষির অবিছেদ্য অংশ হলো এর আঙ্কিক বিবেচনা। এক্ষেত্রে, প্রথমেই যে বিষয়টি পাঠককে নাড়া দেয় তা হলো, একই ধাঁচের বাক্যের বারংবার ব্যবহার। কবি একদিকে “আমি কিংবদন্তির কথা বলছি” পঞ্জিকিত বারংবার প্রয়োগ করেছেন, অপরদিকে “যে কবিতা শুনতে জানে না/ সে...” কাঠামোর পঞ্জিকামালার ধারাবাহিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কবিতা আর মুক্তির আবেগকে একত্রে শিল্পরূপ প্রদান করেছেন। এখানে ‘কিংবদন্তি’ শব্দবন্ধনটি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যের প্রতীক। কবি এই নামনিক কৌশলের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন



গভীরতাসংগ্রামী চিত্রকল্প। একটি কবিতার শিল্পসার্থক হয়ে ওঠার পূর্বশর্ত হলো দুদয়স্পর্শী চিত্রকল্পের যথোপযুক্ত ব্যবহার। চিত্রকল্প হলো এমন শব্দছবি যা কবি গড়ে তোলেন এক ইন্দ্রিয়ের কাজ অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে করিয়ে কিংবা একাধিক ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত আশ্রয়ে; আর তা পাঠক-হৃদয়ে সংবেদনা জাগায় ইন্দ্রিয়াতীত বোধের প্রকাশসূত্রে। চিত্রকল্প নির্মাণের আরেকটি শর্ত হলো অভিনবত্ব। এ সকল মৌল শর্ত পূরণ করেই আলোচ্য কবিতায় চিত্রকল্পসমূহ নির্মিত হয়েছে। কবি যখন বলেন : “কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা”; তখন এই ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের দ্যোতনাই সঞ্চারিত হয়। নিবিড় পরিশ্রমে কৃষকের ফলানো শস্য একান্তই ইন্দ্রিয়ঘাস্য একটি অনুষঙ্গ। কিন্তু এর সঙ্গে যখন কবিতাকে অভেদ কল্পনা করা হয় তখন কেবল ইন্দ্রিয় দিয়ে একে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। সার্বিক বিবেচনায় কবিতাটি বিষয় ও আঙিকের সৌকর্যে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন।

কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। প্রচলিত ছন্দের বাইরে গিয়ে এটি প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক ছন্দ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবির পূর্বপুরুষের করতলে কিসের সৌরভ ছিল?

ক. রাজকুমার
খ. পলিমাটির

গ. শস্যদানার
ঘ. শাপদের

২. “আমি কিংবদন্তির কথা বলছি” – বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন—

- বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য
- বাঙালির সুনীর্ধকালের শোষণ-বঞ্চনার ইতিকথা
- অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালির শাশ্বত প্রতিবাদী সন্তা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii

গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ঢ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,

আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।

চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।

তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, ‘কোথা থেকে তুমি এলে?’

৩. কবিতাংশের “বাংলার আলপথ”-এর সাথে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চেতনা হলো-

- ইতিহাসমন্তব্ধতা
- ঐতিহ্যপ্রিয়তা
- সংস্থামশীলতা



নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা ব্যক্ত হয়েছে নিচের কোন চরণে?

- ক. সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যর্থনা কবিতা
- খ. সুপুরুষ ভালোবাসার সুকর্ষ সংগীত কবিতা
- গ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
- ঘ. যে কর্মণ করে/শস্যের সংজ্ঞার তাকে সমৃদ্ধ করবে

সূজনশীল প্রশ্ন

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি

মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি

মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি

মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি

মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি

মোরা সারা বিশ্বের শাস্তি বাঁচাতে আজকে লাড়ি

ক. প্রবহমান নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে?

খ. ‘ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়’ বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. ‘উনোনের আঙুলে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথার’ সাথে উদ্দীপকের চেতনার ঐক্য নির্দেশ কর।

ঘ. উক্ত ঐক্যের প্রেক্ষাপট “আমি কিংবদন্তির কথা বলছি” কবিতায় কতটুকু সার্থক— মন্তব্যাতি মূল্যায়ন কর।

তোমার আপন পতাকা হাসান হাফিজুর রহমান

কবি-পরিচিতি

হাসান হাফিজুর রহমান বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি জামালপুরে তাঁর নানাবাড়িতে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল জামালপুর জেলার ইসলামপুর থানার কুলাকান্দি গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবদুর রহমান এবং মায়ের নাম হাফিজা খাতুন। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্ট্রিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। পরে অনার্স ফাইলাল পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে বিএ পাস করেন।

কর্মজীবনে শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের চাকরি— এমনি নানা পেশায় তিনি যুক্ত ছিলেন। বাণিজ্যিক আন্দোলনের প্রথম সাহিত্য-সংকলন ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ তিনিই সম্পাদনা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি যৌব খণ্ডে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংকলন ও সম্পাদনা করেন। কেবল কবিতা নয় প্রবন্ধ, গল্পসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল দৃষ্ট পদচারণা। বদেশ, সমকাল এবং সাধারণ মানুষ তাঁর সাহিত্যচর্চার মুখ্য প্রণোদন। সাহিত্য ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্যে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং মরণোত্তর একুশে পদক জাত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো : ‘বিমুখ প্রাত্তর’, ‘আর্জ শব্দাবলি’, ‘অঙ্গিম শরের মতো’, ‘যখন উদ্যত সঙ্গীন’, ‘বঞ্চি চেরা আঁধার আমার’, ‘শোকার্ত তরবারি’ প্রভৃতি।

তিনি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

এবার মোছাব মুখ তোমার আপন পতাকায়।
হাজার বছরের বেদনা থেকে জন্ম নিল
রক্তিম সূর্যের অধিকারী যে শ্যামকান্ত ফুল
নিঃশেক হাওয়ায় আজ ওড়ে, দুঃখভোগানিয়া গান গায়।
মোছাব তোমার মুখ আজ সেই গাঢ় পতাকায়।
ক্রু পদাতিক যত যুগে যুগে
উদ্ভূত পায়ের দাগ রেখে গেছে কোমল পলির ঢাকে,
বিভিন্ন মুখের কোটি অশ্বারোহী এসে
খুরে খুরে ক্ষতময় করে গেছে সহনীয়া মাটি,
লালসার লালামাখা ক্রোধে বন্দুক কামান কত
অসুর গর্জনে চিরেছে আকাশ পরিপাটি,
বিদীর্ঘ বুক নীল বর্ণ হয়ে গেছ তুমি, বাংলাভূমি
নত হয়ে গেছে মুখ ক্ষেত্রে ও লজ্জায়।
এবার মোছাব সেই মুখ শোকাক্রান্ত, তোমার আপন পতাকায়।
কে আসে সঙ্গে দেখ দেখ চেয়ে আজঃ
কারখানার রাজা, লাঙ্গলের নাবিক,



উন্নাল চেউয়ের শাসক উদ্যত বৈঠা হাতে মাল্লা দল,

এবং কামার কুমোর তাঁতি । এরাতো সবাই সেই

মেহনতের প্রভু, আনুগত্যে

শানিত রক্তে ঢল হয়ে যায় বয়ে তোমার শিরাময় সারা পথে পথে ।

দুহাতে সরায় দ্রুত শহরের জটিল পক্ষিল,

মধ্যবিত্ত অনড় আবিল । একে একে সকলকে নামায মিছিলে ।

ডাকে আপামর ভাই বোন । একসাথে মিলে নিষ্ঠিত

বিশাল শিলাদৃঢ় পাহাড় বানায় ।

সেই কোটি হাত এক হাত হয়ে

মোছাবে তোমার মুখ তোমার আপন পতাকায় ।

সমস্ত শূন্যতায় আজ বিশুদ্ধ বাতাস বয়ে যায়

আকাশ চাঁদোয়া ঝল্লে রাত্মুক্ত ঘন নীলিমায় ।

অকলুষ বাংলাভূমি হয়ে ওঠো রাতারাতি আদিগন্ত তীর্থভূমি ।

অন্তহীন মিছিলের দেশ,

সারি সারি মানুষের আকারে হলে মূর্তিময়ী

সমস্ত স্বদেশ আজ রাঙা রাজপথে ।

দিবালোক হয়ে ফোটে প্রাঞ্জল বিপ্লব

সাত কোটি মুখ হাসে মৃত্যুর রঙিন তীর হাতে নিয়ে ।

শ্রেণিবন্ধ এই ভিড়ে সকলেই সবার আগে

একবার শক্রকে শেষ দেখা দেখে নিতে চায় ।

দুঃসাহস চমকায় বরাভয় হিল্লোলিত তোমার আপন পতাকায় ॥

তুমি আছো কাজল দিঘির পাড়ে, কোকিলের মধুকরা স্বরে,

হরিংস্বপ্নে ফুলে-ওঠা প্রাসরের উর্বর আদরে

সিংহপ্রাণ গিরিবর্ত্তে এবং বঙ্গোপসাগর

নামক আকুল ঐ অস্ত্রিভার তুমুল গভীরে

আছো দিন-রাত্রি অয়িমুখ অশনির অশেষ অধীরে ।

তুমি আছো আজো, ছিলে চিরকাল ।

বিশ্বের সেরা সুন্দরী বলে ঝুটেছ প্রবাদের খ্যাতি

যদিও রত্নখচা তোমার সৌন্দর্য সেই অবিরত তোমারই হয়েছে কাল ।

তোমাকে মুঠোতে ভরে আনন্দের ঝুমঝুমি
 বাজাতে এসেছে যারা
 সুকালের ভোজসভার ক্ষুধার্ত অতিথি
 রক্ত নিয়ে মুখে ধিকারে ধিকারে পলাতক তারা,
 আবহমান বাংলার বর্বরতম দখলদারও দেখ আজ
 কৃৎসিততম আঁধারে নির্ধাঁৎ হবে লীন।
 তুমি ছিলে অমলিন, আজো আছ অমলিন।
 শত কোটি লাঞ্ছনার তিক্ত দাগ সারা দেহে সয়ে
 আজো তুমি মাতা, প্রচিঞ্চল মাতা সাত কোটি সংশঙ্ক
 সন্তানের অকাতর তুমি মাতা।
 প্রেম অবারিত হবে বিজয়ের ধারাজলে, রৌদ্র, জোছনায়।
 শত শতাব্দীর অবঙ্গিত আশা পূর্ণ করে—
 মোছাব তোমায় মুখ তোমারই আপন পতাকায় ॥

শব্দার্থ ও টীকা

রঞ্জিম সূর্যের অধিকারী যে

শ্যামকাঞ্জ ফুল

- কবি এখানে আমাদের পতাকার সবুজ শ্যামল জমিনে ঘেরা লাল অংশকে বোঝাতে চেয়েছেন।

পদাতিক

অসুর

বিদীর্ঘ বুক নীল বর্ণ

হয়ে গেছ ভূমি

- হলুয়ুক্তে অংশগ্রহণকারী সৈন্য।
- ভয়ংকর বিপজ্জনক শক্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কারখানার রাজা

লাঙ্গলের নাবিক

এরা তো সবাই সেই

মেহনতের প্রভু

- কষ্টের রংকে নীল বলে সাধারণত অভিহিত করা হয়। এখানে স্বদেশের ওপর যুগে যুগে বহিশক্তির যে নির্যাতন আঘাসন সংঘটিত হয়েছে তার পরিপতিতে দুঃখ-ক্লিষ্ট বাংলাকে বোঝানো হয়েছে।

- শ্রমিকরাই কারখানার প্রাপ। তাই তাদের রাজা বলে সম্মোধন করা হয়েছে।

- সমুদ্রপথে নাবিক যেমন জলের বুক কেটে নতুন পথ আবিক্ষারে ব্রতী হয় তেমনি বাংলার কৃষকগুলি লাঙ্গলের ফলা দিয়ে মাটি চিরে সমৃদ্ধ ফসলভরা আগামী দিনের পথ তৈরিতে সচেষ্ট হয়।

- দেশের শ্রমজীবী মানুষকে বোঝানো হয়েছে। আমাদের সমাজে মেহনতি

১৪২
১৪৩

মানুষ তাদের প্রাপ্তি সম্মান পায় না। অনেক সময় তাদেরকে অন্যের দাসত্ব করতে হয়। কিন্তু কবি এখানে খেটে খাওয়া মানুষের শ্রমের উপর তাদেরই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেছেন।

আনুগত্যে শানিত রক্তে

চল হয়ে যায় বয়ে তোমার

শিরাময় সারা পথে পথে

দুহাতে সরায় দ্রুত শহরের

জটিল পঙ্কল

মধ্যবিত্ত অনড় আবিল।

একে একে সকলকে

নামায় মিছিলে

আপামর

ঠাঁদোয়া

রাহ

দিবালোক হয়ে ফোটে

প্রাঞ্জলি বিপুর

হরিৎ

গিরিবর্ত্ত

সংশঙ্গক

— নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীর জলকে শ্রমিকের শ্রমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

— মেহনতি মানুষের কথা বলতে গিয়ে কবি এখানে শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কথা স্মরণ করেছেন।

— এদেশের শ্রমজীবী মানুষের যে লড়াকু মানসিকতা রয়েছে তার বিপরীতে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন মধ্যবিত্তের স্থিরিতা, আপসকামিতা। কিন্তু এই দুর্বলতাকে পরাভূত করেছে তাদের প্রতি শ্রমজীবী মানুষের উদান্ত আহ্বান। তাই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মিছিলে এক হয়ে গেছে, স্বদেশের মুক্তি সকলের কাছে অভিন্ন লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

— পামর তথা নিচ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিসহ সকলে। অর্থাৎ কাউকেই বাদ না দিয়ে।
— কাপড়ের তৈরি চিত্রবিচিত্র ছাউনি, সামিয়ানা।
— ক্ষতিকারক ব্যক্তি বা শক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

— এটি একটি চিত্রকল্প। সূর্যের আলো ফুটে দিনের শুরু হয়। কবি সেই আলো ফোটার সঙ্গে বিপুবের প্রাণময়তাকে তুলনা করেছেন।

— সরুজ
— পাহাড়ি পথ।
— যে যোদ্ধা এই যর্মে শপথ নেয় যে, হয় যুদ্ধে জয়ী হবে অথবা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। যহাত্তারতে কৃষ্ণের নারায়ণী সেনাদলে সংশঙ্গক যোদ্ধা ছিল, যারা যরণপথ করে যুদ্ধ করত।

পাঠ-পরিচিতি

“তোমার আপন পতাকা” কবিতাটি হাসান হাফিজুর রহমানের ‘যখন উদ্যত সঙ্গীন’ শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে হাজার বছরের যত্নগা ঘূচিয়ে বাংলাদেশের উজ্জ্বল অভ্যন্তরকে কবি দ্যোতিত করেছেন এই কবিতায়। স্বাধীন দেশের একান্ত আপন যে স্বাধীন পতাকা, তা দিয়েই হাজার বছর ধরে পরিশ্রান্ত বঙ্গজননীর সকল ক্রান্তি মুছিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কর্তৃ।

ইতিহাস-সচেতন কবি অনুভব করেন কীভাবে দীর্ঘকাল ধরে বাংলা অঞ্চল বারংবার আক্রান্ত হয়েছে। শক্রসেনার অঙ্গের ঝনঝনানি আর তাদের দম্পত্তি পদভারে বেদনা-নীল হয়েছে এদেশের মাটি, প্রকৃতি এবং প্রাকৃত জীবন। কিন্তু এ-ও সত্য যে, শক্র হংকার কথনোই এদেশে চিরস্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। কেননা, এদেশের শ্রমিক, কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, মাঝি—প্রভৃতি সাধারণ মানুষ তাদের বুকের রজ্জ ঢেলে সজীব করে রেখেছে এই মাটির প্রাণস্পন্দনকে। তারা যুগে যুগে মিছিলের মতো সমবেত হয়েছে, দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছে, কোটি হাত এক হয়ে গিয়ে সেই হাতে বাংলা মায়ের মুখের সবচুকু শান্তি মুছে দিতে চেয়েছে। একই পতাকাতলে মিলিত হওয়ার প্রেরণায় উনিশশো একান্তরে উজ্জীবিত হয়েছিল এ দেশের মানুষ। অগিক্ষুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল তার উত্তাপ। সে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে কবির অনুভবে। কবিচৈতন্যে ভিড় করে মিছিল, লড়াই, রঞ্জে রাঙ্গা রাজপথ আর শক্রকে রূপে দেওয়ার দুর্বল সাহসে ভরা দৃষ্টি মানুষের মুখ। সেই সংগ্রামকে তিনি প্রতিবিম্বিত হতে দেখেন লাল-সবুজের পতাকায়।

সংগ্রামী অনুভবের পাশাপাশি কবির অনুভবে ধরা পড়ে আবহমান বাংলার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ। বাংলার কাঞ্জল দিঘি, কোকিলের গান, সবুজ ফসল ভরা মাঠ, পাহাড়ি পথ কিংবা উচ্ছুসিত সমুদ্র— বহুবেচিয়ের সমগ্রয়ে যে স্বদেশ, তাকে কবি প্রতীকায়িত করে তুলেছেন স্বাধীন দেশের আগন পতাকায়। এই তিলোত্তমা স্বদেশের অমিত সৌন্দর্যই শক্রপক্ষকে এদেশ আক্রমণে প্রলুক্ত করেছে। এ দেশের সাহসী জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধের মুখে শক্ররা পালাতে বাধ্য হয়েছে। মুক্ত হয়েছে স্বদেশ। নতুন আশায় নতুন দিনের স্ফপ্নে বিভোর হয়েছেন কবি। তাঁর একান্ত প্রত্যয় – অনেক রক্তের বিনিয়য়ে পাওয়া পতাকার মধুর স্পর্শে দূর হয়ে যাবে দেশমাতৃকার সকল বেদনা।

কবিতাটিতে হাসান হাফিজুর রহমান দেশ আর কাঁধে কাঁধ-মেলানো অঙ্গস্তৰ মানুষকে একই পতাকার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন। আর তাই ‘পতাকা’ শব্দবন্ধনটি এই কবিতায় ঐক্য ও প্রত্যাশা পূরণের প্রতীক। পুরো কবিতাতেই স্বদেশকে শিল্পাষিত অবয়বে উপস্থাপনের জন্য কবি একের পর এক চিরকল্পের মালা গেঁথেছেন। আর শিল্পকৌশলের সুসমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে কবিতাটি সমৃদ্ধ হয়েছে নামনিক উচ্চতায়।

কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এতে ৮+১০, ১০+৬ প্রভৃতি বিভিন্ন পর্বের মাত্রা বিভাজন পরিলক্ষিত হয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিঃশেষ হাওয়ায় আজ কী ওড়ে?

- ক. শ্যামকান্ত ফুল
- খ. বন্দুক কামান
- গ. আকাশ চাঁদোয়া
- ঘ. কোটি সংশ্লিষ্টক

২. ‘জূর পদাতিক’ বলতে কবি কী বোবাতে চেয়েছেন?

- i. স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নিষ্ঠুর সৈন্যদল
- ii. বাংলায় আগত যুগ-যুগান্তরের শাসক-শোষকশ্রেণি
- iii. বাংলার সম্পদ-সৌন্দর্য লুণ্ঠনকারী শক্রসেনা

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |



নিচের কবিতাখণ্ডটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উভয় দাও—

ওরা কারা বুনোদল ঢেকে
এরি মধ্যে (থামাও থামাও), স্বর্ণশ্যাম বুক ছিঁড়ে
অন্ত হাতে নামে সান্ত্বী কাপুরুষ

৩. “তোমার আপন পতাকা” কবিতার যে দিকগুলো উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো—

- i. বাংলায় শক্রসেনার আগমন
- ii. বাংলার মানুমের প্রতিবাদী সন্তা
- iii. যুগে যুগে আজ্ঞান্ত বাংলা-মা

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. নিচের কোন চরণযুগলে উদ্দীপকের সান্ত্বী কাপুরুষদের পরাজয়ের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে?

- ক. লালসার লালামাঝা ক্রোধে বন্দুক কামান কতো
অসুর গর্জনে চিরেছে আকাশ পরিপাটি,
- খ. ডাকে আপামর ভাই বোন। এক সাথে মিলে নিষ্ঠিত
বিশাল শিলাদৃঢ় পাহাড় বানায়।
- গ. তুমি আছো কাজল দিঘির পাড়ে, কোকিলের মধুকরা স্বরে,
হরিষ্মপে ফুলে-ওঠা প্রান্তরের উর্বর আদরে।
- ঘ. তুমি ছিলে অমলিন, আজো আছ অমলিন
শত কোটি লাঙ্গলার তিক্ত দাগ সারা দেহে সয়ে

সৃজনশীল প্রশ্ন

ছোট ভাইটিকে আমি কোথাও দেখি না
নরম নোলক পরা বোনটিকে আজ আর কোথাও দেখি না
কেবল পতাকা দেখি, কেবল উৎসব দেখি, স্বাধীনতা দেখি
তবে কি আমার ভাই আজ ঐ স্বাধীন পতাকা?
তবে কি আমার বোন তিমিরের বেদিতে উৎসব?

- ক. সাত কোটি সন্তানকে কী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে?
- খ. “তুমি ছিলে অমলিন, আজো আছ অমলিন”— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. উদ্দীপকের কবির জিজ্ঞাসা “তোমার আপন পতাকা” কবিতার যে দিকটিকে ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকটি “তোমার আপন পতাকা” কবিতার খণ্ডকাশ মাত্র— বিশ্লেষণ কর।



হাড়

আলাউদ্দিন আল আজাদ

কবি-পরিচিতি

আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই মে নরসিংহপুরা জেলার রায়পুরা থানার রামনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম গাজী আবদুল সোবহান ও মায়ের নাম আমেনা খাতুন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক সম্মান ও ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৭০-এ তিনি লঙ্ঘন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিপ্লোমা অর্জন করেন। সরকারি কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এছাড়া মঙ্কের বাংলাদেশ দূতাবাসে সংস্কৃতি-উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ গঞ্জ, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ লিখে যশস্বী হয়েছেন। তবে কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মনোজাগিতিক বিকার-বিকৃতি তাঁর কথাসাহিত্যে নিগৃহ জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে তিনি ঐকান্তিক বিশ্বাসের সঙ্গে আঁকতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যস্থুলো হলো : ‘মানচিত্র’, ‘ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ’, ‘সূর্যজ্ঞালার সোগান’, ‘লেলিহান পাঞ্জলিপি’, ‘নির্মোজ সনেটগুচ্ছ’, ‘আমি যখন আসবো’, ‘সাজুর’ ইত্যাদি। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ইউনেশ্বো পুরস্কার, একুশে পদক ইত্যাদিতে ভূষিত হয়েছেন।

২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের তেসরা জুলাই আলাউদ্দিন আল আজাদ মৃত্যুবরণ করেন।

দাল পলাশের ভস্মস্তুপে কিসের জ্বালা
স্তন্ত্র অধীর বজ্রগর্ত মেঘের মতো?
শিবির-সীমায় মনের ছায়ায় ইতস্তত
ছড়ায় সে তার কূট-মন্ত্রণা ঘৃণায় ঢালা
দুই শতকের সেই একদিন মনে কি পড়ে?
মিরজাফরের গুলির শিখায়, সমুদ্রত
নিভলো তোমার দিনের সূর্য দিগন্তেরে
দূর গোধূলির সেই একদিন মনে কি পড়ে
মনে কি পড়ে?

নিভলো তোমার ঘরের প্রদীপ পথের বাতি
নিভলো সহসা মহাশূন্যের লক্ষ তারা
কালো রাত্রির যাত্রিক হলে, লক্ষ্যহারা
সড়কে সড়কে ঝড়-ঝঁঝাই তোমার সাথি।
সমুখে কোথাও এমন সে দেশ আছে কি ভাই
যেখানে আলোর সম্ভাবে হাসে বসুঞ্চরা?



বন্দেশ আমার চক্র-রাতের মুঠোয় ভরা
 গ্রাম জনপদ কাঁপে বর্গীর অশ্বখুরে
 সোনার শস্য পোড়ে ছারখার; দৃষ্টি পুড়ে
 হলো সঙীন, তাই নেই আর অশ্রুবারা
 টোটায় বারে
 অযুত প্রাণের অগ্নিশিখার সূর্য-কুঁড়ি
 ফৌজের হাঁকে কাঁপে ধরথর দস্যপুরী
 নিমেষে ছড়ায় তারই আওয়াজ দিগন্তে
 মনে কি পড়ে?
 রক্ত বারে
 অগ্নির মতো বাঁশের কেল্লা বেদির পরে
 রক্ত বারাই ফাসির মধ্যে ধীপান্তরে
 বারেছে সকল রক্ত। এখন কখনা হাড়ে
 বাকবাক করে তীব্র তীক্ষ্ণ বর্ণ-ফলা
 নতুন দস্য আসে যদি, দেশ দেবোনা তারে
 ইস্পাত-হাড়ে গড়েছি বজ্র বহি-জ্বালা ॥

শব্দার্থ ও টীকা

ভস্মস্তুপ

বজ্রগর্ভ মেঘের মতো

মিরজাফর

মিরজাফরের গুলির শিখায়

... মনে কি পড়ে ।

যাত্রিক

নিভলো তোমার ঘরের প্রদীপ

... ঝড় ঝঁঝাই তোমার সাথি

- ছাইয়ের গাদা ।
- বজ্র ধারণ করে আছে এমন মেঘের অনুরূপ ।
- মির জাফর আলি ঝাঁ ছিলেন নবাব আলীবর্দি ঝাঁ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে গোপন চুক্তি করে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে তিনি সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটান । তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অন্তর্মিত হয় ।
- মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৭ সালে বিপুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ বাংলার স্বাধীন সূর্য অন্তর্মিত হয় । বাংলাদেশ দুইশ বছরের পরাধীনতা বরণ করে । সে দিনের সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা এদেশের দেশপ্রেমিক কোনো নাগরিকেরই ভুলে যাওয়ার কথা নয় ।
- যাত্রা সমৰ্জ্জীয় । যাত্রাযোগ্য । যাত্রাকারী ।
- অপরিসীম শক্তি, সাহস ও শৌর্যবীর্য ধাকা সত্ত্বেও মিরজাফর প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশির যুদ্ধে বাংলায় স্বাধীনতা



সূর্য অন্তমিত হয়। সুদীর্ঘ অন্ধকারের মধ্যে পতিত হয় দেশমাত্কা। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে পুরো দেশ, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংকট তৈরি করা হয় সর্বত্র। এই পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য লড়াই হয়েছে কিন্তু ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র, শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নে তাঁদের সংগ্রাম বারবার ব্যর্থভায় পর্যবসিত হয়েছে।

বর্গী

- ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যরা বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে লুঁচিন, হত্যা ও জ্বালাও-পোড়াও করে চলছিল। এদের বর্গী বলা হয়। এরা অন্ত বহন করত এবং দ্রুতগতির ঘোড়ায় চড়ে আক্রমণ চালাত। বর্গীর অত্যাচারে মানুষ সন্ত্রস্ত ও ভীত-বিহুল হয়ে উঠেছিল।

টোটা

বাঁশের কেল্লা

- বন্দুকের কার্তৃজ।
- ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার জন্য ১৮৩১ সালের ২৩এ অক্টোবর তিতুমির একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। অন্তর্গত রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁর অনুসারীদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য তিনি এই কেল্লা তৈরি করেন।

নতুন দস্যু আসে যদি

... বজ্র বহি-জ্বালা

- বাংলার মানুষ এখন প্রতিরোধের শক্তিতে বলীয়ান। দীর্ঘ সংগ্রাম বিপুল-বিদ্রোহ ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় এখন বাংলার জনগণ সমৃদ্ধ। তার ইস্পাতদৃঢ় হাড়ে বজ্রের সংক্ষেপ। কোনো দস্যু আর এদেশ দখল করতে পারবে না। কোনো বিদেশি শক্তির কাছে পরাত্ব মানবে না এদেশের কোটি কোটি মানুষ।

পাঠ-পরিচিতি

আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত “হাড়” শীর্ষক কবিতাটি তাঁর ‘মানচিত্র’ (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। দেশপ্রেমমূলক এই কবিতাটির মধ্যে এদেশের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস ও তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে যে শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের পটভূমিতে বিপুল বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছিল কবিতাটিতে সেই সংগ্রামের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সুখ-সমৃদ্ধিতে ঐশ্বর্যময় এবং প্রাণেশ্বর্যে ভরপুর এই সুন্দর দেশটি বর্গীর আক্রমণ থেকে শুরু করে অসংখ্যবার শক্তির আক্রমণের শিকার হয়েছে। বিপর্যস্ত হয়েছে এদেশের সহজ-সুন্দর জনজীবন, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। দেশের শান্তিকামী মানুষ একেক সময় ঝুঁসে উঠেছে এবং সংগ্রামে সংগ্রামে, যুদ্ধে যুদ্ধে পরাত্ত করেছে দখলদার বাহিনীকে। বিশ্বাসকর শক্তি-সাহস এবং শৌর্যবীৰ্য ও সমৃদ্ধিতে এখন এদেশের মানুষ আজ্ঞাবিশ্বাসী। কোনো বিদেশি শক্তি এদেশকে আক্রমণ করার সাহস আর পাবে না। এখন এ দেশের মানুষ ইস্পাতদৃঢ়, হাড়ে তাঁর বজ্রের শক্তি। এদেশ আর পরাধীন করতে পারবে না কেউ। দখলদারদের তছনছ করে দেওয়ার মতো ‘বজ্র বহি-জ্বালা’ জন্য নিয়েছে এ দেশের বুকের মধ্যে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “হাড়” কবিতায় ‘বাঁশের কেল্লা’কে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ক. অগ্নির

খ. বর্ণার

গ. ইস্পাতের

ঘ. বজ্রের



২. ‘নিভলো তোমার দিনের সূর্য দিগন্তে’—বলতে বোঝানো হয়েছে—

- i. পলাশির প্রান্তের বাংলার স্থানতার সূর্য অন্ত যাওয়া
- ii. ইংরেজদের শাসন-শোষণ-নিপীড়নে বিপর্যস্ত হওয়া
- iii. অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত হওয়া

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

লেনিন ভেঙেছে রংশে জনপ্রাতে অন্যায়ের বাঁধ

অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ

৩. কবিতাংশের লেনিনের সাথে “হাড়” কবিতায় কার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়?

- | | |
|--------------|----------------|
| ক. বর্গীর | খ. মিরজাফরের |
| গ. তিতুমিরের | ঘ. স্বয়ং কবির |

৪. যে চেতনাগত দিক থেকে তারা সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো—

- | | |
|---------------------|----------------|
| i. স্বাদেশিকতা | |
| ii. বিশ্বাসবাতকতা | |
| iii. প্রতিবাদমুখরতা | |
| নিচের কোনটি ঠিক? | |
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

তিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাশে

বুবাছনি ভাই বুবাছনি, আসল কথা বুবাছনি

এক গেরামের গরিব চাষি কালা মিয়া নাম

সবার পেটে ভাত জুটাইতে ক্ষেতে বরায় ঘাম

ও তার ছাওয়াল কান্দে ক্ষুধার জ্বালায়

মহাজনরা হাসে।

তিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাশে।

ক. বর্গীর অশ্বখুরে কী কাপে?

খ. ‘কালো রাত্রির যাত্রিক হলে’ বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. কবিতাংশের বাগডাশ ও মহাজন “হাড়” কবিতায় কাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চাষি কালা মিয়ার দারিদ্র্যবস্তা থেকে উত্তরণের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় “হাড়” কবিতায়
—মন্তব্যাটির যাথার্থ্য যাচাই কর।



নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

সৈয়দ শামসুল হক

কবি-পরিচিতি

সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭এ ডিসেম্বর কুড়িগ্রামে জন্মাই হণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সিদ্দিক হসাইন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। সৈয়দ হক প্রথমে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক ছিলেন। পরে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যসাধনায় আত্মনিরোগ করেন। একাধারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, কাব্যনাট্য ও শিশু সাহিত্যের লেখক হওয়ায় তিনি সব্যসাচী লেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। চিত্রনাট্য রচয়িতা ও গীতিকার হিসেবেও তিনি খ্যাত। মানুষের জটিল জীবনপ্রবাহ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা। সাহিত্যের গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই নিরীক্ষাপ্রিয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যাঘন হলো : ‘বৈশাখে রচিত পঞ্চভিমালা’, ‘প্রতিবন্ধনিগণ’, ‘পরাণের গহীন ভিতর’, ‘রঞ্জপথে চলেছি’। ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’, ‘গণনায়ক’, ‘নূরলদীনের সারাজীবন’, ‘এখানে এখন’, ‘ঈর্ষা’ প্রভৃতি তাঁর কাব্যনাটক। সৈয়দ শামসুল হক বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আদমজি সাহিত্য পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন বৰ্ষপদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং একুশে পদকসহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

নিলক্ষ্মা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
নিচে ধীম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে উন্মত্তর হাজার।
ধ্বল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার।
নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার
তখন হঠাত কেল দেখা দেয় নিলক্ষ্মার নীলে তীব্র শিস
দিয়ে এত বড় চাঁদ?

অতি অক্ষমাত্
স্তন্ত্রতার দেহ ছিড়ে কোন ধৰনি? কোন শব্দ? কিসের প্রপাত?

গোল হয়ে আসুন সকলে,
ঘন হয়ে আসুন সকলে,
আমার মিনতি আজ ছির হয়ে বসুন সকলে।
অতীত হঠাত হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়।

এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায়
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।

কালঘূম যখন বাংলায়
তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঞ্চিনায়।

নূরলদীনের বাঢ়ি রংপুরে যে ছিল,
রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল
১১৮৯ সনে।
আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে,



নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
 যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
 নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
 যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
 নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
 যখন আমার সপ্ত লুট হয়ে যায়;
 নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
 যখন আমার কষ্ট বাজেয়াঙ্গ করে নিয়ে যায়;
 নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
 যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়
 ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়।
 আসুন, আসুন তবে, আজ এই প্রশংস্ত প্রান্তরে;
 যখন স্মৃতির দুখ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে,
 তখন কে থাকে ঘুমে? কে থাকে ডেতরে?
 কে একা নিঃসঙ্গ বসে অঙ্গপাত করে?
 সমস্ত নদীর অশ্ব অবশেষে ব্ৰহ্মপুত্ৰে মেশে।
 নূরলদীনেরও কথা যেন সারা দেশে
 পাহাড়ি চলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়,
 অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার এ আশায়
 যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,
 আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়
 দিবে ডাক, “জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?”

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|-------------------------|---|
| নিষক্ষা | - দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী। |
| ধৰল দুধের মতো জ্যোৎস্না | - সাদা দুধের মতো জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রঙকে দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। |
| স্তুতির দেহ | - এখানে নীরব নিষক্ষ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে। |
| প্রপাত | - নির্বারের পতনের স্থান। জলপ্রপাত। |
| হানা দেয় | - আক্রমণ করে। আবির্ভূত হয় অর্থে ব্যবহৃত। |
| কালঘূম | - মৃত্যু; চিরনিদ্রা। |
| মরা আঞ্চিনায় | - মৃত্যু নিখর অঙ্গনে। |
| বাহে | - বাপুহে। দিনাঞ্জপুর, রংপুর এলাকার সম্বোধনবিশেষ। |
| কোনঠে | - কোথায়। |

পাঠ-পরিচিতি

“নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়” কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাটক ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশ।

নাটকটির প্রস্তাবনা অংশে সুব্রহ্ম আবেগঘন কাব্যিক বর্ণনার মাধ্যমে দর্শকদের সঙ্গে নাট্যকাহিনির সংযোগ স্থাপন করেছেন। নূরলদীন এক ঐতিহাসিক চরিত্র। রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষকনেতা নূরলদীনের সংগ্রামের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের সাহস আর ক্ষেত্রকে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে।

১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ কালৱাত থেকে শুরু করে দীর্ঘ নয় মাস যখন এই বাংলা মৃত্যুপূর্বীতে রূপ নেয়, যখন শকুনজল্পী দালালের আলখাল্লায় ছেয়ে যায় দেশ; যখন বাঙালি হারায় তার স্বপ্ন ও বাক্স-স্বাধীনতা, যখন স্বজনের রক্তে তেসে যায় ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা— তখন মনে পড়ে ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীনকে— এই চেতনাই কবিতাটিতে সৈয়দ শামসুল হক তুলে ধরতে চেয়েছেন। ১১৮৯ বঙাদে [১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দ] নূরলদীনের ডাকে মানুষ যেভাবে জেগে উঠেছিল, এখনও ঠিক সেইভাবে জেগে উঠবে বাংলার জন-মানুষ— এটাই কবির বিশ্বাস। এভাবে কবির শিল্পভাবনায় নূরলদীন কুমার্বয়ে এক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হয়। ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ভিত্তে— অংশগ্রহণ করে সমকালীন সকল আন্দোলন-সংগ্রামে। তাই কবির মনে হয়— অভাগা মানুষ জেগে উঠে পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দেবে সকল অন্যায় যখন নূরলদীন দেবে ডাক— “জাগো, বাহে, কোনঠে সবাই।”

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নূরলদীনের ডাকে কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলার মানুষ জেগে উঠেছিলেন?

- | | |
|---------|---------|
| ক. ১৭৮২ | খ. ১৭৮৭ |
| গ. ১৮৫৭ | ঘ. ১৯৭১ |

২. “নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়” কবিতায় ফুটে উঠেছে—

- i. নূরলদীনের প্রতিবাদী চেতনায় উত্তাসন
 - ii. বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের আহ্বান
 - iii. বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন
- নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলার আগদে আজ লক্ষ কোটি বীর সেনা

ঘরে ও বাইরে হাঁকে রণধৰনি, একটি শপথে

আজ হয়ে যায় শৌর্য ও বীরগাথার মহান

সৈনিক, যেন সূর্যসেন, যেন স্প্যার্টকাস স্বয়ং সবাই।



৩. উদ্দীপকে সবার সূর্যসেন ও স্পার্টাকাস হওয়ার ব্যাপারটি “নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়” কবিতার যে দিকগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত তা হলো—

i. অধিকার আদায়ে নবজাগরণ

ii. পূর্বসূরির আহ্লান

iii. সকলের সমন্বিত প্রয়াস

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. সম্পর্কিত দিকের প্রেক্ষাপট নির্মাণে কোন চরণটি ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ধৰল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার।

খ. অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়।

গ. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।

ঘ. জাগো, বাহে, কোনটে সবাই?

সূজনশীল প্রশ্ন

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উন্নেজনা নিয়ে

লক্ষ লক্ষ উন্নত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে

ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে : ‘কখন আসবে কবি?’

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,

রবীন্দ্রনাথের মতো দৃঢ় পায়ে হেঁটে

অতঃপর কবি এসে জনতার মধ্যে দাঁড়ালেন।

তখন পলকে দারুণ বালকে তরীতে উঠিল জল,

হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার

সকল দুয়ার খোলা।

ক. নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল?

খ. ‘যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়’— বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. কবিতাংশের কবির চেতনার সঙ্গে নূরলদীনের চেতনাগত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রেক্ষাপটগত সাদৃশ্য থাকলেও কবিতাংশটিতে “নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়” কবিতায় কবির অভিব্যক্তির সার্থক ঝর্পায়ণ ঘটেনি— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।



ছবি

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

কবি-পরিচিতি

আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মার্চ সিরাজগঞ্জ (তৎকালীন পাবনা) জেলার অঙ্গর্গত উল্লাপাড়ার গোবিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এম. শাহজাহান আলী, মাতা আলেকুনেসা। বিশিষ্ট রোমান্টিক কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল ছিলেন একই সঙ্গে খ্যাতিমান অধ্যাপক, সফল গীতিকার, সম্মোহনক্ষম বাণী ও অনন্মীল সাহিত্য-সমালোচক। সময় শিক্ষাজীবনে তিনি সুপরিচিত ছিলেন কৃতী ছাত্র হিসেবে। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রথম প্রেমিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এমএ ডিপ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিপ্রি অর্জন করেন।

পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর কর্মজীবন। তিনি ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালে তিনি বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। আবু হেনা মোস্তফা কামালের রোমান্টিক কবিতাকে করেছে নবনশোভন। শব্দের বহুমুখী দ্যোতনা ও চিত্রর্থিতা তাঁর কবিতার প্রধান সম্পদ। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ : ‘আপন ঘোবল বৈরী’, ‘যেহেতু জন্মান্ত্র’, ‘আক্রান্ত গজল’; গীতি-সংকলন : ‘আমি সাগরের নীল’; প্রবন্ধগ্রন্থ : ‘শিল্পীর রূপান্তর’, ‘কথা ও কবিতা’। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিবরূপ তিনি লাভ করেছেন ‘আলাওল সাহিত্য পুরস্কার’ ও বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত ‘একুশে পদক’।

কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ সেপ্টেম্বর ৫৩ বছর বয়সে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ

ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান।

অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মনোহারী স্পট আমাদের নেই,

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না— আপনার স্বীকৃত সঞ্চয় থেকে

উপচে-পড়া ডলার মার্ক কিংবা স্টার্লিংয়ের বিনিময়ে যা পাবেন

ডাল্লাস অথবা মেক্সিস অথবা কালিফোর্নিয়া তার তুলনায় শিশুতোষ!

আসুন, ছবির মতো এই দেশে বেড়িয়ে যান

রঙের এমন ব্যবহার, বিষয়ের এমন তীব্রতা

আপনি কোনো শিল্পীর কাজে পাবেন না, বস্তুত শিল্প মানেই নকল নয় কি?

অথচ দেখুন, এই বিশাল ছবির জন্যে ব্যবহৃত সব উপকরণ

অক্রিয়;

আপনাকে আরও খুলে বলি : এটা, অর্ধাং আমাদের এই দেশ,



এবং আমি যার পর্যটন দফতরের অন্যতম প্রধান, আপনাদের খুলেই বলি,
সম্পূর্ণ নতুন একটি ছবির মতো করে

সম্প্রতি সাজানো হয়েছে :

খাঁটি আর্যবৎশ সম্মুত শিল্পীর কঠোর তত্ত্বাবধানে ত্রিশ লক্ষ কারিগর
দীর্ঘ নঁটি মাস দিনরাত পরিশ্রম করে বানিয়েছেন এই ছবি।
এখনো অনেক জায়গায় রং কাঁচা— কিন্তু কী আশ্চর্য গাঢ় দেখেছেন?
ভ্যান গগ—যিনি আকাশ থেকে সীল আর শস্য থেকে সোনালি তুলে এনে
ব্যবহার করতেন— কখনো, শপথ করে বলতে পারি,

এমন গাঢ়তা দ্যাখেন নি :

আর দেখুন, এই যে নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার— ওর ভেতরেও
একটা গভীর সাজেশান আছে— আসলে ওটাই এই ছবির— অর্থাৎ
এই ছবির মতো দেশের— থিম।

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|-------------------------|--|
| মনোহারী স্পট | - চিন্তাকর্ষক পর্যটনস্থল । |
| স্ফীত সঞ্চয় | - ফুলে ফেঁপে উঠা সঞ্চিত অর্থ । |
| ডলার | - আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সরকারি মুদ্রার নাম । |
| মার্ক | - বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের মুদ্রার নাম বা হিসাবের একক। সোনা ও রূপার ওজন পরিমাপে মার্ক হিসাবের একক হয়ে কাজ করে । |
| স্টার্লিং | - পাউন্ড স্টার্লিং। পাউন্ড নামে বিশেষভাবে পরিচিত যুক্তরাজ্যের সরকারি মুদ্রা । |
| ডাল্লাস | - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় নগর । |
| মেক্সিস | - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য টেনিসির একটি নগর। নগরটি যিসিসিপি নদীর তীরে অবস্থিত । |
| কালিফোর্নিয়া | - আয়তনের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য । |
| শিঙ্গ মানেই নকল নয় কি? | - কাব্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, সাহিত্য বা শিঙ্গ হচ্ছে জীবনের বা ঘটনার অনুকরণ । এ অর্থেই কবি শিঙ্গকে ‘নকল’ বলেছেন । |
| খাঁটি আর্যবৎশ সম্মুত | - আর্য মানে Aryan। মানবজাতিবিশেষ। এখানে খাঁটি বাঙালি চেতনার ধারক এক মহামানবকে বোঝানো হয়েছে । |
| ত্রিশ লক্ষ কারিগর | - বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদ । |

ভ্যান গগ

- বিশ্ববিখ্যাত ডাচ চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট উইলেম ভ্যান গগ (১৮৫৩-১৮৯০)। ইনি পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী হিসেবে সমধিক পরিচিত। আবেগের সততা, রাঢ় সৌন্দর্য ও গাঢ় রং ব্যবহারের কুশলতায় বিশ শতকের চিত্রশিল্পে প্রভৃত প্রভাব বিত্তার করেছিলেন তিনি। *The Potato Eaters, self portraits, wheat fields* এবং *sunflowers* তাঁর অন্যতম বিখ্যাত ছবি।

নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মাদানকারী অসংখ্য শহিদের করোটি কবিকথিত ছবিতে বারবার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

সাজেশান

- একটি বিশেষ চিঞ্চা যা নতুন কিছুর উন্নয়ন ঘটায়।

থিম্

- আঁকা ছবিতে সঞ্চারিত বিশেষ কোনো চিঞ্চা বা বাণীকেই চিত্রশিল্পে থিম্ বলা হয়। সাধারণত ওই বাণী জীবন, সমাজ ও মানবীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়ে থাকে। থিম্-এর মাধ্যমে একটি ছবির মৌলিক ও বিশ্বজনীন মূল্য প্রতিভাব হয়।

পাঠ-পরিচিতি

“ছবি” কবিতাটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আপন যৌবন বৈরী’ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতায় রোমান্টিক কবি নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে মহান শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি কালজয়ী ছবি হিসেবে কঙ্কনা করেছেন। কবি নিপুণ শব্দের ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন ত্রিশ লক্ষ খাঁটি বাঙালি-শিল্পী তথা শহিদের দীর্ঘ নয় মাসের শ্রমে-আত্মানে সৃজিত হয়েছে এই ছবি। তাঁর নিশ্চিত ধারণা, রঙের জাদুকর শিল্পী ভ্যান গগও ছবিটিতে ছড়ানো রঙের আশ্চর্য গাঢ়তা কখনো দেখেননি। কবি মনে করেন, ছবিটিতে ব্যবহৃত অসংখ্য নরমুণ্ডের ব্যবহার ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মানের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে আছে, যা এই ছবির মতো দেশটির গৌরবময় স্মারক। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত সুন্দর এই দেশ পরিদর্শনের জন্য কবি বিদেশিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবিতায়।

কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের গীতি সংকলন?

ক. আক্রান্ত গজল

খ. আমি সাগরের নীল

গ. যেহেতু জন্মান্ত্র

ঘ. শিল্পীর রূপান্তর

২. ‘মেফিস অধিবা কালিফোর্নিয়া তার তুলনায় শিশুতোষ’— বলতে বোঝানো হয়েছে—

i. এদেশের অতুলনীয় সৌন্দর্য

খ. i ও iii

ii. দেশের প্রতি কবির মমত্ববোধ

ঘ. i, ii ও iii

iii. মেফিস, কালিফোর্নিয়ার সৌন্দর্য শিশুদের উপযোগী

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii



নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

এসেছি আবার ফিরে...রাতজাগা নির্বাসন শেষে

এসেছি জননী বঙ্গে স্বাধীনতা উড়িয়ে উড়িয়ে

৩. উদ্দীপকে “ছবি” কবিতার যে ভাবগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা হলো—

- i. সুনীর্ধ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম
- ii. যুদ্ধকালীন মানুষের বিপর্যস্ত জীবন
- iii. বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত ভাবকে কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল ‘নতুন একটি ছবি’ হিসেবে কল্পনা করেছেন কেন?

ক. ছবির মতো সুন্দর দেশ বলে

খ. খাটি বাঙালি শিল্পীর আঁকা বলে

গ. অকৃত্রিম রঙ ব্যবহৃত হয়েছে বলে

ঘ. ত্রিশ সপ্ত কারিগরের রঙে রঞ্জিত বলে

সূজনশীল প্রশ্ন

শহিদের পুণ্য রক্তে সাত কোটি

বাঙালির প্রাণের আবেগ আজ

পুষ্পিত সৌরভ। বাঞ্ছার নগর, বন্দর

গঙ্গ, বাষটি হাজার গ্রাম

বৎসস্তুপের থেকে সাত কোটি ফুল

হয়ে ফোটে। প্রাণময় মহৎ কবিতা

আর কোথাও দেখি না এর চেয়ে।

ক. কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল এদেশকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

খ. কবি নিজেকে এদেশের পর্যটন দফতরের অন্যতম প্রধান বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে বাঙালির প্রাণের আবেগ পুষ্পিত হ্বার বিষয়টি “ছবি” কবিতায় কীভাবে বাঞ্ছময় হয়ে উঠেছে
—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বৈসাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক ও “ছবি” কবিতা যেন একই সূত্রে গাঁথা— উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

কবি-পরিচিতি

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান যশোর জেলা শহরের পশ্চিম পাস্তে খড়কি গ্রামে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ শাহাদার আলী এবং মায়ের নাম রাহেলা আতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সম্মান ও এর পরের বছর এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এর আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। ১৯৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে তিনি যুক্ত ছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই স্বদেশ ও সমকাল সচেতন এই কবির সাহিত্য-প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঝজু বঙ্গব্য, ছন্দ সচেতনতা এবং গীতিময়তা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : ‘দুর্লভ দিন’, ‘শক্তি আলোকে’, ‘বিপন্ন বিষাদ’, ‘প্রতনু প্রত্যাশা’, ‘ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার’, ‘ধীর প্রবাহে’ প্রভৃতি।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের তেসরো সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

নদীর ধসের নিচে
বাতাসের মধ্যে আছে
কিছুটা আশ্রয়;
গানের বদলে পাখি চুপিসারে কথা বলে
শঙ্খের পরিভাষা শিখে,
চেউ হয়ে গেছে বালুময়।

ভেসে যাওয়া ডালপালা কুড়িয়ে কাড়িয়ে
আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে আছে
ভূমিহীন কৃষিজীবী, ইচ্ছে তার
জেলে হয়ে কিছু মাছ ধরে।

কোনো কোনো দিন যখন জলের তোড়
পাঢ় ভেঙে চুকে পড়ে ক্ষেতের উজানে
ফাটলে, দলিত ঘাস ফসলের শোভা ঠোঁটে



আবার সে ফিরে যায় কাদায় অক্ষর এঁকে দিয়ে;
 তখন সে মাছ ঝোঁজে কাদাখোঁচা পাথির মতন।
 সব মাঠ, হলুদ সবুজ কালো ফসলের সব মাঠ,
 সময়ের প্রতীক্ষায় থাকে শুধু।
 কখন মেঘের রঙ সাদা থেকে কালো হবে
 জমে উঠবে মেঘের পাহাড়
 কখন ক্ষেত্রের কাজ শুরু হবে কৃষকের
 সময়ের প্রতীক্ষায় থাকা শুধু।
 লাঙল নিড়ানি রেখে এখন কেবল
 কোঁচ হাতে গৌঁজ হয়ে মাছরাঙা গামছা পরে
 একঠ্যাঙ্গা বগের মতন চেয়ে থাকে।
 মাটির টিলার পরে তার ঘরে
 টিলাটলা ফতুয়ার মধ্যে বসে
 মাছভাত খেতে খেতে একদিন
 আকালের গল্পকথা বলাবলি করবে তার স্বজনের সাথে
 এই স্বপ্ন চোখে নিয়ে
 প্রতীক্ষায় থাকা শুধু
 মাছরাঙা গামছা পরে একঠ্যাঙ্গা বগের মতন।
 চোখের লবণ জমে চোখ জ্বলে
 শুধু জ্বলে। কোঁচ হাতে গৌঁজ হয়ে
 সময়ের প্রতীক্ষায় থাকা শুধু।

শব্দার্থ ও টীকা

ধস

- পাহাড়, নদীর পাড় প্রভৃতি থেকে মাটি বা পাথর খসে পড়া।

জলের তোড়

- জলের চাপ।

দলিত ঘাস ফসলের শোভা

ঠোঁটে আবার সে ফিরে যায়

কাদায় অক্ষর এঁকে দিয়ে

- জলে ঘাস ফসল ভুবে যাওয়ার পর আবার যখন জল নেমে যায় তখন
 বেরিয়ে আসা কর্দমাক্ত ভূমির বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

| | |
|----------------------|--|
| কাদাখোঁচা | - এক ধরনের পাথি। |
| হলুদ সবুজ কালো ফসলের | |
| সব মাঠ | - সবুজ ফসল থাকে, পেকে সোনালি বা হলুদ হয়, ফসল কাটার পর নাড়া পোড়ালে মাঠ কালো বর্ণ ধারণ করে। |
| কেঁচ | - মাছ-শিকারের জন্য লোহার ছুঁচালো ফলা লাগানো হাতিয়ার বিশেষ। |
| চোখের লবণ জমে | |
| চোখ জলে | - কৃষকের বেদনাকে বোঝানো হয়েছে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে কৃষক জেলে হয়েছে। তবুও তার কষ্ট লাঘব হয় না। মাছের জন্যও তাকে প্রতীক্ষা করেই যেতে হয়। এই কষ্টের জীবন তাকে অশ্রদ্ধিক করে তোলে। |

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের ‘ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার’ গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। প্রকৃতিনিবিড় মানুষের পরিবর্তমান জীবনপ্রবাহের এক নান্দনিক স্বপ্ন-উপাখ্যান এই কবিতাটি। জলবেষ্টিত এই বাংলার জনপদের একজন সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের কথা আছে এতে, আছে তার স্বপ্নসাধ। জলের তোড়ে এই কৃষক হয়ে উঠে ভূমিহীন। কিন্তু আশাবাদী মানুষের এই দেশে সহজে কেউ হতোদ্যম হয় না। তাই ভূমি হারানো এই মানুষটি জলকে ধিরেই বাঁচতে চায়। সে জেলে হতে চায়। খড়কুটো ডালপালা আশ্রয় করে আগুন জ্বালিয়ে সে জীবনের উত্তাপকে ফিরে পেতে চায়। এরই সঙ্গে সে ঘিলিয়ে নেয় তার ঢাওয়া— জেলে হয়ে মাছ ধরার। কেননা, জলমগ্ন এই চারপাশ ভূমিকর্ষণের অনুপযোগী। তাকে প্রতীক্ষা করতে হয় তারী সময়ের জন্য। আর এই অস্তর্ভূত সময়ে সেই কৃষক বরণ করে নিতে চায় জেলেজীবন। জীবিকার এই রূপান্তর তাকে স্বপ্নশূন্য করে না। সে সুন্দর ভবিষ্যতের কল্পনায় বিভোর হয়। বিগত কষ্টের দুঃখস্মৃতি রোমস্তনের মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে থাকে সেই আনন্দ এই কৃষকও একদিন লাভ করবে — এই আশা নিয়ে কবিতার এই কৃষক তার জীবনকে সংজীব করে রাখে। সে মাছ ধরার প্রতীক্ষা করে। কিন্তু কবি এই সরল কাঠামোয় কবিতাটি বিন্যস্ত করেন না। তাঁর বোধের বহুমাত্রিকতায় উল্লিখিত ভূমিহীন কৃষককে পাখির আদল দিতে চান। মূলত পাখির প্রতীকেই কবি উল্লিখিত কৃষক চরিত্রটিকে রূপায়ণ করেন। তাই নদীর জলে ভূমি নিয়মিত হলে সেই কৃষক বাতাসে আশ্রয় খোঁজে; ঠিক যেমন একটি পাখি ডানা এলিয়ে ভেসে বেড়ায় বাতাসে। শুধু তাই নয়, ওই কৃষক তখন পাখির ভাষাও বোঁৰে। তাই পাখির কৃজনকে তখন গান মনে না হয়ে সংজ্ঞাপনযোগ্য কথোপকথন বলেই তার বোঁধ হয়। আবার মাছরাঙা পাখির মতোই তার পোশাক, বকের ভঙ্গিই চলে তার মাছ ধরার প্রতীক্ষা। এভাবে পাখির সঙ্গে যায় সেই ভূমিহীন কৃষিজীবীর আপাত-উন্মুক্তি জীবন। পাখির ভূমিতে আশ্রয় হয় না, এই কৃষকের ভূমিনির্ভর আশ্রয় হারিয়ে গেছে। মৎস্য শিকারি মাছরাঙা কিংবা বক যেমন করে মাছের প্রতীক্ষা করে, এই কৃষকও তেমনি জেলেজীবন গ্রহণ করে মাছের অপেক্ষা করে। এত যে পরিবর্তন, জীবনকাঠামোর রূপান্তর — এসব সত্ত্বেও ওই মানুষটি প্রকৃতিলগ্ন হয়ে বেঁচে থাকে, স্বপ্ন দেখে, অমিত জীবনশক্তির উদ্ঘোধন ঘটায়। এই অনিঃশেষ প্রাণময়তাকেই কবি উপস্থাপন করেন আলোচ্য কবিতার সূত্রে।

অক্ষরবৃন্ত ছন্দে রচিত এই কবিতাটিতে কবি পর্ব নির্মাণে প্রয়োজন অনুসারে স্থানীনতা গ্রহণ করেছেন। আবার ব্যতিক্রমী চরণ বিন্যাসের কারণেও ছন্দের দোলায় বিশেষত্ব যোজিত হয়েছে।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার” কবিতার ভূমিহীন কৃষিজীবীর কী ইচ্ছে জাগে?

ক. জেলে হয়ে মাছ ধরার

খ. সময়ের প্রতীক্ষায় থাকার

গ. চুপিসারে কথা বলার

ঘ. আকালের গল্ল বলার

২. ভূমিহীন কৃষিজীবী লোকটিকে ‘মাছরাঙা গামছা পরে একঠ্যাঙা বগের মতন’ কল্পনা করার কারণ হলো—

i. প্রাকৃতিক বৈরিতায় তার অসহায়ত্ব

ii. বিপর্যস্ততায় নবজীবনের আশাবাদ

iii. রূপান্তরের সাথে অভিযোজন প্রয়াস

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

কত কথা আজ মনে পড়ে তার, গরিবের ঘর তার,

ছেটোখাটো কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।

৩. উদ্দীপকে “ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার” কবিতায় যে ভবের প্রতিফলন ঘটেছে, তা হলো—

ক. বিলাসী জীবন

খ. সৎগ্রামশীলতা

গ. সুখের আশাবাদ

ঘ. দুঃখভারাক্রান্ত জীবন

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত চেতনার দিকটি যে চরণে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

ক. নদীর ধসের নিচে/বাতাসের মধ্যে আছে/কিছুটা আশ্রয়;

খ. আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে আছে/ভূমিহীন কৃষিজীবী,

গ. চোখের লবণ জমে চোখ জলে/শুধু জলে।

ঘ. ...মাছরাঙা গামছা পরে/একঠ্যাঙা বগের মতন চেয়ে থাকে।



সূজনশীল প্রশ্ন

গ্রামের পর গ্রাম কাল-কলেরায় উজাড়!

নিরীহ তালেব মাস্টারের বুকেও বজ্জ্ব পড়ল! কলেরায়

ছেলেটি মারা গেল বিনা পথে, বিনা শুশ্রষায়!

কাফনের কাপড় জোটেনি, তাই বিনা কাফনে

বাইশ বছরের বুকের মানিককে কবরে শুইয়ে দিয়েছি এখানে!

এই-ই শেষ নয়— শুনুন : বলি

মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিলাম পলাশতলী

সেখানেও আকাল! মানুষে মানুষ থায়।

তিনদিনের উপবাসী আর লজ্জাবদ্ধহীন হয়ে নিদারূণ ব্যথায়

দড়ি কলসি বেঁধে পুকুরের জলে ডুবে মরেছিল একদিন সন্ধ্যায়।

ক. “ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার” কবিতার ভূমিহীন কৃষিজীবী চিলাচালা ফতুয়ার মধ্যে বসে কী খায়?

খ. ‘সময়ের প্রতীক্ষায় থাকা শুধু’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. তালেব মাস্টারের জীবনচিত্র “ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার” কবিতার কৃষিজীবীর সাথে কোনদিক থেকে সাজুয়াপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাজুয়াপূর্ণ হলেও “ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার” কবিতার কৃষিজীবীর মতো তালেব মাস্টার অভিযোজন প্রয়াসী নন— এই উক্তির যৌক্তিকতা বিচার কর।



প্রত্যাবর্তনের লজ্জা

আল মাহমুদ

কবি-পরিচিতি

আল মাহমুদ ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জুলাই ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মির আবদুল শুকুর আল মাহমুদ। তাঁর পিতার নাম আবদুর রব মির ও মাতার নাম রওশন আরা মির। তিনি ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। দীর্ঘদিন তিনি সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ‘দৈনিক গণকষ্ট’ ও ‘দৈনিক কর্ণফুলী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। পরে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে যোগদান করেন এবং পরিচালকের পদ থেকে অবসরে যান।

আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ অনন্য এক জগৎ তৈরি করেন। সেই জগৎ যন্ত্রণাদন্ত শহরজীবন নিয়ে নয়—
স্মৃক-শ্যামল, প্রশান্ত গ্রামজীবন নিয়ে। গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির চিত্রায়ত রূপ নিজস্ব কাব্যভাষা ও সংগঠনে শিল্পিত
করে তোলেন কবি আল মাহমুদ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— কাব্যগ্রন্থ : ‘লোক-লোকান্তর’, ‘কালের
কলস’, ‘সোনালী কাবিন’, ‘মায়াবি পর্দা দুলে উঠোঁ’, ‘অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না’, ‘বখতিয়ারের ঘোড়া’, ‘আরব্য
রাজনীর রাজহাঁস’; শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ : ‘পাখির কাছে ফুলের কাছে’; উপন্যাস : ‘ডাঙ্কী’, ‘কবি ও কোলাহল’,
‘নিশিন্দা নারী’, ‘আগুনের মেয়ে’ ইত্যাদি; ছোটগল্প : ‘পানকৌড়ির রক্ত’, ‘সৌরভের কাছে পরাজিত’, ‘গঞ্জবণিক’।
তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সমালোচনা ভূষিত হন। তিনি ২০১৯ সালের
১৫ই ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

শেষ ট্রেন ধরবো বলে এক রকম ছুটতে ছুটতে স্টেশনে পৌঁছে দেখি
নীলবর্ণ আলোর সংকেত। হতাশার মতোন হঠাত
দারণ হইসেল দিয়ে গাঢ়ি ছেড়ে দিয়েছে।
যাদের সাথে, শহরে যাবার কথা ছিল তাদের উৎকর্ষিত মুখ
জানালায় উবুড় হয়ে আমাকে দেখছে। হাত নেড়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

আসার সময় আবো তাড়া দিয়েছিলেন, গোছাতে গোছাতেই
তোর সময় বয়ে যাবে, তুই আবার গাঢ়ি পাবি।
আমা বলছিলেন, আজ রাত না হয় বই নিয়েই বসে থাক
কত রাত তো অমনি থাকিস।
আমার ঘুম পেলো। এক নিঃস্পন্দন নিদায় আমি
নিহত হয়ে থাকলাম।

অথচ জাহানারা কোনদিন ট্রেন ফেল করে না। ফরহাদ
আখ ঘটা আগেই স্টেশনে পৌঁছে যায়। লাইলী
মালপত্র তুলে দিয়ে আগেই চাকরকে টিকিট কিনতে পাঠায়। নাহার
কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে আনন্দে ভাত পর্যন্ত খেতে পারে না।
আর আমি এদের ভাই
সাত মাইল হেঁটে শেষ রাতের গাঢ়ি হারিয়ে
এক অখ্যাত স্টেশনে কুয়াশায় কাঁপছি।

কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরবো ।
 শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে । চোখের পাতায়
 শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাত
 লাল সূর্য উঠে আসবে । পরাজিতের মতো আমার মুখের উপর রোদ
 নামলে, সামনে দেখবো পরিচিত নদী । ছড়ানো ছিটানো
 ঘরবাড়ি, গ্রাম । জলার দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে । তারপর
 দারুণ ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা ।
 কলার হোট বাগান ।

দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কাঁপছে । বৈঠকখানা থেকে আবরা
 একবার আমাকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে পড়তে থাকবেন,
 ফাবি আইয়ে আলা ই-রাবিকুমা তুকাঞ্জিবান... ।
 বাসি বাসন হাতে আম্মা আমাকে দেখে হেসে ফেলবেন ।
 ভালোই হলো তোর ফিরে আসা । তুই না থাকলে
 ঘরবাড়ি একেবারে কেমন শূন্য হয়ে যায় । হাত মুখ
 ধুয়ে আয় । নাস্তা পাঠাই ।
 আর আমি মাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লজ্জাকে
 ঘষে ঘষে তুলে ফেলবো ।

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|------------------------------|--|
| নীলবর্ণ আলোর সংকেত | — ট্রেন ছেড়ে দেবার সংকেত । |
| হতাশার মতোন....ছেড়ে দিয়েছে | — গাঢ়ি ধরতে না পারায় হতাশাহস্ত মনের অভিব্যক্তি । |
| উৎকর্ষিত | — উদ্ধিম, ব্যাকুল । |
| উপুড় | — উপুড় । |
| নিঃস্বপ্ন নিদ্রায়....থাকলাম | — স্বপ্নহীন নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকা । |
| শীতের বিন্দু | — শীতের শিশির । |
| দারুণ ভয়ের....আটচালা | — ট্রেন ধরতে না পারার ব্যর্থতা ও ফিরে আসার লজ্জায় এমন অনুভূতির জন্ম । |
| ফাবি আইয়ে.....তুকাঞ্জিবান | — অতএব, তোমরা উভয়ে তথা জিন ও ইনসান তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্থীকার করবে? |
| বাসি বাসন | — পূর্বরাতে বা পূর্বদিনে ব্যবহৃত, অপরিক্ষার থালা । |
| আমি মাকে.....তুলে ফেলব | — শহরে যেতে না পেরে ফিরে আসার ব্যর্থতা ও লজ্জা মায়ের আশ্রয়ে মুছে ফেলা । |



পাঠ-পরিচিতি

“প্রত্যাবর্তনের লজ্জা” কবিতাটি আল মাহমুদের ‘সোনালী কাবিন’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। সংলাপ এবং গল্প বঙ্গার ঢংয়ে কবিতাটি রচিত।

শহরে যাবার শেষ ট্রেনটি ধরার জন্য রেলস্টেশনে পৌছাতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। কবি দেখতে পেলেন, যাদের সঙ্গে একত্রে শহরে যাবার কথা ছিল তারা ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকে সাস্ত্রনা জানাচ্ছেন। ট্রেন ধরতে না পারার হতাশায় কবির মনে পড়ল বাবা-মায়ের কথাগুলো। নিজের ভাইবোনদের সতর্ক ও সচেতন প্রস্তুতির স্মৃতি ও কবির মনে জাগ্রত হলো। এক রকম পরাজয়ের ফ্লামি নিয়ে কবি সেই ভোররাতে বাড়ির পথে ফিরতে শুরু করলেন। রাতের অন্ধকার সরিয়ে সূর্যের আলো চোখে পড়তেই তিনি দেখতে পেলেন পরিচিত নদী, গ্রাম, নিজেদের আটচালা ঘর। কবির এই ফিরে আসা তার মাকে আনন্দিত করে তুললো। কবিও মাকে জড়িয়ে ধরে তার প্রত্যাবর্তনের লজ্জা মন থেকে মুছে ফেললেন। শহর বা নাগরিক জীবনের চেয়ে মাত্তুল্য গ্রামীণ সহজ জীবনই কবির জন্য পরম স্বত্ত্বি। তিনি শহরমুখী জীবনযাত্রায় খাপ খাওয়াতে না পারার ব্যর্থতাকে মুছে ফেলছেন মায়ের আশ্রয়ে। এই মা একই সঙ্গে প্রকৃতিরও প্রতিমূর্তি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’ কবিতায় কবি কীভাবে ঘরে ফিরবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে?

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ক. কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে | খ. চোখের পাতায় শিশির বিন্দু জমতে জমতে |
| গ. সাত মাইল পথ হেঁটে হেঁটে | ঘ. শিশিরে পাজামা ভিজিয়ে ভিজিয়ে |

২। ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’ বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ক. শেকড়ে ফেরার অভিযন্তি | খ. উন্মুক্ত হবার অনুশোচনা |
| গ. প্রকৃতির কাছে ধাকার আনন্দ | ঘ. নাগরিকজীবনের হতাশা-নৈরাশ্য |

উচ্চীপক্ষটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে
ডাক দিল যে গানে গানে।

৩। কবিতাংশে ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’ কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো—

- অবারিত প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য
- অস্তিত্বে শেকড়ে টান অনুভব
- প্রকৃতির সাথে জীবনের ঘনিষ্ঠতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

৮। কবি আল মাহমুদ উক্ত ভাবের বহিষ্প্রকাশ ঘটিয়েছেন কোন চরণে?

ক. হতাশার মতোন হঠাৎ দারুণ ছইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে

খ. এক নিঃস্বপ্ন নিহায় আমি নিহত হয়ে থাকলাম

গ. তারপর দারুণ ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা

ঘ. কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরবো

সূজনশীল প্রশ্ন

উদ্ধীপক-১

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা !

মা গো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা !

কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয় তোর রতনরাশি—

আমি জানি গো তোর মূল্য জানি, পরের আদর কাঢ়ব না মা !

উদ্ধীপক-২

মানের আশে দেশ বিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে

তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা, ভুলতে সে যে পারব না মা

ধনে মানে সোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—

ওমা ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে, কারো কাছেই হারব না মা !

ক. প্রত্যাবর্তিত কবিকে দেখে তার বাবা কী পড়বেন?

খ. ‘আর আমি মাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লজ্জাকে ঘষে ঘষে তুলে ফেলবো।’— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্ধীপক-২ এর ‘ধনে মানে সোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়’ চরণটিতে ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’
কবিতার যে বিশেষ দিকের ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্ধীপক-১ ও উদ্ধীপক-২ মিলে ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’ কবিতার ভাববস্তু প্রকাশে সক্ষম কি না? তোমার
যুক্তিশাহ মতামত দাও।



মানুষ সকল সত্য দিলওয়ার

কবি-পরিচিতি

দিলওয়ার ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জানুয়ারি সিলেট শহরসংলগ্ন সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী ভার্থখলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম দিলওয়ার খান। কিন্তু কবি-জীবনের শুরু থেকেই তিনি জনমনের সাথে একাত্তরা প্রকাশ করে পারিবারিক ‘খান’ পদবি বর্জন করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান, জননী রহিমজোসা। দিলওয়ার সাধারণে ‘গণমানুষের কবি’ হিসেবে সমধিক পরিচিত। পেশাজীবনে প্রথমে দুইমাস শিক্ষকতা করলেও ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ‘দৈনিক সংবাদ’ পত্রিকায় এবং ১৯৭৩-৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘দৈনিক গণকঠে’ সহকারী সম্পাদক হিসেবে তিনি কাজ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে শুই পেশা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। তিনি ছিলেন মূলত সার্বক্ষণিক কবি-লেখক ও ছড়াকার। তাঁর কবিতার মূল সুর দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি আস্থা ও দায়বন্ধতা। গণমানবের মুক্তি তাঁর লক্ষ্য; বিভেদবৃক্ষ কল্যাণী পৃথিবীর তিনি স্বাপ্নিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘জিজ্ঞাসা’ প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : ‘ঐকতান’, ‘উচ্চিন্ন উচ্চাস’, ‘অনিষ্ট সন্টো’, ‘রক্তে আমার অনাদি অঙ্গ’, ‘সপ্তিশব্দী রইবো সঙ্গীব’, ‘দুই মেরু দুই ডানা’, ‘অনন্তীত পঞ্জক্রিয়ালা’। তাঁর প্রবক্ষ গ্রন্থ : ‘বাংলাদেশ জন্ম না নিলে’ এবং ছড়াগ্রন্থ : ‘দিলওয়ারের শতছড়া’, ‘ছড়ায় আ আ ক থ’। সাহিত্যসাধনার শীকৃতিশৱ্রপ তিনি লাভ করেছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ‘একুশে পদক’।
দিলওয়ার ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

ওরে মন কাল্পা কেন? যন্ত্রণায় কেন জর্জরিত?
মৃত্যুর পাশাগ বুকে প্রার্থনার বাণী ব্যর্থ হয়ে
অবিশ্রান্ত ফিরে আসে। চলে কাল নির্ণিষ্ট নির্ভয়ে।
তুমি কি জানো না মন আমরা কালের হাতে ধৃত?

বুঁধি তাই মৃত্যু তার অন্য এক অর্থ নিয়ে আসে;
অনিবাগ দীঘি যার অম্বতের পুত্রদের পথে
সমস্ত যন্ত্রণা মুছে বহমান দুর্নিবার শ্রোতে,
সেই স্বপ্নে তারাফুল ঝরে পড়ে মৃত্যিকার ঘাসে।

যে পথে গিয়েছে তারা কালিদাস, দান্তে ও হোমার
অজেয় রবীন্দ্রনাথ, বেদব্যাস, খৈয়াম, হাফিজ,
সুকান্ত-মিল্টন-শেলী অকাতরে চেলে মনসিজ
সেই পথে গেছে সেও। এই শান্তি আমার-তোমার।
হে মন প্রফুল্ল হও। শোনো তার মৃত্যুহীন গান
মানুষ সকল সত্য। এই সত্যে আমি অনিবাগ।

শব্দার্থ ও টীকা

- জর্জরিত** — আক্রান্ত; কাতর; পীড়িত।
- নির্লিঙ্গ** — নিরাসজ্ঞ; আসঙ্গিকীয়।
- ধৃত** — ধারণ করা হয়েছে যা; ধারণকৃত।
- অনিবাগ** — নেভে না বা নির্বাপিত হয় না যা; জলন্ত।
- অমৃতের পুত্র** — যার মৃত্যু নেই; অমর; পবিত্র ‘বেদ’-এ ‘মানবগণকে’ অমৃতের পুত্র (অমৃতস্য পুত্র) বলা হয়েছে।
- কালিদাস** — চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বুকে তিনি জীবিত ছিলেন। ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ ও ‘মেঘদূত’ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক ও কাব্য।
- দান্তে** — বিখ্যাত ইতালীয় কবি দান্তে (Dante)। ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্ম। এই কবির জন্ম ১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দে। ‘দ্য ডিভাইন কমেডি’ নামক মহাকাব্য তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি।
- হোমার** — প্রাচীন গ্রিক ভাষা ও সাহিত্যের মহাকবি। প্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী তাঁর সময়কাল। ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’ তাঁর রচিত বিখ্যাত মহাকাব্য।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** — বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তিনি ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের জন্ম ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- বেদব্যাস** — কৃষ্ণ দৈপ্যায়ন ব্যাস, ‘মহাভারত’ মহাকাব্যের রচয়িতা।
- খৈয়াম** — ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খ্রিষ্টাব্দ)। পারস্য দেশের গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও কবি। কবি হিসেবে তিনি বিশ্বনন্দিত। ‘রুবাইয়াং-ই ওমর খৈয়াম’ তাঁর অনন্য কাব্যগ্রন্থ।
- হাফিজ** — খাজা শামস-উদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ; পারস্য দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। বুলবুল-ই-শিরাজ উপাধিতে ভূষিত এই কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা-সংকলনের নাম ‘দিউয়ান-ই-হাফিজ’।
- সুকান্ত** — সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)। বাংলা সাহিত্যের প্রগতিশীল ধারার জনপ্রিয় কবি। ‘ছাড়পত্র’ তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য।
- মিল্টন** — জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)। বিখ্যাত ইংরেজ কবি। ‘প্যারাডাইস লস্ট’ তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।
- শেলী** — পার্সি বিশি শেলী (১৭৯২-১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ)। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। ‘ওড টু দি ওয়েস্ট



‘ডাইল’ এবং ‘প্রমিথিউস আনবাউচ’ যথাক্রমে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ও কাব্য নাটক।

୪୮

— মন থেকে জাত ।

পাঠ-পরিচিতি

“মানুষ সকল সত্য” কবিতাটি ‘দিলওয়ার’ রচনাসমগ্র (২য় খণ্ড) থেকে গৃহীত হয়েছে। এ কবিতায় কবি দিলওয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ যে মৃত্যুকে পরাবৃত্ত করে অমরত্ব অর্জন করতে সক্ষম সেই জীবনসত্য ব্যক্ত করেছেন। প্রার্থনার বাণীকে ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যু ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু এই মৃত্যুর গভীরেই নিহিত ধাকে ভিন্ন এক অর্থ। অমৃতস্য পুত্রের মতো সৃষ্টিশীল প্রতিভার সৃষ্টিসঙ্গার মৃত্যুহীন তথা অমরত্বের বার্তা নিয়ে বেঁচে থাকে। এই বেঁচে থাকার মধ্যেই কবি প্রত্যক্ষ করেন পরম মানবসত্য- মানুষ সকল সত্য, মানুষের মৃত্যুহীন গান।

ବିଭିନ୍ନରୀତିରେ ପ୍ରକାଶ

১। কবির ঘটে আমরা কীসের হাতে ধৃত?

- | | |
|-----------|---------------------|
| ক. কালের | খ. মৃত্যুর |
| গ. যত্নণা | ঘ. দৰিচাবাৰ স্নোতেৰ |

২। ‘অযত্তের পুত্র’ বলতে “মানুষ সকল সত্য” কবিতায় কাকে বোঝানো হয়েছে?

- ক. অনিবার্য দীপ্তিকে
গ. স্মরণীয়-বৰণীয় বাক্তি-বৰ্গকে

খ. সাধাৱণ মানুষকে
ঘ. কবি-সাহিত্যিককে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। কবিতাখণ্ডের ভাব “মানুষ সকল সত্য” কবিতার যে চরণে ফুটে উঠেছে তা হলো—

- ক. চলে কাল নিলিঙ্গ নির্ভয়ে।
খ. সমস্ত যন্ত্রণা মুছে বহুমান দুর্নিবার শ্রোতে,
গ. তুমি কি জানো না মন আমরা কালের হাতে ধূত?
ঘ. যে পথে গিয়েছে তারা কালিদাস, দাস্তে ও হোমার
ফর্ম-৪৪, সাহিত্যপাঠ একাদশ, দ্বাদশ ও আলিম প্রেরণ



৪। ফুটে ওঠা ভাবটি হলো—

- i. সময়ের প্রবহমানতা
- ii. কালের নির্লিঙ্গতা
- iii. মৃত্যুর অনিবার্যতা

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে
 মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
 এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
 জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই ।
 ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত
 বিরহ মিলন কর হাসি অশ্রুময়
 মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
 যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়

ক. কবি দিলওয়ার কোন সত্যে অনিবার্য?

খ. ‘শেনো তার মৃত্যুহীন গান’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. উদ্দীপকে “মানুষ সকল সত্য” কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উদ্দীপকটি “মানুষ সকল সত্য” কবিতার সামগ্রিকভাবে ধারণ করতে পেরেছে কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও ।

ঝ্যাক-আউটের পূর্ণিমায় শহীদ কাদরী

কবি-পরিচিতি

শহীদ কাদরী ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খালেদ-ইবনে-আহমদ কাদরী। শহীদ কাদরী গত শতকের ঘাটের দশকের অন্যতম প্রধান কবি। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাস-জীবন যাপন করছেন। সেখানে তিনি একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন।

সুগভীর মননের অধিকারী শহীদ কাদরীর মূল প্রবণতা বৈশ্বিক ব্যঙ্গনার আশ্রয়ে কবিতায় প্রকাশযোগ্য করে তোলা। বিশেষ করে ঘাটের দশকের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বোপার্জিত বোধকে প্রকাশ করার উপায় হিসেবে তিনি রূপক-প্রতীকের আড়ালকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্য শহীদ কাদরীর কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ। কবিতায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তিনি ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : ‘উত্তরাধিকার’ (১৯৬৭), ‘তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা’ (১৯৭৪), ‘কোথাও কোনো ক্রস্তন নেই’ (১৯৭৮) প্রভৃতি।

একটি আঁটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ

আমার কনিষ্ঠ আঙুলে, কখনও উদ্ধত তলোয়ারের মতো

দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোর কাটা

জলজলে রূপ জ্যোৎস্নায়। তারপর তোমার উন্মুক্ত প্রান্তরে

কাতারে কাতারে কত অচেনা শিবির, কুচকাওয়াজের ধৰনি,

যার আড়ালে তুমি অবিচল, আটুট, চিরকাল।

যদিও বধ্যভূমি হলো সারাদেশ— রক্তপাতে আর্তনাদে

হঠাতে হত্যায় ভরে গেল বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর,

অথচ সেই প্রান্তরেই একদা ধাবমান জেত্রার মতো

জীবনানন্দের নরম শরীর ছুঁয়ে উর্ধ্বশ্বাস বাতাস বয়েছে।

এখন সেই বাতাসে শুধু বালসে যাওয়া স্বজনের

রক্তমাখসের দ্রাণ এবং ঘরে ফিরবার ব্যাকুল প্ররোচনা।

শৃঙ্খলিত বিদেশির পতাকার নিচে এতকাল ছিল যারা

জড়োসড়ো, মগজের কুণ্ডলীকৃত মেঘে পিঙ্গলের প্রোজ্জল আদল

শীতরাতে এনেছিল ধৰ্মনীতে অন্য এক আকাঙ্ক্ষার তাপ।

আবাল্য তোমার যে নিসর্গ ছিল নিদারঞ্জন নির্বিকার,

সুরক্ষিত দুর্গের মতন আমাদের প্রতিরোধে সে হলো সহায়,

ঝ্যাক-আউট অঘাত করে তুমি দিগন্তে জ্বলে দিলে

বিদ্রোহী পূর্ণিমা। আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি;

আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠোন পার হয়ে

নিজেদের ঘরে।



শব্দার্থ ও টীকা

ব্র্যাক-আউট

- নিষ্পন্দীপ। আলো বাইরে আনতে না দেওয়া। সাধারণত যুদ্ধ কিংবা জরুরি অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট এলাকা অঙ্ককারে ঢেকে দেওয়ার কৌশল।

উদ্ভিত তলোয়ারের ঘতো

- স্বদেশের প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ যে ঘাস, কবি তার ভিতরেও প্রতিবাদের আলো, প্রতিরোধের সাহসকে অনুভব করেছেন।

কাতারে কাতারে কত

- শক্তির আক্রমণ ও তাদের অন্তের মহড়া। শক্তি কবলিত দেশের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

জীবনানন্দের নরম

- জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এদেশের মানুষ ও প্রকৃতির কোমলতার প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। সেই কাব্যপ্রেরণা শহীদ কাদরীর চেতনায়ও গভীরভাবে ব্যাপ্ত। তাই তিনি জীবনানন্দের চোখ দিয়ে দেখা সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ আবহমান ঝুপসী বাহ্লার স্মৃতিচারণ করেছেন এই কবিতায়।

শরীর ছুঁয়ে উৎরশ্বাস

বাতাস বয়েছে

- কবি মানব-মন্তিকের পঠনকে কুঙ্গলী পাকানো মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একই সঙ্গে এই মেঘ বিপদ ও শক্তির চিহ্ন বহন করে। এই বিপদ থেকে মুক্ত হতে প্রয়োজন প্রতিরোধ – সশন্ত লড়াই। এই লড়াই চালিয়ে যেতে যত না শরীরিক শক্তির প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার মানসিক শক্তির। তাই কবির কল্পনায় মন্তিক নিজেই হয়ে উঠে অস্ত, পরিষহ করে পিণ্ডলের আকার। এই বোধ ও চৈতন্যের অন্তরে সঙ্গী করেই এদেশের মানুষ বাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।

মগজের কুঙ্গলীকৃত

মেঘে পিণ্ডলের

প্রোজ্জল আদল

- কবি মানব-মন্তিকের পঠনকে কুঙ্গলী পাকানো মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একই সঙ্গে এই মেঘ বিপদ ও শক্তির চিহ্ন বহন করে। এই বিপদ থেকে মুক্ত হতে প্রয়োজন প্রতিরোধ – সশন্ত লড়াই। এই লড়াই চালিয়ে যেতে যত না শরীরিক শক্তির প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার মানসিক শক্তির। তাই কবির কল্পনায় মন্তিক নিজেই হয়ে উঠে অস্ত, পরিষহ করে পিণ্ডলের আকার। এই বোধ ও চৈতন্যের অন্তরে সঙ্গী করেই এদেশের মানুষ বাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।
- যে তিথিতে চাঁদের ঘোলকলা পূর্ণ হয়। পূর্ণিমার চাঁদের আলো বোঝাতে।
- আশ্চিনা। কবিতায় ‘নিজস্ব উর্ঠোন’ বলতে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজের করে পাওয়া স্বদেশকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি শহীদ কাদরীর ‘নির্বাচিত কবিতা’ প্রস্তুত থেকে সংকলন করা হয়েছে। একান্তরের যুদ্ধ-বাস্তবতাকে কবি তাঁর নিজস্ব উপলক্ষ্মি ব্যক্তিকৰ্মী দ্যোতনায় উপস্থাপন করেছেন এই কবিতায়। আক্রান্ত স্বদেশ নিজেই এই কবিতায় এক সাহসী যোদ্ধা। সে প্রাকৃতিক কৌশলে তার সহযোগিদের যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করে; শক্তির বিরুদ্ধে গড়ে তোলে অলঝ্যানীয় প্রতিরোধ। কবি এই সহযোগিদেরই একজন। তাই তিনি স্বদেশকে একটি



আংটির মতো করে আপন কনিষ্ঠ আঙুলে ধারণ করেন; স্বদেশের সঙ্গে গড়ে তোলেন নিবিড় এক সম্পর্ক। কবিতায় উল্লেখিত “কনি” আঙুল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীন ছিসে হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে পাঁচ দেবতাকে বোঝানো হতো; যেমন : তর্জনী দিয়ে বোঝানো হতো দেবরাজ জিউসকে, বৃক্ষাঙ্গুল দিয়ে বোঝানো হতো সমুদ্র দেবতা পসিডনকে। ঠিক একইভাবে শীক যুদ্ধ দেবতা এরিসকে প্রতীকায়িত করে এই “কনি” আঙুল; যা কেবল লড়াই নয়, একই সঙ্গে নিরাপত্তা প্রদানেরও প্রতীক। আর এই ব্যঙ্গনাকেই কবি আলোচ্য কবিতায় ব্যবহার করেছেন। স্বদেশকে কবি এখানে আংটির সঙ্গে তুলনা করেছেন আর ‘কনি আঙুল’ দ্বারা প্রতীকায়িত এরিসের মতোই অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দেশ-মাতৃকার নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। একই সঙ্গে, এই ‘আংটি’ শব্দবক্ষ দ্বারা উপর্যুক্ত স্বদেশ হচ্ছে কবির অভিজ্ঞান তথ্য পরিচয়-চিহ্ন। কেননা, স্বদেশকে দিয়েই তো বিশে আমাদের পরিচয় চিহ্নিত হয়। মাতৃভূমিকে নিয়ে কবির এই বহুমাত্রিক অনুভব ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। যাকে তিনি তুলনা করেছেন আংটির সঙ্গে, পরে তাকেই আবার তুলনা করছেন জেত্রার সঙ্গে। প্রাণিজগতে জেত্রা শারীরিক গঠনে ও স্বভাবে অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত; সৌন্দর্য, সততা আর স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে পরিচিত। এদের দেহের সাদা-কালো ডোরাকাটা বৈপরীত্যের সম্মিলনকে নির্দেশ করে; ঠিক যেমন এদেশেও নানা ধর্ম-বর্গের মানুষ অনায়াসে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। একই সঙ্গে জেত্রা অত্যন্ত সামাজিক এবং একের বিপর্দে অন্যের এগিয়ে আসার প্রবণতার কারণে এরা বিশেষভাবে খ্যাত। বাংলা ভূখণ্ডেও এই সামাজিক সম্প্রীতি দুরাত্মীত কাল থেকেই সুলভ। তাই কবি অত্যন্ত সচেতনভাবে স্বদেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেন জেত্রার ব্যক্তিগতী ব্যক্তিত্বময়তাকে।

এদেশে সামরিক আঘাসন, পাকিস্তানি শোষকদের নির্মম অভ্যাচার, লাখো মানুষের হত্যা, নির্যাতন – এত সবকিছুর পরেও কবির মহিমাবিত স্বদেশ অটল অচঞ্চল হয়ে জেগে থাকে। লাখো মৃত্যুর বেদনা এদেশের মানুষকে দমিয়ে ফেলতে পারেনি। পরাধীনতার শিকলে ধারা বাঁধা পড়েছিল দীর্ঘদিন, তারাই মুক্তির বোধে উজ্জীবিত হয়েছে; মগজের অন্দের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে হাতে তুলে নিয়েছে যুদ্ধজয়ের আয়ুধ। মুক্তিসংগ্রামের এই পথে কবির কল্পনায় বাংলার নিসর্গও আবির্ভূত হয়েছে একজন সপ্তাশ মুক্তিযোদ্ধার বেশে। মুক্তিযুদ্ধের এই অমর অভিযান্ত্রিক কেবল কবিতাটির বক্তব্যে নয়, এর আঙ্গিক সৌকর্যেও গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই ‘কনি আঙুল’, ‘জেত্রা’, ‘জীবনানন্দের কোমল শরীর’, ‘বিদ্রোহী পূর্ণিমা’ প্রভৃতি শব্দবক্ষের আশ্রয়ে কবি প্রতীকের মালা গাঁথেন। আবার এরই সঙ্গে তিনি নান্দনিক চিত্রকলের খজু সমাহারকে সমন্বিত করেন। তাই ‘বাতাসে শুধু ঝলসে যাওয়া স্বজনের রক্তমাংসের স্বাণ’, ‘মগজের কুণ্ডলীকৃত মেঘে পিণ্ডলের প্রোজ্বল আদল’, ‘আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠান পার হয়ে নিজেদের ঘরে’— এসব পঞ্জকি পাঠক হৃদয়ে ইন্দ্রিয়াতীত বোধকে উন্নীপিত করে। এর মধ্য দিয়ে কবিতাটি হয়ে উঠে বিশেষভাবে নান্দনিকতাখন্দ।

কবিতাটি অসমপর্ব বিশিষ্ট এবং অক্ষরবৃক্ষের চালে গদ্যছন্দে রচিত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়” কোন কবির নাম উল্লেখিত হয়েছে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

খ. জীবনানন্দ দাশের

গ. আল মাহমুদের

ঘ. মহাদেব সাহার

২. “ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়” যে কারণে জেন্ট্রার প্রসঙ্গ আনা হয়েছে তা হলো—

- i. গতিময় সৌন্দর্য প্রকাশে
- ii. স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে
- iii. বাংলার চিরায়ত সৌন্দর্য বোঝাতে

নিচের কোনটি ঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উভয় দাও।

বাংলার নগর বন্দর গঙ্গা বাষটি হাজার গ্রাম

ধর্মসম্মত থেকে সাত কোটি ফুল

হয়ে ফোটে।

৩. উদ্দীপকে “ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়” কবিতার কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে?

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ক. অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ | খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ |
| গ. পাকিস্তানি বাহিনীর অভ্যাচার | ঘ. স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন |

৪. উক্ত দিকটি যে অংশে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

- | | |
|---|--|
| ক. যদিও বধ্যভূমি হলো সারাদেশ— রক্তপাতে আর্তনাদে | |
| খ. এখন সেই বাতাসে শুধু বালসে যাওয়া স্বজনের/রক্তমাখসের দ্রাঘ | |
| গ. মগজের কুণ্ডলীকৃত মেঘে পিতলের প্রোজ্ঞল আদল | |
| ঘ. ব্ল্যাক-আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জ্বলে দিলে/বিদ্রোহী পূর্ণিমা | |

সূজনশীল প্রশ্ন

মিলিটারির দল বৃন্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপরে অনেক পুরনো বৃক্ষরাজি তার বিশাল বিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছায়াময় করে জ্বালাগাটিকে মায়াময় করে তুলেছে। কয়েকটি শাখা ভেঙে ঝুলে আছে, কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি। সেই বৃন্তের মাঝখানে হাত বাঁধা সজীবকে টানতে টানতে এনে দাঁড় করানো হলো। সজীবের নাক-মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। তাকে জিজেস করা হচ্ছে, মুক্তিবাহিনী কোথায় পালিয়ে গেছে? তার একই জবাব, তিনি কিছুই বলবেন না। বন্দুকের নলটা কগালের ঠিক মাঝখানটায়। তাকে শেষ সুযোগ দেওয়া হয়। সজীব বলেন, ‘আমার মতো সাধারণ সজীবের যত্নতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু মুক্তিফৌজদের জীবনের দাম আছে। মুক্তিফৌজ না হলে তোমাদের মারবে কে? বেঁচে থাক তারা।’ শুলিটা কপাল ভেদ করে বেরিয়ে যায়। মাটিতে ঝুঁটিয়ে পড়েন সজীব। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিকট শব্দে ঝুলত কয়েকটি বিশাল শাখা পাকিস্তানি বাহিনীর মাঝার শুপর পড়ে।

- | | |
|---|--|
| ক. “ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়” কবিতায় উর্ধ্বর্ধাস বাতাস বয়েছে কিসের মতো? | |
| খ. বাঙালির ‘নিজস্ব উঠোন পার হয়ে নিজেদের ঘরে’ ফেরার কারণ ব্যাখ্যা কর। | |
| গ. উদ্দীপকে “ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়” কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ কর। | |
| ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটি “ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়” কবিতার মূল চেতনাকে আরও শান্তিত করেছে— মন্তব্যটির যাখার্থ্য বিচার কর। | |



শান্তির গান মহাদেব সাহা

কবি-পরিচিতি

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি মহাদেব সাহা ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি পাবনা জেলার ধনমঢ়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গদাধর সাহা এবং মায়ের নাম বিরাজমোহিনী সাহা। কবির শিক্ষাজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে বগুড়া এবং রাজশাহীতে। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে এমএ ডিপ্রি অর্জন করেন।

মহাদেব সাহার কবিতা মানবের সুখ ও দুঃখের এক চলমান উপাখ্যান। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, রাজনীতি-মনস্কতা মহাদেব সাহাকে টেনে আনে মাটি ও মানুষের কাছাকাছি। তাঁর উত্তোল্যমোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, ‘এই গৃহ এই সন্ধ্যাস’, ‘মানব এসেছি কাহে’, ‘চাই বিষ অমরতা’, ‘ফুল কই শুধু অন্ত্রের উল্লাস’, ‘কোথা প্রেম কোথা সে বিদ্রোহ’, ‘বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ’, ‘একবার নিজের কাছে যাই’ প্রভৃতি। তিনি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদকসহ আরও বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই
আমরা এশিয়ার কৃষক
এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই
আমরা আফ্রিকার শ্রমিক
এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই
আমরা ইউরোপের শিশু
আমরা শান্তি চাই;
আমাদের সকলের সমবেত প্রার্থনা আজ— শান্তি।
এই শান্তির জন্যে মিউনিখ শহরে তোলপাড় করেছি আমরা
এই শান্তির জন্যে ইতালির রাজপথে করেছি দীর্ঘ মিছিল
এই শান্তির জন্যে নিউইয়র্ক শহরে বিক্ষোভ করেছি অসংখ্য
মানুষ;
এই শান্তির জন্যে আমরা আফ্রিকার শিশু
প্যালেস্টাইনের কিশোর আর নামিবিয়ার যুবক
কতো বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি,
আবার এই শান্তির জন্যে বাংলার দুষ্পাখিনী মায়ের চোখে
ঘুম নেই।

সবুজ শস্যক্ষেত, সদ্যফোটা ফুল ও শিশুর
হাসির জন্মে

পৃথিবী জুড়ে আমরা চাই শান্তিকল্যাণ।
শান্তি চাই যারা শিশুদের ভালোবাসি
শান্তি চাই যারা রাঙা গোলাপ ভালোবাসি;
শান্তি চাই যারা লুমুম্বা, আলেন্দে ও শেখ মুজিবের
নিষ্ঠুর মৃত্যুর জন্য কাঁদি
শান্তি চাই যারা পিকাসোর গোঁয়ের্নিকার কথা ভাবি
এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই—
শিশুদের পদধরনির মতো শান্তি
বকুল ঝরে পড়ার মতো শান্তি
রঞ্জনীগঙ্কার খোলা পাপড়ির মতো শান্তি।
আমরা হিরোশিমা-নাগাসাকির ব্যথিত আত্মা
আমরা শান্তি চাই;
আমরা ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের
স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদ
আমরা শান্তি চাই;
আমরা শোকাত্ত মায়ের চোখের জল
বোনের ক্রন্দন, স্তুর শোকাশ—
আমরা শান্তি চাই;
আমরা কবিতা ভালোবাসি
আমরা শান্তি চাই;
আমরা শিল্প ও জীবন ভালোবাসি
আমরা শান্তি চাই;
আমরা এখনো মানুষের হৃদয় ও মনুষ্যত্বে
সমান বিশ্বাসী
আমরা শান্তি চাই।

[সংক্ষেপিত]



শব্দার্থ ও টিকা

মিউনিষ্প

- জার্মানির বায়ার্ন রাজ্যের রাজধানী। জার্মান ভাষায় শহরটির নামের উচ্চারণ মুনশেন। শহরটি ইসার নদীর তীরে বেভারীয় আল্লসের উত্তরে অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসময়ে হিটলারের বিরুদ্ধে এই শহরে ছাত্র ও শিক্ষকরা এক অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

নিউইয়র্ক

- যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নিউইয়র্ক রাজ্যের সবচেয়ে বেশি জন-অধ্যুষিত মহানগর। জাতিসংঘের সদর দপ্তর ইওয়াতে এ মহানগর বিশ্ব মানবের মিলন কেন্দ্রে পরিণত।

প্যালেসটাইন

- আরবি উচ্চারণে ফিলিস্তিন। ভূমধ্যসাগর এবং জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। ইসরাইলের সঙ্গে এখনও এই অঞ্চলের জনগণের যুদ্ধ চলছে।

নামিবিয়া

- আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি দেশ। দক্ষিণ-আফ্রিকার শাসনের বিরুদ্ধে প্রায় চবিশ বছরব্যাপী দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধের পর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দেশটি স্বাধীন হয়।

লুয়ুর্বা

- প্যাট্রিস এমেরি লুয়ুর্বা; জন্ম দোসরা জুলাই ১৯২৫, মৃত্যু ১৭ই জানুয়ারি ১৯৬১। আফ্রিকার দেশ কঙ্গোর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা এবং দেশটির প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতা লাভের মাত্র বাবো সঙ্গাহ পরে আন্তর্জাতিক ঘড়িয়ের শিকার হয়ে তিনি নিহত হন।

আলেন্দে

- সালভাদর গুইলার্মো আলেন্দে গোসেন্স; জন্ম ২৬এ জুন ১৯০৮ এবং মৃত্যু ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। চিলির বামপন্থী নেতা এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম মার্কসবাদী রাষ্ট্রপতি। দেশ পরিচালনার নীতিসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং সেনাবাহিনীর এক অভ্যর্থনে বন্দি হন। বন্দি অবস্থাতেই তিনি তাঁর শেষ ভাষণ দেন এবং পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে হত্যা করা হয়।

পিকাসো

- পাবলো রুইজ ই পিকাসো; জন্ম ২৫এ অক্টোবর ১৮৮১ এবং মৃত্যু ৮ই এপ্রিল ১৯৭৩। বিশ শতকের বিখ্যাত স্পেনীয় চিত্রশিল্পী। বিশ শতকের অন্যতম শিল্প-আন্দোলন কিউবিজমের অন্যতম প্রবক্তা। ওই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল আঁকা ছবিতে বিগৃহতা সঞ্চার এবং ত্রিমাত্রিকতা যোজনা করা, যার সাহায্যে একটি ছবিকে বহু দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করা যায়।

গ্যোর্নিকা

- পিকাসোর একটি বিখ্যাত ছবি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে গৃহযুদ্ধ চলাকালে উত্তর স্পেনের একটি ছোট শহর গ্যোর্নিকায় জার্মান ও ইতালির মদদে বোমা হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই ছবিটি তিনি আঁকেন। ছবিটিতে যুদ্ধের মর্মান্তিকতা এবং সাধারণ মানুষের যত্নগা ও অসহায়তাকে তুলে ধরা হয়।



হিরোশিমা-নাগাসাকি

- জাপানের দুটি শহর। শহর দুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পারমাণবিক বোমার আঘাতে বিহ্বস্ত হয়।

ভিয়েতনাম

- ইন্দোচীন উপদ্বীপের অংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে পূর্বে অবস্থিত দেশ। বহু বছরের লড়াইয়ের ইতিহাস রয়েছে দেশটির। একসময় উভর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম দুইটি পৃথক অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর ১৯৭৬ সালে এই দুই অংশ এক হয়ে যায়।

পাঠ-পরিচিতি

“শান্তির গান” কবিতাটি কবি মহাদেব সাহার ‘ফুল কই শুধু অন্ত্রের উল্লাস’ (১৯৮৪) গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী মানুষের জন্য শান্তির অন্তর্হীন প্রত্যাশা নিয়ে কবি যে গান রচনা করে চলেন অবিরাম, তারই দ্যোতনা বহন করে আলোচ্য কবিতাটি। এ কবিতায় কবি ধাপে ধাপে তুলে ধরেছেন—কাদের জন্য এই শান্তি, কেমন করে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে, শান্তিকামী এই মানুষগুলোর মনস্তত্ত্বই বা কেমন। এক কথায় বলা যায় যে, কবির এই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা মূলত মেহনতি মানুষের জন্য, শিশুদের জন্য, মনুষ্যত্ববোধে উদ্বৃষ্ট সকলের জন্য। তাই কবি এশিয়ার কৃষক, আফ্রিকার শ্রমিক, ইউরোপের শিশু—সকলকে এই শান্তি-পতাকার তলে সমবেত করতে চান। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে কবি এবং কবির মতো মানুষেরা লড়াই করেন; প্রতিবাদের বাড় তোলেন মিউনিখ, নিউইয়র্কসহ ইতালির বিভিন্ন শহরের পথে পথে। কিন্তু শান্তি বিরোধীরাও থেমে থাকে না। তারা হয়ে ওঠে আরও হিন্দু, বাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর। এইসব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে, অশান্তির গর্জনকে থামিয়ে দিতে প্রয়োজন হয় সতর্ক প্রহরার। তাই যুগে যুগে আফ্রিকার শিশু, প্যালেস্টাইনের কিশোর, নামিবিয়ার যুবক এমনকি বাংলাদেশের দামাল মুক্তিযোদ্ধারা নির্বুঝ রাত জেগে হয়ে ওঠে শান্তির প্রহরী। একান্তরে মুক্তিযোদ্ধারা যেমন ‘একটি ফুলকে’ বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করেছিল, তেমনি এই শান্তির সেনানীরা ‘শস্যক্ষেত, সদ্যক্ষেতা ফুল, শিশুর হাসির জন্যে’ শান্তি চায়। এই শান্তির পক্ষের মানুষগুলোর মন হয় কোমল, হৃদয়জুড়ে থাকে অফুরান আবেগ। তাই তারা লুম্বু, আলেন্দে, শেখ মুজিবের নির্মম হত্যাকাণ্ডে অঙ্গসিক্ত হয়, পিকাসোর গ্যোর্নিকা তাদের আবেগাপুত করে।

কবিতাটি বিবৃতিধৰ্মী; বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কবি একের পর এক স্বভাবোক্তি করে চলেন। কেননা, কবি জানেন, প্রতিবাদের কথা, প্রত্যাশার কথা বলতে হয় সরাসরি স্পষ্টভাবে। তিনিটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে বলা যায়, অলংকারসমৃদ্ধ কবিতা রচনার প্রচল রীতি থেকে মহাদেব সাহা এই কবিতায় বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। যা তিনি বলতে চান তাতে কোনো আড়াল রাখার পক্ষে তিনি নন। কবি মানুষের দুঃখের কথা বেদনার কথা আশার কথা প্রত্যাশার কথা তুলে ধরার জন্য গদ্দের সহজ ভঙ্গি কবিতায় ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কবিতাটিকে নিবিড়ভাবে বাস্তবধনিষ্ঠ করে তুলতে তিনি ব্যবহার করেন অনেক ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ। পৃথিবীর চেনা ভূগোলকে তিনি কাব্যিক পেলবতায় পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন। আর এরই সঙ্গে কবি অন্তর্বর্যন ঘটান ‘বকুলের ঝারে পড়ার মতো শান্তি’, ‘রঞ্জনীগঙ্গার খোলা পাপড়ির মতো শান্তি’— এরকম উপমামতিত নান্দনিক আবহসমৃদ্ধ পঞ্জক্ষিমালা। অভাবে কবিতাটি বিষয়ে ও আঙিকে বিশেষ তাৎপর্যবহু হয়ে ওঠে।

কবিতাটি গদ্যছন্দের চাল অনুসরণ করে রচিত। অন্ত্যমিলবিহীন ছোটবড় পঞ্জক্ষিতে কবিতাটির কাঠামো গড়ে উঠেছে।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “শান্তির গান” কবিতায় কার চোখে ঘূম নেই?

ক. আফ্রিকার শিশুর

খ. প্যালেস্টাইল কিশোরের

গ. বাংলার দুঃখিনী মায়ের

ঘ. নামিবিয়ার যুবকের

২. ‘বুলু বারে পড়ার মতো শান্তি’ বলতে বোঝানো হয়েছে—

i. নিঃশব্দের শান্তি

ii. শান্তির বিস্তার

iii. শান্তির সৌরভ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,

দানবের সঙ্গে আজ সংঘাতের তরে।

৩. উদ্দীপকে “শান্তির গান” কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে, তা হলো—

i. অপশঙ্কির বিরুদ্ধে রংখে দাঁড়ানো

ii. অধিকার আদায়ে নবজাগরণ

iii. শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত ভাব যে অংশে প্রকাশ পেয়েছে—

ক. পৃথিবীজুড়ে আমরা চাই শান্তিকল্যাণ

খ. এই শান্তির জন্যে বাংলার দুঃখিনী মায়ের চোখে/ঘূম নেই

গ. শান্তি চাই যারা লুমুদা, আলেন্দে ও শেখ মুজিবের/নিউর মৃত্যুর জন্য কাঁদি

ঘ. এই শান্তির জন্যে মিউনিষ্ট শহরে তোলপাড় করেছি আমরা।

সূজনশীল প্রশ্ন

মাটি থেকে কবর উৎপাট একসঙ্গে সবচেয়ে লম্বা দেবদারু

যেখানে তার শিকড় ছিল আগে সেই গর্তে ফেলব ছুড়ে

আমাদের সব অন্ত্র ।

ধরিব্বী গর্তে, ধরণী তলে

পুঁতব মোরা আমাদের সব অন্ত্র, মোরা চিরতরে দেব কবর তাকে সেই গভীরে

আর পুঁতব সেই জায়গায় দেবদারু

হঁা, আসবে সময় মহা শান্তির ।

ক. “শান্তির গান” কবিতায় কোন শহরে শান্তির জন্য তোলপাড়ের কথা বলা হয়েছে?

খ. ‘আমরা হিরোশিমা-নাগাসাকির ব্যথিত আত্মা’— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. কবিতাংশে “শান্তির গান” কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উক্ত দিকটি “শান্তির গান” কবিতার মূলচেতনা প্রতিষ্ঠার একমাত্র নিয়ামক নয়— মন্তব্যটির যথার্থ্য বিচার কর ।

সমাপ্তি

২০২২-২০২৩

শিক্ষাবর্ষ

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম

বাংলা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়